নবম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৬ হইতে পৌষ, ১৩৪৬

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পরিচয়

সূচিপত্র

৯ম বর্ষ—১ম খণ্ড ; শ্রাবণ, ১৩৪৬—পৌষ ১৩৪৬

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত—

পুস্তক-পরিচয় ৯৫

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—

পুস্তক-পরিচয় ১৯৯, ২৯৮, ৩৯৬

শ্রীইন্দিরা দেবী—

রেণে-গ্রুসে-র ভারতবর্ষ ১৭৩, ২৬২, ৩৫৯, ৪১৭, ৫৫৪

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—

সিখ সম্রাট ও সতীশ সাপ ৩৮, ১১৪, ২৪২, ৩১৩, ৪২৬

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—

আজকের এই মুহূর্ত্ত (কবিতা) ৩৭৭

গলিত নখ (”) ৩৬

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়—

নির্ব্বাণ (কবিতা) ২৫০

মৃগতৃষ্ণা (”) ৫৭৩

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু—

পুস্তক-পরিচয় ৩৮৮

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—

পুস্তক-পরিচয় ২৮১, ৪৯৩

মহাপ্রস্থান (কবিতা) ৪৬৭

সনেট ২৫১

শ্রীদর্শন শর্ম্মা—

পুস্তক পরিচয় ৯৮

শ্রীধরিত্রী দেবী—

ও বাড়ীর বৌ (গল্প) ৪১[illegible]

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

পুস্তক-পরিচয় ১৯১, ২৮[illegible]

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল—

তরঙ্গ (গল্প) ৩৪৩

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী—

পুস্তক-পরিচয় ৪৮[illegible]

সুদূর প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদ ও খৃষ্টধর্ম্ম ১৪[illegible]

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—

পুস্তক-পরিচয় ১৯৩

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—

পুস্তক-পরিচয় ১৯৬

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ—

জৈন ও বাৎসাপুত্রীয় মতে আত্মবাদ ৩২৯

ক্ষণিকবাদ ৪৫১

মীমাংসামতে আত্মবাদ ২১, ১০১

শ্রীবসুধা চক্রবর্ত্তী—

পুস্তক-পরিচয় ৯০

শ্রীবিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

সোনার সিঁড়ি (কবিতা) ২১৯

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—

গ্রীক সমাজব্যবস্থার ভূমিকা ৪৯৭

শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত—

পুস্তক-পরিচয় ৪৯০, ৫৯০

শ্রীমণীন্দ্র রায়—

পরস্পর (কবিতা) ১৮৩

পুস্তক-পরিচয় ৪৯৫

শেষরক্ষা (গল্প) ৫১৪

শ্রীমঞ্জু আচার্য্য—

পরিচ্ছদ (নাটিকা) ৫৪৩

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—

অহিংসা (উপন্যাস) ৬৮, ১৬৪, ২৫২, ৩৬৮, ৪৪৩, ৫৬২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ছিন্নস্মৃতি (কবিতা) ১

রেণে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ ১৭৩, ২৬২, ৩৫৯, ৪১৭, ৫৫৪

শ্রীরমাকৃষ্ণ মৈত্র—

প্রতিপক্ষ (গল্প) ১৩৯

শ্রীরাসবিহারী দাস—

পুস্তক-পরিচয় ৪৮৬

শ্রীশোভা মহলানবীশ—

কণিকা (কবিতা) ৩৭৭

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—

পুস্তক-পরিচয় ৮৪, ২৯০, ৩৯৭, ৫৮৫

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার—

গোরা ৫২

শ্রীসমর সেন—

পুস্তক-পরিচয় ৮৯, ২৯৬

শ্রীসরসীলাল সরকার—

বঙ্গ সাহিত্যের মনঃসমীক্ষণ ২০১

মনস্তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব ৪৩৪

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী—

একটি সত্যকার প্রেমের গল্প (গল্প) ১২

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—

"আমার হয়েছে মৃত্যু" (কবিতা) ৫৭১

শ্রীসুকৃৎকুমার মৈত্র—

ওরা (কবিতা) ৩৭৮

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ—

মানুষের মন (গল্প) ২২০

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত—

পুস্তক-পরিচয় ৩৮২, ৪৭০, ৫৭৫

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—

পুস্তক-পরিচয় ৪৮২, ৫৮৮

শ্রীসুশোভন সরকার—

পুস্তক-পরিচয় ৯৩

শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র—
চারিটি বিচ্ছেদের কবিতা ২৭৭
পুস্তক-পরিচয় ২৮৫
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র—
চার অধ্যায় (কবিতা) ৩৮০
পুস্তক-পরিচয় ২০০ (ক)
বিরহ (কবিতা) ৫১
শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—
দেশ-বিদেশ ৭৮, ১৮৭
পুস্তক-পরিচয় ৩৯২, ৫৯১
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—
উপনিষদে জীবতত্ত্ব ৩০[illegible]
জীবের সাংপরায় ৪০[illegible]
পরলোকে "তর-তম" ৫৩[illegible]
বিজ্ঞানের ব্যর্থতা মোক্ষণ ৩, ১২৮, ২৩[illegible]
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ২৯২, ৪৮৮
শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী—
হারানো সুর (কবিতা) ১৮৫

৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪৬

পরিচয়

ছিন্নস্মৃতি

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস,
তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ পরে।
বামে বালুচরে
সর্বশূন্য শুভ্রতার না পাই অবধি।
ধারে ধারে নদী
কলরবধারা দিয়ে নিঃশব্দেরে করিছে মিনতি।
ওপারেতে আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দিরচূড়াপরে।
হেথা হোথা পলিমাটি স্তরে
পাড়ির নিচের তলে
ছোলাক্ষেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে;
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে।

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি'।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।
ম্লান রৌদ্রে অপরাহ্ণ বেলা
পাণ্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকাণ্ড একেলা,
অনারব্ধ সৃজনের বিশ্বকর্তাসম।

সুদূর দুর্গম
কোন্ পথে যায় শোনা
'অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদ-পরশন মাগি'।

শীতের কৃপণ বেলা যায়।
ক্ষীণ কুয়াশায়
অস্পষ্ট হয়েছে বালি।
সায়াহ্নের মলিন সোনালি
পলে পলে
বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।

বাহিরেতে বাণী মোর হোলো শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝঙ্কারে রহিল তার রেশ।
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষঃস্পন্দে কম্পমান সেই স্তব্ধরাতে
সেই সন্ধ্যাতারা।
জন্মসাথীহারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন তরে
শুধু একখানি
সূত্রচ্ছিন্ন বাণী,
সেদিনের দিনান্তের মগ্ন স্মৃতি হোতে
ভেসে যায় স্রোতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষণ

(৩)

গত বারের 'পরিচয়ে' ডাঃ ভগবান্‌দাসের 'Dire Need for a Scientist Manifesto'-প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানের ব্যর্থতা ও বন্ধ্যাত্বের (the Frustration and Prostitution of Science) আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম যে; বিবিধ বিষয়ে সাফল্য সত্ত্বেও 'Frustration is writ large on the face of modern Science'—ব্যর্থতা ও বন্ধ্যাত্ব বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গে জ্বলদ্-অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, এ যুগে বৈজ্ঞানিক প্রায়ই বিষয়ীর ভৃত্য এবং তাঁহার গবেষণার্জিত আবিষ্ক্রিয়া তিনি লোকহিতের জন্য প্রয়োগ না করিয়া, পরপীড়নে বিশেষতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের জীবঘাতী উপকরণ-উদ্ভাবনে নিয়োজিত করেন। এক কথায়—Science has outrun morals—বিজ্ঞানের প্রগতির সহিত ধর্মোন্নতির সঙ্গতি নাই। অধিকন্তু বিজ্ঞান জড়ের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতী এবং চিতের প্রতি অন্যায় অমনোযোগী—এবং বিদ্যার মধ্যে যে পরাবিদ্যা—আত্মবিদ্যা, তাহার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ। বিজ্ঞান এইরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এবং বৈজ্ঞানিক স্বার্থান্ধ হইয়া জনহিতে উদাসীন হওয়ায় জগতের কি সংকট অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে—অতঃপর তাহার আলোচনা করিব।

অনতিচিরে যে একটা বিশ্বব্যাপী মহাসমর সংঘটিত হইবে—একটা প্রকাণ্ড 'Armageddon' যে অবশ্যম্ভাবী—এ সম্পর্কে কেহই সন্দেহ পোষণ করেন না। এই ছয় মাস আগে যুদ্ধ বাধে বাধে হইয়াছিল। বৃটিশ মহামন্ত্রী অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কোনো মতে নিবারণ করিয়াছিলেন কিন্তু কদিনের জন্য ? এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি চার বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলাম*—

Save for the actual employment of arms, war already exists and the open outbreak is only a question of a few years, may be months. All the preliminaries are ready-arranged and military groupings and counter-

* See my article in 'Theosophist' for March, 1935

groupings and triple alliances and quadruple ententes are in evidence. Truly we sent the dove of peace from our ark and she has returned to us as a gas-masked gorilla.

ইহার পর বার্লিন-রোম-টোকিও 'axis' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ড-ফ্রান্স-সোভিয়েট্-সখ্য বদ্ধমূল হইতেছে। ইটালি কর্তৃক নির্মম ও নির্লজ্জ ভাবে হাবসি রাজ্য আত্মসাৎ করা হইয়াছে (rape of Abyssinia) এবং স্পেনে ও চীনে অকথ্য ধ্বংসলীলার অভিনয় চলিতেছে।*

বিগত ১৯১৪-১৮ ব্যাপী কুরুক্ষেত্রের সময় আমরা ঘোষণা শুনিয়াছিলাম—'This is a war to end war—এ যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ, ইহার পর চির শান্তি' এবং ঐ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিবার জন্যই রাষ্ট্রপতি উইলসনের প্রযত্নে 'League of Nations'—মহা-জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল—

নিভিবে সমর-দাবানল
জাতি জাতি জনে জন ভুলি বৈর চিরন্তন
দুর্বল প্রবল—
ভাই ভাই মিলি সবে এক মহাপ্রাণ
সাধিবে স্রষ্টার বিশ্ব-কার্য সুমহান্।

কিন্তু অল্পদিনেই দেখা গেল—ঐ জাতিসংঘ জাতিবর্ণধর্মলিঙ্গ-নির্বিশেষ League of Humanity নয়, 'without distinction of creed, caste, colour, nation, race, or sex—with the one steady unwavering aim of achieving Peace on Earth and Good-will among men'—উহা একটি League of whiteman-ity মাত্র, 'where hand-to-mouth politicians periodically meet and *talk* peace' and 'which

* Especially let us denounce in the strongest terms possible and without fear or favour, the unspeakable frightfulness, the rampant greed of power, the apotheosis of 'might is right', which has found painful expression in the rape of Abyssinia and the invasion of China.—Theosophy and World-Problems—by Hirendranath Datta in the Theosophist for February, 1938.

is already tottering to its fall in a sordid surrounding of inconsequence and ineptitude.'

রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা যে আশুভাবী মহাযুদ্ধের বিকট বিভীষিকার কথা জ্ঞাত নহেন তা' নয়—They are making frantic efforts to stave it off, or at least to keep it at bay। সেইজন্যই ঘন ঘন ঘটা করিয়া সন্ধির বৈঠক (Peace Conferences)—কিন্তু তাহার ফলে সন্ধি সন্নিহিত না হইয়া আরও সুদূর-পরাহত। কেন?

Instead of conferences for 'the disarmament of distrust and diplomacy' and the shedding of suspicion, we have Peace Conferences so called, where delegates meet and speak suavely to each other across the table, and carry on with impeccable "drawing-room behaviour," but returning home, having talked in terms of peace, they act in terms of war.*

এ সম্পর্কে ডাঃ ভগবান্‌দাস যথার্থই বলিয়াছেন—

But because of the radically wrong spirit of Nationalism instead of Internationalism, of territorial Patriotism instead of Humanism, which inspires and drives them all, those very efforts are bringing that horror nearer, instead of pushing it further away * * That is why Disarmament Conference held by diplomats and militarists have so ignominiously failed.

ফলে? সকল রাষ্ট্রই যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইতেছে—সর্বত্রই দামামার ধ্বনি উৎথিত হইয়াছে—সকল দেশেই কুচকাওয়াজ ও রংরুট-সংগ্রহ চলিতেছে এবং অজস্র যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্য টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হইতেছে। এ সম্পর্কে ডাঃ ভগবান্‌দাস বলিতেছেন—

The military experts of the United States of America recently made a survey and reported that the standing armies and reserves of the Great Powers totalled fifty five million men and the estimated annual

* See my article in 1935 March Theosophist.

expenditure thereon, for the year 1937, was twenty five hundred or even three thousand million pounds.

ধন ও জনের কি অন্যায্য অপব্যয়—What 'vast misemployment of men and money !' ১৯৩৭ সালের সামরিক বাজেট ৪০০০ কোটি টাকা এবং সেনা সম্ভার সাড়ে পাঁচ কোটিরও অধিক ! বর্তমান বর্ষে (১৯৩৯ অব্দে) সামরিক ব্যয়ের অঙ্ক কষিবেন কি ?

This year the combined outlays of the great Powers *for arms** are expected to reach the astronominal total of £-2,800,000,000 (অর্থাৎ ৩৬৪০০০০০০০০০০০ টাকা !)—Daily Despatch of 23rd January, 1939.

একা ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়—৬৩০০০০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯৪৫ কোটি টাকা !† কি বিরাট ব্যর্থতা !

এ সম্বন্ধে আমার পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে আমি 'this incurable war-mentality, camouflaged under mellifluous phrases'-এর উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলাম্ ঃ—

Truly each nation is in the strangle-hold of hate, and works feverishly to bring its military machine to perfection. Though the American navy was stronger than the British as well as the Japanese, two years ago her naval estimate was fixed at the colossal figure of seventy eight million pounds. This year (1935) France is spending six thousand million francs on her military budget. England, who was lagging behind in the race, is speeding up air-machine construction ; and Germany, who is unable to

* ইহা মাত্র সামরিক অপব্যয়। অন্যান্য অপব্যয়ের একটু পরিচয় শুনুন। কেবল বৃটনে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মাদক ব্যয় ২৫৯,৩৮৭,০০০ পাউণ্ড, রমণীদিগের পোষাক পরিচ্ছদে ২৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড অথচ সমগ্র শিক্ষার ব্যয় বার্ষিক মাত্র ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

† এই সেদিন অর্থ-সচিব স্যার জন সাইমন referred in Parliament to the 630 millions required for defence—as 'this stupendous figure which measures the size and effort that has to be made and which measures the whole country's determination to make it'। তবেই বলিতে হয়—Peace ! thy name is re-armament !

pay her debts, is massing an immense army behind the Rhine. Japan and Soviet Russia, armed cap-a-pie, are snarling at each other across the Amur, and may come to deadly grips any day. The nations have entered on a period of intensively competitive ship-building, and it has been calculated that five nations now spend on their fleets six times as much as was believed to suffice for the security of sever nations fifty years ago.

স্মরণ রাখিবেন, এবারের যে মহাযুদ্ধ—সে অতিশয় ভীষণ ব্যাপার হইবে—কত কোটি লোক ক্ষয় হইবে, কত কত দেশ ধ্বংস হইবে, কত কি বিভীষিকার অভিনয় হইবে, কত অনাচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবে, কত পরার্দ্ধ টাকার অপব্যয় হইবে, কত শিশু ও অনাথা সর্বস্বান্ত হইবে—তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়। এই আশুভাবী যুদ্ধের তুলনায় বিগত মহাসমর বালকবালিকার পুতুল খেলা মাত্র! চীনে ও স্পেনে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু পূর্বাস্বাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন রণপিশাচী অসংবৃত নগ্ন মূর্ত্তিতে জগৎময় মহাতাণ্ডব নৃত্য করিবে—তখন? বিগত কুড়ি বৎসরে কতই না নব নব সংহারক বোমা, বিস্ফোরক এবং রাসায়নিক যৌগিক আণবিক ও অপকৌষিক (bacteriological) উপাদান ও উপকরণ আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে এবং জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আকাশে বাতাসে কত জারণ ও মারণাস্ত্র পুঞ্জীভূত হইয়াছে।

Armaments have been piled up on land and sea and in the air and the manufacture of the chemical, synthetical and bacteriological impedimenta of modern warfare has proceeded apace.

আবার বৈজ্ঞানিকপ্রবর লর্ড রেলির মুখে সে দিন 'the terror of thermite incendiary bombs'-এর কথা শুনা গেল—spreading fire broadcast through our great cities। কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! ইহাকেই রবীন্দ্র নাথ বলিয়াছেন—'Scientific mass-production of fratricide'!

এই জন্যই ত' ডাক্তার ভগবান্‌দাস বৈজ্ঞানিককে মাথার দিব্য দিলেন—Cease to discover, invent, teach—if the politicians and the soldiers do not cease to misuse the precious knowledge.

কিন্তু বৈজ্ঞানিক যদি হিতকথায় কর্ণপাত না করে—রাষ্ট্রপতিরা যদি জাতীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে বিরত না হয়—তবে ?

তবে মানবের আসন্ন ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন বটে। কিন্তু নিরাশ হইবার কারণ নাই—'ভব যুদ্ধে ভয় কিরে জগদম্বা জননী !' মাভৈঃ—ন দেবো সৃষ্টি-নাশকঃ। একদিন না একদিন কবি ভাবুকের সংকল্পিত 'Fedaration of Man, Parliament of the World' প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে—একদিন না একদিন বিশ্ব মানবের বিরাট সংসদ্ স্থাপিত হইবেই হইবে—a true League of Nations—a League of Humanity, যেখানে (হজরত মহম্মদের ভাষায়)—All people are a single nation and all God's creatures are a family—এমন এক মহাজাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে যেখানে পৃথিবীর সমস্ত জাতি—কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য—বর্ণনির্বিশেষে ধর্মনিবিশেষে সমান সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমান অধিকার পরিচালনা করিবে—যে মহাজাতিসংঘ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সমূহের স্বাধীন সমবায় (Federation of free and self-determined States) হইবে—United States of America, Europe, Asia, or Africa. নয়—the United States of the Whole World হইবে—যে সমবায়ে জাতীয়তা ও অন্তর্জাতীয়তার চিরন্তন বিরোধ শমিত হইবে, যে সমবায়ের অঙ্গীভূত প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকিবে অথচ সমস্ত জাতি যুতসিদ্ধযোগে অঙ্গাঙ্গিরূপে মিলিত হইয়া, এক ভাবে ভাবিত হইয়া, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া, এক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া এক বিরাট সংঘাত রচনা করিবে—যে সংঘাতের ভিত্তি হইবে রাষ্ট্রীয় সৌভ্রাত্য, বন্ধনী হইবে জাতিগত ভ্রাতৃভাব,—সাধনা হইবে বিশ্বহিত, সিদ্ধি হইবে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা।

এ প্রসঙ্গে আমি আমার পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে ঐইরূপ লিখিয়াছিলাম ঃ—

When, if ever, are the war-drums to throb no longer and the battle flags to be furled ? When is there to be international justice and appeasement—the Parliament of Man and the Federation of the World ? Well, not until is established a World State, cemented by a true and living consciousness of human brotherhood ; a State not limited by national, geographical, racial or political frontiers, a State not given up to parochial patriotism

or hidebound by narrow nationalism, but a true League of Humanity, "where all peoples are a single nation," and not by any means a League of white-manity *** Such a *World State* has to be formed by the organisation of the whole world as a single Federation of States. Such a State, when formed, will be the United States, not of America, Asia or Europe, but of the entire World, wherein the constituent States, each keeping its individual uniqueness intact and developing along its own lines for the attainment of full self-realisation, will be united together in an all-embracing unity, to serve as cells in a gigantic world-organism, working together for the accomplishment of a common end, inspired by the same ideal, guided by the same spirit, and energizing for a common purpose.

এই মহান্ ব্রত গ্রহণ করিবার জন্যই ডাঃ ভগবান্‌দাস জগতের যাবতীয় বৈজ্ঞানিককে আহ্বান করিতেছেন—তিনি বলেন—Let them create and guide the new and greatest world-state, the great joint-family of all humanity। যদি বৈজ্ঞানিকের বধির কর্ণের ভিতর দিয়া এ আহ্বান মরমে প্রবেশ করে, যদি বৈজ্ঞানিকগণ 'instead of being misemployed, as they now are, under the direction of self-seeking misanthropic capitalists and militarists, they band themselves in one world-wide organisation for peace and prosperity'—তবে পৃথিবীতে আবার স্বস্তি ও শান্তির বাতাস বহিবে এবং ধন ধান্য পুষ্প ফলে সমৃদ্ধ হইয়া আমাদের এ বসুন্ধরা স্বর্গলোকের অপূর্ব্ব সম্পদ্ ও শোভা ধারণ করিবে—'the whole of the earth's surface could be made to bloom and blossom and fruit'। এ সম্পর্কে বিলাতের স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর কয়েক মাস পূর্বে* একটি মোহন চিত্র আমাদের নয়নের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন—পাঠককে তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে বলি।

"Suppose", he said, "that political confidence could be restored to Europe; suppose that there was a five-year plan immensely greater than any five-year plan that this or that particular country has attempted in

* অর্থাৎ ১৯৩৯, ১১ই মার্চ তারিখে

recent times, and that for a space of five-years there were neither wars nor rumours of wars; suppose that the peoples of Europe were able to free themselves from a nightmare that haunts them and from an expenditure upon armaments that beggers them. Could we not then devote the almost incredible inventions and discoveries of our time to the creation of a golden age, in which poverty could be reduced to insignificance and the standard of living raised to heights that we have never been able to attempt before?

বলা বাহুল্য, ঐরূপ মহাজাতিসংঘ-প্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে, বিলম্বিতক্রমে সংঘটিত হইবে—'ইচ্ছা হইল তব ভানু প্রকাশিল' এ-ভাবে হইবে না,—কিন্তু 'gradualness will be the keynote of the whole process'। অর্থাৎ, যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে রোম একদিনে গন্ধর্ব্ব নগরীর ন্যায় গড়িয়া উঠিবে না—We may be sure that this Rome will not be built in a day. It will have to be built brick by brick, stone by stone। ইতিমধ্যে যাঁহারা জগতের হিতকামী—বিশেষতঃ যাঁহারা সত্য সত্য বিজ্ঞানের সাধক—তাঁহাদের উচিত ঐ আদর্শ মানুষের সমক্ষে প্রদর্শন করা—"It is our job to familiarise the world with this high and noble ideal", এবং সুযুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করা যে ঐ আদর্শই নিসর্গের নিগূঢ় নিয়তির প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধির অনুকূল—'And to point out its spiritual basis, its philosophical justification, to show how it is in accord with what Sir Ray Lankester calls, "Nature's pre-destined plan"। নিসর্গের ঐ নিগূঢ় নিয়তি বা অভিসন্ধি কি? এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—

What is that plan? To create at all levels, higher and higher and more and more complex organisms or *Sanghatas*, in which the individual units, each with a distinct life and purpose of its own, are not merely juxtaposed, but are linked together in a vital organic Unity to subserve the purpose of the whole; until ultimately is reached the *Viswarupa* of the Vedanta—'an organism great enough to express the *Unity* of the Divine

life (immanent in the world) and complex enough to give play to all its infinite multiplicity of manifestation'.

Translate all this into terms of the State and you arrive at the ideal of the Federation of the World.'

ঐ 'বিশ্বরূপ'-রচনাই সংঘাত-সংগঠনের পরাকাষ্ঠা—চরম সার্থকতা। ঐরূপ সংঘাতে ঐক্য বিবিধকে বিলুপ্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে না। কিন্তু বিচিত্রের নানাত্বকে অব্যাহত রাখিয়া, অঙ্গাঙ্গিভাবে তাহাদিগকে সংহত করিয়া, তাহাদের মধ্যে যুতসিদ্ধ-সংযোগ (Organic unity) স্থাপন করিয়া, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, বিভক্তের মধ্যে সংহতের, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের,—ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির —এক কথায়—বহুর মধ্যে একের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্র সম্পর্কে ঐ সূত্রের প্রয়োগ করিলে আমরা যাহাকে 'World-State' বলিলাম—সেই বিশ্বমানবের বিরাট সংসদে উপনীত হই—যে সংসদে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-রূপ নিসর্গের অভিসন্ধি চরিতার্থ হইবে। এ-চরিতার্থতা কালসাপেক্ষ সন্দেহ নাই—কিন্তু কবির ভাষায় বলিতে চাই—'আসিবে সেদিন আসিবে।'*

ইতিমধ্যে কিন্তু মানব সমাজের আর একটি বিকট সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সে সমস্যা অন্ন সমস্যা, দারিদ্র্য সমস্যা, বেকার সমস্যা। এক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিকের প্রভূত করণীয় আছে—কিন্তু সে অনেক কথা, আগামী বারে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

* তত্ত্বদর্শিনী মিসেস্ বেসেণ্টও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—And gradually East and West, North and South shall make that Federation of the World, of which the poor League of Nations is a beginning in the ideal world, but which shall yet be realised in the world of men and become the Great Peace with the blessing of the Supreme upon it.—The Inner Government of the World.

একটি সত্যকার প্রেমের গল্প

আষাঢ়ের প্রথম দিবসের দেরী আছে। কিন্তু আকুল ক'রে মেঘ উঠল অপরাহ্নের দিকে। দেখতে দেখতে এল ঝড়। মাকফার্সন কোম্পানীর আপিসে সামাল-সামাল রব উঠল। খাতা পত্র আর রাখা যায় না। বেয়ারা-গুলো ছুটে ছুটে দরজা-জানালা সশব্দে বন্ধ করতে লাগল। তার পরে আরম্ভ হ'ল যত ঝড়, তত বৃষ্টি। গাছের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় মাতন লেগে গেল। নুয়ে নুয়ে পড়ে বড় বড় গাছ, বুঝি এখনই ভেঙে পড়বে। ঘন ঘন ডাকে বজ্র, ঝিলিক মারে বিদ্যুৎ—আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত। দিনকে আর দিন ব'লে চেনবার উপায় রইল না।

এক ঝলক ভিজে হাওয়া ঘরে ঢুকতেই একটি ছোকরা কেরাণী খুশি হয়ে বলল, আঃ। মন যেন জুড়ুলো।

—ওরে, জানালা বন্ধ করিস না রে। হাওয়া একটু আসতে দে।

—আজ্ঞে, সব উড়ে যাচ্ছে যে!

—উড়ুক, উড়ুক। সব উড়ুক। সেই সঙ্গে মনটাও উড়ুক।

কথাটা ছোকরা এমন ক'রে বললে যে, তার নববিবাহিত জীবনের কথা স্মরণ ক'রে অনেকেই হেসে উঠল। বর্ষার নবীন মেঘ এবং বিরহী চিত্তের কথা কে না জানে?

কথাটা বড়বাবু দামোদর সামন্তেরও কানে গেল। নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি একবার সেদিকে চাইলেন। আপন মনেই একটু হাসলেন। তারপর গম্ভীরভাবে আবার কাজে মন দিলেন।

বৃষ্টি ছাড়ল ছ'টার পরে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য সকলের ছিল না। কিন্তু বাতের কথা স্মরণ ক'রে দামোদরকে অপেক্ষা করতে হ'ল। পূবে হাওয়ায় বাত বাড়ার আশঙ্কা আছে।

তিনি যখন বার হলেন, তখন রোদনক্ষান্ত শিশু মুখের মতো আকাশে অপরূপ বর্ণসুষমা। বর্ষাস্নাত ক'লকাতা সহরের অতি কুৎসিত বাড়ীগুলিও যেন সেই আলোয় হাসছে। কোথাও কোথাও ফুটপাথগুলি ঝরা ফুলে আর ঝরা পাতায় ঢেকে গেছে।

নতুন বাজারের কাছে বড় বাবুর বাসা। আফিস থেকে এই পথটা তিনি বাতের ভয়ে আজ আর হাঁটতে সাহস করলেন না। ট্রাম বন্ধ। রাস্তায় স্থানে স্থানে জল জমে গেছে। দামোদর একখানি বাসে চড়লেন।

দোতলা বাস। কিন্তু বাস তো নয়, যেন ষ্টীমার। হেলতে, দুলতে, থামতে, থামতে, দু'দিকে জলের ঢেউ তুলে চলেছে।

নতুন বাজারের কাছে এসে দামোদর নামলেন।

লোকের পায়ে পায়ে জলে-কাদায় স্থানটি এমন হয়ে আছে যে দামোদর একবার ভাবলেন, ফিরে যাই। কিন্তু এই বর্ষা-সন্ধ্যায় ইলিশ মাছের লোভ শেষ পর্য্যন্ত সম্বরণ করতে পারলেন না। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে অতি সন্তর্পণে তিনি বাজারে ঢুকলেন।

বর্ষার হাওয়া দিলেই ইলিশ মাছের দর চ'ড়ে যায়। বহু কষ্টে, অনেক দর ক'যে দামোদর রজতকান্তি এক জোড়া ইলিশ সওদা করলেন। তাঁর মনে হ'ল সওদা সস্তাই হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ষার সুরের সঙ্গে তাঁর চিত্তের যেন যোগ ঘটল।

দামোদর খুশি হয়ে উঠলেন।

ফেরবার সময় তাঁর মনে হ'ল, সেই বাজারেই যখন এলেন, তখন কালকের বাজারটা ক'রে নিয়ে গেলে পাবেন। তাহ'লে কাল সকালে আর আসতে হয় না। একটা মোটা ঝাড়ন সব সময় তাঁর সঙ্গেই থাকে। তিনি আলু কিনলেন, পটল কিনলেন, থোড়-মোচা-উচ্ছে-ঝিঙে সব কিনলেন। বোঝা বেশ ভারি হতে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন।

—চাই কেয়াফুল !

একটা রোগা-পট্‌কা লোক কেয়াফুল বিক্রি করছে।

—কেয়াফুল চাই বাবু ?

দামোদর মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগলেন।

কেয়াফুল !

দামোদরের হাসি এল। প্রথম যৌবনে কেয়াফুল আর বেলফুলের মালার

পিছনে কি কম পয়সাটাই অপব্যয় ক'রেছেন! আজ কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। সেদিনের পুরানো বন্ধুদের কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, এখন আর কারো সঙ্গে কারো বড় একটা দেখাই হয় না। জানতো শুধু তারা। তখন মাথায় এমন টাক পড়েনি, শরীরে অনাবশ্যক মেদও জমেনি। আর বাত! সে তো সেদিনের।

আফিসের সেই ছোকরাটিকে মনে পড়ল। জোলো হাওয়ায় বেচারার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ইট-কাঠ-কড়ি-বরগা-খাতাপত্রের রুক্ষতা থেকে কোমল হাওয়ায় সে মুক্তি চায়। কিন্তু আফিসের ঘরে জোলো হাওয়া ঢোকবার যো কি! খাতাপত্র সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে!

ছেলেমান্‌ষি! দু'দিনেই সেরে যাবে অখন!

ক্ষান্তবর্ষণ শেষ অপরাহ্ণের এই অপূর্ব্ব আলো!

ঝরা ফুল! ঝরা পাতা!

কিসের একটা মিষ্টি-মিষ্টি আবছা গন্ধ!

দামোদর ভাবতে লাগলেন, প্রেমের কত রকমের প্রকাশই না আছে! প্রথম যৌবনের সেই উচ্ছল দিনগুলি আজ কোথায়! সে-ছেলেমানষি সেরে গেছে। সেই মূঢ়, অবোধ দিনগুলির কথা ভাবলেও এখন হাসি পায়! সত্যিকার প্রেমের সম্বন্ধে তখন তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না।

পূবে হাওয়া বইছিল। দামোদর বেশ ক'রে চাদরটা গলায় জড়িয়ে নিলেন।

—এই যে পাঁপর নিয়ে যান বাবু!

দামোদর চমকে চেয়ে দেখলেন, তাঁর সেই পুরানো পাঁপরের দোকান। দোকানদার সহাস্য বদনে তাঁকে আহ্বান করছে।

ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। আজকের দিনে পাঁপরটা যে নিতান্তই চাই।

—কি পাঁপর দোব বাবু?

—যেটা রোজ নিয়ে যাই।

খিচুড়ি,—ইলিশ মাছ—পাঁপর ভাজা।

দামোদরের চোখে বর্ষার সমগ্র রূপটি জ্বল জ্বল ক'রে উঠল।

কেয়াফুল! চাই কেয়াফুল!

দামোদর পাশ কাটিয়ে গলির মধ্যে ঢুকলেন।

অন্ধকার সরু গলি।

নীচের বসবার ঘরে দামোদরের বড় ছেলে সুশোভন ইতিহাসের পড়া তারস্বরে মুখস্ত করছিল :

And then Mohammad Toghlak···and then···and then··· Mohammad Toghlak···

দামোদর সশব্দে দুটি ইলিশ রান্নাঘরের সঙ্কীর্ণ বারান্দায় নামালেন। তার সঙ্গে তরকারীর বোঝা।

—কই গো!

শব্দ পেয়ে গৃহিণী তাড়াতাড়ি নেমে এলেন।

—ও মা! ইলিশ মাছ এনেছ!

গৃহিণী পরম স্নেহে মৎস্যযুগলকে হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। খুশিতে তাঁর সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—বেশ টাটকা। গঙ্গার ইলিশ?

—কি জানি। বললে তো।

কাঁচা সোনার মতো দেহের বর্ণ। মুখখানি ভারী হয়ে এসেছে। অনেক দিন পরে দামোদর চেয়ে দেখলেন, নাতি দীর্ঘ দেহ আগের চেয়ে একটুখানি স্থুল হয়েছে। চোখের সে চটুলতাও নেই।

দামোদরের মনে হ'ল, তার চেয়ে এ ভালো।

ছেলেমানুষি!

—পাঁপর আননি?

—কি মনে হয়?

—এনেছ।—গৃহিণী হাসলেন।

—কি ক'রে জানলে?

—তা আর জানি না! তুমি পেটুক চূড়ামণি যে!

দুজনেই হাসলেন।

—আজ খিচুড়ি হয়নি কিন্তু।

—যাও, যাও। গন্ধ পাচ্ছি স্পষ্ট।

—এর মধ্যে গন্ধও নাকে গিয়েছে ?

—কিন্তু গন্ধ যদি নাও পেতাম, তবুও বলতে পারতাম সুরমা যে,···

অনেকদিন পরে স্বামীর মুখে নিজের নামটা শুনে সুরমা চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, চুপ। ছেলেরা রয়েছে।

দামোদর থমকে গেলেন। অনেকদিন পরে তাঁরও মুখ দিয়ে নামটা কি রকম অজান্তে বেরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন।

ছেলেমান্‌ষি !

কথাটা ঘোরাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন, মণ্টু কেমন আছে ?

—ভালো। দুপুর থেকেই জ্বরটা নেই।

—ইনফ্লুয়েঞ্জা আর কি।

—তাই হবে। বিকেল বেলায় একটা বেদানার জন্যে কী কান্না ! একটা আনিয়ে দিলাম।

—বেশ ক'রেছ।

দামোদর গামছা কাঁধে ফেলে কলঘরের দিকে চললেন।

—ওকি ! এই রাত্রে চান হবে নাকি ?

—না, চান নয়। মানে কাপড়টাতে এমন কাদা লেগেছে···

—কলতলায় ছেড়ে রেখে এস। আমি কেচে দোব এখন।

—কিন্তু গায়েও লেগেছে যে ! সেটা তো আর কলতলায় ছেড়ে রেখে আসা যাবে না !

—না। সেটা ভিজে গামছা দিয়ে নিজেই মুছে নিতে হবে।

—তাই বলছিলাম।

—কিন্তু চান চলবে না।

—না, চান কেন।

গরম-গরম চা আর পাঁপর-ভাজা।

দামোদরের শরীরটা সুস্থ হ'ল। পূবে-হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজ পড়েছে। সুরমা তোয়াজটা জানেন। তাঁকে যেন ঠিক

আঙুরের মতো তুলোয় শুইয়ে রেখেছে। একটি দিন সুরমা না থাকলে দামোদরের কি অবস্থা ঘটতে পারে, সেই কথাটা দামোদর চোখ বন্ধ ক'রে ভাবতে চেষ্টা করলেন। ওঃ! গ্রীষ্মের দিনে হাওয়া বন্ধ হ'লে যে অবস্থা হয় তেমনি। বাইরের দিক দিয়ে সুরমা একটু স্থূল হয়েছেন। কিন্তু ভিতরের দিক দিয়ে এমন সূক্ষ্মভাবে তাঁকে বেঁধে ফেলেছেন! অত্যন্ত সূক্ষ্ম বাঁধন, মাকড়সার জালের মতো,—কিন্তু অত্যন্ত শক্ত।

দামোদর চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে পান মুখে দিতে যাচ্ছিলেন। নীচের থেকে সুরমা হেঁকে বললেন, পান মুখে দিও না কিন্তু।

—কেন ?

—দরকার আছে।

সুরমা একটা প্লেট হাতে উপরে এলেন।

—দেখ তো এই কাটলেটটা কি রকম হয়েছে ?

—কাটলেট !—খুশিতে দামোদর যেন উথলে উঠলেন,—চিংড়ি মাছ আবার কখন আনালে ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি ? আমি বুঝি তোমার ইলিশ মাছের ভরসায় ব'সে ছিলাম ?

সে ঠিক।

—কেমন হয়েছে ?

—চমৎকার !

সুরমার ঈষদুন্মুক্ত কটিদেশের ত্রিবলী দেখা যাচ্ছে। একটু স্থূল হয়েছে। তা হোক।

মণ্টু আস্তে আস্তে কোলে এসে বসল।

—বেদানা খেয়েছ ?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানালে খেয়েছে।

—কখন খেলে ?

—একটু পরে।

মানে, একটু আগে। আট বছরের ছেলে মণ্টু ওই রকম উলটো-পালটা কথা কয়।

অনুযোগের সুরে মণ্টু বললে, তোমার আফিস থেকে ফিরতে এত দেরী হয় কেন বাবা ?

—বৃষ্টি হচ্ছিল যে।

মণ্টু ব্যাপারটা বুঝলে। বললে, হুঁ।

বললে, দিনে কী গরম পড়েছিল বাবা !

—হুঁ।

—মা কি বলছিল জান ?

—কি বলছিল ?

—বলছিল, অঘ্রাণের গরমে ঘরের ডাক বাইরে করবে।

দামোদর হেসে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ, অঘ্রাণে ভীষণ গরমই পড়ে !

মণ্টু কি শুনতে কি শুনেছে। ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ তার কাছে উভয়ই সমান অপরিচিত।

মিনতির সুরে বললে, তখন একখানা পাখা নিও বাবা।

—নিশ্চয়।

মণ্টুরও দোষ নেই। সারাদিন জ্বরাক্রান্ত দেহে অসহ্য গরমে বেচারা ছটফট ক'রেছে। এখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাবার কোলেই সে ঝিমুতে লাগল। দামোদর সন্তর্পণে তাকে ঘরের মধ্যে তার ছোট বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এলেন।

এই ক'দিনের জ্বরেই বেচারার দেহে কাঁটাখানি সার হয়েছে। চলতে গেলে টলছে। চোখ সকল সময়ই যেন ঝিমিয়ে আসছে। কণ্ঠস্বর মৃদু এবং ভ্রান্ত। ওর একটা ভালোরকম চিকিৎসা প্রয়োজন।

নীচে জ্যেষ্ঠ পুত্র তখনও মহম্মদ তোগলককে নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। কিছুতেই সেই পরলোকগত দুর্দ্দান্ত পাঠান সম্রাটকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছে না। দামোদরের নিজেরও ঢুল আসছিল। কিন্তু পুত্রের চীৎকারে নিদ্রার সূত্র বারে বারেই ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। অভ্যাস বশে গড়গড়ায় টান দিলেন। আগুন নিবে গেছে।

অগত্যা দামোদর নীচে গেলেন।

সুরমা তখন হাতা-বেড়ি-খুন্তি নিয়ে খুব ব্যস্ত। দামোদরের পায়ের শব্দে একবার পিছনে চেয়েই বললেন, আর দেরী নেই। ইলিশ মাছের ডিমের চাটনীটা ফুটছে। এইটে নামলেই হয়।

দামোদর চৌকাঠে দুই হাত দিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন, তার জন্যে নয় একলা ব'সে থাকতে কি রকম ভালো লাগল না। তাই নেমে এলাম।

সুরমা আড় চোখে চেয়ে হেসে একটা চুমকুড়ি কাটলেন।

বললেন, তুমি এক কাজ কর বরং। ওই আসনটা পেতে বোসো। তুমি খেতে খেতে চাটনী হয়ে যাবে।

—সেই ভালো। চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না।

—তা কি আর জানি না? তুমি যে একটি পেটুকরাম।

দামোদর পরমোৎসাহে আসন পেতে বসলেন। সুরমা থালায় ক'রে খিচুড়ি বেড়ে দিলেন।

ওঃ! এ যে একেবারে বর্ষাউৎসব। ইলিশ মাছ দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি, আলু ভাজা, পটল ভাজা, কাটলেট, আলু-পটলের ডালনা, ইলিশ মাছ ভাজা, মাছের ঝাল, এর পরে চাটনী আছে।

দামোদর বললেন, পুঁই শাকের চচ্চড়ি খেয়েছিলাম রাঙা মামীমার কাছে। আজকের চচ্চড়ি খেয়ে সেই কথা মনে পড়ল।

—ভালো হয়েছে?

—চমৎকার হয়েছে?

—নেবে আর একটু?

—না, না। সব রান্নাই চমৎকার হয়েছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের মহম্মদ তোগলককে আয়ত্তে আনতে বেশী দেরী হ'ল না। পড়া শেষ ক'রে মায়ের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া তার বরাবর অভ্যাস। নইলে তার পেট ভরে না।

ঝির ঝিরে মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। দিনের প্রচণ্ড গরমের পরে ধরণী যেন শীতল হয়েছে।

সুরমা যখন শোবার ঘরে এল দামোদরের তখন মহাসমারোহে নাক ডাকছে। ভোজন-শ্রান্ত দামোদর সুশীতল বর্ষারাত্রে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিদ্রামগ্ন।·· কোলের কাছে নরম পাশ বালিশ। গড়গড়ার নলটি তখনও মুঠোর মধ্যে।·

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

মীমাংসামতে আত্মবাদ (১)*

ন্যায়দর্শনকল্পিত আত্মবাদের আলোচনা ও খণ্ডনের পরেই শান্তরক্ষিত মীমাংসাদর্শনোক্ত আত্মবাদের সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাহার পর সাংখ্য, বেদান্ত, দিগম্বর ও বাৎসীপুত্রীয় মতের আত্মবাদও "তত্ত্ব-সংগ্রহে" যথারীতি আলোচিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনের আত্মবাদ খণ্ডনে শান্তরক্ষিত যে পরিমাণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন বেদান্তমত খণ্ডনের জন্য সে-পরিমাণে কিছুই করেন নাই। ইহা হইতে কি অনুমান করিতে হইবে যে শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে ভারতীয় সমাজে বেদান্তের তেমন প্রতিষ্ঠা হয় নাই? সাংখ্যের আত্মবাদও যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে তাহা নহে; তবে বলা যাইতে পারে "তত্ত্ব-সংগ্রহে"র প্রথমেই সৎকার্য-বাদের আলোচনায় এ-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। বাৎসীপুত্রীয় মতের আলোচনার প্রতি দর্শনামোদী সকলেই অবহিত হইবেন, কারণ যতদূর জানি এই শাখার বৌদ্ধ দার্শনিকদের কোন গ্রন্থই আর পাওয়া যায় না।

বর্তমান ও অনুবর্তী প্রবন্ধে কেবল মীমাংসা-পরিকল্পিত আত্মবাদের আলো-চনা হইবে। যজ্ঞকর্মাদির ফলের প্রতি অপরিসীম আস্থাই ছিল মীমাংসকগণের বিশেষত্ব; কিন্তু এক জীবনের মধ্যেই যজ্ঞের ফলাফল তো বিশেষ বুঝা যায় না। সুতরাং মীমাংসকগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে এক জন্মের যজ্ঞকর্মাদির ফল অন্য জন্মে ভোগ করাই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিবিধ জন্মের মধ্যে যদি কোন যোগই না থাকে তবে এই ভোগ কিরূপে সম্ভব হইবে? সুতরাং বিবিধ জন্মের সংযোজক একটি আত্মা স্বীকার না করিলে বেদের কর্মকাণ্ডই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাই মীমাংসকদিগের প্রধান যুক্তি হইলেও যে একমাত্র যুক্তি নহে তাহা এতৎসম্পর্কে শান্তিরক্ষিতের প্রথম কারিকা হইতেই বুঝা যায়:—

ব্যাবৃত্ত্যনুগমাত্মানমাত্মানমপরে পুনঃ।
চৈতন্যরূপমিচ্ছন্তি চৈতন্যং বুদ্ধিলক্ষণম্॥ ২২২॥

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture No. 13

অর্থাৎ, অপরে (মীমাংসকগণ) বলিয়া থাকেন, যে ব্যাবৃত্তি (exclusion) ও অনুগম (inclusion) রূপ চৈতন্যই হইল আত্মার প্রকৃতি, এবং এই চৈতন্যই হইল বুদ্ধি। কারিকাটি খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু কমলশীল সুন্দররূপে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

ব্যাবৃত্তি বলিতে কি বুঝায় ? এতদ্দ্বারা বুঝায় সুখ দুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থার পরস্পর ভেদ। এবং অনুগম বলিতে বুঝায় চৈতন্য; দ্রব্যত্ব, সত্ত্ব প্রভৃতি, যদ্দ্বারা এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সাদৃশ্যই অনুমিত হইতে পারে কিন্তু পার্থক্য নিরূপিত হয় না। এই ব্যাবৃত্তি ও অনুগম যাহার স্বভাব তাহাই হইল আত্মা (অর্থাৎ আত্মা = intelligence)। ফলকথা এই যে, যে-চৈতন্য সুখাদিরূপে ব্যাবৃত্ত (individual) এবং সত্ত্বাদিরূপে অনুগত (generic) বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাই হইল জৈমিনীয়দিগের মতে আত্মা।* সাংখ্যেরা যে বলিয়া থাকেন এই চৈতন্য বুদ্ধি হইতে পৃথক্—তাহা কিন্তু ঠিক নহে।† কি তবে ঠিক ? বুদ্ধিই হইল চৈতন্য। বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত অপর কোন প্রকার চৈতন্য স্বীকার করা যায় না।—এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় প্রথমতঃ এই যে আমাদের মত প্রাচীন দার্শনিকগণও সাংখ্যের অচেতন বুদ্ধি লইয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন। আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের এই অযৌক্তিতার কারণ খুব সম্ভব এই যে প্রকৃতির উপর পুরুষের আরোপ সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে ঘটিয়াছিল, যে-জন্য সান্বয় প্রকৃতিকে সাংখ্যগণ অচেতন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হইবে যে কমলশীল—বোধ হয় এই বিশেষ স্থলে বিশেষ কোন তারতম্য ঘটিবে না মনে করিয়াই—চৈতন্য ও বুদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। ইহা কিন্তু ঠিক নহে, কারণ চৈতন্য বা বিজ্ঞান বলিতে বুঝায় consciousness, কিন্তু বুদ্ধির অর্থ cognition বা discriminating intelligence—ইহা শান্তরক্ষিতের নিজের কথা হইতেই বুঝা যাইবে।

কিন্তু একই আত্মাতে ব্যাবৃত্তি ও অনুগম রূপ দুইটি বিরুদ্ধ স্বভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? তাহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন :—

---

* সুখাদিরূপেণ ব্যাবৃত্তং সত্ত্বাদিরূপেণানুগতমাত্মানং চিদ্রূপমপরে জৈমিনীয়া বর্ণয়ন্তি।

† তচ্চ চৈতন্যং ন বুদ্ধিব্যতিরেকেণান্যৎ, যথা সাংখ্যৈরিষ্যতে।

যথাহেঃ কুণ্ডলাবস্থা ব্যপৈতি তদনন্তরম্।
সংভবত্যার্জবাবস্থা সর্পত্বং ত্বনুবর্ততে ॥ ২২৩ ॥
তথৈব নিত্যচৈতন্যস্বভাবস্যাত্মনোঽপি ন।
নিঃশেষরূপবিগমঃ সর্বস্যানুগমোঽপি বা ॥ ২২৪ ॥
কিন্তস্য বিনিবর্তন্তে সুখদুঃখাদিলক্ষণাঃ।
অবস্থাস্তাশ্চ জায়ন্তে চৈতন্যং ত্বনুবর্তন্তে ॥ ২২৫ ॥

অর্থাৎ, একই সর্প কুণ্ডলাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ঋজু অবস্থা অবলম্বন করিলেও সর্পত্ব যেমন অক্ষুণ্ণই থাকে, সেইরূপ নিত্য চৈতন্যস্বভাব আত্মা আপন রূপ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগও করে না অথবা সমগ্রভাবে অক্ষুণ্ণও রাখে না। আত্মার সুখদুঃখাদি রূপ অবস্থা নিয়তই নিবৃত্ত ও পুনরায় উদ্ভূত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য সমভাবেই সর্বাবস্থায় অনুবৃত্ত হইতে থাকে।—এখানে শান্তরক্ষিত স্পষ্টই বলিতেছেন চৈতন্য ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু সে পার্থক্য অবস্থাভেদের উপর নির্ভর করিতেছে; সর্পকুণ্ডলের উপমা হইতে বুঝা যায় যে সেই অবস্থাভেদ সম্পূর্ণরূপে স্বগত অথবা subjective। কিন্তু ইহাও ঠিক বলিয়া মনে হয় না, কারণ নির্বিষয় বুদ্ধিই হইল চৈতন্য এবং সবিষয় চৈতন্যই হইল বুদ্ধি। কমলশীল টিপ্পনীতে প্রয়োজনীয় কথার মধ্যে কেবল মাত্র বলিয়াছেন, আত্মা কোন অবস্থাতেই আপন স্বভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তও হয় না আবার নৈয়ায়িকাদির পরিকল্পিত পন্থায় কৃৎস্ন স্বভাব সহকারে অনুবৃত্তও হয় না।

বৌদ্ধের মত সর্বত্র নিরন্বয় বিনাশ এবং পূর্ণ ব্যাবৃত্তি (particularism) অথবা নৈয়ায়িকের মত অপরিবর্তিত এবং সর্বানুগত চৈতন্য স্বীকার করিতে বাধা কি? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে :—

স্যাতাং হ্যত্যন্তনাশে হি কৃতনাশাকৃতাগমৌ।
সুখদুঃখাদিভোগশ্চ নৈব স্যাদেকরূপিণঃ ॥ ২২৬ ॥

অর্থাৎ, চৈতন্য বা আত্মার যদি সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে তাহা হইলে কৃত কর্ম্মের নিষ্ফলতা এবং অকৃত কর্মের ফলদায়কত্ব স্বীকার করিতে হয়; আত্মা যদি আকাশের মত সর্বকালে সর্বাবস্থায় একরূপ ও অপরিবর্তিত থাকে তবে সে আত্মার কৃতকর্মের ফল স্বরূপ সুখদুঃখাদির ভোগই সম্ভব হইবে না। সুতরাং

স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার পূর্ণ বিনাশ এবং অবিকল অনুবৃত্তি—এই দুইই অসম্ভব। এই জন্যই কুমারিল বলিয়াছেন ঃ—

তস্মাদুভয়হানেন ব্যাবৃত্ত্যনুগমাত্মকঃ।
পুরুষোঽভ্যুপগন্তব্যঃ কুণ্ডলাদিষু সর্পবৎ॥

এখন আপত্তি উঠিতে পারে, একদিকে আত্মার পূর্ণ বিনাশ অসম্ভব, অপর দিকে আত্মার অবিকল অনুবৃত্তিও অসম্ভব; এ ক্ষেত্রে কি আত্মার বিবিধত্বই স্বীকার করা হইল না? এবং তাহাই যদি হয় তাহা হইলে কিরূপে আর বলা যায়, কর্মের কর্তা যে কর্মফলের ভোক্তাও সেই? সুতরাং এক্ষেত্রেও কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম রূপ দোষ আসিয়া পড়িতেছে।—ইহার উত্তরে বলা হইতেছে ঃ—

ন চ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে পুংসোঽবস্থাঃ সমাশ্রিতে।
ততোঽবস্থাসু তত্ত্বাৎ কর্তৈবাপ্নোতি তৎফলম্॥ ২২৭॥

অর্থাৎ, আত্মার কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব আত্মার বিবিধ অবস্থার উপরে নির্ভর করে না; সুতরাং বিবিধ অবস্থার মধ্যেও সেই কর্তাই ফললাভ করিতে পারেন।—কমলশীল আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে যাঁহারা আত্মা এবং আত্মার অবস্থা বিভিন্ন বলিয়া মনে করেন তাঁহাদেরই পক্ষে ঐরূপ আপত্তি করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু আত্মাই কর্তা এবং ভোক্তা, আত্মার অবস্থা নহে, —সেই হেতু আত্মাই যে অবস্থা বিপর্যয় সত্ত্বেও ফললাভ করিয়া থাকেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই আত্মার সাধক (direct) প্রমাণ দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

পুমানেবংবিধশ্চায়ং প্রত্যভিজ্ঞানভাবতঃ।
প্রমীয়তে প্রবাধা চ নৈরাত্ম্যস্যামুনৈব হি॥ ২২৮॥

অর্থাৎ, আত্মা যে এইরূপ তাহা প্রত্যভিজ্ঞা (self-cognition) হইতেই প্রমাণিত হয়, এবং নৈরাত্ম্যবাদের অসারতাও এতদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়।— "আমি" জানিয়াছি, "আমি" জানিতেছি,—এই প্রকারের বিবিধ প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে যে একই কর্তার পরিচয় পাওয়া যায় সেই কর্তাই হইল আত্মা।—কিন্তু এক প্রত্যভিজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই কি আত্মবাদের প্রতিষ্ঠা এবং নৈরাত্ম্যবাদের

খণ্ডন সম্ভব? পূর্বপক্ষীর হইয়া এই প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর শান্তরক্ষিত নয়টি কারিকায় দিয়াছেন ঃ—

অহং বেদ্মীত্যহংবুদ্ধির্জ্ঞাতারং প্রতিপদ্যতে।
স চাত্মা যদি বা জ্ঞানং স্যাদেকান্তবিনশ্বরম্॥ ২২৯ ॥
যদ্যাত্মা বিষয়স্তস্যাশ্চতুরস্রং তদাঽখিলং।
ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষে তু সর্বমেবাতিদুর্ঘটম্॥ ২৩০ ॥
তথা হি জ্ঞাতবান্ পূর্বমহমেবং চ সম্প্রতি।
অহমেব প্রবেদ্মীতি যা বুদ্ধিরুপজায়তে॥ ২৩১ ॥
তস্যা জ্ঞানক্ষণঃ কো নু বিষয়ঃ পরিকল্প্যতে।
অতীতঃ সাম্প্রতঃ কিং বাসাবাথ সন্ততিঃ॥ ২৩২ ॥
তত্রাদ্যে বিষয়ে জ্ঞানে জ্ঞাতবানিতি যুজ্যতে।
জানামীতি ন যুক্তং চ নেদানীং বেত্ত্যসৌ ততঃ॥ ২৩৩ ॥
বর্তমানে তু বিষয়ে প্রবেদ্মীত্যুপপদ্যতে।
জ্ঞাতবানিত্যসত্যং তু নৈবাসীৎ প্রাগিদং যতঃ॥ ২৩৪ ॥
অতএব দ্বয়ং গ্রাহ্যং নৈব তস্যাঃ প্রকল্প্যতে।
ন হ্যুভৌ জ্ঞাতবন্তৌ বা জানীতো বাধুনা পুনঃ॥ ২৩৫ ॥
সন্তানোঽপি ন তদ্বাহ্যো দ্বিতয়স্যাপ্যসংভবাৎ।
ন হ্যসৌ জ্ঞাতবান্ পূর্বমবস্তুত্বান্ন বাধুনা॥ ২৩৬ ॥
তস্মাদয়মহংকারো বর্ততে যত্র গোচরে।
উক্তাদন্যত্র সিদ্ধোঽসাবাত্মা শাশ্বতরূপবান্॥ ২৩৭ ॥

অর্থাৎ, "আমি জানি" এই প্রকার বুদ্ধির মধ্যে যে অহংবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতেই এক জ্ঞাতার অস্তিত্বও প্রতিপন্ন হয়। এখন এই অহংবুদ্ধি জ্ঞাতারূপে আত্মাও হইতে পারে, অথবা আপনাদিগের (অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের) পরিকল্পিত একান্ত বিনশ্বর ক্ষণিক জ্ঞানও হইতে পারে (কমলশীল)। আত্মাই এই অহংবুদ্ধির বিষয় হইলে আর কোন বিবাদই থাকে না (চতুরস্রং তদাখিলং)। কিন্তু অহংবুদ্ধি বলিতে যদি ক্ষণিক জ্ঞান বুঝায় তাহা হইলেই সমস্ত দুর্ঘট হইয়া পড়ে। কারণ "যে আমি পূর্বে

জানিয়াছিলাম সেই আমিই সম্প্রতিও জানিতেছি”—এই প্রকার যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে জ্ঞানক্ষণ কোন্‌টি এবং সেই জ্ঞানের বিষয়ই বা কি? অতীত জ্ঞানের মুহূর্তকেই জ্ঞানক্ষণ বলিব না সাম্প্রতিক যে জ্ঞানক্ষণে অতীত জ্ঞানের কথা মনে হইতেছে তাহাকেই জ্ঞানক্ষণ বলিব? অথবা বলিব অতীত হইতে বর্তমান ক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানসন্ততির একটি ধারা চলিয়া আসিতেছে?* অতীত জ্ঞানের মুহূর্তকেই যদি জ্ঞানক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অবশ্য “আমি পূর্বে জানিয়াছিলাম” এ-কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু সে-সম্বন্ধে আর বলা যায় না “সেই আমিই সম্প্রতিও জানিতেছি”, কারণ জ্ঞানক্ষণ একই সঙ্গে অতীতে ও বর্তমানে প্রযুক্ত হইতে পারে না; এবং জ্ঞাতার ঐ কথা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে বর্তমান মুহূর্তে কোন জ্ঞানকর্ম ঘটিতেছে না। আবার সাম্প্রত জ্ঞানের মুহূর্তকে প্রকৃত জ্ঞানক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলেও অতীত জ্ঞানের পক্ষ হইতে অনুরূপ আপত্তি হইবে।

জ্ঞানের বিষয় যখন সম্মুখে বর্তমান তখনই বলা যাইতে পারে “আমি জানিতেছি”; কিন্তু তৎসম্বন্ধে বলা যাইবে না “আমি জানিয়াছি,” কারণ জ্ঞায়মান বিষয়টি অতীতে বর্তমান ছিল না। সুতরাং বুদ্ধির একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের জ্ঞান কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। আবার এ-কথাও বলা যায় না যে উভয় জ্ঞানক্ষণই অতীতের অথবা উভয় জ্ঞানক্ষণই বর্তমানের। (সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে একজন পূর্বে জানিয়াছিল, অপর একজন বর্তমানে জানিতেছে—কমলশীল।) আর জ্ঞানসন্ততিও অহংবুদ্ধির বিষয়রূপে পরিগণিত হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানসন্ততি হইল কল্পিত এবং বস্তুধর্মবিহীন; অথচ অহংবুদ্ধি বস্তুধর্মহীন নহে; সুতরাং এই জ্ঞান-সন্তানের পক্ষে পূর্ব জ্ঞান এবং বর্তমান জ্ঞান উভয়ই অসম্ভব। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে উক্ত প্রকার জ্ঞান ব্যতিরিক্তও অন্যত্র যেখানে অহংবুদ্ধি বর্তমান তাহাই হইল শাশ্বতরূপ আত্মা।

কিন্তু এই আত্মার শাশ্বত রূপ কিসে প্রমাণিত হয়? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে:—

* শান্তরক্ষিত কারিকায় অতীত, সাম্প্রত ও সন্ততি—এই তিন পক্ষের কথা বলিয়াছিলেন; কমলশীল কিন্তু অতীতসাম্প্রত নামক এক চতুর্থ পক্ষের কথাও উত্থাপন করিয়াছেন।

ব্যতীতাহং কৃতিশ্চান্যো জ্ঞাতাত্মাপ্যনুবর্ততে।
অহম্প্রত্যয়গম্যত্বাদিদানীন্তনবোদ্ধৃবৎ ॥ ২৩৮ ॥
এষ বা হ্যস্তনো জ্ঞাতা জ্ঞাতৃত্বাত্তত এব বা।
হ্যস্তনজ্ঞাতৃবত্তেষাং প্রত্যয়ানাং চ সাধ্যতা ॥ ২৩৯ ॥

এই কারিকাদ্বয়ের ভাষা কিয়ৎপরিমাণে অসংলগ্ন হইলেও কমলশীলের "পঞ্জিকা"র সাহায্যে সহজেই অর্থ বুঝিতে পারা যায়। শান্তরক্ষিত এখানে বলিতেছেন, অতীত অহংবুদ্ধির আদি জ্ঞাতাই আজ পর্যন্ত অনুবৃত্ত হইয়া আসিতেছে, কারণ ইদানীন্তন বোদ্ধার ন্যায় পূর্বের জ্ঞাতাও ছিল অহংবুদ্ধিরই বিষয়। অথবা এই অহংবুদ্ধির জন্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ইদানীন্তন বোদ্ধাই ছিল পূর্বের জ্ঞাতা, কারণ এই অনুমানেও ঐ সকল প্রত্যয়ের ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্বপক্ষের শেষ কারিকায় বলা হইতেছে :—

একসন্তানসম্বন্ধজ্ঞাত্রহম্প্রত্যয়ত্বতঃ।
হ্যস্তনাদ্যতনাঃ সর্বে তুল্যার্থা একবুদ্ধিবৎ ॥ ২৪০ ॥

অর্থাৎ জ্ঞাতার অহংপ্রত্যয় যেহেতু একই বিজ্ঞানসন্তানের সহিত সম্বন্ধ, সেই হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ব কালের এবং অদ্যকার সমস্ত অহংবুদ্ধিই তুল্যার্থ—অর্থাৎ তাহাদের বিষয় অভিন্ন (কমলশীল), এবং এই তুল্যার্থতা যে কিরূপ তাহাই কারিকায় "একবুদ্ধিবৎ" এই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ, "একটি" জ্ঞানের মধ্যে যেরূপ জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে কোন দ্বৈতভাব থাকে না, পূর্ব হইবে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিবিধ অহংবুদ্ধির মধ্যেও সেইরূপ একবিষয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে।—কারিকায় "একসন্তানসম্বন্ধ" এই বিশেষণ প্রয়োগ করার সার্থকতা কমলশীল বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বিবিধ ব্যক্তির মধ্যে বিবিধ অহংপ্রত্যয় রহিয়াছে; কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির অহংবুদ্ধির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা পূর্বপক্ষীর উদ্দেশ্য নহে। মীমাংসক কেবল দেখাইতে চাহেন যে একই বিজ্ঞান সন্ততির সহিত সম্বদ্ধ জ্ঞাতা বিভিন্ন ক্ষণেও অভিন্ন।—ইহার পরই "তত্ত্বসংগ্রহে" বিজ্ঞানবাদের পক্ষ হইতে মীমাংসা মত খণ্ডনের জন্য দীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

উত্তর পক্ষের প্রথম কারিকা এই ঃ—

তদত্র চিন্ত্যতে নিত্যমেকং চৈতন্যমিষ্যতে ।
যদি বুদ্ধিরপি প্রাপ্তা তদ্রূপৈব তথা সতি ॥ ২৪১ ॥

অর্থাৎ চৈতন্য (consciousness) যদি নিত্য ও একরূপ হয়, তবে পূর্বপক্ষীর মতে বুদ্ধি যেহেতু চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহে সেই হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে বুদ্ধিও (intelligence) তদ্রূপ।—ইহা কিন্তু পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত নহে, কারণ একথা মীমাংসকের প্রতিজ্ঞারই বিরুদ্ধ। ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিয়াছেন "সেই বুদ্ধি ক্ষণিক হওয়ায় পরমুহূর্তে আর বর্তমান থাকে না,"* এবং সূত্রকার জৈমিনিও বলিয়াছেন "সদ্বস্তুর সহিত মানুষের ইন্দ্রিয়াদির সংযোগের ফলে যে বুদ্ধির উৎপত্তি হয় তাহাই প্রত্যক্ষ"।† আবার এ-কথা কুমারিলের নিজের বচনেরই বিরুদ্ধ, কারণ তিনি বলিয়াছেন "এই বুদ্ধি ক্ষণমাত্রও স্থায়ী হয় না ; এমনকি অপ্রমা রূপেও ইহার উপযোগিতা নাই, যাহাতে পরে ইন্দ্রিয়াদির মত ইহা অর্থ গ্রহণে কার্যকরী হইতে পারে।"‡ উপরন্তু বুদ্ধি যদি একরূপই হয় তাহা হইলে ষড়্‌বিধ প্রমাণের সহিত তাহার অসামঞ্জস্য ঘটিবে। তাহার উপর একরূপ বুদ্ধি প্রত্যক্ষের দ্বারাও সমর্থিত হয় না, কারণ স্পষ্টই অনুভব করা যায় যে নিরন্তর নানাবিধ চিন্তার অনুযায়ী বিবিধ বুদ্ধি প্রকট হইয়া আবার লোপ পাইতেছে।

কুমারিল এই বিরোধরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিয়াছেন ঃ—

বুদ্ধীনামপি চৈতন্যস্বাভাব্যাৎ পুরুষস্য চ ।
নিত্যত্বমেকতা চেষ্টা ভেদশ্চেদ্বিষয়াশ্রয়ঃ ॥ ২৪২ ॥

অর্থাৎ, বুদ্ধি ও আত্মা উভয়ই যখন চৈতন্যস্বভাব তখন বুদ্ধি ও আত্মার একত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করাই উচিত ; এতদ্দ্বয়ের মধ্যে যে ভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহা বিষয়গত, আত্মগত নহে।

কিন্তু কুমারিলের কথামত বুদ্ধি যদি বাস্তবিকই নিত্য ও একরূপ হয় তবে বিবিধ রূপাদির ক্রমানুযায়ী অনুভূতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বুদ্ধিতে

---

* ক্ষণিকা হি সা ন বুদ্ধ্যান্তরকালমবতিষ্ঠতে।

† সৎসংযোগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎ প্রত্যক্ষমিতি।

‡ ন হি তৎক্ষণমপ্যাস্তে জায়তে বা প্রমাত্মকম্। যেনার্থগ্রহণে পশ্চাদ্ব্যাপ্রিয়েতেন্দ্রিয়াদিবৎ ॥

কোন ভেদই যদি না থাকে তবে সমস্তই এক মুহূর্তেই অনুভূত হইয়া যাওয়ার কথা।—ইহার উত্তরে মীমাংসক বলিতেছেন ঃ—

স্বরূপেণ তথা বহ্নির্নিত্যং দহনধর্মকঃ।
উপনীতঃ দহত্যর্থং দাহ্যং নান্যন্ন চান্যদা ॥ ২৪৩ ॥

অর্থাৎ, অগ্নির ধর্ম দাহ করা ; কিন্তু সেই জন্যই কি যে-কোন অগ্নি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দহন করিয়া দিতে পারে ? সমস্তই দহন করিবার শক্তি অগ্নির থাকিলেও যাহা দাহ্য এবং সন্নিহিত তাহাই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে। সেইরূপ বুদ্ধিরও সমস্ত এককালীন গ্রহণ করিবার শক্তি থাকিলেও স্থান ও কালানুযায়ী যাহা সন্নিহিত তাহাই কেবল উপলব্ধ হইয়া থাকে।—পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে এই কথাই আরও মনোহর উপমা সহকারে বলা হইয়াছে ঃ—

যথা বা দর্পণঃ স্বচ্ছো যথা বা স্ফটিকোপলঃ।
যদেবাধীয়তে তত্র তচ্ছায়াং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪৪ ॥
তথৈব নিত্যচৈতন্যাঃ পুমাংসো দেহবৃত্তয়ঃ।
গৃহ্ণন্তি কারণানীতান্ রূপাদীন্ ধীরসৌ চ নঃ ॥ ২৪৫ ॥

অর্থাৎ, স্বচ্ছ দর্পণ বা স্ফটিকখণ্ডের সম্মুখে যাহা রাখা হয় তাহারই কেবল ছায়া পড়ে ; সেইরূপ দেহাধিষ্ঠিত আত্মাও চক্ষুকর্ণাদি করণের দ্বারা যাহা আনীত হয় তাহাই কেবল উপলব্ধি করিতে পারে। এই নিত্য চৈতন্যকেই আমরা ধী বা বুদ্ধি বলিয়া থাকি।*—কমলশীল আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন ঃ এই বুদ্ধি কিন্তু সাংখ্যের ব্যতিরেকী বুদ্ধি (discriminating intelligence) নহে। এতক্ষণে মীমাংসকের "বুদ্ধি"র স্বরূপ কি তাহা বুঝা গেল। সাংখ্যের "বুদ্ধি"র সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই। সাংখ্যের "বুদ্ধি" আপনি অগ্রসর হইয়া বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় ; কিন্তু অখণ্ড বিজ্ঞানে বিষয় বস্তুর ছায়াপাতে যে বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয় তাহাই হইল মীমাংসকের "বুদ্ধি"। সাংখ্যের "বুদ্ধি" active, কিন্তু মীমাংসকের "বুদ্ধি" passive। গ্রাহ্যগ্রাহকভেদ উভয়েই আছে, সুতরাং বিশুদ্ধবিজ্ঞান হইতে উভয়ই বিভিন্ন।

---

* তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে intelligence is consciousness defined by the object.

প্রশ্ন উঠিতে পারে নিত্যচৈতন্যই যদি এইরূপে বুদ্ধি হয় তবে বুদ্ধিও নিত্য ও একরূপ না হইয়া ভঙ্গশীল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধির ভঙ্গিনীত্ব সমর্থনের উদ্দেশ্যে পরবর্তী কারিকায় বলা হইতেছে :—

তেনোপনেতৃসংরম্ভভঙ্গিত্বাদ্ভঙ্গিনী মতিঃ।
ন নিত্যং দাহকো বহ্নির্দাহ্যাসন্নিধিনা যথা ॥ ২৪৬ ॥

অর্থাৎ, চক্ষুরাদি যে-সকল করণের দ্বারা বিষয়বস্তু বুদ্ধির গোচরীকৃত হয়, তাহাদের কার্যই প্রকৃতপক্ষে ভঙ্গশীল, এবং তাহা হইতেই বুদ্ধির ভঙ্গিনীত্ব বিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি সর্বদাই বর্তমান, তথাপি দাহ্য বস্তুর সন্নিধি ব্যতিরেকে দহন কার্য সম্ভব হয় না; বুদ্ধিও সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়বস্তু গোচরীকৃত না হইলে স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কিন্তু সেজন্য এক মুহূর্তও মনে করা যাইতে পারে না যে বুদ্ধির বোধশক্তি রুদ্ধ হইয়াছে।

কিরূপে জানা যায় যে এই বুদ্ধি নিত্য? তাহার উত্তর :—

তত্র বোধাত্মকত্বেন প্রত্যভিজ্ঞায়তে মতিঃ।
ঘটহস্ত্যাদিবুদ্ধিত্বং তদ্ভেদাল্লোকসংমতম্ ॥ ২৪৭ ॥

অর্থাৎ, বুদ্ধি (মতি) উপলব্ধির আকারেই অভিজ্ঞাত হয়, এবং ঘট, হস্তী প্রভৃতি বিষয়ক বুদ্ধির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার কারণ ঘটহস্ত্যাদির মধ্যেই পার্থক্য বর্তমান।—কমলশীল কারিকাটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন : বুদ্ধি যখন বুদ্ধিরূপেই অভিজ্ঞাত হয় তখন স্বীকার করিতে হইবে যে বুদ্ধি শব্দের মতই নিত্য। কিন্তু তাহা হইলে ঘটবুদ্ধি, পটবুদ্ধি প্রভৃতি পার্থক্য আসে কোথা হইতে? তদুত্তরে কমলশীল বলিতেছেন, এই ভেদবুদ্ধির জন্য প্রতিপত্তা (cogniser) স্বয়ংই দায়ী (বুদ্ধীনাং বৈলক্ষণ্যং লোকে প্রতিপত্তৃভিরুপগতম্)।—এই কথাই পরবর্তী কারিকায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে :—

সৈবেতি নোচ্যতে বুদ্ধিরর্থভেদানুসারিভিঃ।
ন চাস্ত্যপ্রত্যভিজ্ঞানমর্থভেদ উপাশ্রিতে ॥ ২৪৮ ॥

অর্থাৎ, যাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন তাঁহারা

বলেন না যে সর্বত্র একই বুদ্ধি অভিজ্ঞাত হইতেছে, এবং বিভিন্ন অর্থ স্বীকার করিলেই তবে প্রত্যভিজ্ঞান সম্ভব হয় (ন···অপ্রত্যভিজ্ঞানম্)।—এই কারিকাদ্বারা পূর্বার্থ যে বিশদীকৃত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।।

মীমাংসকের এই সকল কথার উত্তরে এইবার বলা হইতেছে ঃ—

নন্থ হস্ত্যাদিশূন্যায়াং ভূমাবারোপকারিণঃ।
প্রত্যয়া যে প্রবর্তন্তে ভেদস্তত্র কিমাশ্রয়ঃ॥ ২৪৯॥

অর্থাৎ, বুদ্ধির ভেদের জন্য যদি অর্থভেদকারীগণই দায়ী হয় তবে শূন্য স্থানেও ক্রমান্বয়ে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির আরোপরূপ যে প্রত্যয়াবলী উপস্থিত হয় সেগুলি কি আশ্রয় করিয়া সম্ভব হয় ?—শান্তরক্ষিত বলিতে চান, যেখানে বাস্তব কিছু বর্তমান সেখানে না হয় প্রতিপত্তার দোষেই ভেদের সৃষ্টি হইল; কিন্তু যেখানে বাস্তব কিছুই নাই সেখানেও ভেদবুদ্ধি আসে কি করিয়া? কোন প্রকার আশ্রয় ব্যতিরেকে ভেদবুদ্ধি সম্ভব হইতে পারে না (ন স্বতো ভেদোঽস্তি)। অথচ মীমাংসকই বলিয়া থাকেন যে সমস্ত বুদ্ধি এক।

মীমাংসক এখনও বলিতে পারেন, বুদ্ধি যে অর্থশূন্য এ-কথা অসিদ্ধ; কুমারিল বলিয়াছেন ঃ—স্বপ্নাদিপ্রত্যয়ে বাহ্যং সর্বথা নহি নেষ্যতে। সর্বত্রালম্বনং বাহ্যং দেশকালান্যথাত্মকম্॥ অর্থাৎ, স্বপ্নাদি প্রত্যয়েরও যে একটি বাহ্য বাস্তব ভিত্তি আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না; বাহ্য আলম্বন সর্বত্রই বর্তমান, তবে যে দেশে ও কালে তাহার প্রয়োগ তাহা ঠিক না হইতে পারে। এই আশঙ্কাই পরবর্তী কারিকায় উত্থাপন করা হইয়াছে ঃ—

অন্যদেশাদিভাবিন্যো ব্যক্তয়শ্চেন্নিবন্ধনম্।
সর্বত্রালম্বনং যস্মাদ্দেশকালান্যথাত্মকম্॥ ২৫০॥

এই কারিকা কুমারিলের উপরোদ্ধৃত বার্তিকেরই পুনরাবৃত্তি ঃ—যদি বলা হয় যে এক দেশ বা কালের বস্তুসকল অন্য দেশ ও কালস্থ প্রত্যয়ের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে, এবং স্বপ্নাদিরও প্রকৃতপক্ষে বাহ্য আশ্রয় আছে, যদিও দেশ ও কালের পক্ষ হইতে সেই আশ্রয়ের ভ্রান্ত প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে, তবে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে ঃ—

নন্নু তদ্দেশসম্বন্ধো নৈব তাসাং তথাস্তি তৎ।
কিমিতি প্রতিভাসন্তে তেন রূপেণ তত্র চ॥ ২৫১॥

এই কারিকা হইতে উত্তরপক্ষ আরম্ভ হইল। শান্তরক্ষিত এখানে বলিতেছেন, প্রত্যয়াবলীর বিশেষ কোন দেশের সহিত সম্বন্ধ নাই; সুতরাং কেন তাহারা বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে প্রতিভাসিত হইবে?—কমলশীল কারিকাটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—যে প্রত্যয়াবলী একটি বিশেষ স্থানে যে ক্রমানুযায়ী সমারোপিত হইয়া প্রতিভাসিত হয়, সেই প্রত্যয়াবলীর সহিত অন্য স্থান ও কালের অন্তর্গত অনুরূপ ক্রমানুযায়ী প্রত্যয়াবলীর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। নতুবা প্রত্যয়াবলী সমারোপিত যে কোন রূপ লইয়াই প্রতিভাসিত হইবে। এক বিষয়ের রূপের দ্বারা অন্য বিষয়ের প্রতিভাসন সম্ভব নহে, কারণ তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

ভবন্মতে হি নাকারো বুদ্ধের্বাহ্যস্ত বর্ণ্যতে।
ন বিবক্ষিতদেশে চ গজযষ্ট্যাদয়ঃ স্থিতাঃ॥ ২৫২॥

অর্থাৎ, আপনারা (মীমাংসকেরা) আবার স্বীকার করেন না যে বাহ্য আকার বুদ্ধিরই; এবং গজযষ্ট্যাদি বস্তুও যে বিবক্ষিত স্থলে অবস্থিত তাহা নহে। কমলশীল:—মীমাংসকের মতে ভাসমান আকার বুদ্ধির নহে; বাহ্যার্থই এই মতে উহার স্বভাব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণ কথিত হইয়াছে যে বাহ্যার্থ আকারবান্ কিন্তু বুদ্ধি নিরাকার। কিন্তু ইহাতে লাভ হইল কি? ইহারই উত্তরে—কারিকায় বলা হইয়াছে "ন বিবক্ষিত ইত্যাদি। যে স্থানে বুদ্ধির সমারোপ হয় তাহাই হইল বিবক্ষিত দেশ।

যে দেশ ও কালের সহিত গজাদির সম্বন্ধ সেই দেশ ও কালের সম্পর্কেই তাহারা প্রতিভাসিত হইবে। কিন্তু যে দেশ ও কালের সহিত গজাদির সম্বন্ধ নাই সেই দেশ ও কালের সম্পর্কে তাহারা প্রকাশিত হয় কিরূপে? ইহা হইতেই বুঝা যায় যে এই সকল প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে নিরালম্বন, এবং পারমার্থিক অর্থে ইহারা অসংকীর্ণ* এবং চলস্বভাব। প্রত্যয়াবলী যে কদাচিৎ মাত্র উপলব্ধ হয়

* "অসংকীর্ণ" কথাটি এখানে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

—তাহা হইতেও এই কথাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। এবং এই প্রকার বুদ্ধি যে আত্মার স্বভার সেই আত্মাও অনিত্য ও অনেক।

এ-কথার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, প্রত্যয় হইল আত্মার (পুরুষস্য) ধর্ম; সুতরাং প্রত্যয়রূপ ধর্মের ভেদ হইতে আত্মারূপ ধর্মীর ভেদ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু এ-আপত্তি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কারণ প্রত্যয়, চৈতন্য, বুদ্ধি, জ্ঞান হইল একার্থক শব্দ; নামের ভেদ বশতঃ বস্তুও বিভিন্ন হইতে পারে না। বরঞ্চ নামের পার্থক্য সত্বেও এই প্রত্যয় যে এক চৈতন্যস্বরূপ তৎপ্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেই চৈতন্যের যদি কোন ভেদ না থাকে তবে তৎস্বভাব প্রত্যয়াবলীরও কোন ভেদ সম্ভব হইবে না। তাহাই যদি না হয় তবে বিরুদ্ধ ধর্ম অধ্যাসের ফলে চৈতন্য ও প্রত্যয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য আসিয়া পড়িবে। এতদ্দ্বারা যে কেবল প্রত্যয়ের নিরালম্বনত্বই প্রমাণিত হইল তাহা নহে, বুদ্ধির অপ্রত্যক্ষত্বও এতদ্দ্বারা সুসিদ্ধ হইল। কারণ দেখানই হইয়াছে যে এই পরিস্ফুট আকার কখনও বাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে বুদ্ধি (cognition) প্রকৃত পক্ষে স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বসংবিৎ এবং পরিস্ফূর্ত আকারকে আত্মভূত জ্ঞান করাই এই বুদ্ধির ধর্ম (পরিস্ফুরন্তমাকারমাত্মভূতমেব প্রতিপদ্যমানা বুদ্ধয়ঃ)।

পূর্বে (২৪৩ সংখ্যক কারিকায়) বলা হইয়াছিল, দাহিকাশক্তি সত্বেও দাহ্যবস্তু ব্যতিরেকে অগ্নি দাহন করিতে পারে না ইত্যাদি; সেই যুক্তি খণ্ডনোদ্দেশ্যে এখন বলা হইতেছে ঃ—

সর্বার্থবোধরূপা চ যদি বুদ্ধিঃ সদা স্থিতা।
সর্বদা সর্বসংবিত্তিস্তৎ কিমর্থং ন বিদ্যতে॥ ২৫৩॥

অর্থাৎ, সর্বার্থ বোধে সমর্থ বুদ্ধি যদি সর্বদাই উপস্থিত থাকে তবে সর্বদাই সর্ববিষয়ের সংবিত্তি কেন না সম্ভব হইবে?

শব্দোপধানা যা বুদ্ধী রসরূপাদিগোচরা।
সৈব হীতি ন চেদ্ভেদাস্ত্বয়া চৈবোপপাদিতাঃ॥ ২৫৪॥

অর্থাৎ, যে বুদ্ধিতে শব্দ আরোপিত হইয়াছে, রসরূপাদিও সেই বুদ্ধিরই বিষয় হইতে বাধ্য, নতুবা আপনার (মীমাংসকের) নিজেরই প্রত্যয়ের বিভিন্নতা

স্বীকার করা হইবে।—কমলশীল এই কারিকা ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন, শব্দ-বিষয়ক বুদ্ধি রসরূপাদিবিষয়ক বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং কোন একটি বিষয়ের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত বিষয় অনুভূতির সম্ভাবনা আসিয়া পড়িবে, কারণ সেই সকল অনুভূতির উপযুক্ত বুদ্ধিও তন্মধ্যে সর্বদা বর্তমান রহিয়াছে। কথিত হইয়াছে ঃ—

একয়াঽনেকবিজ্ঞানে বুদ্ধ্যেব সর্বদেব তৎ।
অবিশেষাৎ ক্রমেণাপি মাভূত্তদবিশেষতঃ॥

অর্থাৎ, একই বুদ্ধির (cognition) অনেক বিষয় বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই অবিশেষে একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে ; ক্রমানুযায়ী তাহা ঘটিতে পারে না, কারণ "একই" বুদ্ধির মধ্যে কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য সম্ভব নহে।

পূর্বপক্ষীর প্রদত্ত বহ্নির দৃষ্টান্তের অসিদ্ধতা প্রতিপাদনের জন্য শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

সমস্তদাহ্যরূপাণাং ন নিত্যং দহনাত্মকঃ।
কৃশানুরপি নিঃশেষমন্যথা ভস্মসাৎ ভবেৎ॥ ২৫৫॥

অর্থাৎ, অগ্নিতেও সর্বদাই সমস্ত দাহ্য পদার্থের দাহিকা শক্তি থাকে না। নতুবা সমস্ত দাহ্য পদার্থই নিঃশেষে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। কেন ভস্মসাৎ হইয়া যাইত তাহা বুঝাইবার জন্য কমলশীল বলিয়াছেন, দাহ্য পদার্থের স্বদাহক শক্তি অদগ্ধ ও দহ্যমান অবস্থায় সমভাবে বর্তমান। অনুরূপ কারণেই বুদ্ধিও (cognition) সর্বার্থ বোধে অসমর্থ। কিন্তু অগ্নির যদি সর্বদাই দাহিকা শক্তি না থাকে তবে উপনীত বস্তুকেই বা অগ্নি দগ্ধ করে কিরূপে ? তাহার উত্তর ঃ—

দাহ্যার্থসন্নিধাবেব তস্য তদ্দাহকাত্মতা।
যুক্তা সর্বার্থদাহো হি সকৃদেবং ন সজ্যতে॥ ২৫৬॥

অর্থাৎ, অগ্নি দাহ্য পদার্থের সান্নিধ্যেই কেবল দাহকাত্মক (দাহনশক্তি বিশিষ্ট) হইয়া উঠে ; সেই জন্যই একসঙ্গে সর্ববস্তুর দহন হয় না।

পূর্বপক্ষী দর্পণেরও দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন ; শান্তরক্ষিত এখন দেখাইতেছেন যে দর্পণ নিত্য ও একরূপ হইলে এক্ষেত্রে তাহার সযুজ্যতা থাকিত না ঃ—

নীলোৎপলাদিসম্বন্ধাদ্দর্পণস্ফটিকাদয়ঃ।
তচ্ছায়াবিভ্রমোৎপাদহেতবঃ ক্ষণভঙ্গিনঃ॥ ২৫৭॥
সোপধানেতরাবস্থ এক এবেতি সর্বদা।
তচ্ছায়স্তদ্বিযুক্তো বা স দৃশ্যেতান্যথা পুনঃ॥ ২৫৮॥

অর্থাৎ, নীলোৎপলাদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া যে দর্পণ ও স্ফটিকাদি ছায়ার ভ্রম উৎপন্ন করে সে দর্পণ ও স্ফটিকাদি হইল ক্ষণভঙ্গী। তাহা যদি না হইবে তবে এ-গুলির সোপধান (অর্থাৎ, ছায়াযুক্ত) বা নিরুপধান (অর্থাৎ, ছায়াহীন) অবস্থা চিরকাল একরূপই থাকিয়া যাইত, এবং ফলে হয় তাহাতে সকল সময়েই ছায়া দেখা যাইত, না হয় কোন সময়েই ছায়া দেখা যাইত না। কমলশীল কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আরও বলিয়াছেন, দর্পণ অক্ষণিক হইলে দর্পণের সোপধান ও নিরুপধান অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না; এ অবস্থায় উপধেয় বস্তু উপস্থিত না থাকিলেও দর্পণাদিতে ছায়াপাত অবশ্যম্ভাবী—অপরিত্যক্তপূর্বরূপত্বাৎ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

গলিত নখ

প্রখর রৌদ্রে উথলে ক্লান্তি, আকাশ ফাঁকা।
মরুচারী মন খুঁজে-ফিরে কোনো শান্তি কি ?
বাতাসে অগ্নি, বন্ধ্যা করুণ অশথ-শাখা,
যাযাবর দলে নাম লিখাতেও নেই বাকী।

ট্রামের শব্দে দিবানিদ্রা তো হলো উধাও।
বৃথাই এখন সাগরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি।
এতোকাল ধরে' আশাবাদে বলো কী খুঁজে পাও
শূন্য ট্যাঁকেতে হয় যদি শেষ সিকিটা মেকি ?

বাণিজ্যে মেলে লক্ষ্মী একথা সকলে মানি।
তাই কি চাকায় তেল জুগিয়েই শ্রমিক মরে ?
ভ্রষ্টলগ্ন দিন বুঝে নাও হে সন্ধানী।
হারায় কোথায়, কোন্ দিকে হাওয়া নিশানা করে।

মনের আকাশে অযুত পাখীর নিবিড় মেলা।
রঙচঙে দিন, কল্পনা সুখ মিথ্যা বলো।
রাস্তার মোড়ে মোড়লী করার মজার খেলা
ফুরালো কি শেষে, বাঁকাপথে তবে সোজাই চলো।

জন-গণ-মন লক্ষ্যই যদি আসল হয়
টাটকা বুলির ব্যবসা করেই লোক মাতাও।
লক্ষ্যভেদের সহজ উপায় শক্ত নয়,
বাক্যের স্রোতে চায়না কিম্বা স্পেইনে যাও।

পিচের গন্ধে পিপাসা মেটাই বিদেশী ফুলের।
চায়ের দোকানে ভিড় না থাকলে বাকীতে কিনি।
বড়ো বড়ো বুলি কপচানো খাসা, জানা আছে ঢের
আড়ালে দেবতা কেন যে হাসেন, কোথায় তিনি।

বৃথাই দিবসে স্বপ্ন দেখেছি সন্ধ্যার পথ।
বসন্ত দূরে, রাঙা সন্ধ্যাও জীবনে নেই।
ঢের চাঁদা দাও কংগ্রেস করো তবু মনোরথ
বিফলেই যায়, যে-তিমিরে আছো সে-তিমিরেই॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সিখ সম্রাট ও সতীর শাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপে দীনানগরে দিন কাটিতে লাগিল। বাড়ির ছেলে-পুলে চলিয়া গেলে বাড়ী যেমন নিবিয়া যায়, এক শেরসিংহ অভাবে আমাদের উল্লাস কল্লোলপূর্ণ রাজমণ্ডল তেমনি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ের পরামর্শে প্রচার করা হইল যে টিক্কাসাহেব সাম্রাজ্যের পার্ব্বত্য সুবা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সুদূর কুল্লু এলাকায় গিয়াছেন। তলে তলে দেশময় সন্ধান চলিতে লাগিল। কুঁয়রজীর লুকাইকার বলিহারি যাই! একবার ফ্রান্সে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেখানেও পত্র লেখা হইল।

একদিন ভোরে ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, আমরা সব সুচেতা দরবারে বসিয়া আছি; সিংহজীর মেজাজ আজ বড়ই খারাপ; এমন সময় অকস্মাৎ কুঁয়রজী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। সিংহজী চৌকির উপর একটা হাকিমি তেল মালিশ করাইতে করাইতে মীরমুন্সীকে কি লিখাইতেছিলেন। পাশে একটা শমাদানে সুগন্ধি বাতি জ্বলিতেছিল। কুঁয়রের উপর আলো পড়ায় নরনাথের মলিন মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুঁয়র সোজা আসিয়া পিতার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া দুই জানু জড়াইয়া ধরিল আর আবল তাবল অবিরাম বকিয়া যাইতে লাগিল। এক একটা বাক্য যা বোঝা যাইতেছিল তাহা জোড়াতাড়া দিয়া তাৎপর্য্য দাঁড়াইল এই: একেলা একদিন বেয়াস নদীর তীরে শীকার-সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ জ্বর আসিয়া অজ্ঞান করিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে গ্রাম হইতে মেয়েরা জল লইতে আসিয়া, তাহার অচৈতন্য অবস্থা দেখিয়া, ধরাধরি করিয়া নিজেরাই ধর্ম্মশালায়* পৌঁছাইয়া দিল। একজন জাট ভদ্রলোক আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া তিন মাস-কাল সেবা-শুশ্রূষা করিয়া রোগমুক্ত করিল। বরাবর কুঁয়র বেহোঁশ ছিল, ইত্যাদি।

---

* পাঞ্জাবে এমন গ্রাম নাই যেখানে একটি ধর্ম্মশালা নাই। সাধু, ফকির বা অন্য গরীব পান্থের সেবার জন্য রুটি গড়িবার সময় প্রথম রুটিখানি প্রত্যেক গৃহস্থ যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখে। এই একখানি চাপাতি একজন খাইয়ে বাঙালীর পক্ষে যথেষ্ট।

পিতা পুত্রের মুখ তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে চাহিয়া রহিলেন। অতি কোমলস্বরে অথচ গম্ভীরভাবে একটি প্রশ্নমাত্র করিলেন, "পরিবারের মেয়েরা কেহ সেবা করিত?" উত্তর, "হাঁ, মনে পড়ে যেন একটি মেয়ে ছিল, তা আমি অত লক্ষ্য করি নাই; উপযুক্ত বখশীশ সবাইকে দিয়াছি।" সিংহজী আমার দিকে সহাস্য কটাক্ষ করিলেন।

ইহার পর সিংহজী এমন বন্দোবস্ত করিলেন যে যুবরাজ এক তিলার্দ্ধও তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে পাইল না। কুঁয়রকে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে, "তুই অনেকদিন পর কত রোগ ভুগে এসেচিস্, আর তোকে চক্ষের আড়াল করতে ইচ্ছা করে না" বলিয়া হাত ধরিয়া গুসলখানায় লইয়া গেলেন। স্নানের পর তাহার বাহুর উপর ভর দিয়া বাহির হইলেন, ও তাহারই সাহায্যে কাছ ও পাগড়ি পরিয়া আবার ভুজালম্বন করিয়া গুরুদোয়ারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক এক দেউড়ি পার হন আর থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমার প্রতি এক একটা নূতন হুকুমজারী করেন; যথা সাতফটকে সাত ফরমাস, (১) ব্রহ্মদেও, তোর থলে আজ খুব বোঝাই রাখিস্, কেবল সোনার বাদাম আর মোহরে। (২) অন্দরে এক্ষুনি এ সুখবর পাঠিয়ে দে। (৩) এক্ষুনি বৌমাকে পূরা সরঁজামে আন্‌তে পাঠা। (৪) ওরে, টিক্কার খাস সামান আনতে ভার বরদার এক্ষুনি পাঠা। (৫) এক্ষুনি নাগারখানায় বাধাই বাজাবার হুকুম পাঠা। (৬) এক্ষুনি বলে পাঠা, অন্দরে আমার খাস কামরার পাশে টিক্কার খোয়াব-গাহ (আরামঘর) হবে, আর তারই গায়ে বৌমার। (সিংহজীর সব হুকুম এমনি "এইক্ষণেই"; তামিল সেইক্ষণেই, নচেৎ বিষম খাফ্‌ফা হইতেন)। শেষ ও সপ্তম, সূরজ পোল নামে অভিহিত সিংহদ্বার পার হইয়াই আমার কানে কানে, যাহাতে কুঁয়র শুনিতে পায় এরূপ স্পষ্ট অথচ মৃদুস্বরে আজ্ঞা করিলেন, "তুই টিক্কাসাহেবকে এক সময় আমার হয়ে আজ বোঝাস যে দিনরাত আমার কাছে কাছে থাকে।" কুঁয়র ও আমি বুঝিলাম যে কুঁয়র নজরবন্দি হইল।

কুঁয়রাণীসাহেবা বিশেষ সমাদর ও সমারোহের সহিত সেই সকালেই যুবরাজের হাবেলী হইতে রাজমহলে আসিলেন। অন্দরের কর্ত্রী, মহারাণী জীন্দা, যিনি হীরামুক্তার-জড়োয়া কাজ-করা ছোরার মত সুন্দর, ঝকঝকে কঠিন; আর যিনি সিংহজীর বীরবক্ষে আমূল বসিয়া গিয়াছিলেন, পতির আজ্ঞায় যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞীর যথোচিত মেলা-মেশা করাইতে যত্নশীল থাকিলেন।

প্রথামত, বাহিরে মহারাজার যতপ্রকার খাস আমলা, অন্দরে তেমনি মহারাণীদেরও নিজের নিজের কর্ম্মচারিবর্গ। পাঠান মোগলদেরও এই দস্তুর ছিল। তবে তাহাদের মধ্যে কঠোর পর্দ্দার নিয়ম থাকার দরুণ, বেগমদের অহলকার স্ত্রীলোক হইত। সিখদের মধ্যে পর্দ্দাটা নামে মাত্র ছিল, কার্য্যতঃ নহে। সেই কারণ মহারাণী ও কুঁয়রাণীদের দেউড়িওয়ালা, উজির, খাজাঞ্চি, ভাণ্ডারী ইত্যাদি সব পুরুষ মানুষই হইত। ইহারা প্রায় বাপের বাড়ীর লোক হইত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা বোধ হয় অযথা হইবে না যে কাশ্মীর রাজ-অন্তঃপুরে এক চিত্রালী মহিলা বহু বৎসর, সেদিন পর্য্যন্ত, অসাধারণ যোগ্যতার সহিত, উজীরনির কাজ করিয়াছিলেন।

আমি যেমন সিংহজীর খাস হজুরী-রেসালায় কুমেদান, তেমনি সর্দ্দার জোয়াহর সিংহ নামক এক রূপে কন্দর্প, গুণে পিশাচ ব্রাহ্মণ যুবক মহারাণী জীন্দাঁর খাস সামন্তের অধিনায়ক। সে নিজে কুচক্রী ও ধড়িবাজ, আমাকেও ঐ ধরণের একজন জাসু মনে করিত। সিংহজী তাহার উপর কৌশলে খর দৃষ্টি রাখিতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাহার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া, আমি কার্য্যসিদ্ধি করিতাম। তাহারই নিকট যে সব উপায় দ্বারা জীন্দাঁদেবী কুঁয়রকে কুঁয়রাণীর ও নিজের সম্পুর্ণবশে আনিবার চেষ্টা করিতেন, শুনিতেন। যে-সব তত্ত্ব পুরুষের জানিবার যো নাই, তাহা জোয়াহর তাহার নিয়োজিত গোলী বা নিম্ন শ্রেণীর পরিচারিকাদ্বারায় সংগ্রহ করিত।

গুরুদোয়ারা হইতে ফিরিবামাত্র কুঁয়র মাতাদের প্রণাম করিতে অন্দরে গেল। জীন্দাঁ মহারাণীদের মধ্যে কনিষ্ঠা, কিন্তু বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতায় তিনি শ্রেষ্ঠা। শেরসিংহ মাতৃহীন। পাট-রাণীমা ও মধ্যমা মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর, পদমর্য্যাদা অনুসারে, শেষে জীন্দাঁর মহলে প্রবেশ করিল। প্রায় সমবয়স্ক পুত্রকে, যথাবিধি আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণের পর, নিঃসঙ্কোচে একেবারে জীন্দাঁ বলিয়া ফেলিলেন, "আমি জানি তুই* বাপকে মিথ্যা কথা

* পাঞ্জাব কেশরী, আপন সেপাই সঙ্গীদের সহিত, যারা তাঁহার পাশে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, ঠিক Chums এর মত ব্যবহার করিতেন। মহারাজ নিজেকে তাহাদের দণ্ডমুণ্ডকর্ত্তা নহে বরং "বেলী" অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ Comrade ভাবিতেন। উঁহাদের মধ্যে তুই-তু-কারী আপোশে সর্ব্বদা চলিত। জীন্দাঁ অতুল রূপ ও অসীম তেজের দর্পে, গুরুজন ছাড়া, সবাইকে "তুই" বলিতেন।

বলে ভুলাবার চেষ্টা করেছিস। আমি তোকে বলে রাখছি, যদি কোন শয়তানী আমার বৌমার দখলে ভাগ বসাতে চায়, তাকে নখে ছিঁড়ে ফেলব।” আর বাক্য ব্যয় না করিয়া, কুঁয়র গরীবকে টানিতে টানিতে, কুঁয়রাণীর নিকট রাখিয়া আসিয়া, পর্দ্দা ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। কুঁয়রাণী বিনা কোন ভূমিকায়, একেবারে কঠোর উপদেশ ও গঞ্জনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অন্য নিষ্কৃতির উপায় না দেখিয়া, কুঁয়র আমার নিকট কোন ছুতা করিয়া নিজের দুর্গতির কথা এক চতুরা গোলীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। আমি কোন বাহানা করিয়া, অন্দর হইতে কুঁয়রকে ডাকাইতে, সিংহজীকে অনুরোধ করিলাম। তখন বেচারা বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এ রকম রোজ চলিল। বাহিরে, ছায়ার মত পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হয় (সুচেত দরবার ছাড়া ; কারণ কুঁয়র বেলায় ওঠেন), আর ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সাধারণ ইন্তজামের ও কানুনের যে সব প্রশ্ন নিত্য দরবারে উঠে, তা ছাড়া গভীর মারপেঁচের কথা, সবেতেই কুঁয়রকে মন দিতে হয় ; কারণ প্রত্যেক কথায় সিংহজী তাহার মত জিজ্ঞাসা করেন ও (তাঁহার ইঙ্গিতে), দেওয়ান, উজীর, বখ্‌শী এবং বড় বড় মদ্দের আলা হাকিমরা তাহার নিকট যত মুস্কিল মামলা পেশ করিয়া তাহার ইরাদা ইরশাদ লয় ও সেই অনুসারে জাব্‌তা মতো কাজ হয়। অন্দরে, বৈকালটা ও সমস্ত দীর্ঘ রাত্রটা জীন্দাঁর এবং কুঁয়রাণীর নীরস শাসনে কাটাইতে হয়। এই দুই ব্যাঘ্র-প্রকৃতির নারী বুঝিল না যে এই প্রকার সিংহ-প্রকৃতি পুরুষকে ভয় আর লোভ দেখাইয়া বশ করা যায় না, স্বচ্ছ, অকৃত্রিম, নিঃস্বার্থ স্নেহমাত্র দিয়া গোলাম করা যায়।

অন্ধও এ সময় দেখিতে পাইত যে কুঁয়র আর সে সাদামদ্দ, সরল আবেগপূর্ণ কুঁয়র নাই। থাকিয়া থাকিয়া তাহার স্বভাবত উদাস কমল-নেত্র জলপূর্ণ হয়। বড়ই দীনদৃষ্টিতে চাহে, করুণ স্বরে কথা কহে। তাহার বিশেষ সখের জিনিষ, গান, বাজনা, কবিতা, ফুলবাগান, চিড়িয়াখানা, শীকার, কিছুতেই তার মন ভুলে না। তাহার চিত্তাকর্ষণের জন্য, দরবারে, দিল্লি, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তোয়ায়ক আসিল, সুরপুরী-দুর্লভ সুরা আসিল, প্রসিদ্ধ শায়র ও কালোয়াৎ আমন্ত্রিত হইল। শেরসিংহ পিতাকে করজোড়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া সকল রকম আমোদে আগেকার মত যোগ দিল, কিন্তু পূর্ব্বের

ন্যায় মশগুল হইতে পারিল না, ভাসা ভাসা রহিল। মহারাণী ও কুঁয়রাণী, যা যা শরবৎ, কুলফী, * ফালুদা, ফীরনী, মোরব্বা, চাটনি, খামীর, চাশ্‌নী, কুঁয়র পছন্দ করিতেন, বৈকালিক "নুকলের" সময় তাহার সম্মুখে রাখিতেন। তাহারই পছন্দসই রঙের ও ধরণের পোষাক † এবং আতর ফুলেল ব্যবহার করিতেন। কুঁয়র খুব উল্লাসের সহিত প্রশংসা করিতেন, কিন্তু ইহা যে মৌখিক ভদ্রতা মাত্র ইহা তাহার স্থির ম্লান ভাবে প্রকাশ পাইত। ইহাতে দুই গর্ব্বিতা নারীর আক্রোশ বাড়িত বই কমিত না।

আমি যাহা অসম্ভব মনে করিতাম তাহা এ সময় ঘটিতে দেখিলাম। ব্যাঘ্রী ত কখনও অন্য ব্যাঘ্রীর সহিত মিশে না, স্ব স্ব শিকার-ভূমির মধ্যে স্বতন্ত্র থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে কুঁয়রাণীর প্রতি মহারাণী জীন্দাঁর সত্যকার ভালবাসা জন্মিল। আর, যেমন এ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে, মহারাণী যখন কুঁয়রাণীকে আপনার এ তাবৎ শুষ্ক হৃদয়ে একবার স্থান দিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত অসাধারণ শক্তি, বধুকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আর আপদ বিপদকে সমূলে ধ্বংশ করিবার জন্য, সশস্ত্র জাগাইয়া রাখিলেন। যে যত শক্ত ও কঠোর মানুষ তার ভালবাসাও তেমনি দুর্নিবার।

ক্রমে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, আর বর্ষার পর শরৎ ঋতু আসিল। বর্ষাকালে সিংহজীর এক অদ্ভুত আমোদের কথা বলি। যেদিন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িত, সেদিন সিংহজী আমাদের সবাইকে লইয়া কোন বড় আম বাগানে যাইতেন। গাছ হইতে ভিজা ঘাস ও মাটির উপর লাল-সোনালি চ্যুতফল মুক্তাঝরার মত ঝরিয়া পড়িত। আর আমরা সেই "টপকা আম", ভিজিতে ভিজিতে, বালকদের মত, কাড়াকাড়ি করিয়া কুড়াইয়া খাইতাম। আমাদের সিংহজী, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, দুরন্ত শিশুর মত মাতামাতি করিতেন।

আশ্বিন মাস পড়িতেই, দীনানগরের আনন্দবাজার ভাঙ্গিয়া, আমরা দশহরার

---

* মুসলমান বাদশাহের সময় যেমন ডাক দ্বারা ধর্ম্মশালা পাহাড় হইতে দরবারের জন্য বরফ আসিত। তেমনি সিখদের সময়ও নিয়মিত রোজ তুষার আনানো হইত। বাজারেও বিক্রয় হইত।

† চোস্‌ৎ পায়জামা, বা ঢিলা ঘেরালো "সুথন" (পাঠিকারা তুর্কী ভদ্রমহিলাদের ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন) তাহার উপর ঘেরদার ঘাঘরা, লম্বা কুর্ত্তি, কাঁচুলি, মিহি ওড়না, এই পাঞ্জাবের "সেকেলে" স্ত্রী পরিচ্ছদ। বালিকারা ঘাগরা সচরাচর পরে না।

বাৎসরিক দরবারের জন্য লাহোর চলিলাম। পঞ্চাশ ক্রোশ মাত্র পথ; পাঁচ ক্রোশের অধিক আমরা কোনদিন কুচ (march) করিতাম না। দুই তিন ক্রোশ ব্যাপী ত সিংহজীর "সওয়ারীই"* ছিল। সমস্ত পথের দুধারে লাখ লাখ স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকাদের ভীড়ে এক তিল ফাঁক ছিল না। সিংহজীকে তাঁহার প্রজারা পিতার ন্যায় ("মাতার ন্যায়" বলিলে আরও ঠিক হইবে) ভালবাসিত। সোনাচাঁদির বাদাম ছড়াইতে, আর শিশু-ক্রোড়ে জননীদের ওড়না বিতরণ করিতে করিতে, আমার ও আমার 'দফার'† দফারফা হইয়াছিল।

রাজধানীতে পৌঁছিয়াই দশহরা দরবার ও তৎসঙ্গীয় রামলীলার ধূমে আমরা ডুবিয়া গেলাম। সিংহজীর সময় যেরূপ দশহরায় জনতা, জাঁকজমক, জঙ্গী, জলুস ও নানা জিনিষ এবং গৃহপালিত ও শীকারের জীবজন্তুর প্রদর্শনী ও কেনা-বেচা হইত সে রকম পেশওয়াদের রাজত্বকালে পুণাতেও হইত না। পঞ্জাবের কেন, সমস্ত হিন্দুস্থানের সকল প্রান্ত হইতে লোক চাকরীর জন্য, ব্যবসার জন্য বা তামাসা দেখিবার জন্য আসিত। এক মাস ধরিয়া মন্দিরে মন্দিরে রামায়ণ (তুলসীদাসের) পাঠ ও নগরের চকে চকে রামলীলার অভিনয় চলিত। মিথিলা ও ঢাকা-বাঙ্গালা হইতে পূজারী পণ্ডিত অষ্টভূজাদেবীর "নবরাত্রির" পূজার জন্য আসিত। ৪০।৫০,০০০ সৈন্য নয়দিন ক্রমাগত রণক্রীড়া করিত। বিজয়ার দিন খালসার সমস্ত সমৃদ্ধির সমষ্টিস্বরূপ প্রাতে এক কিম্বা দেড় প্রহর ব্যাপী আম দরবার হইত। সিংহজীকে তাঁহার পুত্র, কুটুম্ব, জঙ্গী ও সাধারণ সরদার ও অন্য কর্ম্মচারীরা এবং দেশের অন্য গণ্যমান্যরা পেশকশ ও নজর দিত। গুরু, পুরোহিত, পণ্ডিত, গোসাই মোহান্তরা পুষ্প ও কুজামিছি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। সিংহজী সকলকে নজর ও আশীর্ব্বাদীর বিনিময়ে যথাযোগ্য খেলাৎ দিয়া সম্মানিত করিতেন। তোষাখানায় দুইশত কর্ম্মচারী ও প্রায় একহাজার চোবদার খেলাৎ বিলি করিতে হিম্‌সিম্ খাইয়া যাইত। এই দরবারেই সরকারের সকল বেতনভোগী ভৃত্য, দেওয়ান উজীর হইতে সামান্য মুন্সী পর্য্যন্ত—এক

---

* রাজাদের মামুলি চলাফেরা, আর কোন স্থানে যাওয়া উভয়কেই "সওয়ারী" বলে। যেমন "সরকারকী দিওয়ান-খানা কো হুই হ্যায", "সরকারকী সওয়ারী জম্মুসে কাশ্মীর কো হুই হ্যায"। Procession-কেও সওয়ারী বলে।

† "দফা" = ঘোড়সওয়ারের দল (troop), দফাদার = ঐ দফার নায়ক।

বৎসরের জন্য বাহাল হইত; আর নূতন লোক নিযুক্ত করা হইত। বৈকালে পেরেট মাঠে, ২০,০০০ ফৌজ শ্রীরামচন্দ্রজীর ও ২০,০০০ রাবণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধের ভাণ করিত। এবারে সিংহজী স্বয়ং হইয়াছেন শেষোক্ত লস্করের নেতা, আর কুঁয়রসাহেব পূর্ব্বোক্ত বাহিনীর। দুই দলের মাঝখানে ১০০ হাত উচ্চ রক্ষরাজের কাগজ, বাঁশ, খড় নির্ম্মিত এক প্রতিমূর্ত্তি যাহার মধ্যে রংমশাল, বোমা ও আতসবাজি ঠাসা। সূর্য্য অস্ত যাইতে কুঁয়র নিজের হাতে তীগ করিয়া এক তোপের গোলা ছাড়িল, আর রাবণের উপরকার গ্যাধার মুণ্ড উড়িয়া গেল। আর একটা অগ্নিবাণ (fire shell) ছুঁড়িলেন, আর মিনারবৎ মূরত্ দাউ দাউ করিয়া আগ্নেয়গিরির মত জ্বলিয়া উঠিল। অমনি, এক-দেড়লক্ষ দর্শকের কণ্ঠ নিসৃত "জয় রঘুনাথজী!" সাগরগর্জ্জনবৎ জয়নাদের সঙ্গে সঙ্গেই ৭০০ তোপ দাগা হইল; ৪০,০০০ সৈন্যের একসময়ে বন্দুক ছোঁড়া হইল; সিংহজীকে ঘেরিয়া নাঙ্গা তলওয়ার ঘুরাইয়া, তাঁহার ৭০০।৮০০ খাস সর্দ্দাররা "বোলো, ওয়াহ্ গুরুজী কী ফতে", "ওয়াহ্ গুরুজী কা খালসা" সিংহরবে, ঘোড়া বা হাতীর উপর হইতে, এক মহাবরণ পৃষ্ঠে উপবিষ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার পার্শ্বের গজের উপর স্থাপিত নিশান সাহেবকে, মহা উল্লাসে "সেলামী" দিতে লাগিল। যত হস্তী শুণ্ড তুলিয়া, ও ঘোটকসকল আগের দুই পা তুলিয়া অন্নদাতার "সেলামী"তে যোগ দিল। অসংখ্য মশাল ও "শাখ্" জ্বালা হইল। যে সুন্দর বালক রাম সাজিয়াছিল, সে সীতাকে বামে লইয়া, চতুর্দ্দোলে করিয়া, বানর কটক সহিত, সিংহজীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, আগে আগে গুরুজ কাঁধে পবন নন্দন। যে হনুমান সাজিত, তাহাকে, ৭০ বৎসর বয়সে, আজকাল সেই পেরেট মাঠেই, সেই রামলীলার আবছাওয়া মত নিয়মরক্ষাগোছ যে অনুকরণ-চেষ্টা করা হয়, তাহাতে ১০ হাত উচ্চ ও ২০ হাত লম্বা লাফাইতে তুমি দেখিয়াছ। যখনকার কথা আমি বলিতেছি তখন তার পূর্ণ শক্তি। তাহার তখনকার অসম্ভব লম্ফ দেখিলে, সে যে দৈব বলে বলীয়ান, ইহা সকলকার ধারণা হইত। আশ্চর্য্য এই যে কেবল রামলীলার কয়দিনই সে মত্ত অবস্থায় থাকে আর ঐরূপ মহাবীরজীর তেজ পায়, তারপর সাধারণ মানুষের মতন। সিংহজী, দরবার শুদ্ধ, রামসীতাজী, লছমন যতী, ও বজ্রবলীজীর চরণ বন্দনা করিলেন। তারপর, বিস্তর দেব দেবীর সং, এক একটি "তখত্-রওয়ার" উপর

একত্র হইল। অনেক সখের ও পেশাদার ভজন-মণ্ডলি, গানের "চৌকী" ও কীর্ত্তনদল, টানাগাড়ি করিয়া সে স্থানে আসিয়া জুটিল। এক মহান শোভা যাত্রা তৈয়ার হইল। নিশান সাহেব, হস্তি ও উষ্ট্রের পিঠে ডঙ্কার কাতার, ফরাসী রণবাদ্য, * দেশী রণবাদ্য, দেবতাদের সং, মধ্যে মধ্যে ভজন কীর্ত্তন ও বাইনাচ, রঘুনাথের চতুর্দ্দোল, ইহার সহিত সদলবলে সিংহজী পদব্রজে, সিংহজী সীতারামজীকে চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে আর আমি বাদাম ছড়াইতে ছড়াইতে, জনসংঘ, শেষে হুজুরী রেসালা, তৎপশ্চাৎ সজ্জিত ঘোড়া হাতীর সার। এইক্রমে জলুস মসতী দরজায় প্রবেশ করিয়া, চুণীবাজার, মোতিবাজার হীরামস্তি হইয়া, খাই পার হইয়া কেল্লার দক্ষিণ ফটক রৌশন দরজায় আসিল। এখানে ভরতজী শত্রুঘ্ন সহিত এক প্রকাণ্ড চবুতরার উপর অগ্রজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ফটকের উপরকার বড় গাঁরদঘরের জানেলাগুলির মধ্য হইতে মহিষীরা, ও অন্য রাজ অন্তঃপুরবাসিনীরা সমস্ত দেখিতেছেন। রঘুনাথজী ভরতজীকে আলিঙ্গন করিলেন। শঙ্খ বাজাইয়া মহিলারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। এইরূপে পবিত্র বাৎসরিক 'ভরত্-মিলাপ' পরব সমাধা হইল। দশহারার মনপ্রাণ-উন্মাদকারী উৎসব শেষ হইল। সিংহজী ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকলকার সহিত একসঙ্গে শান্তিজলের ছিটা লইলেন। দেখি, তাঁহার চক্ষে জল! দেশকাল মনে করিয়া আমি আশ্চর্য্য হই, তাঁহার এ ভাবুকতা কোথা হইতে আসিল।

পূর্ব্বে দশহারার দশ বারো দিন কুঁয়র খুব মাতিয়া যাইত। দাওয়তে, নাচে, জলসায়, সিরোপাদানে ২।৩ লক্ষ টাকা এ কয়দিনে খরচ করিত। এবার প্রথামত সবই করিল। মাতাদের ও কুঁয়রাণীকে বহুমূল্য তত্ত্ব পাঠাইল, পিতাকে একটি আসল নসলের বংশ তাজী ঘোড়া ভেট করিল। বন্ধুদের উপঢৌকন পাঠাইল। নিজের আমলাদের বকশিশ দিল। কিন্তু তাহার নিরানন্দভাব ঘুচিল না। দারু সরদাই নিকটে আসিতে দিল না।

দেওয়ালী আসিল, গেল। অন্নকুটের দিন যে সব চাউল ও গমের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়, ঘৃতের পুষ্করিণী, গুড়, বাতাসা ও মিষ্টান্নের গন্ধমাদন প্রথামত

---

* মহারাজার প্রিয়পাত্র, ফ্রান্স দেশীয় জেনেরেল ভেবতুবা, যুরোপীয় ধরণে গঠিত, পল্টনের জন্য ভাল ভাল ব্যাণ্ড-মাষ্টার আনাইয়া, কতকগুলি ব্যাণ্ড বানাইয়াছিল।

রচিত হইয়াছিল, তাহার বিতরণের ভার সিংহজী কুঁয়রকে দিলেন। সবাই জানিত কুঁয়র গরীব দুঃখীকে দান করিতে বড় ভালবাসে। কুঁয়রের জড় ভাব এক মুহূর্ত্তও দূর হইল না। সিংহজী পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কোন উপায় কুঁয়রকে প্রকৃতিস্থ করা যায়। একদিন জীন্দাঁ ও কুঁয়রাণীকে কাতরভাবে কহিলেন, আমি তখন হাজির-বাশ্ ছিলাম, "যদি ছোকরা কোথাও ভালবেসে ফেলে থাকে, ত তোমরা তার মনের কথা বার করো না; আর যদি নেহাৎ নীচঘরের না হয় ত বিবাহ দাও না; আর নীচঘরের হয়ত 'ঘর* বসাইয়া' দাও না, অমন ত আমাদের হয়। দেখছ ত ছোঁড়া মারা যেতে বসেছে।" শ্বাশুড়ী ও বধূ শুনিবামাত্র এমন নিষ্ঠুর কঠোরভাব ধারণ করিল; জীন্দাঁ এমন স্থির গম্ভীর স্বরে পিতা হইয়া পুত্রের বদ খেয়ালীতে সহায়তা করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে উপদেশ দিল; দুই খণ্ড হীরা দেখাইয়া উহার সাহায্যে সহজে সংসারজ্বালা জুড়াইবার উপায় এমন দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে ব্যাখ্যা করিল যে সিংহজী (যাঁহাকে জীন্দাঁ নিশ্চয় জাদু করিয়াছিল) ভয় পাইয়া, জীন্দাঁর আজ্ঞা ব্যতিরেকে তিনি কিছু করিবেন না, কিছু করিতে পারেন না, ইহা মিনতিপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলেন। বাস্তবিক জীন্দাঁ সিংহজীকে এতদূর বশীভূত করিয়াছিলেন, যে অন্দরে কেন, বাহিরেও মহারাণীর ইচ্ছাবিরুদ্ধে কিছু হইতে পারিত না।

পূর্ব্বে, কুঁয়রাণীর উপর তাঁহার অভাবনীয় অপরিসীম স্নেহ পড়িবার আগে, মাই জীন্দাঁর বাসনা ছিল যে কুঁয়র সাহেবের সহিত তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয়া মাতৃহীনা কন্যার, যাহাকে তিনি পিতৃগৃহ হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন আর যে তাঁহার সামান্য কথা গ্রন্থসাহেবের শ্রীমুখবাক্যের মত মানিত, বিবাহ দেন। কুঁয়র কিন্তু কিছুতেই রাজি হইল না, কারণ সে জানিত যে এই ষোড়শী মেয়েটি মহারাণীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। মহারাণী জীন্দাঁর বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে তিনি যাহা মনে করিবেন তাহা প্রকৃতির অটুট নিয়মের মত কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে। ভাবিয়াছিলেন যে সিংহজীর সময় তিনি যেমন বশীকরণ ইন্দ্রজাল বলে সর্ব্বে-সর্ব্বানী, তেমনি সের সিংহের রাজ্যকালেও ঐ কন্যার দ্বারায় সর্ব্বশক্তির আধার স্বরূপা হইয়া বিরাজ করিবেন। কিন্তু ঐ টিক্কার মত

* রীতিমত বিবাহ না করিয়া কোন স্ত্রীলোককে ঘরণী করিলে 'ঘর বসানো' বলে।

ঢিলা লোক এক 'না'-তেই তাঁহার গগনস্পর্শী কল্পনা-সৌধ ধূলিসাৎ করিয়া দিল। ইহাতে তাঁহার আক্রোশের এবং গাত্রদাহের সীমা রহিল না। সিংহজীও যে যুবরাজের "না"-কে "হাঁ" করাইতে পারিবেন না, নিদেন ঐ প্রকার চেষ্টা করিবেন না, কারণ ঐ ঘরোয়া ব্যাপার লইয়া উত্তরাধিকারীকে তিনি এমন কঠিন সমস্যায় ফেলিবেন না যে সে পিতার কথা রাখে কি নিজের মন রাখে —ইহা জীন্দাঁ বেশ বুঝিতেন, সেজন্য ঐরূপ অনুরোধ সিংহজীকে করিলেন না। অন্য "চাল" অবলম্বন করিলেন। এত দীন, লাঞ্ছিত ভাব দেখাইলেন, এত খস্থিভঙ্গ হইয়া পড়িলেন, যে সিংহজী জগত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময় একজন পালটি ঘরের সর্দ্দার, কুঁয়রের জন্য, রাজঅন্তঃপুরে "ডালা" পাঠাইলেন। রূপ, গুণ, বংশ, মর্য্যাদা, রাজনৈতিক লাভ, সকল দিক হইতেই সর্দ্দার-দুহিতার পাণিগ্রহণ কুঁয়রের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু জিন্দাঁ সিংহজীকে সোহাগভরে একদিন এইটুকুমাত্র কহিলেন, "তোমার জন্য আমি হাস্যমুখে এ অপমান সহিব, তুমি চিন্তা করিয়ো না।" অর্থাৎ জীন্দাঁর পালিত কন্যাকে, তাঁহার প্রকাশ্য যাচ্ঞা সত্ত্বেও, কুঁয়র গ্রহণ করিল না, আর এই সর্দ্দার-কন্যাকে বিবাহ করিবে, আত্মসম্মানের উপর এতবড় আঘাতটা, স্বামীর মুখ চাহিয়া তিনি প্রসন্নবদনে সহ্য করিবেন। সিংহজী বাহিরে আসিয়া ডালা ফিরাইয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। আমরা সকলে প্রমাদ গণিলাম। দরবারে বয়স্যরা স্ত্রৈণ বলিয়া গাল দিল, সিংহজীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিল। কিছু হইল না। এই সাঙ্ঘাতিক অপমানের ফল এই হইল যে সর্দ্দার চিরকালের জন্য রনজীত বংশের ঘোরতর শত্রু হইয়া রহিলেন। কুঁয়রাণীর প্রতি বিশেষ সদয় হইবার পর জীন্দাঁ একরম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ বধূর উপর সপত্নী বসাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন। আর কুঁয়রকে ত শাসাইয়াছিলেন যে কুঁয়রাণীর গদির ভাগ যদি কোন হতভাগী লইতে আইসে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া চিলকে খাওয়াই দিবেন। একবার একজন গোলীকে কি একটা অপরাধের জন্য অন্দরে খুনী কুকুর দিয়া সংহার করাইয়াছিলেন। আর এ পৈশাচিক কার্য্য লুকাইবার উদ্দেশ্যে, শেষরাত্রে অমৃতসরে অমাবশ্যা-স্নানের বাহানা করিয়া তাহার দেহটা নিজের রথে বহন করিয়া, নির্ব্বিকারচিত্তে রূপার কলসে কাদা ভরিয়া শবের গলায় বাঁধাইয়া, ঐ

পূত সরোবরে (সীখদের মহাতীর্থে) নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন ! এ কথা সকলে জানিত, কেবল সিংহজী জানিতেন না। তাঁহাকে সবাই এত ভালবাসিত যে তাঁহাকে ঘুণাক্ষরে কেহ ইহা জানিতে বা সন্দেহ করিতে দেয় নাই।

বধূ ও মহারাজ্ঞীর নিকট নিরাশ হইয়া কুঁয়রের জন্য কি করা উচিত সিংহ-মহারাজ ইহা তাঁহার বিচক্ষণ ও বহুদর্শী চিকিৎসক এবং উজীর আজীজ উদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজ্ঞ অমাত্য মত দিলেন যে দূরে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে টিক্কাসাহেবকে পাঠানো উচিত। পরামর্শের পর স্থির হইল যে কুঁয়র রাজপ্রতিনিধি হইয়া পেশাওয়ার প্রান্তে প্রেরিত হউন। উজীর সাহেব কহিলেন যে অ্যাহলে ফরঙ্গ (European)-দের মত কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ জাতি জগতে নাই অতএব কুঁয়রজীর সহিত ফিরিঙ্গি হাকিম যাওয়া চাই। ঠিক হইল যে জেনারেল অ্যাভিটাবিল* (General Avitaville) সুবেদার হইয়া আর মুশেঁ অ্যালাড † (Monsieur Allord) দেওয়ান মাল হইয়া সঙ্গে যান। সপ্তাহের মধ্যে সব বন্দোবস্ত হইয়া গেল। টিক্কাসাহেব শাহজাদার উচিত ঠাটে, হাজার লোকলস্কর সহিত শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজধানীর যেন অর্দ্ধেক রৌমক্ যুবরাজের সহিত চলিয়া গেল। কুঁয়রাণীকে পরে সুবিধামত পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।

দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা, অমায়িকতা আদি গুণে, বিশেষ শাহ-খরচে স্বভাব হওয়ার দরুন (পাঠান ভদ্রলোকেরা নিজে সরল ও দরাজ-হাত) কুঁয়র কয়েক মাসের মধ্যে পাঠানের মত দুর্দ্ধর্ষ প্রজা বশ করিয়া ফেলিল। সে আফগান চরিত্র বুঝিত ও তাহাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিত। কিছুদিনের মধ্যেই চির অভ্যাস মত একা পাঠানদের মাঠে, গ্রামে যেখানে সেখানে ঘোড়ায় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু বৎসর না যাইতে সুবেদার অ্যাভিটাভিল সাহেবের সহিত তাহার খিটিমিটি লাগিল। অ্যাভিটাভিল লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধান করিতেন। ফাঁসির হুকুম ত কথায় কথায় দিতেন। একজন বদমায়েসের অপরাধে গ্রাম জ্বালাইয়া দিতেন। চুরি বা ডাকাতি হইলে চতুপার্শ্বস্থ পল্লীসকল দু ক্রোশ পর্য্যন্ত ধ্বংশ করিয়া ফেলিতেন। ইনি খড়্গ সাহায্যে

* সিংহজীর একজন পুরাতন ইটালিয়ন সৈন্যাধ্যক্ষ।

† সিংহজীর একজন অর্থশাস্ত্র বিশারদ দরবারী।

শাসনের পক্ষপাতী—কুঁয়র মমতাদ্বারা শাসনের দিকে। সাহেবের কোন অতি নিষ্ঠুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে নজর-সানির আবেদন আসিলেই কুঁয়র সাজা কম করিয়া দিবার হুকুম দিতেন বা একেবারেই ক্ষমা করিতেন। অ্যাভিটাভিল দরবারে নালিশ করিলেন। কুঁয়র প্রতিবাদ করিল। প্রথামত তুজনেরই উকিল দরবারে নিয়োজিত ছিল। ইহাদের নিজ নিজ প্রভুর পক্ষ সমর্থন, দরবারে এক প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সরেজমীন্ তদারক করিয়া তুজনের শাসননীতির দোষগুণ নির্ণয় করা স্থির হইল। এইহেতু সেবার সিংহজী, দীনা নগরে না গিয়া পেশওয়ারের সন্নিকট, সরহদ্দী সূবার মধ্যস্থিত, হাজারাজাত* পার্ব্বত্য প্রদেশে গরমের সময়টা কাটাইলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়, যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া অন্যান্য সেবকবৃন্দ, এবং সেনা-নিবাসের আনুষঙ্গিক গুলজার বাজারের সমাগমে, কোলাহলপূর্ণ হইল। সবই যেমন আগে হইত তেমনি হইল, এক আবার কুঁয়র সাহেব মন-মরা হইয়া রহিল। তুই বৎসরের অধিক, বিভিন্ন কাজকর্ম্ম, বিভিন্ন বিচিত্র দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়া গিয়াও, তাহার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল না। আমাদের উজীর আজীজুদ্দিন, কেবল রাজনৈতিক-শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, চিকিৎসকশ্রেষ্ঠও ছিলেন। সিংহজী ইঁহার প্রাণের অধিক প্রিয় ছিলেন। শের সিংহের মানসিক অবস্থার উপর এই বহুদর্শী হকীম বরাবর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। একদিন বিমর্ষমুখে সিংহজীকে বলিলেন যে টিক্কা সাহেবের সমস্ত লক্ষণ উন্মাদের পূর্ব্ব-আভাষ বোধ হইতেছে। আসন্ন রোগ হইতে রক্ষা করিবার উপায় এই যে সিংহজী কুমারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে, সামান্য গৃহস্থ পিতার মতন সর্ব্বদা থাকেন। অথচ কুঁয়র কোনরূপ সন্দেহ না করে যে তাহাকে এতো বেশী সঙ্গদানের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

---

* আজকাল হাজারাজাত জেলার সদর মোকাম এবটাবাদ, উত্তর পশ্চিম প্রান্তের (N. W. F. P.) চীফ কমিশনরের 'সামার ক্যাপিটল'। এ দেশের উপত্যকাগুলির মত সুন্দর স্থান, যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি নদী-বন-পর্ব্বত শোভিত, ভারতে কম আছে।

ইংরাজরা "The gullies" মধ্যে গ্রীষ্মকালে বেড়াইতে যাইতে ও ক্যাম্প করিয়া থাকিতে বড় ভালবাসে। লিটন-রিপন আমলে, এ অঞ্চলের ভদ্র সমাজে, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খুব প্রতিপত্তি ছিল। পুরাকালে এ প্রদেশ তক্ষশীলা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। পাঞ্জাব কেশরীর শুভাগমনকালে পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্নমাত্র ছিল না। মহারাজার পদার্পণে ৩৪টি প্রাচীন মৃতপ্রায় পল্লী যেমন রাওলপিণ্ডি, হজরো, হসন অবদল পুনর্জ্জীবিত হইল। বিস্তর মন্দির, ধর্ম্মশালা, গুরুদোওয়ারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই যে উত্তর পেশওয়ার ও হাজারাজাতের শ্রী ফিরিল, এখন পর্য্যন্ত তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে।

যদি কুঁয়রের হৃদয়ে কোন গভীর ক্ষত থাকে, ত পিতার স্নেহপ্রলেপে সারিয়া যাইবে। মাতা পিতার স্নেহসুধা জগত সংসারে "অকসীরু এ-আজম।"

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক

['সিখ সম্রাট ও সতীর শাপ-এর লেখক আশৈশব পঞ্জাবে মানুষ হইয়াছিলেন। বালক অবস্থায় তিনি একদিন সন্ধ্যায় লাহোরের বাদসাহী মসজিদের এক মীনারের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের দৃশ্য দেখিতেছিলেন। লেখকের পার্শ্বে ছিলেন তাঁহাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সর্দ্দার কুমেদান শিব সিংহ। ইনি মহারাজ রণজীতের প্রিয় সহচর ছিলেন, বহু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন তখন লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে ও বিশেষভাবে কাবুল-বিজয়বার্ত্তা ঘোষণার জন্য লাহোরে বিরাট দরবারের ব্যবস্থা হইয়াছিল ও বাদসাহী মসজিদের নিম্নে ময়দানে দেশী রাজন্যবর্গের ও বিবিধ ভারতীয় সৈন্যদলের বিস্তৃত শিবির পড়িয়াছিল। হঠাৎ অন্ধকার নামিয়া আসামাত্র শিখসৈন্যেরা "বাহ গুরুজীকা খালসা" ও ডোগরা সৈন্যরা "জয় রঘুনাথজী" বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিল। লেখক ভয় পাইয়া কাঁদিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সর্দ্দার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া ইংরাজদের কাছে আপনারা হারিলেন?" সজলকণ্ঠে সর্দ্দারজি জবাব দিলেন, "ইংরাজের ফৌজ নহে, এক সতীনারীর অভিশাপ আমাদের সর্ব্বনাশ করিল।" কি করিয়া তাহা ঘটিল সেই কাহিনী পরে সর্দ্দার সাহেব লেখকের ও তাঁহার পিতামাতার নিকট বিবৃত করেন। এই কাহিনীর প্রথমাংশ এইরূপ:—মহারাজা রণজীতের উত্তরাধিকারী কুঁয়র শের সিংহ দীনানগরের রাজশিবির হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। দুইতিন মাস তাঁহার কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে কুঁয়রজি দলবল সহ বেয়াস নদীর তীরে বিচরণ করিতে করিতে একদিন ভোরে অভ্যাসমত একলা ঘোড়া ছুটাইয়া উধাও হইয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গীদের হুকুম দিলেন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে ও তাঁহার কোনো সন্ধান না করিতে। তাহার পর কি ঘটিল এই সংখ্যায় তাহার বর্ণনা আছে।]

(ক্রমশঃ)

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিরহ

বালুচর জ্বলে ধূ ধূ—সুদীর্ঘ সময়,
উড়ে গেছে শ্বেতপক্ষ যাযাবর পাখী !
আকাশে অবাধ শূন্য, আর কিছু নয়,
নির্লিপ্ত, অলস চোখে দূরে চেয়ে থাকি।
সবুজ ইশারা নেই তৃণহীন চরে।
জলের পশুর হাড় বিক্ষিপ্ত ধূলায়।
পিশাচী হাসির ধ্বনি বাতাসের স্বরে।
একাকী দর্শক আমি এ শিব-লীলায়॥

এখানে সমুদ্র ছিল নীলাম্বু নিথর,
আদিম প্রাণের বন্যা নিবিড় নীলিমা।
এখানে সমুদ্র ছিল অগাধ, দুস্তর,
উছল জলের দীপ্ত অশান্ত মহিমা !
তুমি যবে চ'লে যাও, সমুদ্র তো নয়
বালুচর জ্বলে ধূ ধূ,—সুদীর্ঘ সময় !

হরপ্রসাদ মিত্র

গোরা

বাংলার বিশ্ববরেণ্য কবি আপনার অজস্র সৃজনীপ্রতিভার সাহায্যে আজীবন সাধনার ফলে মাতৃভাষাকে যে-অপূর্ব্ব সাহিত্যে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহার যথার্থ তুলনা হইতে পারে সুবিশাল পর্ব্বতমালার সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সীমান্ত রেখাটি অনুসরণ করিয়া যখন আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে উপস্থিত হই, আমাদের মনে হয়, যেন এক সুদূরবিস্তৃত সমতল প্রান্তরে খণ্ড ছিন্ন পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিয়া এক সুদূরপ্রসারী পর্ব্বতশ্রেণীর সম্মুখীন হইলাম, যেমনি তাহার অভ্রভেদী উচ্চতা, তেমনি তাহার সীমাহীন বিস্তৃতি। এই বিরাট সাহিত্যের সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন বিপুলমতি মনস্বীর পক্ষেও সহজসাধ্য নহে। গোরা এই গিরিশ্রেণীর তুঙ্গতম শৃঙ্গ সমূহের অন্যতম। এই উপন্যাসের আকৃতি যেরূপ বৃহৎ বিষয়বস্তুর সম্ভারও তেমনি অপরিমিত। কত অগণিত পাত্র-পাত্রী, তাহাদের সঞ্চরণক্ষেত্র কত বিভিন্ন, তাহাদের মনোবৃত্তির মধ্যে কত বৈচিত্র্য, তাহাদের জীবনের সমস্যা কত ভিন্নজাতীয়, সেই সকল সমস্যার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কত তথ্য, তত্ত্ব ও আলোচনা! কল্পলোকে মুক্তপক্ষে বিচরণের অন্য শিল্পীগণ সাধারণতঃ বস্তুপুঞ্জের জঞ্জাল ঝাড়িয়া ফেলিয়া লঘুভার হন। কিন্তু পক্ষীন্দ্র গরুড় যেমন প্রকাণ্ড ভার লইয়াও ঊর্দ্ধে স্বচ্ছন্দে আপনার নয়নাভিরাম গতিভঙ্গীতে সঞ্চরণ করেন, গোরা-রচয়িতাও সেইরূপ গুরুভার স্বত্বেও অবলীলাক্রমে কল্পলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথ্য, তত্ত্ব, আলোচনা প্রভৃতি সাধারণতঃ রসসৃষ্টির পরিপন্থী। গোরাতে দেখিতে পাই, কবি তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তির প্রচণ্ড জারকরসে এই সকল কঠিন পদার্থসমূহকে জীর্ণ বিগলিত করিয়া সমগ্র উপন্যাস বাহিয়া অবিচ্ছিন্ন অবারিত রসধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। এই সুবৃহৎ উপন্যাসের সর্ব্বত্র যে-অপ্রমত্ত সামঞ্জস্যবোধ, চরিত্রসকলের বিকাশ ও পরিণতির মধ্যে যে-জীবন্ত সঙ্গতি, চরিত্র ও ঘটনার বিপুল ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও আখ্যায়িকার যে-সহজ স্বাভাবিক প্রবাহ দেখিতে পাই, তাহা আমাদিগকে বিস্ময়মুগ্ধ করে। সর্ব্বত্রই সক্ষম লেখনীর দুচারিটি সুনিপুণ রেখাপাতেই এক একটি দৃশ্য, ঘটনা ও চরিত্র

আমাদের ভাবলোকে ভাস্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন চরিত্র, কোন দৃশ্য নীহারিকার রাজ্যে নাই, প্রত্যেকে কবিকল্পনার কনককিরণ সম্পাতে আপনার বিশিষ্ট রূপশ্রী লইয়া ঝলমল করিতেছে। সুদীর্ঘ উপন্যাসের মধ্যে কোথাও স্রষ্টার ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। প্রতি ছত্রই সৃষ্টির আনন্দরসে সঞ্জীবিত হইয়া আমাদের চিত্তে আসিয়া দোলা দেয়।

গোরার সমালোচকদিগকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—সাহিত্যে লোকশিক্ষান্বেষীর দল ও বিশুদ্ধকলাবাদীর দল। লোকশিক্ষা সন্ধানীর দল বলেন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সাহিত্যের প্রধান কাজ নয়, আনন্দদান সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়; জীবন সমরাঙ্গনে এই বনভোজনবিলাসের স্থান কোথায়? যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্যিকগণই লোকশিক্ষার, সামাজরক্ষার, জাতিগঠনের গুরুভার বহন করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা জীবনের এই সকল দায়িত্ব এড়াইয়া কল্পলোকে পলাতকজীবন যাপন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়া গণ্য হইতে পাবেন না। দুরন্ত শিশুর জন্য কটুতিক্ত ঔষধকে সুচতুর চিকিৎসক যেরূপ অনুপানসহযোগে সুস্বাদু করিয়া তুলেন, গোরা-প্রণেতাও সেইরূপ নানাবিধ তত্ত্বকথাকে সরস সুন্দর করিয়া জনসাধারণের শিক্ষার উপযোগী করিয়াছেন। তিনি এই উপন্যাসে আমাদের সনাতন সমাজব্যবস্থার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সুগভীর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কবি তাঁহার সৌন্দর্য্যলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছেন মর্ত্ত্যলোকে, আমাদের সমাজধর্ম্ম, আচারবিচারকে বিরুদ্ধশক্তির বিদ্বেষপ্রসূত আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। প্রভুর রক্তচক্ষু অনেককেই সন্ত্রস্ত করিতে পারে না, সুহৃদের হিতোপদেশে অনেকের কোপবৃদ্ধি হয় কিন্তু কান্তার অনুরোধ কে এড়াইতে পারে? উপন্যাসের মধ্যে জনসাধারণ সেই কান্তাসম্মিত উপদেশ লাভ করে। কবি সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতিকে আপনার প্রাচীন পবিত্র পথে চলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। গোরা এইজন্য সত্যসত্যই সাহিত্যজগতে অতুলনীয়।

এই জাতীয় সমালোচকের দল তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দ্বারাই সাহিত্যকে অপমানিত করেন, কেননা তাঁহারা স্তব করিতেছেন সৌন্দর্য্যলোকের রাজলক্ষ্মীর নয়, শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে শিক্ষাব্রতীর সুদক্ষ পরিচারিকার। তাঁহারা কল্পনাশক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না, সাহিত্যের স্বকীয় উদ্দেশ্য আছে এ কথা

বরদাস্ত করিতে পারেন না, তাঁহারা কল্পনাশক্তিকে দেখেন বুদ্ধিবৃত্তির দাসীরূপে, সাহিত্যিককে দেখেন শিক্ষাক্ষেত্রের ও কর্ম্মক্ষেত্রের ভৃত্যরূপে। যে-সকল পাঠক মহাকবি দান্তের কাব্যে বহুবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অন্বেষণ করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর এক মুক্তদৃষ্টি রসবিদগ্ধ সমালোচক যে চমৎকার উক্তি করিয়াছেন তাহার দু'একটি এখানে একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারেঃ পেশাদার গণৎকার গৃহস্থের পারিবারিক জীবনের সকল পূর্ব্ব ঘটনা সংগ্রহ করিয়া ভুলক্রমে গৃহস্থের প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাইয়া গৃহকর্ত্তার হাতের রেখাঙ্কনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সংগৃহীত খবর সকল বলিতে সুরু করিলে গৃহস্বামী যেমন বলেন, আপনি এ বাড়ীতে আপনার সময় ও শক্তির অপচয় না করিয়া পাশের বাড়ীতে যান, সেইরূপ সাহিত্যিক ও তত্ত্বান্বেষী সমালোচকদিগকে বলিতে পারেন, আমার কাব্যের কথাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া আপনার মনোমত পূর্ব্বসংগৃহীত তত্ত্বকথার সমর্থনলাভের চেষ্টা না করিয়া অন্যত্র আপনার শক্তি ও সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। কাব্যে তত্ত্বকথা, নীতিকথা থাকিতে পারে,কিন্তু তাহারা উপলক্ষ্য মাত্র, তাহারা কাব্যের লক্ষ্য নহে; সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে গ্রহণ করিতে হয় পূর্ণ আত্মনিবেদনের সহিত উন্মুখচিত্তে নূতন কিছু লাভ করিবার জন্য; তবেই শিল্পীর রস-আবেদন পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, তাহার আত্মপরিচয় উজ্জ্বলতর করে, তাহার অন্তরপুরুষকে গভীরতর পরিণতি দান করে। সাহিত্যকে যাঁহারা কান্তাসম্মিত উপদেশ বা নীরস তত্ত্বকথার সরস প্রকাশ হিসাবে দেখেন তাঁহাদের সাহিত্যের সত্য স্বরূপ ও সাহিত্যের সৃষ্টিরহস্যের সহিত কোন পরিচয় নাই। রসান্বিত বাক্য কাব্য নয়; রসাত্মক বাক্যই কাব্য। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বকথার সহিত পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি গল্প জুড়িয়া দিলে illustration বা বিশদ্ দৃষ্টান্ত তৈরী হইতে পারে, কিন্তু উপন্যাস সৃষ্টি হয় না। উপন্যাসে অর্থের সহিত গল্পের যে সংযোগ তাহা কৃত্রিম বা যন্ত্রগত নহে, সে বন্ধন অচ্ছেদ্য, মর্ম্মগত। Illustration-এর একটিমাত্র অর্থ থাকে, তাহা ক্ষণকালের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়, সেখানে দ্বিতীয়বার চিত্তনিবেশের অবসর নাই। কিন্তু চন্দ্রতারকাখচিত অন্তহীন নীল আকাশের, বিচিত্র বর্ণসমুজ্জল সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের যেমন কোন সুনির্দ্দিষ্ট একটি অর্থ নাই, আছে সৌন্দর্য্য ও রহস্য, সেইরূপ কথাসাহিত্যের মধ্যেও কোন

একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই, আছে রহস্য ও ব্যঞ্জনা, সেই আয়ত্তের অতীত অনির্ব্বচনীয় রসময় সত্য, যাহা মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নব নব রূপে আমাদের প্রাণকে মুগ্ধ করে, যাহার অর্থ কিছুতেই নিঃশেষিত হয় না, যতই তাহার মধ্যে বার বার মনোনিবেশ করি তাহার রহস্য গভীরতর হয়, সে যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিরস যাহা 'বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়' ।

বিশুদ্ধ কলাবাদীর দল বলেন গোরা প্রচারসাহিত্য, গোরার মধ্যে উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু প্রচারের পঙ্কিলতা সাহিত্যকে কলুষিত করে, শিক্ষাই শিল্পের শেষ, তাহার কোন উদ্দেশ্য নাই। গোরা সমস্যামূলক উপন্যাস কিন্তু সমস্যা জিনিসটি বিশেষ দেশ ও কালের অথচ সাহিত্য সার্ব্বজনীন ও নিত্যকালের ; ব্রীহিশস্য যেমন বর্ষে বর্ষে জন্মায় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয় সমস্যাও সেইরূপ ; কালক্রমে সমস্যাগুলি সরিয়া গেলে সমস্যামূলক সাহিত্য সৌধহীন স্তম্ভের ন্যায় ভূমিসাৎ হইবে। গোরা তত্ত্ববহুল উপন্যাস কিন্তু তত্ত্বালোচনা সাহিত্যের কাজ নয়, সাহিত্যের কাজ রসসৃষ্টি। গোরার মধ্যে অপর্য্যাপ্ত বস্তুতান্ত্রিকতা দেখিতে পাই, গোরার সহিত বাস্তব জীবনের সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কিন্তু যথার্থ সাহিত্য বিচরণ করে সৌন্দর্য্যলোকে, জীবনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এইরূপ আলোচনা পাঠকালে আমাদের মনে হয় শ্রেয়োবুদ্ধিহীন ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি যেমন ধর্ম্মের উদারনীতিগুলি আশ্রয় করিয়াই তাহার নৃশংসাচরণের দ্বারা ধর্ম্মকে আঘাত করে, রসদৃষ্টিহীন সমালোচকও সেইরূপ সাহিত্যের মূলসূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া না বুঝিয়া স্থানে অস্থানে এইগুলি প্রয়োগ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক সৌন্দর্য্য প্রতিমার উপর কলঙ্কলেপন করেন। গোরার মধ্যে প্রচার ও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা কোথাও সাহিত্যসৃষ্টির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। সকল সাহিত্যেরই বিষয়বস্তু একটি বিশেষ দেশ ও কালের ; কিন্তু ঐ বিশেষ বস্তুই কবিকল্পনায় রূপান্তরিত হইয়া এক সুগভীর অর্থময়তায় ভরিয়া উঠে, কবি চিত্তের রসাবেগ হইতে অপরূপ জীবন লাভ করিয়া সার্ব্বভৌম ও চিরন্তন রূপ গ্রহণ করে। গোরার মধ্যে নানাবিধ তত্ত্বকথা আছে সত্য কিন্তু নিছক তত্ত্বকথা হিসাবে তাহারা কোথাও স্থান পায় নাই, পাঠকের রসের প্লাবনে বাহিত মন কোনখানে তত্ত্বের চড়ায় আসিয়া ধাক্কা খায় না। তত্ত্বকথার সাহায্যে কবি রসসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'তত্ত্বকথার সাহায্যে

রসসৃষ্টি' এই উক্তিকে কলাবাদীর দল অর্থহীন বাক্‌চাতুর্য্য বলিয়া মনে করেন। সত্য ও সুন্দর অভিন্ন কিনা এই বিতর্ক-কণ্টকাকীর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া, তত্ত্বোপলব্ধি আনন্দদায়ক হইলেও তাহা সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত নয়, কেননা রসাবেগ-পরিতৃপ্তিজনিত আনন্দই সাহিত্যের আনন্দ, ইহা স্বীকার করিয়াও, একথা বলা যায় যে তত্ত্বের সাহায্যে রসসৃষ্টি অসম্ভব নহে। যে-মেঘ আমাদের জল দেয় 'সেই আবার রঙের ছটায় আমাদের মন কাড়িয়া নেয়'; যে-গাছ আমাদের ছায়া দেয় 'সে-ই সবুজ শোভার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্য্যে দিগ্বধূদের ডালি ভরিয়া দেয়।' এই ভাবে প্রকৃতির মধ্যে যেমন মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে একটি সৌন্দর্য্যের দিক্ আছে, তেমনি তত্ত্বের মধ্যেও জ্ঞানের দিকের পাশাপাশি একটি সৌন্দর্য্যের দিক্ আছে। তত্ত্বের এই সৌন্দর্য্যের দিক্‌টি আমরা দেখিতে পাই না, তাহার কারণ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তির ও বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তির সম্মিলন অতীব বিরল। কবি তত্ত্বকথার জগতে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিয়াছেন, কিন্তু সেখানেও সর্ব্বসম্পৎশালিনী কবিকল্পনা তাঁহার চিরসঙ্গিনী, এই জন্য তত্ত্বের যে-রূপ, রঙ্ ও সুর আছে, যাহা গম্ভীরপ্রকৃতি বুদ্ধিশক্তির কাছে কোন আমল পায় না, তাহা কবির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যথোচিত সমাদর লাভ করিয়াছে। তত্ত্বকথা এই উপন্যাসে মানবহৃদয়ে বেদনা, বিস্ময়, আনন্দের বাহন। তাহাদের সাহায্যে উপন্যাসের এক একটি চরিত্রের অন্তরপুরুষের সত্য পরিচয় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

গোরাতে কবি সৌন্দর্য্যলোক হইতে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতায় ভরা বাস্তবলোকে নামিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং গোরার সাহিত্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে, এই উক্তি বিচারসহ নহে। সৌন্দর্য্য যাহাদের নিকট অবসরবিনোদনের সামগ্রী, কবিয়ানা যাহাদের পেশা, ক্ষীণপ্রাণা আচারসর্ব্বস্বা পল্লীবৃদ্ধা যেভাবে খড়কুটা এড়াইয়া পথে চলে, সেইভাবে যাহারা জীবনের রূঢ়তা দূরে রাখিয়া কাঁটাছাটা বেড়া দেওয়া নিভৃত নিকুঞ্জবনে সৌন্দর্য্য রচনা করেন, তাঁহারাই বাস্তবজীবনকে সাহিত্যে স্থান দিতে ভয় পান, কিন্তু সৌন্দর্য্য যাঁহাদের সাধনার বস্তু, কল্পনাশক্তি যাঁহাদের বলিষ্ঠ, যাঁহারা সৌন্দর্য্যের নিগূঢ় আনন্দরস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা 'ন বিভেতি কুতশ্চন', তাঁহাদের মধ্যে এই শুচিবায়ু-গ্রস্ত ভাব দেখা যায় না। জীবন এবং শিল্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একের সহিত

অন্যের কোন সম্পর্ক নাই, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইতে পারে না। রসদৃষ্টিহীন সমালোচক ও পাঠকের দল যেদিন কল্পলোকবিহারী কবির পক্ষচ্ছেদের আয়োজন করিতেছিল, স্বভাবানুকারিতা ও বিশ্বাস্যতার কৃত্রিম মানদণ্ড খাড়া করিয়া হতশ্রী জীবনের অন্ধ রসহীন অনুকৃতিকেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলিয়া অভিনন্দন জানাইতেছিল, জীবনে এইরূপ ঘটিয়া থাকে, জীবনে এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, এই অজুহাতে আখ্যায়িকানির্ম্মাণ ও চরিত্রচিত্রণে স্বৈরাচারের সমর্থন করিতেছিল, তখন শিল্পই শিল্পের শেষ এই মতবাদিগণ কবিকল্পনার সৃজনীপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া, চরিত্র-চিত্রণ আখ্যানরচনা প্রভৃতি বিষয়ে মানবহৃদয়ের বিধিলিখিত রসানুশাসনকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া দৃপ্তভাবে প্রকাশ করিয়া, শিল্পের সত্যস্বরূপ নির্ণয়ে যে পরিমাণ সহায়তা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই, কিন্তু কেবলমাত্র এই মতবাদের সাহিত্যের বিশেষতঃ আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। সাহিত্যের সহিত জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সংযোগ অনেকটা গূঢ় অন্তঃশীল, কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যে ইহা অব্যবহিত প্রত্যক্ষগোচর রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের রসদৃষ্টির সাহায্যে জীবনে বিরাট্, মহান্, ভীষণ, সুন্দর, চারু, করুণ প্রভৃতি যাহা কিছু রসময় আবিষ্কার করিতেন, তাহাই চিরপ্রসিদ্ধ সর্ব্ববাদিসম্মত শিল্পরূপের মধ্যে প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের রসবোধের সাহায্যে তৎকালীন জীবনের সত্যমূল্য যাচাই করিয়া লইবার কথা তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই। আধুনিক সাহিত্য রসবোধের সাহায্যে আধুনিক জীবনের যথার্থ রূপটি আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যগ্র; কবিকল্পনার মুক্ত মুকুরে জীবনের যে-রূপটি ভাসিয়া উঠে, শিল্পী তাহাই অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত যথাযথভাবে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করেন। এইজন্য যাঁহারা প্রচলিত বিধিব্যবস্থাগুলি আঁকড়াইয়া থাকিতে নিরাপদ বোধ করেন, তাঁহারা এই চিত্র দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠেন। হঠাৎ যেন আমাদের বদ্ধ দৃষ্টি মুক্ত হইয়া যায়, অকস্মাৎ বাস্তব জীবন হইতে চির পরিচিত যবনিকা উঠিয়া যায়, এবং দেখিতে পাই আমরা অভ্যাস ও সংস্কারবশে যাহাকে পূজা করি সে কত হেয়, যাহাকে অবজ্ঞা করি তাহার মধ্যে কত মহত্ত্ব লুকাইয়া আছে, জীবনে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সম্ভাবনীয়তা কত অধিক, কিন্তু

চতুর্দ্দিকে কি দিগন্তজোড়া ব্যর্থতা ও নিরানন্দ, কি মর্ম্মভেদী শুষ্কতা ও রিক্ততা !

গোরা বর্ত্তমান বাঙ্গালী তথা ভারতীয় জীবনের মহাভারত। একটি দেশের জীবন এমন সমগ্রভাবে একটি উপন্যাসের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ বিরল। সমাজের প্রত্যেক স্তর হইতে, জীবনের প্রত্যেক বিভাগ হইতে প্রতিনিধি আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক, ধর্ম্মবিষয়ক, শিক্ষাবিষয়ক কত ভিন্নজাতীয় সমস্যাসমূহ এই উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে। পৃথিবীর শেষ প্রান্তবাসী কোন বিদেশী এই উপন্যাস পাঠ করিয়া এই দেশের জীবনের একটি পরিপূর্ণ ছবি পাইবেন। সমগ্র দেশ বিভক্ত বিচ্ছিন্ন ; যে-আলাপ পরিচয়ের ফলে মানুষ নিজের মতামত ও সংস্কার অতিক্রম করিয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করিতে পারে, যে-ভাব বিনিময়ের সাহায্যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি লাভ করে, সত্যদৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়, কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ, এই বোধশক্তি পরিপুষ্ট হয়, সেই আলাপ পরিচয় ও ভাব বিনিময়ের কোথাও কোন সুযোগ নাই, অথচ ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের, মতের সহিত মতের, দলের সহিত দলের সংঘর্ষে অহর্নিশি যে-উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ উদ্গীর্ণ হইতেছে, তাহা জাতীয় জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া দেশের প্রতি ধূলিকণাকে বিষে নীল করিয়া দিতেছে। যে-পুঞ্জীভূত বেদনার চাপ নারীদের জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে কাহারও হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, বাহিরের সকল সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মের নিত্যচক্রে বন্দিনী থাকার ফলে শুধু যে তাহাদেরই প্রাণশক্তি বুদ্ধিশক্তি শুকাইয়া যাইতেছে, তাহাই নহে, তাহারা দেশের সকল কল্যাণ প্রচেষ্টার পথে অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞান প্রাণ প্রীতির অভাব, অর্থহীন আচারবিচার ও কুসংস্কারের প্রভাব দেশের অশিক্ষিত সমাজের জীবনযাত্রাকে নানা জাতীয় যন্ত্রণার ভারে অসহনীয় করিয়াছে, তাহাদের জীবনকে নিরতিশয় ইতর ও কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। দেশের শিক্ষিত সমাজ নকল সাহেবিয়ানার বীভৎস পুচ্ছপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেছে, পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও বিদেশী সরকারের গোলামি করিয়া অহঙ্কারে আত্মহারা হইতেছে,

বিদেশী সরকারের শক্তিকে নিজের শক্তি মনে করিয়া দেশবাসীর প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ প্রদর্শন করিয়া তৈলচিক্কণ মসৃণ দেহে প্রাণহীনের ন্যায় জীবন কাটাইয়া দিতেছে। ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার পঙ্কিলতা সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। কি শিক্ষিত সমাজ, কি অশিক্ষিত সমাজ সর্ব্বত্রই মিথ্যা লজ্জা, মিথ্যা ভয় ও মিথ্যা মানের দিগন্তবিস্তৃত ষ্টীম্‌রোলার অহর্নিশি গড়াইয়া গড়াইয়া বক্ষপঞ্জরকে গুঁড়াইয়া দিতেছে। দেশময় একটি ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় ও নিরুপায়ের ভাব, এই দুর্দ্দিনের কোন দিন অবসান হইতে পারে, একথা ভাবিতেও যেন সকলেরই ভয় করে। এই দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় সমাজের অন্তরে আমরা একটি নবোৎসারিত জীবনের ফল্গুপ্রবাহ দেখিতে পাই যাহা জ্ঞানশক্তির দ্বারা মূঢ়তাকে, প্রাণশক্তির দ্বারা জড়তাকে, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে জমাট-বাঁধা নৈরাশ্য ও অবসাদকে আঘাত করিতেছে। এই বলিষ্ঠ সমাজচিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে উপন্যাসের অসংখ্য পাত্র পাত্রীকে আশ্রয় করিয়া। চসারের ক্যাণ্টারবেরী গল্পগুচ্ছের অবতরনিকা পাঠ করিয়া ড্রাইডেন বলিয়াছিলেন, Here we find God's plenty। এই উক্তি গোরার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কত বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিকভাবে আনাগোনা করিতেছে, কোথাও তাহাদিগকে কবির ইচ্ছাচালিত কলের পুত্তলি বলিয়া মনে হয় না। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে যে-অফুরন্ত প্রাণলীলা তাহাই যেন কবি মন্ত্রবলে কথাসাহিত্যের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। প্রচুর সরস শাখাপল্লব সত্ত্বেও যেমন বনস্পতির একটি অভ্রভেদী সরল মহিমা দেখা যায়, সেইরূপ বিষয়বস্তু ও পাত্রপাত্রীর এই প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও গোরার আখ্যায়িকার মধ্যে একটি বৃহৎ সারল্য আছে। বিষয় ও পাত্রপাত্রীর এই অজস্র সম্ভারের সাহায্যে একটি অপূর্ব্ব চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কথাসাহিত্যে যাহারা দোসর পাওয়া কঠিন। বস্তুত গৌরমোহনশূন্য গোরা রামশূন্য রামায়ণ।

গোরা একজন লোকোত্তর পুরুষ। এই শালদীর্ঘ, ব্যূঢ়োরস্ক, শক্তিগরিষ্ঠ যুবকের পদক্ষেপে মাটি যেন কাঁপিতে থাকে, কণ্ঠে তাহার জীমূতমন্দ্ররব। হৃদয় তাহার সমুদ্রের ন্যায়, উদ্দাম গতিবেগবান্ তাহার হৃদয়াবেগসমূহ। সঙ্কল্পে সে সানুমানের ন্যায় অচল। তাহার অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ভিতরের ও বাহিরের সকল বাধা বিঘ্নকে কাটিয়া ছাঁটিয়া দলিয়া নিজের গতিপথ অব্যাহত

রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারে। অপরাজেয় তাহার আত্মমর্য্যাদাবোধ, আত্মশক্তির উপর তাহার সীমাহীন বিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়হীনতার প্রতি তাহার সীমাতীত অবজ্ঞা। উচ্চ আদর্শের নিকট সে তাহার জীবনকে পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করিয়াছে; ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্রতা তাহার কর্ম্ম ও চিন্তাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; সে যেন স্বদেশ বিধাতার কোন গূঢ় অভিপ্রায় সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহার আশা বৃহৎ, তাহার কল্পনা বৃহৎ, বৃহৎ তাহার আনন্দ, বৃহৎ তাহার বেদনা। তৃণগুল্মের রাজ্যে সে বনস্পতি, সমতল প্রান্তরে সে গিরিশৃঙ্গ। প্রাচীন সাহিত্যে এই জাতীয় চরিত্রের উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে চরিত্রের আত্মপ্রকাশ কীর্ত্তিকাহিনীর মধ্য দিয়া, বিরাটপুরুষের হৃদয়-স্পন্দন কোথাও এত নিকটে এত নিবিড়ভাবে অনুভব করি না। গোরার মধ্যে বিরাট লোকোত্তর পুরুষের lyrical স্বরূপটি দেখিতে পাই। গোরার চরিত্র-চিত্রণে গীতধর্ম্মী কবিপ্রতিভার পয়িচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় চরিত্র অনেক সময় আপনারা দূরত্বের জন্য আমাদের সমবেদনার পরিধির বাহিরে থাকে, কিন্তু উচ্চ আদর্শের জন্য গোরা নিজের সহিত যে-ভাবে সংগ্রাম করিয়া নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিতেছে, তাহার সেই ব্যর্থতার বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের চিত্রটি আহত শিশুর পাণ্ডুর মুখশ্রীর ন্যায় আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে, ও আমাদের অন্তরে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত করুণার উদ্রেক করে।

গোরার মতামত ও বিশ্বাস তাহার কাছে অত্যন্ত সত্যবস্তু। কৃষ্ণদয়ালের উগ্র আচারনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার সংস্কৃতিমান মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। মিশনারী সাহেবদের এদেশীয় শাস্ত্রে ও সমাজের প্রতি আক্রমণ তাহার স্বদেশবৎসল হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিল। সে ভারতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের আলোচনায় তলাইয়া গেল। ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল। ভারতবর্ষ বলিয়া একটি সুমহৎ সত্তা তাহার চোখে পড়িল, অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সে সুবৃহৎ ঐক্য দেখিতে পাইল। মানুষের প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া একটি বিশেষ মত ও পথের জাঁতাকলে চাপিয়া মানুষের জীবনকে নিষ্ফল করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষ করে নাই। মানবের জীবনকে কত বিচিত্ররূপে সার্থক পরিণামের দিকে লইয়া যাইবার জন্য

ভারত সাধনা করিয়াছে ; সত্য ও ধর্ম্মকে কত ভিন্ন দিক হইতে কত ভিন্ন উপায়ে উপলব্ধি করিয়াছে ; রূপের সহিত অরূপের, বিশেষের সহিত অশেষের কি অনুপম সমন্বয় সাধন করিয়াছিল। ভারতের একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে, একটি বিশেষ সাধনা আছে, বিশ্বসভ্যতাকে দিবার মত একটি বিশেষ বাণী আছে। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসী কোন গৌরববোধ করে না, বরং ইউরোপীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের সহিত হুবহু মিল না দেখিয়া শিক্ষিত সমাজ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে, মিথ্যা আত্মসম্মানবোধে বলিতেছে এ ধর্ম্ম, এ সমাজ আমার নয়, যাহারা ইহা মানে সেই জনসাধারণ হইতে আমরা স্বতন্ত্র ; সকল বিষয়ে মেকী সাহেব হইয়া উঠিবার চেষ্টার দ্বারা তাহারা তাহাদের কালো অঙ্গে গভীরতর কলঙ্কের কালি লেপিয়া লইতেছে। ভারতীয় সভ্যতার সম্ভাবনীয়তার এই ব্যর্থতার সম্ভাবনায় গোরা প্রাণান্তকর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিল। তাহার সঙ্কল্প হইল, স্বদেশের প্রতি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিবে, দেশের সম্বন্ধে কোন লজ্জা ও কোন সঙ্কোচকে কাহারও মনে স্থান পাইতে দিবে না। সে বলিল, এই মূঢ় ইতর জনসাধারণ আমার ভাই, তাহাদের কুসংস্কারই আমার সংস্কার। যাহা কিছু স্বদেশের তাহাকেই নিজের কাছে ও পরিহাসপরায়ণ শত্রুর কাছে কল্পনার ইন্দ্রজালে উজ্জ্বল ও মনোহর করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাবী ভারতের সমুজ্জ্বল চিত্রটি জাগিয়া থাকিত—সে ভারতবর্ষ ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ত্যাগে পূর্ণ, প্রেমে পূর্ণ, কর্ম্মে পূর্ণ, ধর্ম্মে পূর্ণ। এই পরিপূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষের, এই লক্ষ্মীর বন্দরটির আহ্বান তাহার অন্তরে নিরন্তর ডমরু বাজাইত। এই আহ্বানকে সে অপরের কাছে সত্য ও স্পষ্ট করিয়া তুলিবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

দেশের হৃদয়ের আন্দোলন হইতে, দেশের বৃহৎ প্রবাহ হইতে ব্রাহ্মরা নিজেদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, জাতীয় চরিত্রের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধাহীন, জাতির ভবিষ্যতে আস্থাহীন, জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ, এই জন্য গোরা তাহাদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত। বিনয়ের সহিত অকস্মাৎ এক অভিজাত ব্রাহ্ম পরিবারের পরিচয় হইল। গোরার প্রাণপণ সঙ্কল্প, বিনয়কে এই সংসর্গ হইতে মুক্ত করিবে। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের প্রতি মানবহৃদয়ের যে-আদিম উদ্দাম

আকর্ষণ তাহাই বিনয়কে এই পরিবারের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছে, সে যেন এতদিনে একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে, ছায়ালোক হইতে রূপলোকে আসিয়াছে, এইজন্য উভয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে সাধারণ ঘটনার সাহায্যে তাহাদের জীবনের এই বিরোধটি এমনই শক্তিমত্তার সহিত চিত্রিত হইয়াছে যে মনে হয়, দুর্বার নিয়তি তাহাদের মিলন বার বার সম্ভবপর করিয়া আনিয়াই আবার পর মুহূর্ত্তে দেখাইয়াছে যে দুইটি জীবন পরস্পরবিরোধী দুই স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। এই বিচ্ছেদের জন্য উভয়ে অন্তরে যে বেদনা বোধ করিতেছে তাহার সাহায্যে একটি অতীব মনোজ্ঞ বন্ধুত্বের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিনয়কে রক্ষা করিতে যাইয়া গোরা দেখিল যে মোহ ও আবেশের ইন্দ্রজাল তাহার উপরেও মায়া বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, তাহাকে প্রবৃত্তি সাম্‌লাইতে হইবে, ব্যক্তি বিশেষের প্রণয় লইয়া সে থাকিতে পারে না, তাহার জীবনে নারীপ্রেমের কোন স্থান নাই। সে পল্লীভ্রমণে বাহির হইল। সেখানে দেখিল যে যে-আচারবিচারকে সে অভ্রান্ত, পরমকল্যাণকর মনে করে, তাহাই জনসাধারণের জীবনে প্রীতি ও ঐক্যের অন্তরায়, সকল শক্তি ও আনন্দের উৎসকে তাহারাই শুকাইয়া দিতেছে, সারাদেশকে নিরুপায় অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে আনিয়া হাজির করিয়াছে। দেশের আচারবিচারের প্রতি ঘৃণা জন্মায়—সে যেন নিজেকে আবর্ত্তের মধ্যে হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, সে ভাবিল এ কি হইল, ছলনাময় দেবতারা কি চক্রান্ত করিয়া দেশের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া তাহার তপস্যাভঙ্গের আয়োজন করিয়াছে? সে সঙ্কল্প করিল দয়া প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিকে সে স্থান দিবে না, তাহারা জ্ঞানকে, নিষ্ঠাকে, তপস্যাকে আবিল করিয়া ফেলে। এই বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সে আর এক বিঘ্ন দেখিতে পাইল, এ আবার কোন মায়াবিনীর ষড়যন্ত্র। তাহার বাণী সুচরিতার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, ভারতবর্ষের আহ্বানে সুচরিতার অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিয়াছে, এই জন্য গোরার হৃদয় তাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইবার জন্য উদ্দামভাবে ছুটিয়া যাইতেছে, কিন্তু গোরা প্রতিজ্ঞা করিল, সে কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না, সাধক সে, নারীর সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। যৌবনের প্রসারণোন্মুখ হৃদয়ের প্রবল আবেগসমূহ একটি সত্যপথে সমুদ্রের জোয়ারের ন্যায় ছুটিয়া

চলিয়াছে কিন্তু তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে গোরা তাহাদিগকে দমনের চেষ্টা করিয়া নিজেকে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া ফেলিতেছে। গোরা দেখিল, তাহার সঙ্গীদের দেশের প্রতি দরদ নাই, তাহার প্রিয়তম বন্ধু যেখানে গোরার নাড়ীর টান সেখানে ছোরা বসাইয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, তাহার স্নেহময়ী মাতা সমাজের আচার লঙ্ঘন করিয়া সমাজ হইতে দূরে রহিয়াছেন; গোরার হৃদয় অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। সে অনুভব করিল কোথাও একটা ভুল হইয়াছে, সে নিশ্চয় সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে, সে নিত্যধর্ম্মকে আঘাত করিয়াছে, নতুবা কেন তাহার জীবন এভাবে অভিশপ্ত, সে কাহারও সহিত মিলিত হইতে পারিতেছে না, সর্ব্বত্রই বিরোধ—বন্ধুর সহিত, মাতার সহিত, প্রেমাস্পদের সহিত, শ্রদ্ধাস্পদের সহিত, যাহাদের সেবা করিতেছে তাহাদের সহিত—সকলের সহিত বিরোধ, তাহার জন্মবৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত হইলে সে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরিসীম তৃপ্তি বোধ করিল, যাহা গৌণ তাহাকে মুখ্য মনে করার যে নিদারুণ ভার তাহা খসিয়া পড়িল, সাময়িক প্রয়োজন সাধনের লুব্ধতায় সত্যকে ক্ষুব্ধ করার যে বিড়ম্বনা তাহার সমাপ্তি হইল, সকল বিরোধ ও অনৈক্যের অবসান হইল। তাহার যে আচারদ্রোহিণী মাতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই,' তিনিই যথার্থ কল্যাণের প্রতিমা; যে-পরেশবাবু সত্যকে সুখ-সম্পদ্, দেশ-সমাজ সকলের ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া সকল সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দেবতার চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহার গুরু, তাঁহার প্রিয়তমা শিষ্যাই তাহার জীবনসঙ্গিনী।

গোরার যে জন্মবৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনেকের মনঃপূত হয় নাই; তাঁহারা বলেন ইহা কবির জাতীয় চরিত্রে আস্থাহীনতার পরিচায়ক। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সাহিত্যের ঘটনাকে শিল্পেতর দৃষ্টি হইতে দেখিলে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। এই ঘটনা উপন্যাসের ভূমিকা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। এই ভূমিকা রসসৃষ্টির পক্ষে, বিষয়বস্তুকে শিল্পরূপে রূপায়িত করিবার পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছে। আমরা প্রারম্ভেই এই ঘটনা জানিতে পারি কিন্তু উপন্যাসের পাত্রপাত্রীগণের নিকট ইহা অবিদিত। তুচ্ছতম আচার বিচারের বিন্দুমাত্র লঙ্ঘনে যে-গোরা দারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছে,

এই ঘটনা কখন কিভাবে তাহার কাছে উদ্ঘাটিত করা হইবে, সে কিভাবে ইহা গ্রহণ করিবে, ইহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত আগ্রহে আমরা পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাই; গোরার আশঙ্কা, উদ্বেগ, বেদনা নূতন অর্থে ভরিয়া উঠে। আমরা ধীরে ধীরে বুঝিতে পারি যে প্রতি পদে উদ্দেশ্য সাধনে বিড়ম্বিত হইয়া গোরার আহত হৃদয় যে-উপলব্ধি সঞ্চয় করিতেছে, তাহা তাহাকে সত্য পথে চালিত করিবে। গোরার জন্মরহস্য-উদ্ঘাটন একটি আকস্মিক বাহ্য ঘটনা মাত্র নহে। যে-চাঞ্চল্যকর বাহিরের ঘটনার সহিত চরিত্রের অন্তরের বিকাশের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই, উচ্চাঙ্গের কথাসাহিত্যে তাহার স্থান নাই। সামাজিক আচার বিচারকে একান্তভাবে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিলে সমাজের অন্তর্নিহিত সত্যবস্তুর বিকাশ ব্যাহত হয়, এই সত্য গ্রহণের জন্য গোরার চরিত্রের পরিণতির মধ্যে সঙ্গোপনে আয়োজন চলিতেছিল। শেষের দিকে গোরার মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণভাব দেখিতে পাই না, তাহার মতামতের আর সেই পূর্ব্বের জোর নাই; সে বুঝিয়াছে যে তাহার অভিপ্রেত জীবন একটি কৃত্রিম বোঝা স্বরূপ হইয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া দিবে, সে নূতন সত্য লাভের জন্য উন্মুখচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে। গোরার জন্মবৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত হওয়ার পর সে বিস্মিত হইল সত্য, কিন্তু সে যেন এই ঘটনার মধ্যে যে-সত্যের জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহাই পাইল। সে অস্ফুটভাবে যাহা অনুভব করিতেছিল তাহাই নিঃসন্দিগ্ধভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ব্যাকুলতার সহিত বিস্ময়ের সম্মিলনে নিবিড়তর সাহিত্যরস জমিয়া উঠিয়াছে।

গোরা একটি পরিপূর্ণাঙ্গ কমেডি। কমেডি-সাহিত্যে আমরা সাধারণত দেখিতে পাই সামাজিক জীবনের ব্যঙ্গচিত্র, স্বপ্নলোকে অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ তরুণীর অলীক বাধাবিঘ্নের উপলব্যথিত গতি মিলনান্তক প্রণয়লীলা, এবং বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টিছাড়া হাস্যকর সমাবেশ—প্রেমিকের পাশে পেটুক, বীরের পাশে ভীরু, আদর্শবাদীর পাশে ভোগবাদী। চরিত্রগুলি জীবন্ত নরনারী বলিয়া প্রতীয়মান না হওয়ায় সত্যকার আঘাত-সংঘাত না থাকায় ও আখ্যায়িকার মধ্যে মর্ম্মগত সংহতির অভাবের জন্য কমেডি-সাহিত্য ট্র্যাজিডির ন্যায় মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় না, স্থায়ী আনন্দরস সৃষ্টি করিতে পারে না। এই ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিয়া

কবি এই সাহিত্যরূপের মধ্যে যে-শিল্পরস সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, তাহাকে সফল করিয়া তুলিয়াছেন। ট্র্যাজিডির অন্তরের সুরটি পরাজয়, ব্যর্থতা ও বেদনার সুর; কমেডির সুরটি বিজয়, সার্থকতা ও আনন্দের সুর; এই সার্থকতা ধনদৌলত, মান-খ্যাতি লাভের সার্থকতা নহে, এই আনন্দ আত্মোপলব্ধির আনন্দ। গোরা শেষে উপলব্ধি করিয়াছে যে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও আনন্দ জীবনের চরমতম সাধনার পরিপন্থী নহে, পরন্তু ইহাদের সংস্পর্শে সাধনা সম্পূর্ণ হয়, সার্থক হয়। গোরা, বিনয়, সুচরিতা, ললিতা সকলেই সংঘাতের মধ্য দিয়া আপন আপন প্রকৃতির অপূর্ণতা জয় করিয়া জীবনে সার্থক পরিণামের পথে চলিয়াছে। দুঃখদ্বন্দ্ব, শোকমৃত্যুর তমিস্রা ভেদ করিয়া কবি জ্যোতির্ম্ময় সত্যলোকে উপনীত হইয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, জীবনের মূল সুরটি সার্থকতার সুর, এবং সমগ্র সৃষ্টি অখণ্ড আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত; কবির সৃষ্টি এই উপলব্ধির অমৃতধারায় অভিষিক্ত; এই উপলব্ধির পুণ্য পরশটি আমাদের বদ্ধমূল অবিশ্বাস, নৈরাশ্য ও নিরানন্দের ভারকে মুহূর্ত্তের জন্য দূর করিয়া একটি অমৃতলোক, আনন্দলোকের বাণী আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

গোরার মধ্যে দুইটি প্রণয়লীলা দেখিতে পাই। দুইটি মিলনই বিরুদ্ধ মিলন, এ মিলন যে সম্ভবপর তাহা কেহ ভাবিতেও পারে নাই। গোরা ও সুচরিতা, বিনয় ও ললিতা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইবে, কখন যে তাহারা অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহারা নিজেরাও জানিতে পারে নাই। যখন বিদ্বেষপরায়ণ প্রতিপক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিল তখন তাহারা চমকাইয়া উঠিল, বিস্মিত হইয়া ভাবিল এ কি হইল, এত অন্যায় সন্দেহ নহে। এই ভাবে প্রেমের আবির্ভাবের রহস্যময়তার, এই বিষয়ে নরনারীর সগোচর ইচ্ছাশক্তির অসহায়তার হৃদয়গ্রাহী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যখন এই আবির্ভাব তাহাদের গোচরে আসিল, তখনও তাহারা জানে যে পরস্পরের সহিত মিলন অসম্ভব। প্রণয়াবেগ তাহাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে কিন্তু প্রকাশের পথ না পাইয়া উদ্দামতর হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের গোপন প্রণয়ের কথা যখন পরিহাস-পরায়ণ স্ত্রীপুরুষ সকলের মুখে মুখে সকৌতুকে দোলা খাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন তাহারা সকল বাধা-বিঘ্নের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া মিলিত হইবার জন্য উদ্যত হইল। প্রেমের প্রবাহ

বাধাবিঘ্নের উপলখণ্ডে পদে পদে ব্যাহত হইয়া মুখরিত, তরঙ্গিত হইয়া ছুটিয়াছে, এই আশ্চর্য্য দৃশ্য আমরা মুগ্ধনয়নে আত্মবিস্মৃত হইয়া দেখিতে থাকি।

গোরার মধ্যে আমরা উচ্চাঙ্গের হাস্যরস দেখিতে পাই। এই হাসি যথার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির হাসি, এ হাসির মধ্যে প্রগলভতা নাই; কথাগুলি যেন সকল জানিয়া শুনিয়া বাহিরে নিতান্ত ভালো মানুষের ভাণ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। গোরার মধ্যে বিভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন চরিত্রসকল একত্র হইয়াছে, প্রত্যেকে স্বকীয় স্বতন্ত্র মনোলোকে বিচরণ করিতেছে; একজন যখন স্বপ্রতিষ্ঠভাবে তাহার নিজের দৃষ্টিকোণ হইতে অপরের কাজের ও কথার ভুল ব্যাখ্যা করে, তখন স্বতঃই হাস্যরস উৎসারিত হইয়া উঠে। গোরা বিনয়কে ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে রাস্তায় দেখিতে পাইয়াছে, এই জন্য বিনয় যখন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, বরদাসুন্দরী ভাবিল, আচার্য্যের উপদেশ বিনয়ের মনে ক্রিয়া করিতেছে। গোরার অনুপ্রেরণায় সুচরিতা ভারতবর্ষের হৃদয়ের আন্দোলন নিজের হৃদয়ে অনুভব করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া কহিল, আমি হিন্দু, তখন হরিমোহিনী এই মতিপরিবর্ত্তন যে তাহার ঠাকুরসেবার ফল, ইহা স্থির করিয়া নৈবেদ্যের পরিমাণ বাড়াইবার সঙ্কল্প করিল। গোরার মধ্যে এই জাতীয় উদাহরণ প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। একটি নগণ্য ব্যক্তি সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠতাভিমানে কৃত্রিম বিনয়ে যখন নিজেকে নগণ্য বলিয়া ঘোষণা করে, তখন যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় তাহা আমাদের ব্যঙ্গ হাস্যের উদ্রেক করে। অবিনাশ নিজেকে বিনয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া বলিতেছে, 'আমরা বিনয়বাবুর মত অত বিদ্বান্ নই, তবে আমরা জীবনে যাই হোক্ একটা প্রিন্সিপ্‌ল ধরিয়া চলি'; সে জানে না যে আমরা তাহাকে কি চক্ষে দেখিতেছি। কোথাও কোথাও মানুষের চরিত্রের অতি-সাধারণ দুর্ব্বলতাকে মৃদু ব্যঙ্গ-আক্রমণ করা হইয়াছে। বিনয় কন্যাদের বুদ্ধির প্রশংসা করায় বরদাসুন্দরীর বিনয়ের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। হারাণ বিনয়ের দীক্ষাগ্রহণের সংবাদে আনন্দপ্রকাশ না করায় হারাণের সম্বন্ধে বরদাসুন্দরীর মতপরিবর্ত্তনের সময় আসিল। গোরা সুচরিতাকে বিবাহের উপদেশ দেওয়ায়, হরিমোহিনী ভাবিল, লোকটা গুণী বটে।

মহিম কবির একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে যে-হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে তাহা স্বতন্ত্র ধরণের। এই হাসি শ্রেষ্ঠতাভিমানপ্রসূত নহে, এ হাসি আত্মভোলা

প্রাণখোলা হাসি। মহিম কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভূমিকায় কমেডিসাহিত্যের চিরপরিচিত বাতিকগ্রস্ত চরিত্র নহে; সে হাস্যাস্পদ নহে, হাস্যরসিক। তাহার প্রতি কথায় তাহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে; আমাদের মনে হয় সত্যসত্যই The style is the man; তাহার ভাষা তাহার মনের গঠনের, তাহার প্রকাশভঙ্গী তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছ দর্পণ। তাহার মধ্যে অফুরন্ত হাস্যরস অহর্নিশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। গোরা হিন্দুসমাজের যে-আচারবিচারকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও রঙীন কল্পনার সাহায্যে গভীর ও মহান্ রূপে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে, মহিম দেখাইয়াছে তাহারা কিরূপ অসহায় মানুষকে পিষিয়া ফেলিতেছে। গোরার পাশে মহিম যেন ভাবলোকবিহারী ডন্ কুইক্সটের পাশে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সাঙ্কো পাঞ্জা। এই হাস্যরস প্রাণের স্ফূর্ত্তির বহিঃপ্রকাশ নহে, ইহার জন্মস্থান অশ্রুসজল মানব হৃদয়। সমাজের হৃদয়হীন রথচক্র-নিষ্পেষিত শত শত নরনারীর মর্ম্মবেদনা মহিমের হাস্যরসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আর একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি 'বক্তিয়ার'। বিনয় পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিল, বাংলাদেশ জয়ের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, বক্তৃতাই যথেষ্ট। এই বালকটি তাহার বক্তৃতার সাহায্যে সত্যসত্যই বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার হৃদয় লুটিয়া লইয়াছে। সে অফুরন্ত প্রাণরসে সর্ব্বদা টল্‌মল করিতেছে; সে চুপ করিয়া থাকে না, কেবলই বকে; সে ধীরে ধীরে হাঁটে না, লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। গোরা উপন্যাসে সতীশ যেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে এক নিভৃত শান্তময় দ্বীপ। কোন সর্ব্বশক্তিমান্ ঐন্দ্রজালিক যেন তাহার যাদুদণ্ডের সাহায্যে এখানে একটি মায়াগণ্ডী টানিয়া দিয়াছেন; দেশ, মহাদেশের ভাগ্যবিপর্য্যয়, ধর্ম্ম ও সমাজের উত্থানপতন এস্থানে প্রবেশ করিয়া এখানের শান্তিভঙ্গ করিতে পারে না। এই চির শান্তি, চির আনন্দের দেশে আর্গিনের সুরেতালে জাহাজটি সকল সময় দোলা খাইতেছে, আর ক্ষুদে কুকুরটি তাহার প্রভুকে কখনো বা এক পা তুলিয়া সেলাম করিতেছে, মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতেছে, লেজের উপর বসিয়া দুই পা তুলিয়া কখনো বা বিস্কুট্ ভিক্ষা করিতেছে। শৈশবের যে-অনাবিল আনন্দের লোকে সে বাস করিতেছে, জীবনসংগ্রামক্লান্ত নরনারী সেখানে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য সকল উদ্বেগ, আশঙ্কা ভুলিয়া একটি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করিবে।

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরদিন চারিদিকে খবর ছড়াইয়া গেল, মহেশ চৌধুরী সস্ত্রীক সাধু বাবার আশ্রমে ধন্না দিয়াছেন। চারিদিক হইতে নরনারী দেখিবার জন্য আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল—সদানন্দের আশ্রমে আসিয়া তারা আজ মহেশ চৌধুরীর দর্শনপ্রার্থী !

শেষ রাত্রে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা ভিজা পৃথিবীতে সোনালী রোদ উঠিয়াছে। মহেশ চৌধুরী ও তার স্ত্রী দুজনের গায়ে রোদ পড়িয়া দেখাইতেছে যেন মূর্ত্তি-ধরা বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা কিন্তু অপার্থিব জ্যোতি দিয়া আবৃত। দুজনের গায়ে আবরণের মত পড়িবে বলিয়া রোদের রঙটা আজ বেশী গাঢ় হইয়াছে নাকি ?

রত্নাবলী ও উমা আসিয়াছিল সকলের আগে, রোদ উঠিবারও আগে। রত্নাবলী চোখ বড় করিয়া বলিয়াছিল,

'সমস্ত রাত এখানে ছিলেন ?'

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিলেন, 'থাকবার জন্যেই তো এসেছি মা।'

মহেশ চৌধুরীর কথা বলিবার ধরণ পর্য্যন্ত যেন এক রাত্রে বদলাইয়া গিয়াছে।

'মারা পড়বেন যে আপনারা ?'

মহেশ চৌধুরী করুণ চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেবতা কি প্রার্থনা শুনিবেন না, এই বিপদে তাকে পথ দেখাইয়া দিবেন না ?

কাল শেষ রাত্রির দিকে কতবার যে তার মনে হইয়াছে সব শেষ করিয়া দিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া কোন একটি আশ্রয়ে চলিয়া যান। মনে হইয়াছে, এমনভাবে একজনকে কষ্ট দিবার কোন অধিকার তার নাই, তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেই বা এ জগতে কার কি আসিয়া যাইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেই বা কার কি আসিয়া যাইবে, সব কি তার নিজেরই বিকৃত অহংকারের কথা নয় ? সাধুজীর চরণ দর্শন না করিয়া উঠিবেন না বলিয়া গাছতলায় ধন্না দিয়াছেন,

চরণ দর্শন হইবার আগে উঠিয়া গেলে লোকের কাছে একটু নিন্দা হইবে, লোকে বলিবে মহেশ চৌধুরীর মনের জোর নাই। নিজের কাছে নিজের দামটাও একটু কমিয়া যাইবে বটে, মনে হইবে বটে যে, আমি কি অপদার্থ, ছি! কিন্তু নিজের কথা ভাবিয়া আরেকজনকে যন্ত্রণা দিলে, মারিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা ঘটাইলে, তাতে কি নিজের অপদার্থতা আরও বেশী প্রমাণ হইয়া যাইবে না, নিজের মধ্যে অশান্তি কিছু কম হইবে ?

রোদ উঠিবার পর আসিল মাধবীলতা। কে জানে কেন এ আশ্রমে কোন ব্যাপারে সকলের চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশী হইতে দেখা যায়। বোধ হয় কোন কোন ব্যাপারে সে সকলের চেয়ে ভীরু বলিয়া।

আসিয়াই মহেশকে সে দিতে আরম্ভ করিল বকুনি। বলিল, 'মাথা খারাপ হয়ে থাকে অন্য কোথাও গিয়ে পাগলামী করুন না ? আমরা আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি ?'

'অপরাধ ? অপরাধের কথা কি হল মা ?'

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিলেন।

তফাতে শতাধিক নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাধবীলতার মুখের রঙ যেন রোদের সঙ্গে মিশ্ খাইয়া যাইবে।

'তবে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন ? এটা তো হাট নয়, আশ্রম তো এটা ? দেখুন তো চেয়ে কি লোক জমতে সুরু করেছে ? এর মধ্যে আশ্রমের কাজ চলে কি করে, আমরাই বা থাকি কি করে ? একটু শান্তি পাবে বলে যারা আশ্রমে আসে—', সাহস মাধবীলতার একটুও কমে নাই, তবে আবেগটা বাড়িতে বাড়িতে একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় গলাটা রুদ্ধ হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী বলিলেন, 'তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে মা ? আচ্ছা আমি ওদের যেতে বলছি।'

'যেতে গরজ পড়েছে ওদের !'

কিন্তু তারা গেল। মহেশ চৌধুরী ঘুরিয়া বসিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন, বলিলেন যে এই গাছতলায় তার মরণ হইবে এটা যদি তারা না চায় তবে যে যার বাড়ী ফিরিয়া যাক। ভঙ্গি দেখিয়া প্রথমে মাধবীলতার মনে হইয়াছিল মহেশ চৌধুরী বুঝি লম্বা বক্তৃতা দিবেন, কিন্তু একটু

অনুযোগ দিয়া ও নিজের মরণের ভয় দেখাইয়া কয়েকটি কথায় তিনি বক্তব্য শেষ করিয়া দিলেন এবং এমনভাবে কথাগুলি বলিলেন যেন শ্রোতারা সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে আশ্রমের সীমানা পার হইয়া চলিয়া গেল। বাড়ী সকলে গেল না, আশ্রমের কাছেই খবরের লোভে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল, কিন্তু গাছের জন্য আশ্রমের ভিতর হইতে তাদের আর দেখা গেল না। মাঝে মাঝে দু'একজন করিয়া আশ্রমের ভিতরে ঢুকিয়া মহেশকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, আশ্রমের মধ্যে আর ভিড় হইল না।

বিপিন ভিতর হইতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিল। দাঁতের ব্যথা এখনো তার সম্পূর্ণ কমে নাই, কিন্তু হয় রোদ উঠিয়াছে বলিয়া অথবা ব্যাপারটা দেখিয়া উত্তেজনা হইয়াছে বলিয়া, মাথায় জড়ান সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া সে চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল।

মাধবীলতা একটা পাক দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা আপনি কি চান ?'

'প্রভুর চরণ দর্শন করিতে চাই।'

শুনিয়া মাধবীলতা আবার পাক দিয়া আসিতে গেল।

বেলা বাড়িতে থাকে, ভিজা জামা ও কাদা মাখা পরনের কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়, গুমোট হয় দারুণ। মহেশ একসময় স্ত্রীকে বলেন, 'আচ্ছা, এবার তো তুমি ফিরে যেতে পার ?'

বিভূতির মার চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, চোখের পাতা বুজিয়া বুজিয়া আসিতেছে। তিনি শুধু মাথা নাড়িলেন।

মহেশ চৌধুরী খানিকক্ষণ গুম্ খাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'চল, আমিও যাচ্ছি।'

শুনিয়া বিভূতির মার লাল চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল।—'সাধুজীর চরণ দর্শন না করেই যাবে ?'

'কি করব ? নারীহত্যার পাতক তো করতে পারি না।—জ্বর এসেছে না তোমার ?'

হয়ত আসিয়াছে জ্বর, হয়ত আসে নাই, সেটা আর এখন বড় কথা নয়, বিভূতির মা এখন আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চান না। এখানে বসিবার সময় বলিয়াছিলেন বটে যে স্বামী সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া যাইবেন কিন্তু এখন আর সদানন্দের চরণ দর্শনের আগে সেটা তিনি করিতে চান না। স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভয়ে? ভয় সেটাই বটে, কিন্তু মহেশ যা ভাবিতেছে তা নয়, স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভাবনায় তো বিভূতির মার ঘুম আসিতেছে না! এখন বড় ভয় এই যে, এত কাণ্ডের পর তার পাগল স্বামী সদানন্দের দর্শনলাভ না করিয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলে তার সঙ্গে তিনি ঘর করিবেন কি করিয়া? সেই তিলে তিলে দিনের পর দিন দগ্ধানোর চেয়ে এইখানেই একটা হেস্ত-নেস্ত হইয়া যাক্!

যুক্তিটা যে খুবই জোরালো, তাদের সম্পর্কের হিসাব ধরিলে প্রায় অকাট্য, মনে মনে মহেশ তা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, কিন্তু অনাহারে অনিদ্রায় রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া দিবারাত্রি কাটানোর পর যুক্তিতে বেশী কিছু আসিয়া যায় না, পরের কাছে বিনয়ে কাদা হইয়া হাতজোড় করা যায় কিন্তু নিজের লোকের অবাধ্যতায় গা জ্বলিয়া যায়। মহেশ চৌধুরীর দাঁতে দাঁত ঘষিবার প্রক্রিয়াটা কাছে দাঁড়াইয়া কেউ লক্ষ্য করিলে চমকাইয়া যাইত।

'তুমি থাক তবে, আমি ফিরে চললাম।'

'যাও।'

'আমি চলে গেলেও তুমি একা বসে থাকবে?'

'কি করব না বসে থেকে? এখন গেলেই চিরকাল তুমি আমায় দুষবে, বলবে আমার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে।'

'তোমায় দুষব?'

'দুষবে না?'

খানিকক্ষণ হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী বলিলেন, 'আমি নিজেই যখন চলে যাচ্ছি, তোমায় দুষব কেন?'

এবার বিভূতির মা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিলেন, 'ছাখো, তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়, ওসব মারপ্যাঁচ আমাদের মধ্যে চলবে না,—রাস্তার

লোককে ওসব বলে বুঝিও। নিজেই চলে যে যাচ্ছ তুমি, কার জন্য যাচ্ছ শুনি? বাড়ী গিয়ে যে ছটফট করবে সেটা তলে তলে দগ্ধাবে কাকে শুনি? তোমায় চিনতে তো আমার বাকী নেই। তুমি হলে…তুমি হলে…' মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

'কেঁদো না।' বলিয়া মহেশ চৌধুরী বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। এ জগতে কোন প্রশ্নেরই কি শেষ নাই? মানুষ বিচার করিবে কি দিয়া? খুঁজিলেই সত্যের খুঁত বাহির হয়,—নিজে খোঁজ বন্ধ করিয়া দিলেও রেহাই নাই, প্রতিনিধি যদি খোঁজে, নিজের জ্ঞান বুদ্ধির হিসাবে তাতেও খুঁত বাহির হওয়া আটকায় না। নিজে যা-হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে পারিলেই অন্যে তা মানিবে কেন, অন্যেও যাহোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে গিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করিবেই। সুতরাং এখন কর্ত্তব্য কি? যা ভাল মনে হয় তাই করা?

কি করা ভাল?

হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা—

না, দেবতার কাছে আবদার চলিবে না। দেবতার কি জানে মহেশ চৌধুরী? দেবতা ও তার সম্পর্কের মধ্যে কোনটা মারপ্যাঁচ আর কোনটা মারপ্যাঁচ নয়, তাকি তিনি নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছেন, যেমন জানিতে পারিয়াছে স্বামী নামক দেবতা সম্বন্ধে তারই সম্মুখে উপবিষ্টা তারই এই স্ত্রীটি? এরকম না জানিলেই বা কর্ত্তব্যনির্ণয় চলিবে কেন? মহেশ চৌধুরীর ক্লেশ বোধ হয়। দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু দেবতার সঙ্গে নিজের সংযোগটা কেমন সে সম্বন্ধে নিজের পরিষ্কার ধারণা নাই, এ কেমন আত্মসমর্পণ? চোখ কান বুজিয়া বিচার বিবেচনা না করিয়া নিজেকে দিলেই কি আত্মসমর্পণ হয়? কোন প্রত্যাশা না থাকিলেই? তবে সদানন্দের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে তাঁর এত কষ্ট হয় কেন, কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্যও কেন নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না যে যা ঠিক করিয়াছেন তাই ঠিক? তাঁর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে তার স্ত্রীর কেন একবারও দ্বিধা করিতে হয় না, ভুল করিবার ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয় না? মহেশ চৌধুরী কি তবে স্ত্রীলোকেরও অধম? অথবা— ?

একটা প্রশ্ন যেন মনের তলায় কোনখানে উঁকি দিতে থাকে, মহেশ চৌধুরী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কেমন একটা রহস্যময় দুর্ব্বোধ্য অনুভূতি হইতে থাকে। আসল কথা, বিভূতির মার শেষ কথাগুলিতে তিনি একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন, সকল বিষয়ের মূল্যনির্ণয়ের অভ্যস্ত মানসিক প্রক্রিয়াটা একেবারে গোড়া ধরিয়া নাড়া খাইয়াছিল। সমস্ত চিন্তার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে হইতেছিল, একথাটা তো মিথ্যা নয়, ওঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক এ জগতে আর কারও সঙ্গে তো তা নেই, কোনরকম মারপ্যাঁচ ওঁর সঙ্গে আমার তো চলতেই পারে না? কি আশ্চর্য্য!

তারপর মাধবীলতা এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলুন আপনারা সাধুজীর চরণ দর্শন করবেন।'

মহেশ যেন বিশেষ অবাকও হইলেন না, কৃতার্থও বোধ করিলেন না। সহজভাবে কেবল বলিলেন, 'অনুমতি দিয়াছেন?'

একথার জবাবে মাধবী বলিল, 'প্রণাম করেই চলে আসবেন কিন্তু, কথাবার্ত্তা বলে জ্বালাতন করবেন না।'

'আমরা দুজনেই যাব তো?'

'হ্যাঁ, আসুন।'

কিন্তু বিভূতির মা স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে আসেন নাই, তিনি উঠিলেন না। বলিলেন, 'আমি এখান থেকেই মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি, তুমি যাও, প্রণাম করে এসো।'

একা যাইতে মহেশের ভাল মন সরিতেছিল না, একসঙ্গে এত দুর্ভোগ সহ্য করিবার পর সাফল্যটা ভোগ করিবেন একা? একটু অনুরোধ করিলেন, বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলেন যে এমন একটা অনুগ্রহ পাইয়া কি হেলায় হারাইতে আছে? কিন্তু বিভূতির মা কিছুই বুঝিলেন না। তখন মাধবীলতার সঙ্গে মহেশকে একাই ভিতরে যাইতে হইল। কাপড়ে কাদা লাগিয়াছিল, এখন শুকাইয়া পাঁপরের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহেশ একবার ভাবিলেন

কাপড়টা বদলাইয়া সদানন্দের সামনে যান, তারপর আবার ভাবিলেন, থাক, হাঙ্গামায় কাজ নাই। সদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা বিপিনের বদলে মাধবীলতার মধ্যস্থতায় হইতেছে কেন একথাও মহেশের মনে হইতেছিল। ভাবিলেন, তার কাছে নিজে নত হইতে বিপিনের হয়ত লজ্জা করিতেছিল, তাই মেয়েটাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সদানন্দের অভ্যর্থনা এ ধারণা তার মন হইতে বলপূর্ব্বক দূর করিয়া দিল। রাগে আগুন হইয়া সদানন্দ বলিলেন, 'এর মানে ? আমি না বারণ করে দিয়েছি সাত দিন কেউ আমার দর্শন পাবে না ?'

সদানন্দ নদীর দিকে জানালার কাছে পাতা চৌকীতে বসিয়া ছিলেন, সেইখান হইতে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া রহিলেন। মহেশ তখন ঘরের চৌকাট পার হইয়াছেন, তিনি সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

মাধবীলতা তাড়াতাড়ি চৌকীর কাছে আগাইয়া গেল। নীচু গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'আপনার পায়ে ধরছি রাগ করবেন না। অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, আমি সমস্ত বলছি আপনাকে। আপনি শুধু এই ভদ্রলোককে একবার প্রণাম করে চলে যেতে দিন।' বলিয়া মুখ আরও তুলিয়া সদানন্দের চোখে চোখে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'দেবেন না ?'

সদানন্দ বলিলেন, 'আচ্ছা।'

'আসুন, প্রণাম করে যান।'

মহেশ নড়ে না দেখিয়া সদানন্দও ডাকিয়া বলিলেন, 'এসো মহেশ।'

মহেশ অবাধ্য শিশুর মত মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না প্রভু, আপনি আমায় ডাকেন নি, এই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না জেনে আপনার কাছে আমি একি অপরাধ করলাম প্রভু! আপনি ডাকেন নি জানলে তো আমি আসতাম না।'

সদানন্দ শান্তভাবে বলিলেন, 'তাই নাকি ? তা, এখন কি করবে ?'

'আমি ফিরে যাচ্ছি প্রভু। আপনি নিজে ডাকলে এসে প্রণাম করে যাব।'

মাধবীর মুখখানা পাংশু হইয়া গিয়াছিল, সে ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আবার গাছতলায় গিয়ে ধন্না দেবেন ? মরে যাবেন যে আপনারা দু'জনেই ?'

মুখের চেয়ে মাধবীর চোখের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল বিচিত্রতর, এবার চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল। কত ভাবিয়া কত হিসাব করিয়া নিজের দায়িত্বে এত বড় একটা কাজ করিতে গিয়া বুকটা তার ভয়ে ও উত্তেজনায় টিপ্ টিপ্ করিতেছিল, সদানন্দ দেবতা না দানব মাধবীর জানা নাই কিন্তু এমন ভয় সে করে সদানন্দকে যে কাছে আসিলেই তার দেহমন কেমন একসঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সদানন্দ তাকে বুকে তুলিয়া লইলেও যে জন্য সে নূতন কিছুই আর অনুভব করিতে পারে না, অনায়াসে সদানন্দের মুখের দিকে প্যাঁট প্যাঁট করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সে তো গা এলাইয়া দেওয়ার কথা, কোন হাঙ্গামাই তাতে নাই। এতকাল নিজের ও সদানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যা কিছু ঘটিয়াছে তাতে তার নিজের কিছুই করিবার বা বলিবার থাকে নাই, সদানন্দই সমস্ত করিয়াছে ও বলিয়াছে। আজ প্রথম নিজেকে মানুষটার নিষেধ অমান্য করিতে সক্রিয় করিয়া তুলিয়া ভিতরটা তার আবেগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাই, তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া মহেশ আবার গাছতলায় ধন্না দিতে যাইবে এই আশাভঙ্গের সুযোগ অবলম্বন করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার উদ্দেশ্যটা যথারীতি সফল হইলে, সদানন্দকে প্রণাম করিয়া মহেশ বাড়ী ফিরিয়া গেলে, অন্য কোন উপলক্ষ্যে সে অবশ্য কাঁদিত। উপলক্ষ্য না পাইলে বিনা উপলক্ষ্যেই কাঁদিত।

সদানন্দ অপলক চোখে মাধবীলতার চোখে জল ভরিয়া উপচিয়া পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখিতেছিলেন। এ দৃশ্য তিনি আগেও দেখিয়াছেন, মাধবীর চোখ তখন তাঁর চোখের আরও কাছে ছিল। তবু এমন স্পষ্টভাবে আর কোনদিন কি তিনি মাধবীর চোখের কান্না দেখিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে ?

একটু ভাবিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সদানন্দ বলিলেন, 'মহেশ, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম।'

'পরীক্ষা প্রভু ?'

'হাঁ। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সব জানি মহেশ, তুমি আসবার একমুহূর্ত্ত আগে আমি আসন ছেড়ে উঠেছি। দরজা বন্ধ ছিল, তুমি আসবে বলে দরজা খুলে রেখেছি। তোমায় দেখে রাগের ভাণ করছিলাম, আমায় না জানিয়ে কেউ কি আমার কাছে আসতে পারে মহেশ ? এখন বাড়ী

যাও, ক'দিন বিশ্রাম করে আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো। দেখি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি কি না।'

শুনিতে শুনিতে টলিতে টলিতে মহেশ চৌধুরী কোনরকমে খাড়া ছিলেন, সদানন্দের কথা শেষ হইলে প্রণাম করিবার জন্য আগাইতে গিয়া দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেলেন।

সুতরাং বিভূতির মাকেও শেষ পর্য্যন্ত ভিতরে আসিয়া সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে হইল। শশধরও আসিল। বিপিন আসিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার শুধু সে চোখ তুলিয়া চাহিল সদানন্দের দিকে, তারপর আর মনে হইল না যে আশেপাশে কি ঘটিতেছে এ বিষয়ে তার চেতনা আছে।

আধঘণ্টা পরে মহেশ চৌধুরীকে একটু সুস্থ করিয়া এবং একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া শশধর ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাহিরে দেখা গেল বিরাট কাণ্ড হইয়া আছে—শ'দুই নরনারী সেই কদম গাছটার তলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া। শ্রীধরকেও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল।

মহেশকে দেখিয়া জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—মহেশ চৌধুরীকী জয়!

জনতার মধ্যে একজনও অবাঙ্গালী আছে কিনা সন্দেহ, মহেশ চৌধুরীও যে খাঁটি বাঙ্গালী সন্তান তাহাও কাহারও অজানা নাই, তবু জয়ধ্বনিতে মহেশ চৌধুরীর নামের সঙ্গে কোথা হইতে যে একটি 'কী' যুক্ত হইয়া গেল!

তারপর কয়েকজন যুবক মহেশ চৌধুরীকে কাঁধে চাপাইয়া গ্রামের দিকে রওনা হইয়া গেল। কাঁধে চাপাইল একরকম জোর করিয়াই, মহেশ চৌধুরীর বারণও শুনিল না, বিভূতির মার ব্যাকুল মিনতিও কাণে তুলিল না।

যতক্ষণ দেখা গেল আশ্রমের সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপর ছোট ছোট দলে আরম্ভ হইল আলোচনা। বিপিনও সদানন্দের কুটীরের সামনে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিল, শোভাযাত্রা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে কাহারও সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া সে সটান গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে যেন হার মানিয়াছে, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা দাঁতের ব্যথায় আবার কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

মাধবীলতা সদানন্দের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ বাকী আছে।

সদানন্দ সাগ্রহ অভ্যর্থনা করিলেন, 'এসো মাধবী।'

কোথায় আসিবে মাধবী? কাছে? পাঁচ সাত হাত তফাৎ হইতে এমনভাবে ডাকিলে তাই অর্থ হয়। মহেশ চৌধুরী খানিক আগে টলিতে টলিতে সদানন্দের দিকে আগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মাধবীলতা কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ে পায়ে আগাইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীর মত দড়াম করিয়া পড়িয়াও গেল না। কিন্তু কাছে যাওয়ারও তো একটা সীমা আছে? তাই হাতখানেক ব্যবধান থাকিতে মাধবীলতা থামিয়া পড়িল।

সদানন্দ হাত ধরিয়া তাকে পাশে বসাইয়া দিলেন। চিবুক ধরিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া বলিলেন, 'মাধবী, তুমি তো কম দুষ্টু মেয়ে নও!'

'ওঁর স্ত্রী যে মরে যাচ্ছিলেন।'

'তাহলে অবশ্য তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।' সদানন্দ একমুখ হাসিলেন।

মাধবীলতা থামিয়া থামিয়া সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা সদানন্দকে জানাইয়া দিল, নিজের কাজের কৈফিয়তে বলিল যে সদানন্দ পাছে রাজী না হন এই ভয়ে একেবারে মহেশ চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

বলিয়া মাধবী হঠাৎ দাবী করিয়া বসিল সদানন্দের কৈফিয়ৎ, কাঁদ কাঁদ হইয়া বিনা ভূমিকায় সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'কিন্তু আপনি ও কথা বললেন কেন মহেশ বাবুকে?'

'আমি তো জানতাম না মাধবী এত কাণ্ড হয়ে গেছে। তুমি ডেকে এনেছ জানলে কি আর আমি রেগে উঠতাম?'

'না, তা নয়। আপনি মিছে কথা বললেন কেন? কেন বললেন আপনি সব জানতেন, ওকে পরীক্ষা করছেন?'

সদানন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'ওটা কি জান মাধবী—'

কিন্তু মাধবী কি ওসব কথা কানে তোলে? আকুল হইয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল আর বলিতে লাগিল, 'কেন আপনি মিছে কথা বললেন! কেন বললেন!'

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশ

বাংলাদেশে বা বাংলার বাহিরে সুভাষচন্দ্রকে বামপন্থীদের যোগ্য নেতা বলিয়া ভুল করে এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নহে। যে-তত্ত্বের উপর চরম বামনীতির প্রতিষ্ঠা তাহার সহিত সুভাষের সম্যক পরিচয় আছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু যোগ্য 'লীডার' না হইলেও সময়োপযোগী সাইনবোর্ড হিসাবে সুভাষ বামপন্থীদের অত্যন্ত প্রিয়। রাজনীতিক্ষেত্রে যে-অগ্রগতির কথা জোর গলায় তিনি প্রচার করিতেছেন তাহা বামপন্থীদের মনের কথা; 'ফেডারেশন'-এর বিরুদ্ধে যে অভিযান তিনি ঘোষণা করিয়াছেন বাম. সংগ্রামনীতি তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। সুতরাং ত্রিপুরী কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যখন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হইলেন তখন স্বভাবতই বামদল উল্লসিত হইয়া আশা করিয়াছিল অতঃপর কংগ্রেসের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে বামনীতির প্রভাব পরিস্ফুট হইবে। তাহার পর ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধিজির উপর কংগ্রেস-ক্যাবিনেট গঠনের ভার অর্পিত হউক এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পান্থের প্রস্তাব গৃহীত হইল; কলিকাতায় নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে গান্ধিজি কর্ত্তৃক অখণ্ড ক্যাবিনেট নিরূপিত হইল ও সুভাষচন্দ্রের স্থলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইলেন; সর্ব্বশেষ বোম্বাইতে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি কংগ্রেসের পবিত্রতা রক্ষার্থে একাধিক বামবিরোধী বিধান নির্দ্দেশ করিলেন ও এই হুকুম জারি করিলেন যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি না লইয়া ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশে কংগ্রেসের কোনো সভ্য নিজে সত্যগ্রহ করিতে বা সত্যগ্রহ 'অর্গানাইজ' করিতে পারিবেন না এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যে কোনো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হস্তক্ষেপ করিবে না। সত্যগ্রহের পরিপন্থী এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে ভারতের সর্ব্বত্র বামপন্থীরা প্রবল প্রতিবাদ করিতেছে, কিষাণ-দলও এই ইস্তাহার অমান্য করা স্থির করিয়াছে এবং জওহরলালজির তীব্র তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া বহু বামপন্থী সম্প্রতি ইহার বিরুদ্ধে একজোটে নির্দ্দিষ্ট দিনে নিখিল ভারতময় বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

কংগ্রেসী বিভিন্ন দল, উপদলের পক্ষে কংগ্রেসের শীর্ষ-প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ

অগ্রাহ্য করা সঙ্গত ও সমীচীন কিনা এই লইয়া যে-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দুইটি দিক মোটামুটি এইরূপ : দক্ষিণপন্থীদের মতে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী কংগ্রেসেরই সৃষ্টি, এবং কংগ্রেস-কর্তৃক নিযুক্ত পার্লামেণ্টারি সাব-কমিটির অধীন, সুতরাং সত্যগ্রহ বা অন্য কোনো উপায়ে এই মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা কংগ্রেসেরই বিরুদ্ধাচরণ করা, অতএব কংগ্রেস-ভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অতীব গর্হিত। বামপন্থীদের তরফ হইতে ইহার উত্তর এই যে কংগ্রেসে ক্রমশ বুর্জোয়া-প্রভাব বাড়িতেছে, তাহার কারণ যে-ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণে সম্মত হয় ক্রমশ কংগ্রেস সেই ব্রিটিশ-শক্তিরই সহায়ক হইয়া উঠিতেছে ও ফলে পথভ্রষ্ট হইতেছে ; ইহার একমাত্র প্রতিকার দেশময় প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখা এবং তাহা করিতে হইলে প্রয়োজনমত কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধ সমালোচনা, এমনকি সত্যগ্রহেরও প্রয়োজন হইতে পারে ; এই অবস্থায় কি ন্যায় কি অন্যায় তাহার বিচারে কংগ্রেসের যাহা চরম আদর্শ তাহাই একমাত্র মানদণ্ড।

এই চরম আদর্শের দোহাই দক্ষিণপন্থীরাও দিতে দ্বিধা করেন না, এবং দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া জওহরলালজিও যখন তখন জ্বলন্ত ভাষায় এই আদর্শের ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি কবুল করিয়াছেন যে সত্যগ্রহের বিরুদ্ধে ইস্তাহারে তাঁহার সায় ছিল না, এমনকি, এ-আই-সি-সি'র অধিবেশনে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল ; কিন্তু কেন যে এই সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই তাহা তিনি ব্যক্ত করেন নাই।

এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে যে দক্ষিণপন্থীরা বর্ত্তমানে যে-ভাবে চলিতেছেন, তাহাতে যদি বামপন্থীদের সহিত তাঁহাদের শীঘ্র আপোষ না হয় তাহা হইলে তাঁহারা ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধনিককুলের সহায়তায় জনসাধারণের নির্য্যাতনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিবেন, এবং দেশময় বাম ও দক্ষিণের সঙ্ঘর্ষের সুবিধা পাইয়া ব্রিটিশ-শক্তির দাপট আরও বাড়িবে। উপস্থিত ভারতীয় রাজনীতির প্রধান সমস্যা এই আশঙ্কা যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয় তাহারই ব্যবস্থা করা।

এই ব্যবস্থার প্রধান উপায় সমগ্র কংগ্রেসের সংহতি-সাধন—অবশ্য আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া। দুঃখের বিষয় সুভাষচন্দ্র বা মানবেন্দ্রনাথের মতন বাম-নেতা বা

বর্ত্তমান 'অখণ্ড' কংগ্রেস ক্যাবিনেট-এর সদস্যবর্গ কেহই এই বিষয়ে ততটা অবহিত নন যতটা অবহিত চরম বামপন্থী বা কম্যুনিষ্ট দল। কিন্তু 'ফেডারেশন'-প্রতিরোধ বা ইম্পিরিয়্যালিষ্ট সমরের আবর্ত্ত হইতে ভারতবর্ষের নিষ্কৃতি নির্ভর করিতেছে শুধু অখণ্ড কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ জাগরণে।

* * * *

ইটালি-কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণে এই 'ইম্পিরিয়ালিষ্ট' সংগ্রামের যে-দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সূচনা হয় এখনো তাহার অবসান হয় নাই। ইউরোপে সম্প্রতি ডানজিগ এই সংগ্রামের কেন্দ্র হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। ১৯১৯ সালের ভার্সেই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী ইহা 'ফ্রি সিটি' বা স্বাধীন সহর আখ্যা লাভ করে এবং একজন সভাপতি, একটি সেনেট ও একটি 'ডায়েট' বা ব্যবস্থা পরিষদ (তাহার সভ্য-সংখ্যা ৭২) লইয়া ইহার জন্য এক শাসনতন্ত্র গঠিত হয়। শুধু তাহাই নয়। এই 'স্বাধীন' নগর স্বাধীনতা রীতিমত ভোগ করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার ভার অর্পিত হয় 'লীগ্ অব নেশন্স্'-এর উপর। তাই আজ পর্য্যন্ত 'লীগ্ অব নেশন্স্'-কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন কমিশনার ডানজিগ-এর শাসনব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য মোতায়েন আছেন।

ভিশ্চুলা নদীর মোহানা হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত এই সহরটি বলটিক সমুদ্রের উপকূলস্থ অন্যতম বৃহৎ বন্দর। ভার্সেই সন্ধির নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ডের সীমানা হইতে ডানজিগ পর্য্যন্ত এক সঙ্কীর্ণ অঞ্চল বা 'করিডর' ও পোল্যাণ্ড লাভ করে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ও সময় ডানজিগ ছিল জার্ম্মান রাষ্ট্রের অন্তর্গত। বর্ত্তমানে জার্ম্মানি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ব্ব-প্রাশিয়া, পশ্চিমে বিস্তৃত জার্ম্মান দেশ। ডানজিগের অধিবাসীরাও অধিকাংশ জার্ম্মান। সুতরাং হিটলার-এর লোলুপ দৃষ্টি যে ইহার উপর পড়িবে তাহা বিচিত্র নহে। হিটলার কথায় কথায় ঐতিহাসিক যুক্তির উল্লেখ করেন। এই যুক্তির বলে ডানজিগও পুনরায় জার্ম্মানীর কবল-ভুক্ত হইবে এই আশঙ্কায় আজ ইওরোপ অধীর। সর্ব্বাপেক্ষা অধীর পোল্যাণ্ড। কেননা, ডানজিগ বন্দর হিসাবে পোল্যাণ্ডের প্রাণস্বরূপ। ডানজিগ-এর প্রতি হিটলারের লোলুপ দৃষ্টির মূলে রহিয়াছে পোল্যাণ্ডকে এই বন্দর হইতে বঞ্চিত

করার উদ্দেশ্য—অন্তত পোলিশ পররাষ্ট্রসচিব কর্ণেল বেকের মতে। তিনি আরও বলেন যে হিটলারের ঐতিহাসিক যুক্তি ভূয়ো, কেননা, মধ্যযুগে ডানজিগ ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত হান্‌সিয়াটিক লীগ-এর সভ্য এবং তদবসানে তিন শতাব্দীর উপর এই সহর 'স্বাধীন' সহর বলিয়া স্বীকৃত হয়—কিন্তু পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায়। ইহার স্বাধীনতার অবসান হয় পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সঙ্গে। সুতরাং ইহার বর্ত্তমান স্বাধীনতা পোল্যাণ্ডের পুনর্লব্ধ স্বাধীনতারই অনুষঙ্গ বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত।

ইংল্যাণ্ড জোর গলায় প্রচার করিতেছে জার্ম্মানীর আর কোনো অনাচার সহ্য করিবে না, কিন্তু এই অনাচারের যাহা প্রবলতম প্রতিষেধক—রাশিয়ার সহিত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স-এর চুক্তি—তাহা সপ্তাহের পর সপ্তাহব্যাপী আলাপ আলোচনার পর আজ পর্য্যন্ত স্থির হইল না। ইংল্যাণ্ডের একাধিক পত্রিকা এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছে যে সুবিধা পাইয়া রাশিয়া এই চুক্তির জন্য অসম্ভব কঠিন সব সর্ত্ত দাবী করিতেছে। এই খবর কতদূর সত্য জানিবার উপায় নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য যদি কোনো রাষ্ট্র আগ্রহ দেখাইয়া থাকে তো তাহা রাশিয়া। তাই বিলাতি কাগজে যাহাই প্রকাশিত হউক না কেন, সন্দেহ হয় অন্যরূপ।

ফ্যাশিষ্ট অক্ষদণ্ডের আবর্ত্তন এতাবৎ ইউরোপে বিন্দুমাত্র বাধা পায় নাই। ডানজিগ-এ আসিয়া তাহা ঠেকিবে কিনা দেখিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীর লোক চাহিয়া আছে। কিন্তু এসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে জার্ম্মানি ও ইটালির অক্ষসহচর জাপানের আস্ফালন দিন দিন যতই বাড়িতেছে তাহার অবস্থা ক্রমশ ততই সঙ্গীন হইতেছে মনে হয়। জাপানের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক, তাহার উপর চীন যুদ্ধের ফলাফল মোটেই জাপানের আশানুরূপ হইতেছে না। এ কথা সত্য যে চীনদেশের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ বিস্তৃত অঞ্চলে জাপ-বাহিনী জাঁকিয়া বসিয়াছে। কিন্তু এই জনপদসমূহের শাসনভার এখনো তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে নাই, 'গেরিলা' বা বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল তাহাদের উত্যক্ত করিয়া মারিতেছে, এবং বোমা ও পিস্তল সহযোগে চীন 'সন্ত্রাসবাদী'রা যখন তখন জাপানী শাসনের প্রতিবাদ করিতেছে। এই রকম সন্ত্রাসবাদীরা কেহ কেহ টিয়েনষ্টিন নামক এক বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রের সংলগ্ন বৃটিশ-অধিকৃত স্থান বা

'কনশেসন'-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ জাপানীদের হাতে ইহাদের সমর্পণ করিতে নারাজ হন। ফলে, জাপানী কর্তৃপক্ষ এই কনশেসন-এর চারিপাশে কড়া পাহারা বসাইয়াছেন এবং যে-সকল ইংরেজ নরনারী এখান হইতে বাহিরে আসিতে চান বা বাহির হইতে এখানে যাইতে চান জাপানী সৈন্যদের হাতে তাঁহাদের অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। টোকিওতে এই ব্যাপারের মিটমাটের জন্য কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে, হয়তো মীমাংসা একটা হইবে, কিন্তু ইহার মূলে যে-কারণ রহিয়াছে তাহার অপসারণ সহজে হইবার নহে।

অনেকে বলিতেছেন, চীনাদের হাতে জব্দ হইয়া জাপানীরা ইংরেজদের উপর ঝাল ঝাড়িতেছে। ইহা আংশিক সত্য হইতে পারে, সম্পূর্ণ সত্য নহে। জাপানীদের ইংরেজ বিদ্বেষের মূল কারণ এক ইম্পিরিয়্যাল শক্তির সহিত আর এক ইম্পিরিয়্যাল শক্তির স্বার্থ-সংঘর্ষ। ইহার পিছনে রহিয়াছে প্রায় এক শতাব্দীর ইতিহাস। একদা চীনদেশে বিদেশীদের বাণিজ্য করা দূরের কথা প্রবেশ করাই ছিল দুষ্কর। ১৮৪২ সালে ইংল্যাণ্ড-চীন যুদ্ধের পর যে-সন্ধি হয় তাহার সর্ত্তানুযায়ী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্রে বিদেশীরা প্রথম বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। এই বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি 'ট্রিটি পোর্ট' ও ইহাদের অন্তর্গত বিদেশীদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলগুলি 'কনশেসন' নামে পরিচিত। টিয়েনষ্টিন সহর এই জাতীয় 'ট্রিটি পোর্ট' বলিয়া স্বীকৃত হয় ১৮৬০ সালে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংল্যাণ্ড 'ফ্রি ট্রেড' বা অবাধ বাণিজ্য-নীতি জোর গলায় প্রচার করিতে আরম্ভ করে। করিবারই কথা, কেননা ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির প্রধান উপায় ছিল এই 'ফ্রি ট্রেড'। ইহার বার্ত্তা প্রচার করিবার সময়ে কিন্তু দেশে দেশে মৈত্রীস্থাপনের আদর্শই ইহার প্রেরণা বলিয়া ইংল্যাণ্ড দাবী করে এবং এই মহৎ প্রেরণার প্রভাবে ব্যাকুল ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট চীনদেশে রণতরী পাঠাইয়া অবাধ বাণিজ্য-নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

এইভাবে চীনদেশে যে-ইম্পিরিয়্যালিষ্ট শোষণ আরম্ভ হইল, তাহার অগ্রণী হইল ইংল্যাণ্ড, পিছন পিছন আসিল ফ্রান্স ও জার্ম্মানি, ১৮৯৪ সালে চীনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইহাদের দলে ভিঁড়িল জাপান। দুর্ব্বল চীন

বিদেশীদের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্ষীণ প্রতিবাদ করিল ১৯০০ সালের বিখ্যাত বক্সার্ বিদ্রোহে এবং হাতে হাতে তাহার পুরস্কারও পাইল। সম্মিলিত বিদেশী বাহিনী রাজধানী পিকিঙে প্রবেশ করিয়া চীনদেশকে পাশ্চাত্য সভ্যতার এমন নমুনা দেখাইল যে ফলে জগদ্বিখ্যাত অলৌকিক শিল্প-কীর্ত্তি নিদাঘ-প্রাসাদ পরিণত হইল ভগ্নস্তূপে, উপরন্তু চীন সরকারকে জরিমানা করা হইল ৬৪ মিলিয়ন পাউণ্ড। ইংল্যাণ্ড এই জরিমানার যে-ভাগ পাইল তাহা দিয়া চীনদেশে রেলওয়ে প্রভৃতি নির্ম্মাণদ্বারা নিজেদের স্বার্থ আরো কায়েমিভাবে প্রতিষ্ঠা করিল।

ইম্পিরিয়্যালিষ্ট শক্তিসমূহের স্বার্থ অবশ্য পরস্পরবিরোধী। চীনদেশের ভাগ-বাটোয়ারায় এই বিরোধ ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সমন্বয়ের জন্য ১৯২২ সালে নয়টি শক্তিপুঞ্জের মধ্যে এক সন্ধিদ্বারা চীনদেশে 'মুক্তদ্বার'-নীতি ঘোষিত হয়। কিন্তু জাপানের পক্ষে আজ এই 'মুক্তদ্বার'-নীতি দুঃসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে চীনের সহিত জাপানের যে-যুদ্ধ বিনা ঘোষণায় আরম্ভ হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য শুধু চীনদেশে আপন স্বার্থের প্রসার নহে, অন্যান্য বিদেশী স্বার্থের অপসারণ। টিয়েনষ্টিন ব্যাপারের মূল এই স্বার্থ-সংঘাত। ইংরেজের উপর জাপানের রাগ হইবার বিশেষ কারণ আরও এই যে ইংরেজরা সম্পূর্ণ স্বার্থপর উদ্দেশ্যেই চীনদেশকে ভিতরে ভিতরে সাহায্য করিতেছে। চীনের অন্যতম শোষক আজ তাহার সহায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধনিকতন্ত্র ও ইম্পিরিয়্যালিজ্‌ম-এর উদ্বর্ত্তনের বিচিত্র ধারায় এইরূপ বিপরীত ব্যাপার বিরল নহে। কিন্তু বিদেশীর বিরুদ্ধে চীনাদের প্রধান সহায় তাহারা নিজে। ১৯২৭ সালে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের বিরোধ ও বিচ্ছেদের ফলে চীনদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়। তাহারই ফলে জাপান প্রথমে মাঞ্চুরিয়া, পরে উত্তর-চীন অধিকার করিয়া ক্রমশ আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বর্ত্তমান যুদ্ধের সুরু হইতে কুওমিনটাঙের সহিত কমিউনিষ্টদের যে-অখণ্ড যোগস্থাপন হয় তাহার দরুণ চিয়াং-কাই-সেক-এর নেতৃত্বে আজ ঐক্যবদ্ধ চীনদেশ জাপানের বিজয়ী বাহিনীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই যোগ স্থাপনের ফলে চীনদেশ যে-শক্তিলাভ করিয়াছে ভারতবর্ষের পক্ষে আধুনিক চীন ইতিহাসের উহা প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

পুস্তক-পরিচয়

The Village—by Mulk Raj Anand (Jonathan Cape)
7s. 6d.

আলোচ্য গ্রন্থকারের প্রণীত একটি ছোট গল্প আমার ভালো লেগেছিল। মেলার ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ছোট একটি ছেলের উপকথা। অবাক হয়েছিলাম তাঁর বর্ণনার নৈপুণ্যে। শরৎকালের সুবর্ণময় রৌদ্রের মাঝে উজ্জ্বল রঙের ছড়াছড়ি ও উৎসবের আনন্দ তিনি যেমন স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন কোন ইংরাজের ইংরাজিতে তা সে রকমভাবে ফুটতো কিনা সন্দেহ।

বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই প্রকারের চমৎকার বর্ণনার অভাব নেই। বিদেশীসুলভ ভাষার প্রগল্ভতা অনেক স্থানে অদ্ভুত লাগসৈ ভাবে উৎরে গেছে। প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদ যথার্থই আনন্দদায়ক। কিন্তু তবুও পাঠকের ক্লান্তি আসে আর এক কারণে। গ্রন্থকার পাঞ্জাবের একটি গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে প্রকাশ করেছেন বাহ্যিক কদর্য্যতা। ভারতীয় পল্লীগ্রামগুলি যতই অশিক্ষিত, দরিদ্র ও জনবিরল হোক না কেন বহু বিচিত্র ব্যাপারের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে এসেছে এবং বহু স্মৃতি সম্ভারে সমৃদ্ধ। সাধারণ ভারতবাসী যতই অশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণচেতা হোক না কেন সংসারে তার লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করে। গড়পড়তা গার্হস্থ্য জীবনের কথা বলছি। গ্রন্থকার তাঁর বিলাতী প্রকাশক ও পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থে যে-চিত্র উন্মোচন করেছেন তার মধ্যে অনাসৃষ্টি ও অসামাজিক ব্যাপারের ছড়াছড়ি দেখছি। হীন পশু-প্রবৃত্তি হয়েছে উলঙ্গ ভাবে উদ্ঘাটিত অথচ গ্রামের অন্তর্ভূর্ত সংস্কৃতি বা ব্যক্তিবিশেষের মহত্ব হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত।

গ্রন্থকার গত প্রগতিসঙ্ঘের অধিবেশনে অধিনায়কত্ব করেছিলেন। তখন তাঁর জ্ঞান, শিল্প-বোধ ও দেশভক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং আশা পোষণ করেছিলাম যে এতদিনে বুঝি ভারতীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত পরিবেশক উদিত হলো। সে আশা তিরোহিত হয়নি, কারণ বর্ত্তমান প্রয়াসের

ব্যর্থতা অনভিজ্ঞতার ফল এবং সংশোধনীয় বলে মনে করি। তবু আশঙ্কা হয় যে সময় থাকতে সচেতন না হলে হয়ত অর্থ ও নামের মোহ তাঁর স্বাভাবিক শক্তি অপহরণ করে তাঁকে ভাড়াটিয়া বাক্‌যন্ত্র করে তুলবে।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহ দেখছি বিদেশী সমালোচকদের প্রশস্তি মুদ্রিত করে অন্ধভাবে আত্মপ্রসাদ লাভের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের কর্ত্তব্য গ্রন্থখানি প্রণিধান করা এবং গ্রন্থকারকে সতর্ক করে দেওয়া যে তাঁর কল্পিত নান্দ্‌পুর গ্রামটি যতই অমার্জ্জিত ও অসভ্য হোক না কেন অজ্ঞ পাঠকের কাছে ভারতীয় সভ্যতার প্রতিভূ স্বরূপ গৃহীত হতে পারে। নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনা স্বাভাবিক বলে গ্রাহ্য হলে যে বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়—

(১) গ্রামের মহিলানিচয় দীঘির সোপানের উপর উবু হয়ে বসে বসন ধৌত করছিলেন। অদূরে একটি রজকিনী প্রস্তর খণ্ডের ওপর বস্ত্রাঘাত করে চলেছিল। দুইটি যুবতী ডুব দিয়ে সিক্ত বস্ত্রে উঠে এলো। যুবকটি লুব্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলে না। দেহলতার পরিস্ফুট আকারের উপর চক্ষু নিবদ্ধ হতে উত্তপ্ত শোণিত উদ্বেল হয়ে উঠলো ভীতি আনন্দের সংযুক্ত দ্যোতনায়। একটি যুবতী ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে পরে শুষ্ক বসন জড়িয়ে নিলে। যুবকটি তখন লজ্জায় দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলদটির গলদেশে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। বলদ আরামে শিউরে উঠলো।

(২) গ্রামের শিরোমণি মোহন্ত মহারাজ লম্বা ছিলিমে গঞ্জিকা ভর্ত্তি করিয়ে পরমানন্দে সেবন করছিলেন। আশেপাশে সাগরেদরা ছিল মোতায়েন। যুবকটি নগ্ন পদে প্রবেশ করে নতজানু হয়ে পাদস্পর্শের পর প্রথামত অর্ঘ্য অর্পণ করাতে ধর্ম্মপ্রাণ উল্লসিত মত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন – "কিহে বন্ধু, তোমার যে দেখা পাওয়া ভার হয়ে পড়েছে, এরকম পর হয়ে থাকলে চলবে কেন।" যুবক এ ঘনিষ্ঠতায় আড়ষ্ট হয়ে রইলো। সে জানতো মোহন্ত গ্রামের চালাক চতুর ছেলে ছোকরাদের হাতে রাখতে চায় কারণ তারা গেরুয়া ছদ্মবেশের অন্তরালে যা ঘটে সব খবর রাখে। তাঁর কামার্ত্ত প্রকৃতির কথা সকলে জানে। সুন্দরী শিষ্যাদের দ্বারা অঙ্গ দলনের কু অর্থ করে থাকে।

যুবকটির বৃদ্ধ পিতা গঞ্জিকা পিষবার হামানদিস্তা নিয়ে এসে উচ্চৈঃস্বরে গান ধরলেন—

এস পুত্র, এস ভ্রাতা, এস সকলে
গাঁজা পিষে যাও ইত্যাদি।

অবিশ্রান্ত কাশির আবেগ ক্ষান্ত হলে মোহন্ত এক ঝলক শ্লেষ্মা উদগার করে বৃদ্ধকে আদেশ করলেন যে তাঁর পুত্র গঞ্জিকা পরিবেশনেব ভার গ্রহণ করবে। তারপর উত্তাল নৃত্যকারিণী এক উন্মাদিনী বৃদ্ধার নিষ্ঠীবনের দ্বারা সর্পাঘাতে মুমূর্ষু এক বালকের চিকিৎসার চেষ্টা হলো।

(৩) কয়েকটি শীর্ণ, বক্রকায়, উদর-সর্ব্বস্ব বালক একটি গোবৎসকে নির্দ্দয়ভাবে টানা হেঁচড়া করে কামড়ে খিমচে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। পথ-চারীদের মধ্যে একজন দৈবাৎ তাকে রক্ষা করতে ক্ষুধার্ত্ত বাছুরটি ছুটে গিয়ে গাভীর শুষ্ক বাঁটে মুখ দিয়ে বৃথা ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করে কাতর আর্ত্তনাদে প্রান্তর ভরিয়ে দিল।

(৪) যুবকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে গেল কে কতখানি মল ও সশব্দ বায়ু ত্যাগ করতে পারে।

(৫) শিখ যুবকটি যখন নিজের কেশ কর্ত্তন করাবার ফলে যার পর নাই লাঞ্ছিত হচ্ছে গ্রামের কুলনারীরা উচ্চরবে মিথ্যা ঘোষণা করলেন যে সে তাঁদের নগ্নদেহ দর্শন-কল্পে পুষ্করিণী তীরে গমনাগমন করতো।

(৬) অভ্যাগত খাতকদের সামনে স্থূলকায় শেঠজী তাঁর উরুদেশ উত্তোলন করে উচ্চ বিস্ফোরণ তুল্য শব্দ ছাড়লেন।

(৭) বন্ধ্যা কুলবধূ কেশরীকে মঠে হাজিরা দিতে হতো আশীর্ব্বাদ সংগ্রহের জন্য। একদিন মোহন্ত মহারাজ ও জমিদার পুত্র তাকে নিয়ে এমন রসক্রীড়ায় মেতে গেলেন যে ক্রোধান্ধ স্বামী নরহত্যা করে উদ্বন্ধন-দণ্ড বরণ করে নিল।

(৮) জমিদার-গৃহিণী পল্লীবাসীর কাছে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করলেন যে যুবকটি তাঁর চোখের ওপর কন্যার সতীত্ব নষ্ট করেছে।

ঘটনাগুলি সম্ভবপর কিনা জানি না। পাঞ্জাবের কোন গ্রামের সহিত পরিচয় ঘটেনি আমার।—তবে গ্রন্থকার অপেক্ষাকৃত সুসভ্য নগরী ও সেনা-

নিবাসের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাইতে ছিদ্রান্বেষণ করে জাতীয় চরিত্রের বিকৃতি দেখাবার চেষ্টা বিদ্যমান রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ তুলে দেওয়া গেলো :

(১) নগরীর বারবনিতারা উজ্জ্বল রঙের বসন ও তৈলাক্ত পাউডারে রঞ্জিত হয়ে রাজপথের প্রলুব্ধ নাগরিকদের মাথার উপর অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত পানের পিক ফেলছিল।

(২) ট্রেণের কামরাটি ভীড়ে বোঝাই হয়েছিল কিন্তু সামরিক বিভাগের হাবিলদার একটি পূরা কাষ্ঠাসন অধিকার করে বিশাল বপুটি ছড়িয়ে চলেছিল। চাষীরা সাহস করে তার কাছে ঘেঁসেনি। এক কোণে একটি মহিলা শিশু কোলে নিয়ে বসেছিলেন। সহসা বাঙ্ময় হয়ে উঠলেন তিনি এবং তাঁর রসিকতার বাচালতায় সহযাত্রীদের আনন্দে কামরা মুখর হয়ে উঠলো। তথাপি হাবিলদার সাহেবের নিমীলিত চক্ষু যখন খুললো না তখন মহিলাটি তার মুখগহ্বরের মধ্যে খানিকটা মিষ্টান্ন পুরে দিয়ে অট্টহাসি হেসে বল্লেন—"মুখে রসুনের গন্ধ তাই মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করলাম।"

(৩) জীবনে এই প্রথম গোরা সৈন্য দেখে যুবকটি আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

(৪) ক্যাপ্টেন পুরী আই, এম, এস, অফিসার কিন্তু সাহেব অফিসারদের তুলনায় মর্কট বিশেষ, অধিকন্তু ঘুষখোর। কেরাণী বাবু ও হাবিলদারের সহিত ষড়যন্ত্র করে উৎকোচ গ্রহণ করে থাকেন।

(৫) লান্স কর্পোরাল লোকনাথ রাজপথ হতে একটি ছোট বালককে টানতে টানতে ব্যারাকের মধ্যে পুরে ফেলে সিপাহীদের সামনে আদেশ করলে, "দেখা বেটা তোর বাপ মা বিছানায় শুয়ে কি করে, দেখা—তারপর আতঙ্কে বেপমান দেহটিকে উপুড় করে ফেলে পাছার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে চপেটাঘাত করতে লাগলো। ফৌজের অধিকাংশ হেসে গড়িয়ে পড়লো।

(৬) ধর্ম্মপ্রাণ মোল্লাটি মুশলিম বালকদের প্রহার করবার জন্য বেত সিক্ত করে রাখতেন প্রস্রাবের মধ্যে।

(৭) ভারতীয় সুবেদার মেজর পর্য্যন্ত স্বীয় পুত্রের সুবিধা করবার জন্য ঘোরতর অবিচার করে বসলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীদের তুলনায় প্রত্যেক ভারতীয় অফিসার দুরাত্মা ও নীচ।

দৃষ্টান্ত আরও অসংখ্য দেওয়া যেতে পারে। যে কয়টি দিয়েছি ছিদ্রানুসন্ধান করে সংগ্রহ করিনি। মঠের জলবাহক ভৃত্য ও ইংরাজ চরিত্র ব্যতিরেকে কোথাও মহত্ত্বের লেশ মাত্র পরিচয় নাই। গ্রন্থের নায়ক লাল সিং উৎপীড়িত হয়ে গ্রাম ত্যাগ করেছে বটে কিন্তু কেবল মাত্র অসহিষ্ণুতা ভিন্ন তার স্বভাবে কোন বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়নি।

গ্রন্থকার হয়ত' ভেবে থাকবেন যে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা এত ক্ষণভঙ্গুর নয় যে অপ্রিয় সত্যকথনে ক্ষুণ্ণ হবে। তিনি হয় ত' আশা করেছেন যে নিরক্ষর হতভাগ্য চাষীদের দুর্দ্দশার কথা প্রচারিত হলে প্রগতির গতি সাবলীল হবে। কিন্তু সাহিত্যের যে স্বতন্ত্র চাহিদা আছে সে কথা অস্বীকার করবার তাঁর কোন অধিকার নাই। সার্ব্বজনীন সাহিত্য ক্ষেত্রে নেমে স্বদেশকে গালাগালি দিয়ে সভ্য করবার চেষ্টা হাস্যপ্রদ ব্যাপার।

প্রগতি সাহিত্য সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণার প্রচলন দেখতে পাই। অনেকে মনে করেন চাষীর জীবন কাহিনী অথবা কারখানার শ্রমিকদের ঘনবিন্যস্ত বসতির দুঃখের কথা বিবৃত করলেই অগ্রগতিশীল সাহিত্যরচনা হয়ে যায়। একথা স্মরণে থাকে না যে রসোপপত্তি না ঘটলে কোন শিল্পসৃষ্টিই শক্তিমন্ত বা শাশ্বত হয়ে উঠতে পারে না এবং প্রগতি কথাটি হচ্ছে শক্তিরই নামান্তর মাত্র।

ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানের বিজড়িত পটভূমিকা হতে ধাবমান প্রাণশক্তি ও বাধাশীল আবর্জ্জনার স্বরূপ সন্ধান করে সংক্ষোভের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাওয়া সাধনার ব্যাপার। গ্রন্থকার সে শক্তি অর্জ্জন করেননি কিন্তু তিনি যে শিল্পী তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। প্রথম পরিচ্ছেদের পিতা-পুত্রের সংবাদ; বৃদ্ধা গুজরীর সাংসারিক সমস্যা; যুবকদিগের মেলা-দর্শন; ইংরাজ ডেপুটি কমিসনারকে স্বাগত-করণ ইত্যাদি কয়েকটি দৃশ্য বিশেষ ভাবে মনোরঞ্জক। পাঞ্জাবী গালিগালাজ ও প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের ইংরাজি অনুবাদ অনেক স্থানে বিসদৃশ ঠেকলেও মোটামুটি খাঁটি ভারতীয় আবহের সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবর্ণনা বিশেষণ-বাহুল্য দোষ সত্ত্বেও প্রীতিকর ও চমকপ্রদ হয়েছে। দু এক স্থানে ব্যাকরণ ভুল রয়েছে, কিন্তু লিখনভঙ্গীর স্বকীয় ছন্দের তরঙ্গে সে সব দোষ শুষ্ক তৃণের মত ভেসে যায়।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Family Reunion—by T. S. Eliot (Faber and Faber).

এলিয়টের কাব্য এবং নাটককে অনেকে একটি কবিতা বলে ধরেন ; প্রথম থেকেই তাঁর রচনায় একটি একাগ্র অনুসন্ধিৎসা আছে ; প্রুফ্‌রকে যে সুর বেজেছে তার সঙ্গে সংযোগ পরবর্ত্তী প্রত্যেক কবিতারই আছে। বহির্জগতের, এবং ব্যক্তিগত ঘাতপ্রতিঘাতের পীড়নে এলিয়ট সম্প্রতি কবির চেয়ে ধর্ম্মযাজকের কথাই মাঝে মাঝে আমাদের মনে করিয়ে দিতেন। তাছাড়া প্রবহমাণ ঐতিহ্যের যে আশ্রয় এলিয়ট ব্যবহার করতেন তাও দু'একবার পাঠকের কাছে কষ্টকৃত ঠেকেছে। এদিক থেকে তাঁর অতি-আধুনিক কাব্যনাট্য 'ফ্যামিলি রিইউনিয়নে' যে দক্ষতার পরিচয় এলিয়ট দিয়েছেন তা সত্যই চমকপ্রদ। তাঁর একাগ্র অনুসন্ধিৎসার শেষ এখনো হয়নি ; এবং উপরোক্ত নাটকটি যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে তাতে আধুনিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি যে পাদরীর গম্ভীর ভূমিকায় সমাপ্তি পাবেন সে আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই।

স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে গ্রীক নাটকের কায়দায় রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' সহজেই উচ্চস্থান অধিকার করবে। আধুনিক ইংলণ্ডের একটি বনেদী ঘরে বহুদিন পরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুনরাগমনে যে পরিস্থিতির সূচনা করল তার বর্ণনায় এলিয়ট ইস্‌কিলাসের কথা বার বার আমাদের স্মরণে এনেছেন ; এমন কি মহাজনের পন্থা অনুসরণ করে তিনি জান্‌লার উপরে ইউমেনিডিস্‌কে বসিয়ে পাঠকদের হঠাৎ চমক লাগিয়েছেন ; কোরাসগুলি উৎকণ্ঠায় 'আগামেম্‌ননের' বৃদ্ধদের কোরাসগুলির সঙ্গে তুলনীয় ; এবং যে চরম পরিত্রাণ 'অরিস্‌টিয়ার' শেষ নাটককে মহিমান্বিত করেছে তার অল্প আভাস্‌ এলিয়টের নাটকেও আছে। অবশ্য এলিয়টের পরিত্রাণের অনুসন্ধান মরুভূমিতে কৃচ্ছ্রসাধনব্রত মধ্যযুগের ক্রীশ্চানদের ছবি চোখের সামনে আনে।

In and out, in an endless drift
Of shrieking forms in a circular desert
Weaving with contagion of putrescent embraces
On dissolving bone. In and out, the movement
Until the chain broke, and I was left
Under the single eye above the desert.

এই অন্তহীন পরিক্রমা থেকে মুক্তির উপায় ঃ

Where does one go from a world of insanity ?
Somewhere on the other side of despair,
To the worship in the desert, the thirst and deprivation,
A stony sanctuary and a primitive altar,
The heat of the sun and the icy vigil,
A care over lives of humble people,
The lesson of ignorance, of incurable diseases,
Such things are possible.

ভর্সের উপর অসামান্য দখল, এবং অন্যান্য উৎকর্ষ সত্ত্বেও 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' অনেকটা শূন্যজীবী। এবং তার কারণ খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয় না। এলিয়টের ঠিক পূর্ববর্ত্তী নাটক বেকেটের ইতিহাস ঘটনার সংঘাতে গড়ে উঠেছে ; সেজন্য প্রচারক-সুলভ সঙ্কীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও "মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রালের" গঠন আরো কঠিন এবং ঘন। কিন্তু 'ফ্যামিলি রিইউনিয়নে' নাটক-বহির্ভূত কোনো আবেগকে (obsession) এলিয়ট রূপ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। আধুনিক মনস্তত্ত্বের সাহায্যে ও'নিল যে সফলতা অর্জন করেছিলেন আদিম পাপের আধিজৈবিক বিষয় এলিয়টকে সে সাহায্য করেনি। এলিয়টের এই নাটকে অনেক স্থানেই তাঁর আশ্চর্য্য কাব্যশক্তি আমাদের বিস্ময় জাগায় ; কিন্তু নাটকীয় চরিত্র এবং গতি যখন নাট্যকারের দর্শনের মুখপাত্র তখন নাটক গঠনে দক্ষতাও একধরণের চালিয়াতি মনে হয়। Objective correlative-এর অভাব আবিষ্কার করে (Selected Essays, পৃঃ ১৪৫) এলিয়ট্ 'হ্যামলেট্'কে আর্ট হিসেবে বিফল বলেছিলেন ; অতি-নাটকীয় obsession-এর জন্য "ফ্যামিলি রিইউনিয়ন" 'হ্যামলেটে'র কথাই বার বার আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

সমর সেন

Our Differences—by M. N. Roy ; (Saraswaty Library).

শ্রীযুক্ত এম এন রায়ের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের যে মতভেদ ঘটেছিল এবং যার ফলে তিনি আজও ইণ্টারন্যাশন্যালের বাইরে রয়েচেন, তার সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেকেরই খুব স্পষ্ট ধারণা নেই, কেবল জানা আছে

যে মতভেদ একটা হয়েছিল এবং তারই দরুণ এখনও পর্য্যন্ত এদেশের অফিসিয়াল কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা করা সম্ভবপর হচ্চে না।

"Our Differences" নামে বইখানিতে শ্রীযুক্ত রায় এ মতভেদের কারণ সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এবং তার প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র যা' বর্তমানে হাতে আছে, তা' উপস্থাপিত করেছেন। বইখানিতে ভূমিকা ছাড়া আছে একটি উপক্রমণিকা, "My crime" বলে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের মেম্বরদের কাছে একখানা খোলা চিঠি, "On the Indian Question" নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইণ্টারন্যাশন্যালের সভ্যদের নিকট লিখিত আরেকখানা চিঠি এবং ভি বি কার্ণিক লিখিত রায়বাদ সম্বন্ধে তুটি প্রবন্ধ। তা' থেকে আমরা জানতে পারি যে শ্রীযুক্ত রায়ের যে মতবাদকে Decolonisation theory বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, প্রধানত তার থেকেই এই মতভেদের উদ্ভব। এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয়েচে "On the Indian Question" নামক অধ্যায়ে যাকে রায়ের De-colonisation thesis বলা হ'য়ে থাকে। এতে তিনি প্রতিপাদিত করেছেন কী করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাচক্রে প'ড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষকে দূর থেকে শোষণ কর্‌বার নীতি ক্রমে ছেড়ে দিয়ে এদেশেই মূলধন খাটিয়ে দেশের যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলতে এবং সে উদ্দেশ্যে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহায্য নিতে। এরই ফলে সে শ্রেণী দিন দিন সাম্রাজ্যবাদের জুনিয়র অংশীদাররূপে পরিণত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির প্রতি তার যে বৈর ভাব ছিল, তাও কমে গেছে—বস্তুত সে শ্রেণী বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দিন দিন বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছে। রায় মহাশয় ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ সম্পর্কিত তথ্য দ্বারা তাঁর মতবাদ প্রমাণিত করেছেন ঃ তিনি দেখিয়েছেন কী ভাবে ভারতের যন্ত্রশিল্প গড়ে তোলবার প্রয়োজনে অবাধ বাণিজ্য বা ফ্রী ট্রেডের নীতি ছেড়ে দিয়ে সংরক্ষণ বা প্রোটেকশনের নীতি প্রবর্তিত করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্বন্ধ বিবর্তনের ফলে আমাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামেরও রূপান্তর হ'তে বাধ্য এবং রায় মহাশয় তাই বল্‌তে চেয়েছেন যে সে শ্রেণীকে আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে পরিগণিত করা যাবে না। তার সঙ্গে তাঁর দৃঢ় অভিমত এই ছিল যে সে শ্রেণী ছাড়া আর যে কৃষক, শ্রমিক এবং সহরের ও

গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যাদের দিয়ে দেশের জনসমষ্টির শতকরা নব্বই ভাগ গঠিত—তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সমভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং তাদের নিয়েই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এক প্রবল রাজনৈতিক পার্টিতে পরিণত করা দরকার।

এই সুচিন্তিত ও বাস্তবানুমোদিত মতবাদের অপব্যাখ্যা করা হলো এই ব'লে যে শ্রীযুক্ত রায় বলেছেন যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ আপনা থেকেই ভারতবর্ষ ছেড়ে দিয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকটা মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইণ্টারন্যাশন্যালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত রায়কে অপসারিত করা হয়। সে সব অভিযোগ তিনি যথেষ্ট পরিমাণে খণ্ডন করেছেন, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনের আসল কারণ ছিল এই যে সে ছিল এক গোঁড়ামির যুগ এবং রায় মহাশয় যে তাঁর সহজাত স্বাধীনচিত্ততার ফলে অবস্থানুযায়ী মতবাদ নির্ভয়ে প্রচার করেছিলেন, তা' অনেকের মনঃপূত হয়নি। এই গোঁড়ামির ফলেই আবার সেই কংগ্রেসেই এই অপসিদ্ধান্ত করা হয় যে কম্যুনিষ্টগণ কেবল সর্বহারা মজুরদের দ্বারা গঠিত দল ছাড়া একাধিক শ্রেণী নিয়ে গঠিত যে দল তাতে যোগ দিতে পারবে না। এই সিদ্ধান্তের ফলে পরাধীন দেশে স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য এবং অন্যান্য অবস্থাতেও একাধিক শ্রেণীর সম্মিলনে যে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট প্রয়োজন, তা' অসম্ভব হ'য়ে পড়ল যদিও সে প্রয়োজন ষষ্ঠ কংগ্রেস অস্বীকার করেনি। এই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা দেখিয়ে শ্রীযুক্ত রায় ইণ্টারন্যাশন্যালের সভ্যদের কাছে এক চিঠি লেখেন, এবং অনেকটা তারই ফলে সপ্তম কংগ্রেসে সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ভারতের কম্যুনিষ্ট তার ফলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে মেনে নিতে বাধ্য হলেও তাকে বিবিধ শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানের সম্মিলনক্ষেত্রের বেশী ভাবতে পারছে না, ফলে কংগ্রেসকে এক সুসংহত বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পার্টিরূপে গড়ে' তুলতে বাধা ঘটছে। আলোচ্য পুস্তকের শেষ দুটি অধ্যায়ে কমরেড কাণিক এ' কথাটাই স্বচ্ছ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত রায়ের ডি-কলোনাইজেশন থিওরির সত্যতা আমরা দেখতে পাই কেবল তাঁর একটি যুক্তি ও তথ্য সংযোগে নয়—বাস্তব রাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়েও। দেখতে পাই যে প্রাদেশিক আত্মশাসনপ্রতিষ্ঠা ও কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের

পর থেকেই ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী নিয়মতান্ত্রিকতার আড়ালে আত্মগোপন কর্‌ছে। তারি ফলে যে গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের আশ্রয়ে সে শ্রেণীর প্রভুত্ব চলছে, তার বিরুদ্ধে দেশে জেগেছে প্রবল বিক্ষোভ; সে নেতৃশক্তিকে অপসারিত ক'রে প্রকৃত বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী জেগে উঠেছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং এখনও তার মীমাংসা হয় নি। নেতৃবৃন্দের বিবিধ কথায় এবং কাজে তাঁদের প্রতিবিপ্লবমুখী মনোবৃত্তির পরিচয় দিন দিন অধিকতর স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে এবং তার দ্বারা, শ্রীযুক্ত রায় ঐতিহাসিক ধারানুযায়ী অবস্থা বিশ্লেষণ ক'রে যে মতবাদ বহু পূর্বেই গঠন ও প্রচার করেছিলেন, ঐতিহাসিক ঘটনানুযায়ী তার সত্যতা সুপ্রতিপন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা যেতে পারে যে ইদানীং Independent India-য় "A critic" লিখিত কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহযোগে দেখানো হয়েছে যে শ্রীযুক্ত রায় যে সময়ে তাঁর ডি-কলোনাইজেশন থিওরি প্রচার করেছিলেন, তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত সে থিওরির কার্য্যকারিতা অবিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে চলেছে এবং এখন প্রায় সুপরিণত হ'য়ে উঠেছে।

বসুধা চক্রবর্ত্তী

মার্ক্স-প্রবেশিকা—শ্রীরেবতী বর্ম্মণ প্রণীত (গণসাহিত্যচক্র)।
মার্ক্সীয় দর্শন্—শ্রীরবি রায় প্রণীত।
বিপ্লবী চীন—শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত প্রণীত (অগ্রণী প্রকাশালয়)।

আজকালকার দিনে বামপন্থা সমাজতন্ত্রবাদে পর্য্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক। এদেশেও তাই সোশ্যালিজ্‌ম সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এদেশে এই পরিবর্ত্তন সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। এক সময়ে ভারতের বৈশিষ্ট্য এখানে সাধারণ সত্যরূপে সমাদর পেত; আজ সন্দেহ উঠেছে যে অনেক বিষয়েই সমস্ত পৃথিবী এক এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা ঠিক সৃষ্টিছাড়া নয়। উনিশ শতকে রুষদেশে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপাসক স্লাভোফিল্‌দের পশ্চিমপন্থী মতের কাছে পরাজয় ঘটেছিল; আমাদের দেশেও তার অনুরূপ কিছু ঘটছে বল্‌লে অন্যায় হবে না। সোশ্যালিজম্ সম্বন্ধে ইংরাজি সাহিত্য বিরাট ও সমৃদ্ধ; কিন্তু এ-অবস্থায় নিজেদের মাতৃভাষায়

সমাজতন্ত্রী মতবাদের প্রচার ও আলোচনার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতে বাধ্য। বাংলা ভাষাতেও তাই সমাজতন্ত্রী সাহিত্য ক্রমশঃ গড়ে' উঠছে। উপরে নির্দ্দিষ্ট বই তিনখানি সেই পর্য্যায়ভুক্ত।

সমাজতন্ত্রবাদের নানা বিভিন্ন মূর্ত্তি থাকলেও মার্ক্সের মতামত যে তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ও প্রাণস্বরূপ একথা আর অস্বীকার করা যায় না। তাই এদেশের নবীন লেখকেরা কেউ কেউ মার্ক্সকে বুঝবার এবং তাঁর মতবাদ প্রচার করবার কাজে হাত দিয়েছেন। মার্ক্সপন্থী সাম্যবাদের তত্ত্ব এবং ব্যবহারের কোন কোন অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনাই উপরের বইগুলির বিষয়বস্তু। এই কাজ অবশ্য অত্যন্ত দুরূহ। প্রথমতঃ, মার্ক্সবাদ সরল ও সহজ বিষয় নয়। তার আর্থিক, দার্শনিক ও রাষ্ট্রিক স্বরূপ আয়ত্ত করা বহু পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ। তবে আলোচ্য গ্রন্থগুলির লেখকেরা এ বাধা অতিক্রম করেছেন বলা যায়। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বাংলায় সমাজতন্ত্রী লেখকদের মধ্যে যে-অসম্পূর্ণ জ্ঞান লক্ষ্য করা সহজ ছিল, এর থেকে আশা করা যায় যে এখন তা' অনেকাংশে বিশুদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় বাধা, মার্ক্সবাদকে সরল অথচ অবিকৃতভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতার এই অভাব আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী লেখক কাটিয়ে উঠেছেন কিনা সন্দেহ। ভাষার অস্পষ্টতা ও দৌর্ব্বল্য আলোচ্য বইগুলিতেও সহজেই চোখে পড়ে। সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় এ-অভাবের একটা কারণ এই যে প্রকৃত শক্তিশালী লেখকেরা শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে মার্ক্সবাদকে এড়িয়ে চলেছেন। এই অবস্থায় যাঁরা এই দুঃসাধ্য কাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের আচরণ প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে বাংলা সমাজতন্ত্রী সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে এঁরা পথপ্রদর্শকের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হবেন না।

শ্রীযুক্ত রেবতী বর্ম্মণের বইখানি মার্ক্সের আর্থিক মতামতের সারাংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কুড়িটি-পাঠে এর মূলসূত্রগুলির পরিচয় যথাযথভাবে প্রকাশ ক্ষমতার পরিচায়ক। তাছাড়া বাংলায় ঠিক এই জাতীয় বই-এর বিশেষ অভাব ছিল। তাই পুস্তকাটির দু' একটি ত্রুটির উল্লেখ করলেও এর মূল্য খর্ব্ব করা হবে না। ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে যে, বাজার-মূল্য ওঠা নামা সত্ত্বেও স্বাভাবিক-মূল্যে পৌঁছতে উদ্যত থাকে, পঞ্চম পাঠে এ-কথাটি আর একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হ'ত। পুঁজি এখন ক্যাপিটাল্ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে অবশ্য, কিন্তু

চল্‌তি ভাষায় পুঁজি কথাটি মনে খানিকটা saving-এর ধারণা এনে দেয়; তাই ক্যাপিটালের প্রতিশব্দ মূলধন হ'লে, ক্যাপিটাল-সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যক্তিগত saving-এর ধারণাকে বাদ দেওয়া চলে। রেবতীবাবু এই বইখানিতে পাউণ্ড, শিলিং ইত্যাদি মুদ্রা অথবা 'বাইবেল্' রূপ পণ্যের উল্লেখ না করলেই ভাল হ'ত। বাংলা বই-এ বাংলা উদাহরণই বাঞ্ছনীয়।

মার্ক্সবাদের দার্শনিক রূপ উদ্‌ঘাটন বোধ হয় সব চেয়ে শক্ত কাজ। সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে ব্রতী হয়ে শ্রীযুক্ত রবি রায় সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এই বইখানিতে পূর্ব্বাভাষ অর্থাৎ বিষয়ের সাধারণ পরিচয় ছাড়া তিনটি ভাগ আছে—সমাজে দ্বন্দ্ব, চিন্তাধারায় দ্বন্দ্ব এবং তত্ত্ব ও ব্যবহার। ডায়ালেক্‌টিকের মূলসূত্র-গুলিকে প্রকাশ করবার এই উদ্যম প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বিষয়টির দুরূহতার জন্য রচনা সুখপাঠ্য হয়নি। কোটেশন্ ব্যতীত অন্যত্র ইংরাজি নাম ও শব্দ ব্যবহারের সময় বাংলা হরফে কথাগুলি ছাপাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। ডায়ালেক্‌টিক্ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ লেখকেরা এই বইখানি থেকে উপকার পাবেন, একথা বলা চলে।

'বিপ্লবী চীনে'র লেখক কলিকাতা বিশ্বায়তনের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে' পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'লেন। চীনের নবজাগরণের প্রাণ হ'ল চীনে সাম্যবাদীদল। এই বইখানি প্রকৃতপক্ষে সে দলেরই উৎপত্তি থেকে আজ পর্য্যন্তের আখ্যায়িকা। রুষদেশের বাইরে চীনেই সাম্যবাদ কর্ম্মক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত সব চেয়ে সাফল্য অর্জ্জন করেছে। চীনের ইতিবৃত্তের এই দিকটি তাই মার্ক্সবাদী সাহিত্যের অন্তরঙ্গ অংশ।

শ্রীসুশোভন সরকার

অণুকথা সপ্তক।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত (ভারতী ভবন)।

নামেই পরিচয়। বইখানি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের খুব ছোট সাতটি ছোট গল্পের সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যে এ রকম ছোট গল্প, চৌধুরী মহাশয় উৎসর্গ পত্রে যাদের বলেছেন যে "একরত্তি কথা", প্রায়শ হয়ে থাকে ভাব-প্রকাশের উপলক্ষ্য, অর্থাৎ গদ্য-লিরিক্। তাদের মধ্যে গল্পের মূর্ত্তি স্পষ্ট নয়,

মনের আবেগ প্রকাশই প্রধান কথা। রেখা প্রায় নেই, রংই সর্ব্বস্ব। বলা বাহুল্য এ পুঁথির ছোট গল্পগুলি সে শ্রেণীর নয়। কারণ চৌধুরী মহাশয়ের মনের গড়ন লেখার মধ্যে সমস্ত রকম ভাবাবেগ প্রকাশের বিরোধী। আর তাঁর গল্পের ঘটনার কি লোকের চেহারা কখনও আবছায়া থাকে না। দৃঢ় রেখার নিপুণ টানে তাদের মূর্ত্তি প্রকট হয়ে ওঠে। মনে, সুতরাং লেখায়, কি প্রবন্ধে কি গল্পে, তিনি দিনের উজ্জ্বল আলোর পক্ষপাতী ; গোধূলির প্রায়ান্ধকার তাঁর পছন্দ নয়। মননের রাজ্যে তিনি ফরাসি দেকার্তের দলে, জর্ম্মান হেগেলের দলে নন।

এ পুঁথির ছোট গল্পগুলি খুবই ছোট। সাতটি গল্পে ১৬ পেজী ক্রাউন কাগজের ৫৯ পৃষ্ঠা মাত্র, তাও পাইকা হরপে। কিন্তু এই অত্যল্প পরিসরের মধ্যে প্রতিটি গল্পে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর লেখার সমস্ত গুণ আশ্চর্য্য ফুটে উঠেছে। গল্পের ঘটনা যতই ছোট হোক আদি-মধ্য-অন্ত নিয়ে তা একটি সম্পূর্ণ ঘটনা ; আর সে ঘটনা কি আর্টিষ্টের চোখে কি সাধারণ গল্প-পাঠকের কাছে মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। এবং ঘটনার ঐ স্বল্পতার মধ্যেই গল্পের নায়কদের মন ও দেহের চেহারা স্পষ্ট আঁকা পড়েছে ; তারা হয়ে উঠেছে জীবন্ত মানুষ। শুধু নায়কদের বলছি এই জন্য যে একমাত্র "মেরি ক্রিস্‌মাস" গল্পটি ছাড়া আর কোনও গল্পে কোনও নায়িকা নেই। সুতরাং ছোট গল্পের, বিশেষ বাংলা ছোট গল্পের, প্রধান উপজীব্য প্রেমের কাহিনীও নেই। আর্টিষ্টের চোখ থাকলে বাংলা দেশেও যে প্রেম ছাড়া ছোট গল্পের উপাদানের অভাব নেই এই গল্পগুলি তার প্রমাণ। বলতে ভুলেছি, "মেরি ক্রিস্‌মাস" গল্পের অদ্বিতীয়া নায়িকাটিও লৌকিক নন, হয় ভৌতিক নয় মায়িক।

এই গল্পগুলির সর্ব্বাঙ্গে ছড়ান রয়েছে হীরার চূর্ণের মত 'হিউমারের' সুভাষিতাবলী, বাংলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর যা একেবারে নিজস্ব। এ 'হিউমার' কঠিন দানা বাঁধা, তরল কি বায়বীয় নয়। এ মর্ম্মে প্রবেশ করে জিব কি কান দিয়ে নয়, মগজ অর্থাৎ মার্জ্জিত বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে। এ থেকে যে-আলো ঠিক্‌রে পড়ছে তাতে হাসির ঝিলিক অবশ্য আছে, কিন্তু সে আলো 'এক্স-রে'। যাতে পড়ে তার ভিতরের স্বরূপটা একবারে প্রকট হয়, এবং চরম 'হিউমারটা' সেইখানেই যেমন "ঝোটন ও লোটন" গল্পের 'নিরীহ বিলিতী

শিকারী' কুকুরটি পোড়ো আস্তাবলের 'গো-সাপ ঢোঁড়া সাপ আর গিরগিটি দেখবামাত্র তন্মুহূর্ত্তে বধ করত; অথচ তাদের মাংস খেত না। সে ছিল ইংরেজরা যাকে বলে real sportsman।......ফল নিরপেক্ষ হত্যাই ছিল তার স্বধর্ম্ম!' বলেছি এ হিউমারগুলি গল্পের সর্ব্বাঙ্গে ছড়ান রয়েছে; কিন্তু সে কথা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ গল্পের শোভার জন্য এগুলি বাইরে বসান অলংকার নয়। এগুলি গল্পের দেহের নিজস্ব ভঙ্গী।

বাংলা গদ্যের মেদস্ফীতি ঘুচিয়ে যাঁরা তাকে 'গিরিচর ইব নাগঃ' প্রাণসার ক'রে তুলেছেন, যাঁরা তাকে করেছেন তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, সেই গণে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় অগ্রণী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর সে কীর্ত্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই ছোট্ট গল্পগুলি তাঁর গদ্যের চমৎকার নমুনা। তার গতিভঙ্গী সবল ও সুঠাম, চলায় যেন পরিশ্রম নেই, স্ফূর্ত্তি আছে। আর সে চলে বিদ্যুৎ বাতির আলো ছড়াতে ছড়াতে। প্রথম প'ড়ে মনে হয় যেন কত সহজ এই ভাষা। কিন্তু যারা কখনও বাংলা গদ্য লিখতে চেষ্টা করেছেন তাদের বুঝতে দেরী হয় না যে কত কঠিন এই সহজকে আয়ত্ত করা। এর নমুনা তুলতে চেষ্টা করবো না, কারণ তা হলে ৫৯ পৃষ্ঠাই তুলতে হয়।

উৎসর্গ পত্রে চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন, "এই সব একরত্তি কথার ভিতর কোন বড় কথা নেই, তা-সত্ত্বেও এদের অন্তরে যদি কিছু গুণ থাকে ত, তা তোমার মত সহৃদয় হৃদয়বেদ্য।" কিন্তু এ সব গল্পের সমগ্র গুণ যাঁদের হৃদয়বেদ্য তাঁরা হচ্ছেন সেই সব গুণী লোক, আলংকারিকদের ভাষায় যাদের মনোমুকুর নিরন্তর সাহিত্য ও নানা বিদ্যার অভ্যাসে বিশদীকৃত। বাংলা দেশের মনের চর্চ্চা যে স্তরে পৌঁছেচে তাতে এ রকম গুণীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। সেইজন্য শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর লেখার যে-প্রচার ও চর্চ্চা উন্নততর দেশে নিশ্চয় হতো বর্ত্তমান বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়নি। বাঙ্গালী পাঠকসাধারণের মনে প্রসার এবং সাহিত্যিক বুদ্ধি ও রুচি যখন ভবিষ্যৎকালে এখনকার চেয়ে অনেক বড় ও মার্জ্জিত হবে তখন তাঁর লেখার গুণগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা যে অনেক বাড়বে তাতে বেশী সন্দেহ নেই। এবং সে লেখা থেকে এই অতি ছোট 'অণুকথা সপ্তক' পুঁথিখানি বাদ পড়বে না।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

The Road to Damascus—by August Strindberg.
(Jonathan Cape).

সয়তান ক'রেছিল বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তার ফলে হয়েছিল তার লাভ স্বর্গ হ'তে নির্বাসন ও নরকীয় যন্ত্রণা ভোগ।

সয়তান ছিল একজন দেবদূত, আর আমরা হচ্ছি মানুষ। জীবনের পঙ্কিল আবর্ত্তে পড়ে দুঃখকষ্টে হাবুডুবু খেতে খেতে পুনঃ পুনঃ আশাভঙ্গজনিত ক্রোধের বশীভূত হয়ে যদি আমরা ভগবানে বিশ্বাস হারাই ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি, তাহ'লে আমাদের কি দশা হয় ?

স্ট্রিণ্ডবার্গের জীবনে এ সমস্যার উদ্ভব নিশ্চয়ই হয়েছিল। শৈশব থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের তিক্ততার আস্বাদ। মাতাপিতার আদর তাঁর ভাগ্যে জুটে ওঠেনি। তাঁর বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ছাপ আমরণ তাঁর মনে ছিল। তাঁর বাড়ীর লোকের সন্দেহ হয় তিনি চুরি করে মদ্যপান করেছেন। যদিও তিনি প্রকৃতই নির্দ্দোষ ছিলেন, তাহলেও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাঁকে দোষ স্বীকার করতে হয়। অর্থাভাব ছিল তাঁর নিত্য সহচর। বিবাহিত জীবনেও তাঁর বিশেষ সুখ মিলেছিল ব'লে মনে হয় না। পর পর তিনটি মহিলার তিনি পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু এই তিন ক্ষেত্রেই তাঁর নিজের দোষেই হউক বা অন্য কোন কারণে বিবাহ অবশেষে যন্ত্রণা বিশেষে পরিণত হয়েছিল ও এই যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ তিনি পেয়েছিলেন বিবাহ-বিচ্ছেদে। লেখক হিসাবেও তাঁকে কম নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। তাঁর একখানা বইয়ের জন্য তাঁকে এমন কি আদালতের বিচারের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, যদিও বিচারে তিনি সসম্মানে মুক্তিলাভ করেছিলেন। এই সমস্ত বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্টের ফলে নিপীড়নের আশঙ্কা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে জীবনের এক সময়ে কংসের মত তিনি সব দিকেই নিপীড়নের ভয় দেখতে পেতেন। তাঁর মনের এমন অবস্থাও হয়ে উঠেছিল যে কিছুকাল তাঁকে হাঁসপাতালেও থাকতে হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি তিনখানি নাটকের সমষ্টি, এবং এই তিনখানি নাটকের মধ্যে স্ট্রিণ্ডবার্গ তাঁর জীবনের অতি দুর্যোগময় অংশের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। নাটক তিনখানির নায়ক হচ্ছেন স্ট্রিণ্ডবার্গ স্বয়ং একজন "অপরিচিত লোকের"

ছদ্মবেশে। এই অপরিচিত ব্যক্তিটির সহিত একজন ডাক্তারের স্ত্রীর হঠাৎ প্রণয় হয়। ডাক্তারের স্ত্রী ডাক্তারকে ত্যাগ ক'রে অপরিচিত ব্যক্তিটির সঙ্গে পলায়ন করেন ও পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু এ বিবাহ বিশেষ সুখের হ'ল না। তার কারণ প্রথমত অপরিচিত ব্যক্তিটির অর্থাভাব, দ্বিতীয়ত তার নিপীড়ন-ভীতি এবং তৃতীয়ত ও শ্রেষ্ঠত উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব। নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে বজায় রাখবার অত্যুগ্র ইচ্ছায় অপরিচিত ব্যক্তিটি বারবার তাঁর স্ত্রীর মোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করেন। পরিশেষে একটি কন্যার জন্মগ্রহণের পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এ বিচ্ছেদের পরেও আবার মিলন হয়—সে মিলন হয় কল্পলোকে একটি সন্ন্যাসিনিবাসে।

প্রথম দুখানি নাটকে ভগবান বা ভাগ্যবিধাতার বিরুদ্ধে অপরিচিত ব্যক্তিটির বিদ্রোহভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত। তাঁর ধারণা তাঁকে সব বিষয়ে প্রতিহত করবার জন্য একটি চক্রান্ত চলেছে—এই চক্রান্তের নায়ক ভগবান কাপুরুষের মত অলক্ষ্যে থেকে তাঁর অস্ত্র প্রয়োগ করছেন। অপরিচিত ব্যক্তিটি এই গোপন শত্রুর সহিত একটা বোঝাপড়া করতে চান—তাঁর বশ্যতা স্বীকার ক'রে নয়—তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু এ বিদ্রোহের ফলে তিনি নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়লেন বেশী। বারবার এ ভাবে বিধ্বস্ত ও আহত হওয়ার পর তাঁর মন ক্রমে ক্রমে ভগবানের পদে আত্মসমর্পণের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল। শেষ নাটকে আছে অপরিচিত ব্যক্তির ভ্রমাত্মক ধারণার নিরসন ও ভগবানে পূর্ণ-আত্ম-নিবেদন। এই নাটকেই নাট্যকার, আমরা যে-সমস্যার কথা প্রথমে উল্লেখ করেছি তার একটি সমাধান করেছেন।

এ সমস্যার দিক থেকে বিচার না করলেও নাটক তিনখানি খুব চিত্তাকর্ষক মনে হবে। প্রথমত ষ্ট্রিণ্ডবার্গের জীবনের বহু ঘটনাই এই নাটকসমষ্টির মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাঁর দুঃখকষ্ট, তাঁর উৎপীড়ন-ভীতি, তাঁর অর্থাভাব, রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে অন্য ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করবার তাঁর প্রচেষ্টা, তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি—এ গ্রন্থখানির মধ্যে এ সমস্তেরই উল্লেখ আছে। গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র তাঁর প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর চরিত্রের সংমিশ্রণে গঠিত। অন্যান্য পাত্র-পাত্রীও তাদের কোন না কোন জীবন্ত প্রতিকৃতি অবলম্বনে

রচিত। বইখানির মধ্যে এমন অনেক স্থানেরও উল্লেখ আছে যেখানে ষ্ট্রিণ্ডবার্গ তাঁর জীবনের কোন না কোন সময় অতিবাহিত করেছিলেন।

যদিও অনেক প্রকৃত ঘটনা ও প্রকৃত চরিত্রের উপর নাটক তিনখানির ভিত্তি তাহলেও বই ক'খানিকে পূর্ণ বাস্তবিকতামূলক নাটকের (Naturalistic drama) পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। ষ্ট্রিণ্ডবার্গের নাট্যকার জীবনের প্রথম ভাগের অনেকগুলি নাটকই ছিল বাস্তবিকতামূলক, অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাস্তব-জীবনের নিখুঁত চিত্রসৃষ্টি। এই বাস্তব জীবনের চিত্র হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর মিস্ জুলিয়া। পরে তাঁর নাটকরচনা প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটে ও তাঁর নাটকের মধ্যে বাস্তবের চেয়ে রূপকেরই স্থান হয়ে উঠে বড়। রূপকপ্রধান এই নাটকগুলির শ্রেষ্ঠত্ব চরিত্র অঙ্কনে নয়, এদের শ্রেষ্ঠত্ব একটি বিশিষ্ট আবহাওয়ার সৃষ্টিতে। গ্রন্থকার তাঁর নাটকগুলির সাহায্যে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন যা পাঠকের মনে একটি চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

The Road to Damascus-এর প্রথম খণ্ডে বাস্তবের স্থানই খুব বেশী। দ্বিতীয় খণ্ডে বাস্তব একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও রূপকেরই প্রাধান্য। তৃতীয় খণ্ডে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। এ খণ্ডে যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সে সকলই ঘটেছে যেন এক কল্পলোকে, চরিত্রগুলিও যেন পার্থিব ক্লেদ-বর্জ্জিত হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় ভাস্বররূপে, আমরা ঘুরে বেড়াই এমন এক রাজ্যে যেখানে পৃথিবীর মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শাঠ্য নাই, যেখানে সমস্ত জিনিসেরই প্রকৃত মূল্য আমাদের কাছে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

The Road to Damascus বইখানি ষ্ট্রিণ্ডবার্গের নাট্যপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু যে-তিনখানি নাটকের সমষ্টিতে এই বইখানি তৈয়ারী, সে তিনখানির উপরেই যে তাঁর প্রতিভার বিশিষ্ট ছাপ আছে তা বোধ হয় কোন রকমেই অস্বীকার করা চলে না। যে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই বইখানির ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে সেই Anglo-Swedish Literary Foundation নিশ্চয়ই প্রত্যেক রস-পিপাসু সাহিত্যিকের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

'পরিচয়ে'র আগামী সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৪৬

পরিচয়

মীমাংসামতে আত্মবাদ (২)*

(পূর্বানুবৃত্তি)

বৌদ্ধ এইবার দেখাইতেছেন যে বস্তু ক্ষণিকই হউক আর অক্ষণিকই হউক বিজ্ঞানরূপ দর্পণে তাহার ছায়াপাত অসম্ভব ঃ—

স্থিরত্বান্নির্বিভাগত্বান্মূর্তানামসহস্থিতেঃ।
বিভর্তি দর্পণতলং নৈব চ্ছায়াং কদাচন ॥ ২৫৯ ॥

অর্থাৎ, দর্পণতল কোন অবস্থাতেই কোন বিষয়ের ছায়াধারণ করিতে পারে না, কারণ দর্পণতল হইল স্থির (unchanged) এবং নির্বিভাগ (indivisible), এবং যেহেতু বিভিন্ন মূর্ত বিষয়ের সহস্থিতি কখনই সম্ভব নয়।—দর্পণতলের দৃষ্টান্ত দিয়া মীমাংসক বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে আত্মা স্বয়ংক্রিয় না হইলেও আত্মার চৈতন্যস্বরূপ দর্পণের উপর বিষয়াদির অভিধান (projection, reflexion) সম্ভব। বৌদ্ধ কিন্তু এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে তাহা অসম্ভব, কারণ আত্মারূপ দর্পণ যদি অক্ষণিক (অর্থাৎ নিত্য) হয় তবে তাহাতে বিষয়ের ছায়াপাত সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলেই নিত্য আত্মাতে বিশেষ গুণাপত্তি আসিয়া পড়িবে। আবার ক্ষণিক হইলেও এই দর্পণ কখনই ছায়াধারণ করিতে পারে না, কারণ তাহা নির্বিভাগ। উদক যেমন কূপের অন্তর্গত, প্রতিবিম্বও সেইরূপ দর্পণের অন্তর্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি দর্পণতলের অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ বলিয়া কিছু আছে? সুতরাং

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture No. 13.

দর্পণে এই ছায়াদর্শন ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। কারিকাস্থ "নির্বিভাগ" কথাটি দ্বারা ইহাও বুঝাইতে পারে যে পূর্বাবস্থা ও উত্তরাবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এ ক্ষেত্রে সমুদায়ার্থ হইবে—"যেহেতু দর্পণ পরিবর্তনশীল নহে সেই হেতু পূর্বাবস্থা ও উত্তরাবস্থার পার্থক্য ইহাতে না থাকায় ইহা নির্বিভাগ"। কারিকায় আরও বলা হইয়াছে, দর্পণতল ছায়াধারণ করিতে পারে না কারণ একাধিক মূর্ত বিষয়ের সহস্থিতি অসম্ভব; দর্পণে যে পর্বতাদি বিবিধ বস্তু পরিলক্ষিত হয় তাহার কারণ সেগুলি ছায়ামাত্র; দর্পণ ও ছায়ার মত বিভিন্ন মূর্ত পদার্থ কখনই একই স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ একই স্থান অধিকার করিয়া যাহা অবস্থিত তাহা একাধিক হওয়া অসম্ভব। ইহাই হইল ক্ষণিকবাদের পক্ষ হইতে আপত্তি।

পরবর্তী কারিকায় দেখান হইতেছে যে স্বচ্ছ স্ফটিকের দৃষ্টান্ত দিয়াও প্রমাণ করা যায় না যে বিজ্ঞানরূপ আত্মাতে বাস্তবিকই বিষয়ের ছায়া পতিত হইয়া থাকে ঃ—

পার্শ্বদ্বিতয়সংস্থাশ্চ সুশুক্লং স্ফটিকোপলম্।
সমীক্ষ্যন্তে তদেষোঽপি ন চ্ছায়াং প্রতিপন্নবান্॥ ২৬০॥

অর্থাৎ, স্ফটিকের সম্মুখে রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া রাখিলেও দুই পার্শ্ব হইতে সেটি স্বচ্ছ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও বলা যায় না যে স্ফটিকটি ছায়াতে রূপান্তরিত হইয়াছে। রক্তপুষ্পের সান্নিধ্যে স্ফটিক যদি তদ্রূপেই রূপান্তরিত হইত তবে শুধু সম্মুখ কেন, সকল দিক হইতেই সেটি রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হইত।—স্বচ্ছ স্ফটিকের উপর রক্তজবার ছায়াপাতের দৃষ্টান্ত দিয়া স্বয়ং শঙ্করাচার্যও নির্বিষয় বিজ্ঞানে বিষয়াপত্তির যৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; সাংখ্যাচার্যগণও এই সম্পর্কে বিম্ব-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।* সুতরাং তদ্বিরুদ্ধে বৌদ্ধের এই যুক্তির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

পরবর্তী কারিকায় শান্তরক্ষিত দেখাইতেছেন যে যদি ধরিয়াও লওয়া যায় বস্তু অক্ষণিক, তাহা হইলেও মীমাংসকের কথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ঃ—

* চতুর্দশ বক্তৃতা দ্রষ্টব্য, শ্রীভারতী আষাঢ়, ১৩৪৬, পৃঃ ৬৬৭।

ভেদঃ প্রত্যুপধানং চ স্ফটিকাদেঃ প্রসজ্যতে।
তচ্ছায়া প্রতিপত্তিশ্চেত্তস্য বিদ্যেত তাত্ত্বিকী॥ ২৬১॥

অর্থাৎ, স্ফটিকাদিতে বাহ্য বিষয়ের ছায়াপাত যদি বাস্তবিকই সত্য (তাত্ত্বিকী) বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলেই স্বীকার করা হইল যে উপাধেয় বিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ফটিকাদিও স্বয়ং পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।—এই কথা ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু মীমাংসকের মত স্থিরভাবে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতের সহিত একথার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। কমলশীল বলিয়াছেন, কারিকায়—"তাত্ত্বিকী"—কথাটির প্রয়োগ হইতে বুঝিতে হইবে দর্পণাদিতে বাহ্য বিষয়ের ছায়াপাত মায়িক ও মিথ্যা। সুতরাং ঃ—

তস্মাদ্‌ভ্রান্তিরিয়ং তেষু বিচিত্রাচিন্ত্যশক্তিষু।

অর্থাৎ, বুঝিতে হইবে যে বিজ্ঞানে বিষয়ের এই ছায়াপাত ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং তাহার মূলে আছে কেবল অনন্ত বৈচিত্র্য বিশিষ্ট বিবিধ শক্তির (potency) লীলা। কারণ ক্ষণিক এবং অক্ষণিক এই উভয় পক্ষ হইতেই যদি দেখা যায় যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে বাহ্য বিষয়ের ছায়াপাত অসম্ভব তাহা হইলে ইহা ভিন্ন আর কি সমাধান কল্পনা করা যাইতে পারে? কিন্তু সবই যদি ভ্রান্তিই হয়, তবে স্ফটিকাদির উপরেই কেবল ছায়াপাত হয় কেন এবং প্রাচীর গাত্রে তাহা হয় না কেন? তাহারই উত্তরে কারিকায় বলা হইয়াছে "বিচিত্রাচিন্ত্যশক্তিষু"।

পূর্বপক্ষী কিন্তু বলিতে পারেন, সবই যদি ভ্রান্তি হয় তবে বুদ্ধিই যে বিষয়ের ছায়ায় রূপান্তরিত হয়—এই প্রকার বুদ্ধিই বা ভ্রান্তি হইবে না কেন (বিষয়-চ্ছায়াপ্রতিপত্তির্ভ্রান্তিরেবাস্তু)? এই প্রশ্নেরই উত্তরে কারিকার দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে ঃ—

ন বুদ্ধৌ ভ্রান্তিভাবোঽপি যুক্তো ভেদবিয়োগতঃ॥ ২৬২॥

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ভ্রান্তি কখনও সম্ভব হয় না, কারণ ইহাতে কোন প্রকার ভেদের অবকাশই থাকে না।—স্ফটিকাদি বিষয়ে ভ্রান্তি যুক্তিযুক্ত, কারণ সেখানে স্ফটিকাদি হইতে বিভিন্ন আর এক বুদ্ধির অবকাশ রহিয়াছে (অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে

subject ও object-এর ভেদ বর্তমান)। কিন্তু নির্বিষয় বুদ্ধিতে কোন ভ্রান্তি সম্ভব নহে, যে-হেতু মীমাংসকও স্বীকার করিয়া থাকেন যে এই বুদ্ধি এক ও অভিন্ন। আর একথাও বলা যায় না যে বুদ্ধিই ভ্রান্তিরূপে প্রতীয়মান হয় কারণ বুদ্ধি যে নিত্য তাহা পূর্বপক্ষীও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু মীমাংসক যে বুদ্ধির একত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য বলিয়া থাকেন বুদ্ধি বোধের আকারেই প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, তাহার বিরুদ্ধে বক্তব্য ঃ—

অবোধরূপভেদং তু সমানং সর্ববুদ্ধিষু।
আরোপ্য প্রত্যভিজ্ঞানং নানাত্বেঽপি প্রবর্ততে ॥ ২৬৩ ॥

অর্থাৎ, সর্বপ্রকার বুদ্ধির সাধারণ ধর্ম হইল তাহা (বুদ্ধির বিপরীত) অবুদ্ধি হইতে পৃথক্ ; এই সাধারণ ধর্ম আশ্রয় করিয়াই নানা বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞান (recalling) সিদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য সকল প্রকার বুদ্ধির মধ্যে তদপেক্ষা নিকটতর কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।—কমলশীল বলিয়াছেন, এতৎসম্পর্কে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতে হইবে ঃ—বিষয়ের নানাত্ব থাকিলে তবেই বিজাতীয় ধর্মাবলীর ব্যাবৃত্তি পর্যালোচনা করিয়া এই প্রত্যভিজ্ঞান সম্ভব হয়, নানাত্ব ব্যতিরেকে ইহা সম্ভব হয় না।

মীমাংসক বলেন যে আত্মা নিত্য ও একরূপ ; কিন্তু তাহা হইলে সুখাদি বিভিন্ন অবস্থা সম্ভব হয় কি করিয়া ? সুখাদি অবস্থা স্বীকার করিলে আত্মার নিত্যত্ব ও একরূপত্ব প্রত্যাখ্যান করিতেই হয়।—এই আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য কুমারিল বলিয়াছেন ঃ—

অবস্থাভেদভেদেন শূন্যোঽপ্যেকান্ততঃ স্থিতে।
স্থিরাত্মনি·········র্যৎ পরৈঃ পরিকল্প্যতে ॥ ২৬৪ ॥*

অর্থাৎ, অবস্থার ভেদ অনুযায়ী আত্মার কোন পরিবর্তন উপস্থিত হয় না, যদিও লোকে তাহা মনে করিয়া থাকে, কারণ ঃ—

সুখদুঃখাদ্যবস্থাশ্চ গচ্ছন্নপি নরো মম।
চৈতন্যদ্রব্যসত্ত্বাদিরূপং নৈব বিমুঞ্চতি ॥ ২৬৫ ॥

* এইখানে পুঁথিতে ত্রুটি থাকায় কুমারিলের বচনটি পূর্ণাকারে তত্ত্বসংগ্রহে পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ, সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া যাইবার সময়েও আমার আত্মা (নরঃ) চৈতন্য, দ্রব্যত্ব এবং সত্ত্বাদি বিষয়ে অপরিবর্তিত ও অভিন্নই থাকে।—কমলশীল পঞ্জিকায় বলিয়াছেন যে "সত্ত্বাদি" বলিতে এখানে জ্ঞেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম বুঝাইতেছে। কিন্তু বিশেষ ধর্মগুলিরও যে পূর্ণ সমুচ্ছেদ হয় না তাহাই দেখাইবার জন্য মীমাংসক বলিতেছেন ঃ—

> ন চাবস্থান্তরোৎপাদে পূর্বাত্যন্তং বিনশ্যতি।
> উত্তরানুগুণার্থং তু সামান্যাত্মনি লীয়তে॥ ২৬৬॥

অর্থাৎ, একটি অবস্থার পর আর একটি অবস্থার উদ্ভব হইলেই যে পূর্বাবস্থাটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা নহে; আসলে পূর্বাবস্থাটি সামান্যাবস্থায় বিলীন হইয়া যায় মাত্র, যাহাতে উত্তরাবস্থার উদ্ভবের সুযোগ হয়।—কমলশীল মীমাংসকের এই সুন্দর বচনটির সম্যক্ ব্যাখ্যা করেন নাই, কেবল মাত্র বলিয়াছেন যে চৈতন্য, দ্রব্যত্ব প্রভৃতি হইল সামান্য ধর্ম ; এইগুলি সর্বাবস্থাতেই সমভাবে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ এখানে আপত্তি করিতে পারেন, সামান্য ধর্মগুলির একটিতে অপরগুলির বিলীন হওয়া যেমন অযৌক্তিক, বিশেষ ধর্মগুলির সামান্য ধর্মে বিলীন হওয়াও সেইরূপ অযৌক্তিক হইতে পারে। ইহার উত্তর ঃ—

> স্বরূপেণ হ্যবস্থানামন্যোন্যস্য বিরোধিতা।
> অবিরুদ্ধস্তু সর্বাসু সামান্যাত্মা প্রতীয়তে॥ ২৬৭॥

অর্থাৎ, বিভিন্ন অবস্থাগুলি (=বিশেষ ধর্মগুলি) যখন স্বাধীনভাবে বর্তমান তখনই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা থাকিতে পারে ; কিন্তু দেখাই যায় যে সামান্য ধর্ম সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্মের অবিরোধী।—ইহার ব্যাখ্যায় কমলশীল বলিয়াছেন, সুখদুঃখাদি রূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে ; সুতরাং তাহাদের একটি অপরটিতে বিলীন হইতে পারে না। কিন্তু সামান্য ধর্মে যদি বিশেষ ধর্ম বিলীন হয় তবে তাহাতে কি বিরোধ থাকিতে পারে যেজন্য তাহা সম্ভব হইবে না ? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে সামান্য

ধর্ম সর্বাবস্থাতেই সমভাবে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে, যে-হেতু সর্বাবস্থাতেই চৈতন্যাদি উপলব্ধ হয়।

এইখানেই মীমাংসকের পূর্বপক্ষ শেষ হইল। শান্তরক্ষিত ইহার পরেই মীমাংসা মত খণ্ডন করিবার জন্য দীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন ঃ—

তত্র নো চেদবস্থানামেকান্তেন বিভিন্নতা।
পুরুষাত্তদ্ব্যয়োৎপাদে স্যাতামস্যাপি তৌ তথা॥ ২৬৮॥

অর্থাৎ, এই সকল বিশেষ অবস্থা যদি আত্মা হইতে একান্ত বিভিন্ন না হয় তবে এই সকল অবস্থার উৎপত্তি ও লয়ানুযায়ী আত্মারও উৎপত্তি ও লয় ঘটুক!—কমলশীল "পঞ্জিকায়" বলিয়াছেন "একান্তেন" কথাটির ব্যবহার হইতে বুঝা যাইতেছে, অতি সামান্য মাত্র অভিন্নতা থাকিলেও বিশেষ অবস্থার মত আত্মারও উৎপত্তি ও লয় দুর্বার হইয়া পড়িবে।—এই যুক্তি যে অনৈকান্তিক নহে তাহাই দেখাইবার জন্য পরবর্তী কারিকায় বলা হইতেছে ঃ—

বিরুদ্ধধর্মসঙ্গে তু ভেদ একান্তিকো ভবেৎ।
পুংসামিব স্বভাবেন প্রতিস্বং নিয়তেন তে॥ ২৬৯॥

অর্থাৎ, পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বর্তমান থাকিলে ঐকান্তিক ভেদই প্রমাণিত হয়—আপনাদের আত্মাসকলের প্রত্যেকটি যেমন স্বীয় স্বভাবের সহিত সংযুক্ত।—কমলশীল কারিকাটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—যদি অবস্থাবলীরই কেবল উৎপত্তি ও লয় ঘটে এবং পুরুষ সর্বাবস্থায় অবিকারীই থাকেন তাহা হইলে আত্মা ও অবস্থাবলীর মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্ম, এবং তজ্জন্য ভেদ, স্বীকার করা হইল,—ঠিক যেমন বহু আত্মার মধ্যে প্রত্যেকের উপযোগী বিশেষ গুণবশতঃ পার্থক্য পূর্বপক্ষীর দ্বারাও স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিবিধ আত্মা বস্ত্বাদিরূপে পরিগণিত হইলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ আর থাকে না; সেই জন্যই কারিকাতে "প্রতিস্বং" কথাটি ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক আত্মার আপন বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক আত্মার বিশেষ রূপটি অপর সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, নতুবা অনুভব, স্মরণ প্রভৃতি ব্যাপারে বিষয়ের উপযোগিত্বের প্রয়োজন হইত না, এবং সর্বত্রই সঙ্করাবস্থার উদ্ভব হইত। এই অনুমানটির প্রয়োগ এইরূপ ঃ—যে বস্তুর সহিত আর এক

বস্তুর যোগক্ষেমাদি এক নহে সেই বস্তুর সহিত এই বস্তুটি অভেদী হইতে পারে না; বিভিন্ন আত্মাও সেইরূপ প্রত্যেকে স্বীয় রূপে প্রতিনিয়ত, ইহাদের প্রত্যেকের যোগক্ষেমাদিও বিভিন্ন, এবং ইহাদের সুখাদি অবস্থার যোগক্ষেমও এক নহে; সুতরাং ব্যাপকের অনুপলব্ধিবশতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মাসকল অভেদী নহে।

মীমাংসক বলিয়াছেন যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইলেও পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় না। তাহার উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন ঃ—

স্বরূপেণৈব লীয়ন্তে যদ্যবস্থাশ্চ পুংসি বঃ।
দুঃখাদ্যপ্যনুভূয়েত তৎসুখাদিসমুদ্ভবে॥ ২৭০ ॥

অর্থাৎ, আপনাদের (=মীমাংসকদের) তথাকথিত অবস্থাগুলি যদি স্বরূপেই আত্মাতে লীন হয় তাহা হইলে সুখাদির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখাদিরও অনুভূতি হওয়া উচিত, কেননা একই উপলব্ধি সুখ ও দুঃখ এই উভয়ের মধ্যেই সামান্য ধর্মরূপে বর্তমান (কমলশীল)।—বৌদ্ধের এই যুক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মীমাংসক বলিয়াছিলেন যে সুখদুঃখাদি বিশেষ ধর্মের পরিবর্তন সত্ত্বেও বস্তু অনন্যই থাকে যদি অস্তিত্বাদি সামান্য ধর্মের পরিবর্তন না ঘটে। কিন্তু সমস্যা হইল, সুখ ও দুঃখকে দুইটি পৃথক বিশেষ ধর্মরূপে গ্রহণ না করিয়া উপলব্ধিরূপ একমাত্র সামান্য ধর্মরূপেও গ্রহণ করা যায়, কারণ সুখ ও দুঃখ উভয়ই হইল উপলব্ধি। এখন, সামান্য ধর্মরূপে উপলব্ধি এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থাতে অনুবৃত্ত হইতে পারে, এবং সুখ ও দুঃখ এই উপলব্ধিরই অঙ্গস্বরূপ হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে প্রতি মুহূর্তে একই সঙ্গে সুখ ও দুঃখ অনুভূত হইতেছে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মীমাংসক যদি বলেন যে সুখাদি স্বরূপে নয়, পররূপেই আত্মাতে বিলীন হয়, তবে তাহার উত্তর ঃ—

ন চান্যরূপসংক্রান্তাবন্যসংক্রান্তিসম্ভবঃ।
তাদাত্ম্যেন চ সংক্রান্তিরিত্যাত্মোদয়বান্ ভবেৎ॥ ২৭১ ॥

এই কারিকাটি আদৌ সুস্পষ্ট নহে, এবং কমলশীলও এটির যথোচিত ব্যাখ্যা করেন নাই। কারিকার দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে যে (তাদাত্ম্যেন) অবস্থা-

সকল যদি স্বরূপেই আত্মাতে সংক্রান্ত হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মাও উৎপত্তিমান্—সুতরাং অনিত্য। কিন্তু সুখাদির পররূপে আত্মাতে বিলীন হওয়ার সহিত এ-কথার কি সম্পর্ক ?

মীমাংসক পূর্বে বলিয়াছিলেন যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব পুরুষের "অবস্থার", উপর নির্ভর করে না (কারিকা ২২৭)। তাহার উত্তরে বৌদ্ধ এখন বলিতেছেন ঃ—

যদি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে নৈবাবস্থাং সমাশ্রিতে।
তদবস্থাবতস্তত্ত্বান্ন কর্তৃত্বাদিসংভবঃ ॥ ২৭২ ॥

অর্থাৎ, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যদি বাস্তবিকই অবস্থার উপর নির্ভর না করে, তাহা হইলে কর্তৃত্বাদি অবস্থাও আত্মার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ যাহার ঐ অবস্থা আছে তাহার পক্ষেই কেবল কর্তৃত্বাদি সম্ভব।—এখানে যুক্তি অপেক্ষা বাক্চাতুর্যই অধিক ; ইহা বুঝিয়াই বোধ হয় কমলশীল কারিকাটির বিশেষ আলোচনা করেন নাই।—ইহার পরেই কমলশীল প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য দিঙ্নাগ ও কুমারিলের মতদ্বন্দ্বের উল্লেখ করিয়াছেন। দিঙ্নাগ বলিয়াছেন ঃ—

বুদ্ধিজন্মনি পুংসশ্চ বিকৃতির্যদ্যনিত্যতা।
অথাবিকৃতিরাত্মাখ্যঃ প্রমাতেতি ন যুজ্যতে ॥

অর্থাৎ, আত্মাতে বুদ্ধির জন্ম ঘটিলেই যে বিকৃতি উপস্থিত হয় তজ্জন্যই যদি আত্মাকে অনিত্য বলা হয়, তবে আত্মাখ্য বিকারবিহীন কোন প্রমাতার অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। ইহার উত্তরে কুমারিল বলিয়াছেন ঃ—

নানিত্যশব্দবাচ্যত্বমাত্মনো বিনিবার্যতে।
বিক্রিয়ামাত্রবাচিত্বাত্তদ্ব্যুচ্ছেদোঽস্য তাবতা ॥

অর্থাৎ, আত্মা যে অনিত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে তাহা অস্বীকার করা হইতেছে না ; কিন্তু এ-কথার অর্থ কেবলমাত্র "বিকার", ইহাতে আত্মার উচ্ছেদ বুঝায় না। কুমারিলের এই কথার বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত এখন বলিতেছেন ঃ—

তন্নিত্যশব্দবাচ্যত্বং নাত্মনো বিনিবার্যতে।
স্বরূপবিক্রিয়াবত্ত্বাদ্ব্যুচ্ছেদস্তস্য বিদ্যতে ॥ ২৭৩ ॥

অর্থাৎ, আত্মাকে যদি লোকে "নিত্য" বলিতেই থাকে তবে তাহা নিবারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে আত্মার যে-হেতু স্বরূপের বিকৃতি ঘটে সেই হেতু আত্মার উচ্ছেদও অবশ্য স্বীকার্য।—আত্মার নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়াও কেন যে বৌদ্ধ আত্মার নিত্যশব্দবাচ্যত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত তাহা কমলশীল বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ক্ষণবিধ্বংসী চৈতন্য আপন উপাদানের সহিত সংসারকালের অন্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এই অর্থে যদি মীমাংসক আত্মাকে নিত্য বলেন তবে বৌদ্ধের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু এই চৈতন্য স্বভাবতঃই যখন স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া থাকে তখন ইহার উচ্ছেদও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মীমাংসক পূর্বে (কারিকা ২২৩) একই সর্পের পরস্পরবিরোধী কুণ্ডলাবস্থা ও ঋজু অবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ এখন বলিতেছেন যে সর্পের দৃষ্টান্ত এখানে আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে ঃ—

সর্পোঽপি ক্ষণভঙ্গিত্বাৎ কৌটিল্যাদীন্ প্রপদ্যতে।
স্থিররূপে তু পুংসীব নাবস্থান্তরসঙ্গতিঃ ॥ ২৭৪ ॥

অর্থাৎ, সর্প যে কুটিলাদি বিবিধ অবস্থা পরিগ্রহণ করিতে পারে তাহার কারণ সর্প ক্ষণবিধ্বংসী ; মীমাংসক কিন্তু আত্মাকে স্থিররূপ বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন, সুতরাং সে আত্মার অবস্থান্তর সম্ভব হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী আরও বলিয়াছেন যে "আমি জানিতেছি"—এই কথা হইতেই এক জ্ঞাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় (কা ২২৯), এবং এই জ্ঞাতাই হইল আত্মা। এই কথার উত্তরে বৌদ্ধের বক্তব্য ঃ—

নিরালম্বন এবায়মহংকারঃ প্রবর্ততে।
অনাদিসত্ত্বদৃগ্বীজপ্রভাবাৎ ক্বচিদেব হি ॥ ২৭৫ ॥

অর্থাৎ, অহংবুদ্ধির যে কোন বাস্তব ভিত্তি আছে তাহা নহে (নিরালম্বন) ; অনাদি সৎকায়দৃষ্টির বীজ (=বাসনা=potency, élan vital) হইতেই

এই অহংবুদ্ধির উৎপত্তি, কিন্তু তাহাও ক্বচিৎ মাত্র উৎপন্ন হয়* ।—কমলশীল কারিকার শেষ কথাটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে ষড়ায়তন শরীরের সহিতই কেবল এই মিথ্যা অহংবুদ্ধির সম্বন্ধ (অধ্যাত্মনিয়ত এব ষড়ায়তনে) ।

এখন এই অনাদি সৎকায়দৃষ্টিই যদি অহংবুদ্ধির কারণ হয় তবে এই অহং-বুদ্ধি সর্বত্রই দেখা যায় না কেন ? তাহার উত্তর ঃ—

কেচিদেব হি সংস্কারাস্তদ্রূপাধ্যবসায়িনি ।
আধিপত্যং প্রপদ্যন্তে তন্ন সর্বত্র বর্ততে ॥ ২৭৬ ॥

অর্থাৎ, কতকগুলি বিশেষ সংস্কারই † কেবল সেই বিশেষ শক্তিটি উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে ; সেইজন্যই সেই বিশেষ রূপ সর্বত্র সম্ভব হইতে পারে না ।—কমলশীল "পঞ্জিকায়" বলিয়াছেন যে "তদ্রূপ" বলিতে এখানে বুঝাইতেছে সেই অহংবুদ্ধি, যদ্দ্বারা পূর্বকালীন ও উত্তরকালীন জ্ঞাতা সমভাবে অভিহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানসন্তান পৃথক্ হইলে আর এই প্রকার অহংবুদ্ধির কথা বলা চলিবে না ।

তুল্যঃ পর্যনুযোগোঽয়মন্যথা পুরুষেঽপি বঃ ।
তচ্ছক্তিভেদসদ্ভাবাৎ সর্বমেব নিরাকুলম্ ॥ ২৭৭ ॥

অর্থাৎ, একথা যদি স্বীকার করা না হয় তবে অনুরূপ আপত্তি মীমাংসকের আত্মা সম্বন্ধেও উত্থাপন করা যাইবে ; কিন্তু বিভিন্ন শক্তির ভেদ স্বীকার করিলে আর কোনপ্রকার আপত্তি উঠিতে পারে না ।—কমলশীল কারিকাটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ—যদি ধরাই যায় যে অহংবুদ্ধির অবলম্বন হইল আত্মা, তাহা হইলেও অনুরূপ আপত্তি করিয়া বলা যাইতে পারিবে, ঐ অহংবুদ্ধি অপর আত্মাতেই (ঘটাদিতে) বা দেখা যায় না কেন ? বৌদ্ধের পক্ষে কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, কারণ বৌদ্ধ সংস্কারের ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ বলিতে পারেন যে আধ্যাত্মিক বস্তু সম্বন্ধেই কেবল অহংবুদ্ধির সংস্কার সম্ভব, ঘটাদি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে নহে ।

---

* সৎকায়-দৃষ্টি=প্রকৃত অস্তিত্ব আছে এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান="belief in a real personality" (Stcherbatsky, Central Conception of Buddhism, p. 51) ।

† "usually means some latent mysterious power which later on reveals itself in some patent fact" (Stcherbatsky, Central Conception, p. 21) ।

ইহা হইতে না হয় বুঝা গেল যে আত্মা অহংবুদ্ধির আশ্রয় হইতে পারে না; কিন্তু অহংবুদ্ধি যে সম্পূর্ণ নিরালম্বন তাহার প্রমাণ কি? ইহারই উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন ঃ—

নিত্যালম্বনপক্ষে তু সর্বাহংকৃতয়স্ততঃ।
সকৃদেব প্রসূয়েরন্ শক্তহেতুব্যবস্থিতেঃ ॥ ২৭৮ ॥
অনিত্যালম্বনত্বেঽপি স্পষ্টাভাঃ স্যুস্ততঃ পরে।
আলম্বনার্থসদ্ভাবং ব্যর্থং পর্যনুযুঞ্জতে ॥ ২৭৯ ॥

অর্থাৎ, অহংবুদ্ধির অবলম্বন যদি নিত্য হয় তাহা হইলে জগতের সর্ববিধ অহংকার একই সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া যাইবে, যেহেতু সমস্ত অহংবুদ্ধিরই সম্যক্ কারণ সর্বদা উপস্থিত রহিয়াছে। আর যদি এই আলম্বন অনিত্য হয় তাহা হইলে প্রত্যেক অহংবুদ্ধি সুস্পষ্ট (স্পষ্টাভাঃ) হওয়া উচিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অহংবুদ্ধির আলম্বনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।—এই কারিকা দুইটি সরল। তথাপি কমলশীল এই সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন ঃ—অহংবুদ্ধি যে এক ও অভিন্ন এ-কথা বলা যায় না, কারণ গাঢ় নিদ্রা, মত্তাবস্থা ও মূর্ছার সময় অহংকারের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, অথচ অন্য সময়ে ইহা বাস্তবিকই অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং অহংবুদ্ধি যে এক নয় বহু তাহা নিশ্চিত; এবং আত্মারূপ নিত্য বস্তু এই অহংবুদ্ধির সম্যক্ কারণ হইলে সমস্ত অহংবুদ্ধিই একসঙ্গে উৎপন্ন হওয়া উচিত—যাহা অবশ্যই অসম্ভব। অপরপক্ষে যদি বলা হয় যে এই আলম্বন অনিত্য তাহা হইলে দৃষ্টি-বিজ্ঞানাদির মত অহংবুদ্ধিও সর্বত্র সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, কারণ সাক্ষাৎ বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই এই প্রকারের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে কুমারিল প্রভৃতি তীর্থিকগণ (heretics) বৃথাই কেবল অহংবুদ্ধির আলম্বনের কথা উত্থাপন করিয়াছেন।

বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন অহংবুদ্ধি নিরালম্বন (without substratum of reality) এবং অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত সৎকায়দৃষ্টির বাসনার* দ্বারা ইহা

* বাসনা=elan vital, "which in the Buddhist system replaces any conscious agent, whether soul or God or even a conscious human being" (Stcherbatsky, pp. 19—20).

ভ্রান্তিপথে পরিচালিত হইতেছে (অনাদিসৎকায়দৃষ্টিবাসনাবলাদ্ভ্রান্তঃ প্রবর্ততে)। কুমারিল কিন্তু ইহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

জ্ঞাতরি প্রত্যভিজ্ঞানং বাসনা কর্তুমর্হতি।
নাতস্মিন্ স ইতি প্রজ্ঞাং ন হ্যসৌ ভ্রান্তিকারণম্॥ ২৮০॥
তন্নাহংপ্রত্যয়ো ভ্রান্তিরিষ্টশ্চেদ্বাধবর্জনাৎ।

অর্থাৎ, বাসনার দ্বারা কেবল জ্ঞাতারই প্রত্যভিজ্ঞান (recognition) সম্ভব, যে বস্তু যাহা নহে সেইরূপে সেই বস্তুর প্রজ্ঞান বাসনার দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না, যেহেতু বাসনাই ভ্রান্তির কারণ নহে ; সুতরাং অহংবুদ্ধি ভ্রান্তি হইতে পারে না, যে-হেতু ইহার বাধক কোন প্রমাণ নাই।—কুমারিলের প্রত্যেক বচনের মত এই বচনেও তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারিলের অস্ত্রাঘাতের পর যে বিজ্ঞানবাদ ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কুমারিলের মতে বাসনা যে কেন ভ্রান্তির কারণ হইতে পারে না তাহা বুঝাইবার জন্য কমলশীল বলিয়াছেন যে বাসনা সর্বত্র যথানুভূত বিষয়ের জ্ঞানই জন্মাইয়া থাকে, ভ্রান্ত জ্ঞান নহে।—কমলশীলের এই কথার মধ্যে মীমাংসা দর্শনের একটি মূল তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মীমাংসকগণ, বিশেষ করিয়া প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মীমাংসকগণ, কোন ক্ষেত্রেই ভ্রান্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে ইহারা বলিবেন শুক্তি প্রকৃতই দৃষ্ট হইতেছে, এবং রজতও পূর্বে প্রকৃতই দৃষ্ট হইয়াছিল—সুতরাং শুক্তির জ্ঞানও সত্য এবং রজতের জ্ঞানও সত্য। কাজেই শুক্তি সম্বন্ধে বা রজত সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। শুক্তির সহিত যে রজতের সম্বন্ধ স্বীকার হইয়াছে সেইটুকুই কেবল ভ্রান্তি। আধুনিক ইউরোপীয় Logic-এর ভাষায় ইহার অর্থ হইল "negation negates neither the subject, nor the predicate but the copula"। যদি কেহ বলে "Gandhi is not honest" তবে এই বাক্যের "not" কথাটি কোন্ বিষয়ের প্রত্যাখ্যান করিতেছে, বুঝিতে হইবে ? অবশ্যই গান্ধীকে নহে ; "honesty"-কেও নহে, কারণ গান্ধী ব্যতিরিক্তও সৎলোক জগতে আছে এবং থাকিবে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে বাক্যস্থ "is" কথাটিই কেবল প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। Negation-এর দ্বারা যে কেবল copula-ই প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের আবিষ্কার ; Aristotle ইহা ধরিতে পারেন নাই। ভারতীয় মীমাংসা দর্শনের কিন্তু ইহা একটি প্রাচীনতম মূলতত্ত্ব, যদিও সংস্কৃত ভাষায় copula-র ব্যবহার না থাকায় ইহা উপলব্ধি করা ভারতীয়ের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

কুমারিলের এ-যুক্তিতেও কিন্তু নিরস্ত না হইয়া বৌদ্ধ বলিতেছেন ঃ—

ঈশ্বরাদিষু ভক্তানাং তদ্ধেতুত্বাদি বিভ্রমাঃ।
বাসনামাত্রভাবাচ্চ জায়ন্তে বিবিধাঃ কথম্ ॥ ২৮২ ॥

নিরালম্বনতা চৈবমহংকারে যদা স্থিতা।
তন্নাহংপ্রত্যয়গ্রাহ্যে জ্ঞাতা কশ্চন বিদ্যতে ॥ ২৮৩ ॥

ততঃ সর্বপ্রমাণেষু ন দৃষ্টান্তোঽস্তি সিদ্ধিভাক্।
হেতবশ্চাশ্রয়াসিদ্ধা যথাযোগমুদাহৃতাঃ ॥ ২৮৪ ॥

অর্থাৎ, কেবল বাসনাই যদি ভ্রান্তির কারণ না হয় তাহা হইলে ঈশ্বরাদি সম্বন্ধে ভক্তদিগের নানাবিধ ভ্রান্তি কিরূপে সম্ভব, যাহা হইতে লোকে ভাবিতে পারে যে ঈশ্বরই সৃষ্টির কারণ ইত্যাদি ?—কমলশীল এইখানে মীমাংসককে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে কুমারিল স্বয়ং ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না (২৮২)।—এইরূপে অহংকারের নিরালম্বনতা যখন প্রতিষ্ঠিত হইল তখন স্বীকার করিতে হইবে যে এমন কোন জ্ঞাতারও অস্তিত্ব নাই যাহা এই অহংপ্রত্যয়ের দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে (২৮৩)।—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন প্রকার প্রমাণেরই সমর্থক কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, এবং যে-সমস্ত হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে সেগুলিরও আশ্রয় (basis, substratum) হইল অসিদ্ধ (২৮৪)।—কমলশীল এই কারিকাত্রয়ের নৈয়ায়িকসুলভ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই। মোট কথা এই যে, মীমাংসকের মতে অহংবুদ্ধির মূলে নিত্য ও বাস্তব কিছু আছে। কিন্তু বৌদ্ধ দেখাইলেন যে অহংবুদ্ধি নিরালম্বন ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং সেই অহংবুদ্ধির বিষয়ীভূত এমন কোন জ্ঞাতাও নাই যাহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে (অহংকারস্য নিরালম্বনত্বান্ন তদ্গ্রাহো জ্ঞাতা কশ্চিৎ প্রসিদ্ধোঽস্তীতি ন তস্মাদাত্মা সিধ্যতীতি)।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

সিখ সম্রাট ও সতীর শাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সিংহজীর ও আমার বুকের উপর যেন পাহাড় ধসিয়া পড়িল। দৈনিক কার্য্য ও আমোদ কিন্তু নিয়মিত চলিতে থাকিল। সেদিন সান্ধ্য মজলিসে কেহই আরাম বোধ করিল না। মালিকের মনের গুপ্ত ভাবনা-ভার তাঁহার ভক্ত সহচরদলের প্রত্যেকের ভিতর যেন অজানিতে প্রবিষ্ট ও বিভক্ত হইয়া, সকলকার মন ভারাক্রান্ত করিয়া দিল। সারাদিন ভয়ানক বর্ষা গিয়াছে। এক্ষণে গুড়ুনি গুড়ুনি বৃষ্টি হইতেছে। অসহ্য গুমট্। শত শত হাত-পাখা, টানা পাঙ্খা, মোরছল্ চলিতেছে, গোলাপজল মুহুর্মুহু ছড়ানো হইতেছে ; বরফ দেওয়া কেওড়া, বেদমুশ্ক্, সৌঁফী "উড়িতেছে",—সব বৃথা। নকীবদের একঘেয়ে ডাক এবং বাইজীর তান ও সঙ্গৎ ছাপাইয়া বাহিরের ঝিল্লিরব ও ভেকের কলরব মজলিস্ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সিংহজীর দক্ষিণে গালে-হাত দিয়া কুঁয়র আসীন। ঠিক পশ্চাতে উজীর সাহেব "দোজানু" হইয়া উপবিষ্ট। তাঁহার আড়ালে আমি চোগার আস্তিনে লুকানো চিরকুটে সেদিনকার বাদামের খরচ গোপনে টুকিয়া লইতেছি। অবসর বুঝিয়া উজীর সাহেব কুঁয়রকে আরজ করিলেন, "টিক্কাজী, বর্ষার উপদ্রবে ঘায়েল হ'য়ে পড়া গেছে। শ্রীসরকার ও আমাদের, হুজুরের উদ্যান-বেহেস্তে কিছুদিনের জন্য লইয়া চলুন না।" কুঁয়র তৎক্ষণাৎ পিতাকে সদলে তাহার বিখ্যাত উপবন ও বারাদার প্রাসাদে চরণধুলি দানের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন। পিতা আনন্দের সহিত স্বীকার করিলেন। দেউড়িওয়ালা, সিংহজীর আজ্ঞায়, ঘোষণা করিল যে কল্য সুচেত্ দরবার সাঙ্গ করিয়া খালসাজী টিক্কা সাহেবের বাগ্‌ভবনে দর্শন দিবেন।

এই বিস্তীর্ণ বাগান ও বাগান্-বাড়ি কুঁয়রের বড় আদরের জিনিষ ছিল। দেশী ও বিলাতী বাগবান্ (gardener) রাখিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমাবেশে, এ সুখ-কানন বানাইয়াছিলেন। বাদশাহী সময়ের নহর নকল প্রপাত, ফোয়ারা, "সাওন-ভাঙ্গা" যাহা কিছু উদ্যানে অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় ছিল,

সমস্ত সুচারুরূপে মেরামৎ করাইয়াছিলেন। দুই তিন শত মালী ও মেয়ে-পুরুষ মজুর সর্ব্বদা বাগানে কাজ করিত।

কুঁয়র পিতাকে নিজের খাস দেওয়ানখানা ও মহলের অংশ ছাড়িয়া দিলেন। জীন্দাঁ (কুঁয়রাণী সহিত) ও অন্য মহিষীরা, যে আঠারীতে কুঁয়রাণী আগে থাকিতেন, সেখানে পৃথক পৃথক গৃহ দখল করিলেন।

প্রাতে কুঁয়র উদ্যান ভ্রমণ করিত। সিংহজী সুচেৎ দরবার সাঙ্গ করিয়া যখন গুরুদোয়ারায় যাইবার জন্য উঠিতেন, তখন কুঁয়র পিতার সঙ্গ লইত।

কুঁয়রের উঁচু নজর ও সুরুচি, তাহার পছন্দের বস্তুর বিশুদ্ধ উৎকৃষ্টতায় ও সুচারুতায় বুঝা যাইত। যেমন, ধরো গায়কদের "চৌকী"। রাত্র তৃতীয়প্রহর হইতেই সিংহজীর শয্যাপার্শ্বে "আসা-দী-ওয়ার"* আরম্ভ হয়। চাবী ঘোরানো, কলের গানের মত। গানে প্রাণ নাই। কুঁয়রের এখানে কিন্তু যেই তাহার চৌকী "বলিহার তেরো নাম কী" ধরিল, সিংহজী আর উপস্থিত আমরা সকলে স্থির অচল হইয়া গেলাম। পেশ্‌কারের কাগজ হাতেই রহিল; সিংহজীর ইরশাদ্‌ মুখেই রহিল; আমি সিংহজীকে ধরিয়া খাট হইতে নামাইতেছিলাম, ধরিয়াই রহিলাম; গঙ্গাজলের কলস লইয়া একজন গোলী কামরায় ঢুকিতেছিল, সে মাথায় ঘড়া লইয়া দরজাতেই দাঁড়াইয়া রহিল। শবদ-কীর্ত্তনের শেষ পর্য্যন্ত সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। সিংহজীর স্নান, পূজাদিতে দেরী হইয়া গেল। যাহা তাঁহার কর্ম্মযোগের প্রধান অঙ্গ—ঠিক সময় নিয়মমতো সব কাজ করা, এক চুলও ব্যতিক্রম হইতে না দেওয়া—এ বজ্রদৃঢ় নিয়মও অজ্ঞাতসারে টলিল। মন্দিরে ও গুরুদোয়ারায় যাহারা সিংহজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা এ অভূতপূর্ব্ব বিলম্ব দেখিয়া এতদূর চিন্তান্বিত হইল যে অনেকে একক্রোশ আগাইয়া, ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। সিংহজী বলিয়া পাঠাইলেন, আজ বাড়িতেই নিত্যকর্ম্ম শবদ শুনিতে শুনিতে সমাধা করিব।

কুঁয়র আসিলে প্রশ্ন করিলেন, "ওরে, তোর এ আশ্চর্য্য চৌকী পাইলি কোথায়? আমায় দে না।" কুঁয়র কহিল, "বাপ্পুজী, এ আমার সৎ-গুরু-পরসাদ্! এ ভজনমণ্ডলী বহুদিনে, বহুকষ্টে তৈয়ার করেছি। গায়ক দুজনই

* অকাল পুরুষের প্রভাতী স্তব, গ্রন্থসাহেবের "শবদ" শ্রীমুখ-বাক-রচিত। এ সমস্ত বন্দনা ও প্রার্থনার ভজনগুলি, আসা, আসাবরী, যোগ, যোগিয়া, টোড়ি, ভৈরবী, ভয়রোঁতে রচিত।

লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান্। পাখওয়াজী, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। রবাবী, কাবুলের ক্ষেত্রী যুবক। পথের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছি। পেশাওরের বাজারে রবাব্ বাজিয়ে ভিক্ষে কচ্ছিল। তাউস-ওয়ালা সিখ; অমৃতসরের পেশাদার ওস্তাদ।”

সব কাজ ফেলিয়া, পেশকার সাহেবের বিরক্তি লক্ষ্য করিয়াও সিংহজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করিতে লাগিলেন, ভজন চলিতে থাকিল। খাস্ হজুরী অন্তরঙ্গ ছাড়া, আর সবাই যে-যার কাজে চলিয়া গেল। কুঁয়র আবার বাগানে বেড়াইতে গেলেন।

এরূপ একঘণ্টা আন্দাজ কাটিয়াছে। এইমাত্র সূর্য্য উদয় হইয়াছে, ঘন মেঘের ফাঁকে। হর-সিঙ্গারের ঘ্রাণে, হরিকীর্ত্তন গানে, কোয়েল দোয়েল শ্যামার তানে, ঘর বাহির সমস্ত ভরপূর। আকাশে রামধনু! যাকে হিন্দি কবিরা বলে-“সমাবঁধ্[১] গেয়া”, এ তাই।

এমন সময়, সিংহজীর পশ্চাতে, অন্দরমহলের দিকের পরদা তুলিয়া মলিন বেশ, ধূলা-মাখা, দেবকন্যার ন্যায় সুন্দর, একটি মেয়ের হাত ধরিয়া কুঁয়র ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল। একেবারে পিতার পদতলে, যুবতীকে লইয়া বসিয়া পড়িল। সজলকণ্ঠে “বাপ্পুজী” বলিতেই, সিংহজী নয়ন মেলিলেন। যেন স্বয়ং বিধাতার হাতের যোড় মিলানো, এই অতুল যুগলরূপ হঠাৎ দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কুঁয়র, বাষ্পরুদ্ধস্বরে প্রার্থনা করিল, “বাপ্পুজী বধূকে, এ অধমসন্তানের পরিণীতা স্ত্রীকে, গ্রহণ করতে আজ্ঞা হোক।” ইহা শুনিবামাত্র আমি ছাড়া সকলে সসম্ভ্রমে বাহির হইয়া গেল। বধূ মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। সিংহজী, শশব্যস্ত হইয়া, উহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। আমি মুখে মাথায় গোলাপজল ছিটাইতে লাগিলাম। কুঁয়র ক্ষিপ্তের মত ছুটাছুটি ও হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল—“বুলা ফকীর[২] সাব! সদ্দ[৩] হকীম!” এই পায়ে-কাদা, কাপড়ে গর্দা, শুষ্ক মুখ, সংজ্ঞাহীন দেবীমূর্ত্তিটীকে দেখিলে পাথরও মায়ায় গলিয়া যাইত।

কিছুক্ষণে জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার লক্ষণ দেখা দিল। সিংহজী বালিকার

---

১ চির-চলন্ত সময়ের একটি এমনি অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত, যে চেতনার মধ্যে চির-আবদ্ধ হইয়া রহিল।

২ আজীজুদ্দীন সৈয়দ ছিলেন। সৈয়দদের মীর সাহেব, ফকীর সাহেব বা শাহসাহেব বলে।

৩ সদ্দনা=ডাকা।

কপালে সস্নেহে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকী,* এখন সামলেছিস ?" মেয়েটি নড়িয়া উঠিলেন। সিংহজী মৃদুস্বরে আজ্ঞা দিলেন, "উঠিসনে, চুপচাপ পড়ে থাক।" নবীনা কিন্তু ক্রোড় ছাড়িয়া, টুকটুকে ছোট্ট হাত দুখানি জোড় করিয়া, সমুখে দাঁড়াইলেন। অদ্ভুত মনের জোরে ভয় ও কুণ্ঠা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা তুচ্ছ করিয়া, দুটিমাত্র কথা উচ্চারণ করিলেন, "ম্যয়ন্ হুকুম্।" দুটিমাত্র কথা কিন্তু যেন সারিঙ্গিতে কে এমন সুর দিল যাহার ঝঙ্কার আর থামিল না। দুটিমাত্র কথা কিন্তু এক গণ্ডুষ জলে সমস্ত জলধি, একটি লাখে এক, প্রভাময়ী প্রতিভাশালিনী ললনার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ভরসা। আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় হইতে লাগিল। কুঁয়রের কপাল হইতে দর্‌দর্ ঘাম ঝরিতে লাগিল। 'আমার প্রতি কি আজ্ঞা ?' উত্তর দিবার পূর্ব্বে সিংহজী তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেয়েটির মুখের উপর স্থাপন করিলেন। সিংহজীর মুখ দেখিয়া লোক চিনিবার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁহার যত পারিষদ, অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ, সকলকে তিনি শুধু তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া রাখিয়াছেন। হীন অবস্থা হইতে তুলিয়া ক্রমে উচ্চতম পদে বসাইয়াছেন। তাঁহার যাচাই কখনও ভুল হয় নাই। সেই দৃষ্টির সম্মুখে মেয়েটির মৃগনেত্র নত হইল। কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া থাকিয়া সিংহজী কহিলেন, "তোমাকে আমি চক্ষের উপর (সির-মথাতে) করে নেবো।" আমার কানে কানে কহিলেন, "এ দেখছি সিংহের উপযুক্ত সিংহী। এর হাতে ছোঁড়াটা মানুষ হয়ে যাবে।" কুঁয়র অমনি নূতন কুঁয়রাণীকে লইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। কুঁয়রের চেহারা হইতে যেন আনন্দ ঠিকরাইয়া বাহির হইতে লাগিল। বধূমাই এখন প্রার্থনা করিলেন, "তবে আমার পিতাকে ডাকিয়া পাঠানো হোক। তিনি সদর দেউড়িতে অপেক্ষা করছেন।" সিংহজী কুঁয়রকে আদেশ করিলেন; সে ছুটিয়া গিয়া একটি সাদাসিধা গ্রাম্য জাট ভদ্রলোককে যথোচিত সমাদরের সহিত সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। সিংহজী অপরিচিত বৈবাহিককে, অনেকদিন বিচ্ছেদের পর মিলন হইলে পরম আত্মীয় বন্ধুকে যেরূপ লোকে আদর করে, সেরূপ অভ্যর্থনা করিলেন। কোলাকুলি করিয়া নিজের পাশে হাত ধরিয়া বসাইলেন। একজন সাধারণ চাষী যে সব প্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারে, সেই সব বিষয় লইয়া

* খুকি।

মহা উল্লাসে গল্প করিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতেও এ নূতন কুটুম্ব-লাভের রহস্য জানিতে প্রয়াস পাইলেন না। অন্তরঙ্গ দরবারীদের ডাকাইলেন। তাহাদের সহিত বেহাইয়ের আলাপ করাইয়া দিলেন। তাহারা বহু-রাণীকে নজর পেশ করিল। তারপর বধূকে কুঁয়রের সহিত অন্দরে পাঠাইয়া দিলেন। আমার দ্বারা অন্দরে হুকুম পাঠাইলেন, যেন নববধূকে রাজকন্যার উপযুক্ত সম্মান এবং আদরের সহিত, পূরা দস্তুরে বরণ করা হয়। বৈবাহিককে রাজখেলাত দিয়া আরাম করাইতে পাঠাইলেন। তাহার থাকিবার জন্য একটা মহল ঠিক করা হইল। কামরার দ্বার পর্য্যন্ত "রাখিতে" গেলেন। কহিলেন, "ভাইজী এখন বাড়ি ফিরতে দিচ্ছি না। রাজকীয় আদবকায়দা আর বাঁধাবাঁধির হাঙ্গামে বড় কষ্ট পাচ্ছি। আমরা আসলে পাড়াগেঁয়ে কৃষাণ মানুষ। তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে যেন কতকাল বিদেশে ফাঁকা গোলমাল, অবিরাম ছুটাছুটিতে কাটিয়ে, নিজের নিভৃত ছায়াশীতল কুটির-প্রাঙ্গণে ফিরে এসেছি।" সিংহজীর প্রাণের ভিতর হইতে একথা বাহির হইয়াছিল, এই কারণে তাঁহার বাক্যের এক একটি বর্ণ আমার মনে আছে। সেদিনকার সমস্ত অভাবনীয় ঘটনা আমার এমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে মনে আছে যেন আজই সব ঘটিয়াছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এ অভিনব সংবাদ দীনানগরে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। রাজমণ্ডলে মহা আন্দোলন উত্থিত হইল। এত রকম হাটে বাজারে, ঘরে ঘরে গুজব রটিল যে কী বলি। সমস্ত হুজুগের তথ্য দুই উদাহরণেই বুঝিতে পারিবে। (১) রাত্রে বাড়ি যাইতেই সহধর্ম্মিণী (তিনি সদর দেউড়িতে অপেক্ষা করিতেছিলেন) পুছিলেন, "হ্যাঁ গা সত্যি কি আজ অষ্টভূজা মাতার কৃপায় এক মহাবিদ্যা পূজার সময় শ্রীসরকারের সুমুখে আকাশ থেকে বিজলীর চমকে নেমে এসেছেন, আর মাতাজী টিক্কার সঙ্গে এঁর বিয়ে দিতে আদেশ করেছেন?" আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করায় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বৃষ্টি হইতে লাগিল—মেয়েটী কে? বাপ কে? কী করে বিয়ে হল? কোত্থেকে এলো? ইত্যাদি ইত্যাদি। "আমি কিছু জানি না" বলায়—"যাও, তোমরা আমাদের কিছু বলো না" রুষ্টস্বরে উচ্চারণ করিয়া, মান করিয়া রহিলেন। (২) জীন্দাঁ মাইর কারদার জোয়াহির সিংহ দুপুর রাত্রে বাড়িতে চড়াও করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফরমাইলেন "আসল খবর

আপনিই দিতে পারেন। সত্য কি এই মেয়েটি কাবুলের রাজ্যচ্যুত আমীরের কন্যা? আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ নাকি সামান্য জাট সেজে শাহজাদীকে জাটনী সাজিয়ে, হঠাৎ দরবারে উপস্থিত হয়েছে? টিক্কার সঙ্গে খাতুনের নিকা হয়ে গেলে, শ্রীসরকার বৈবাহিককে রাজ্য উদ্ধার করে দেবেন?"

যাহা হউক পরদিন রাত্রে যখন সিংহজী উজীর সাহেবের সহিত নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে গল্প করিতেছেন, কুঁয়র আরজ করিল যে সব আত্মীয় ও অমাত্যদের তলব করা হোক, সে সকলকার সাক্ষাতে তাহার এ গুপ্ত বিবাহ-ব্যাপার খুলিয়া বলিবে। সিংহজী খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। আচম্বিতে পিতার চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া এক অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে কুঁয়র বলিয়া উঠিলেন, "তুমি* মানুষ নও, দেবতা। এখন ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছি, কেন তুমি শুধু দেশের রাজা নও, তুমি প্রত্যেক দেশবাসীর প্রাণের রাজা। তুমি তোমার এক চক্ষুর এক কটাক্ষে বুঝে নিলে যে আমি তোমার যোগ্য বধূ এনেছি, আর তাকে বুকে তুলে নিলে।" সিংহজী তাহার মুখ হাত দিয়া চাপিয়া বন্ধ করিলেন, "থাম্ তোর ব্যাখ্যান। দেখ্‌ছি ছোট কুঁয়রাণী এসে বদমায়শের দুবছরের বোজা মুখ ফুটিয়াছে!"

সকলে হাজির হইলে কুঁয়র যাহা শুনাইল তাহার সংক্ষিপ্তসার এই। বৈকালের সময় বেয়াসের ধারে ধারে মুরগীর সন্ধানে, শিকারী বাজ হস্তে তাজী কুকুর পশ্চাতে, ঘুরিতে ঘুরিতে একটি বন-হাঁস দেখিতে পাইয়া তাহার উপর বাজ ছাড়িল। অমনি এক কালো আঁধি উঠিল। ঘটনাক্রমে শিকারশুদ্ধ শিকারি পক্ষী একদল গ্রাম্য মেয়ের মধ্যে আকাশ হইতে উল্কার মতন পতিত হইল। ডালকুত্তাটাও তীরবেগে মহিলাদের মাঝখানে শিকারের উপর গিয়া পড়িল। তাহারা জল লইতে আসিয়াছিল। বেচারিরা চমকাইয়া ভয়ে দিশহারা হইয়া গেল। বাজ্‌বহিরী ছোঁ মারিলে কপোতের ঝাঁক্ যেমন প্রাণভয়ে ছিটাইয়া পড়ে, পল্লীবালারা তেমনি চীৎকার করিতে করিতে চরময় ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের মাথার উপর হইতে মাটির জলপূর্ণ মট্‌কা পড়িয়া চুরমার হইল, পিত্তলের কলস গড়াইতে লাগিল। কত জনের ওড়না উড়িয়া

---

* পাঞ্জাবী ভাষায় "আপ" (আপনি) শব্দ নাই। কেবল "তুসী" (তুমি) আর "তু" (তুই)। আজকাল কথাবার্ত্তায় কেহ কেহ "আপ" ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

গেল। কুঁয়র দৌড়াইয়া গিয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিবার জন্য "ভয় নাই ভয় নাই" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে শুনে? আঁধি এখন ঝুপ করিয়া পুরোদস্তুর নামিল, দশদিক অন্ধকার হইল। কেবল একটি যুবতী কিছুমাত্র ভয় পায় নাই। সে দাঁড়াইয়াছিল। সঙ্গিনীদের "তোরা কি পাগল হলি" বলিয়া তিরস্কার করিতেছিল, ও এক একজনের নাম করিয়া ডাকিতেছিল, "ওরে আমার শব্দ ধরে এদিকে আয়।" কুঁয়র একটু পূর্ব্বে তাহার নিকটস্থ হইবামাত্র (তখনও আলো ছিল) ইহার দিকে সদর্পে ফিরিয়া, নিজের কণ্ঠবীণা সপ্তমে চড়াইয়া, ঝঙ্কার দিয়াছিল, "তোমার দেখছি পাঁচ হাত দেহ—এতে ওয়াহ গুরু একটু আক্কেল দেয়নি? তুমি টিক্কাসাহেবের লোক বোধহয় তবুও এত ব্যাকুফ!" দেখিতে দেখিতে ফর্সা হইয়া আসিল। মেয়েরা সকলে আলুখালু বেশে তাহার পিছনে একে দুইয়ে আসিয়া জড়ো হইল। কুঁয়র দেখল সুন্দরীর অপেক্ষা তার সব সখীরা প্রায় বয়সে বড়, তথাপি তাহারা সকলে ইহার দ্বারাই চালিতা। ইহার সান্নিধ্যে সাহস পাইয়া কুঁয়রকে সকলে হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। "তোরা কি আগে কখনও সেপাই-শিকারী দেখিসনি"? নেত্রীর নিকট বকুনি খাইয়া, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘড়া ও চাদর কুড়াইয়া আনিতে চলিল। বালা তাহাদের বারণ বরিয়া কুঁয়রকে হুকুম করিল, "যাও! লজ্জা করছে না? তোমার বাজ্ আমার হাতে দিয়ে এদের দোপাট্টা ও কলসি তুমি জড়ো করে এনে দাও"। কুঁয়র তাহাই করিল। মহিমাময়ী মেয়েটি সেই বাঘের-দোসর কুকুরের মাথার উপর হেলায় পা রাখিতেই সে লেজ নাড়িয়া পদপ্রান্তে এলাইয়া পড়িয়াছিল। গরিব কুঁয়রের কুকুরটার সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা হইল। এই কয় মুহূর্ত্তে কুঁয়র ঐ দেবীর এমন ভক্ত হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার পূজায় নিজের প্রাণ বলি দিতে পাইলে যেন তাহার জীবনটা সার্থক হয়। কুঁয়র পরে আমাকে বলিয়াছিল যে জেব-ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়াছিল, সবশুদ্ধ এই কাণ্ডটি ঘটিতে দশ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার মধ্যে পাঁচ ছয় মিনিট আবার সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিন্তু এই অত্যল্প সময়ে, ললনার সূক্ষ্ম শরীর, কুঁয়রের দেহের ও অন্তরাত্মার প্রত্যেক অণু পরমাণু ভেদ করিয়া এমন চিরস্থায়ীভাবে বাহিরে ভিতরে দখল করিয়া গিয়াছিল যে তাহার নিশ্চয় বোধ হইতেছিল

বামা চক্ষের আড়াল হইবামাত্র তাহার সমস্ত শক্তি ও চেতনা লোপ পাইবে।

দেখ, তুমি বালক তো বুঝিবেই না। হাজারের মধ্যে নয়শ নিরানব্বই মানুষ এ রকম দেখিবামাত্র একেবারে আত্মহারা, সম্পূর্ণ-তন্ময় আমিত্ব-শোষক প্রেম যে কি জিনিষ, কল্পনাও করিতে পারিবে না। শেরসিংহের* মত যদি দ্বিগুণ সিংহ-প্রবর কেহ হয়, সেই এই প্রকার ভালবাসা উপলব্ধি করিতে পারিবে। এ প্রেম সৎ-গুরু-প্রসাদ! এ প্রেম রাধাজীর ছিল। এ প্রেম নহিলে ভক্ত ভগবানে লীন হয় না।

মেয়েরা যখন গ্রাম অভিমুখে চলিল তখন কুঁয়র বিনীতভাবে কহিল, "আমি বড় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েছি। আমিও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের গাঁয়ে যাব।" কুঁয়র যথাসাধ্য নিজেকে উদ্বেগশূন্য দেখাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার আরাধ্যার দৃষ্টি এড়াইল না। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কুঁয়রের দিকে চাহিয়া একটু ফীকে হাসি হাসিল। কুঁয়র মেয়েটির বাড়ি অবধি গেল। নিজেকে টিক্কা সাহেবের শিকার বিভাগের দারোগা বলিয়া পরিচয় দিল। কুঁয়রের ডেরা গত সন্ধ্যায় ক্রোশখানেকের মধ্যে পড়িয়াছে সকলে জানিত। কুঁয়রের এ অজ্ পাড়া গাঁ অঞ্চলে আগে কখনও আসা হয় নাই, এখানে কেহ তাহাকে চিনিত না। মেয়েটির বৃদ্ধ পিতা আর মাতা দুজনেই তাহার সাদর অভ্যর্থনা করিল, আর কন্যাকে খাটিয়া পাতিয়া দিয়া যাইতে ডাকিল। কন্যার নাম কৌলাঁ (কমলা)। দশ বারো জন প্রতিবাসী নিমেষে আসিয়া কুঁয়রকে ঘেরিয়া বসিল। † এ এলাকার সকলকারই বীরের মত শরীর, উজ্জ্বল বর্ণ, সুন্দর চেহারা, যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্য ব্যবসা। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কুঁয়রকে যে সামান্য শিকারী বেশেও বক মধ্যে হংস দেখাইতেছিল, ইহা নিশ্চয়। কর্ত্রী ও কন্যা কুঁয়রকে, ও অন্য যাহাদের ইচ্ছা হইল, বাটি বাটি লস্যি‡ ও খরমুজ§ খাওয়াইল।

---

* "শের" অর্থাৎ সিংহ। সিংহ raised to the second power.

† এ দেশ রাবী ও বেয়াস্ নদীদ্বয়ের মধ্যে। ইহাকে দেশের লোকে "মাঝা" বলে। বিদেশীরা "বারী দো আব" বলে। এ দেশে প্রায় সবাই ফর্সা, সবাই ঢ্যাঙা, ও সকলকার গঠন বলিষ্ঠ ও সুন্দর। মাটিতে এদেশে কেহ সচরাচর বসে না বা শোয় না—খাটিয়ায়।

‡ মাখন-শুদ্ধ মাঠটা।　　§ এখানকার খরমুজ (খরবুজা) সরদার মত সরস, মিষ্ট ও সুস্বাদু হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যে গল্প বলিয়া, বয়েত্ গাহিয়া কুঁয়র আসর জমাইয়া তুলিল। স্থানীয় ধর্ম্মশালার জন্য, আর কলসি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুইটি টাকা দিল। দীপ জ্বালা হইলে, বাড়ির গ্রন্থ সাহেবের যখন আরতি হইল, তখন কুঁয়রই স্তবগানের নেতা হইল। তাহার বক্ষ নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। মেয়েদের মধ্যে সে দেখিল, কমলার নয়ন মুদ্রিত, দেহলতা অল্প দুলিতেছে, রক্তিম কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। উপাসনা শেষ হইলে, অনেক দূরে যাইতে হইবে, অচেনা জায়গা, বলিয়া কুঁয়র বিদায় চাহিল। অনেকে পৌঁছাইয়া আসিতে প্রস্তুত হইল; কুঁয়র জ্যোৎস্নারাত্র, পথ প্রদর্শকের দরকার নাই, কহিয়া, কাহাকেও সঙ্গে লইল না। আসিবার সময় সকলে কাল আবার আসিতে বারবার অনুরোধ করিল।. কমলা গম্ভীর বিমর্ষ মুখে, একটি ছোট ভগ্নীর সহিত, গ্রামের ফটক পর্য্যন্ত চেরাগ হস্তে আসিল। "জী ম্যয়নু বখ্শনা; দরবা দে কান্তঃ ম্যয় বড়ী বধী কী কীতীসী", "মহাশয় আমাকে ক্ষমা করবেন, নদীতটে বড় বাড়াবাড়ি করেছিলুম", বলিয়া ত্রস্ত চরণে ফিরিয়া গেল। কুকুরটা একবার ছুটিয়া কমলার কাছে ফিরিয়া যায় একবার প্রভুর পিছু পিছু চলে; যতক্ষণ না গ্রাম অদৃশ্য হইল এরূপ করিল। শায়েস্তা ঘোড়ী, প্রভুর অনুগমন করিতেছিল। এতক্ষণে তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, কুঁয়র তাহার উপর, কিছুদূর গিয়া, সওয়ার হইল।

মাটির উপর কি হাওয়ার উপর চলিতেছে—তাহার জ্ঞান ছিল না। চন্দ্রমার টানে সাগর যেমন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, কমলের গম্ভীর মুখ মনে করিয়া কুঁয়রের প্রাণ তেমনি দুলিয়া ফুঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। কুঁয়র কতবার আমাকে বলিয়াছে যে তখন যদি সে হঠাৎ চিরকালের জন্য দৃষ্টিহীন হইয়া যাইত, তবুও সে সেই দেবী প্রতিমা, সারাজীবন তেমনি সুস্পষ্ট দেখিতে থাকিত। কুঁয়রই আমাকে বলিত যে, বেলা ৪টা আর সন্ধ্যা ৮টা, এই সওয়া প্রহর সময়ের মধ্যে সে অনুভব করিল যে তাহার পূর্ব্বের জীবন এত দিন অসাড় ছিল, এখন নূতন চেতনা প্রাপ্ত হইল। এখন যেন তার প্রাণের সুর অনহদ্ সুরের সহিত মিলিয়া গেল। তাহার নূতন দৃষ্টিতে, কিছু আর সামান্য, অকিঞ্চিৎকর দেখাইল না, সমস্তই অপূর্ব্ব সুন্দর, গৌরবময়, আনন্দ-উজ্জ্বল। সংসারের কান্নাহাসি সব একই জিনিষ—একই মঙ্গল—

উচ্ছ্বাসের রূপান্তর মাত্র—তাহার বোধ হইতে লাগিল। আমি এ সব প্রলাপের অর্থ বুঝি না, তবে কুঁয়রের তখনকার মনের অবস্থা জানাবার জন্য তোমাকে বলিলাম।

ডেরাতে পৌঁছিয়া, প্রভাতে ছাউনি ভাঙ্গিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে হুকুম দিল। সবাই ভোরের সময় কুচ করিলে, বৃক্ষতলে অশ্বিনী সহিত কুঁয়র আশ্রয় লইল। তাহার ত্বর্ সহিতেছিল না, অতএব ঠিক-দুপুরেই দেবী দর্শন মানসে যাত্রা করিল। সেই চিরস্মরণীয় স্থানটিতে পৌঁছিয়া, অশ্বিনীটিকে দূরে খেয়াঘাটের পত্তনিদারের জিম্মায়, যথেষ্ট অর্থ দিয়া, রাখিয়া আসিল। তারপর চরের উপর পায়চারি করিতে করিতে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার বোধ হয় সেই কাঠ-ফাটা মধ্যাহ্ন রৌদ্রটা সুধাংশু-কিরণ বোধ হইতেছিল, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম প্রেমিককেও বাদ দেয় না। কিছুদিন আগে কুঁয়র তরাই দেশে ব্যাঘ্র শিকারে গিয়াছিলেন। সেখানকার মারাত্মক "আউল" বিষাসক্ত হওয়ায় রাত্রদিন ঘুরিতেন। সেই ভয়ানক হলাহল, প্রচণ্ড রৌদ্র উত্তাপে, সমস্ত রাত্র জাগরণ ও হিম সেবনের পর, বিষম জ্বর আনয়ন করিল। যখন সহেলী-গণ সহিত কমলা সেখানে আসিল, তখন কুঁয়র বালির উপর গড়াইয়া গড়াইয়া কোনপ্রকারে তাহার সম্মুখে গিয়া, তাহার মুখের দিকে জবাফুল চক্ষু তুলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। অন্য সকলে কলরব করিয়া উঠিল—'ওরে মাতাল, আরে মদ্ খেয়ে মরেছে! অ্যাঁ, কাল দেখলুম এমন ভক্তসজ্জন, আর আজ এই দশা! আ মরি মরি, কী রূপ! (আমি এ সব বৃত্তান্ত পরে বৌরাণী কমলা দেবীর মুখে শুনিয়াছিলাম।) কমলা কিন্তু স্থির গম্ভীরভাবে কুঁয়রের মাথার কাছে বসিয়া পড়িল। তাহার কপালে হাত দিয়া প্রকৃত অবস্থা পলকে হৃদয়ঙ্গম করিল। সকাতরে সখীদের সাহায্য করিতে কহিয়া, কুঁয়রের মস্তক হইতে ক্ষিপ্রহস্তে সাফা, পাগড়ি ও তাহার নীচের ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিল। দুই তিন জনের মদদে গাত্র হইতে আংরাক্ষী, জিরাহ,* মোচন করিল। ঘড়া করিয়া মাথার উপর জলের ধারা ছাড়িল। কিছু পরে কুঁয়রের অল্প জ্ঞান হইল। রাজ-ভোগে-লালিত যুবরাজ, একা অসহায় অবস্থায় দহ্যমান

---

* ইস্পাতের তারের সূক্ষ্ম বুনানের জামা।

বালুতটের উপর অসহ্য যন্ত্রণা পাইতেছিল। শুশ্রূষায় তাহার বড় আরাম বোধ হইল, নেত্র দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কমলা ওড়না দিয়া কুঁয়রের দেশ-বিদেশ প্রসিদ্ধ দীর্ঘ রেশমবৎ কেশ পুঁছাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাইজী,* তুসি মেরে সহারে টুর সকোগে? আমার উপর ভর দিয়া কি চলিতে পারিবেন?' কুঁয়র সে কষ্টের মধ্যেও উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আহো জী, ম্যয়নু ল্যয় চল্লো। আজ্ঞা হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে চলুন।" তখন সকলে মিলিয়া কুঁয়রকে খাড়া করিল ও এক পা এক পা করিয়া প্রায় বহন করিয়া লইয়া চলিল। †

ফিরিতে এত বিলম্ব দেখিয়া কমলার পিতা ও অন্য মেয়েদের চার পাঁচজন অভিভাবক নদীর দিকে আসিতেছিল। কমলার মুখে সমস্ত শুনিয়া, তাহারা একখানি খাটিয়া আনাইয়া কুঁয়রকে দলসিংহের (কমলার পিতার নাম) বাটি লইয়া গেল। সারারাত ঐ ধার্ম্মিক পরিবারের সকলে এই প্রায়-আগন্তুকের অকাতরে সেবা করিল। প্রভাতে জ্বরের তেজ ও অঘোর ভাব কমিল। কুঁয়র আশ্চর্য্য মানুষ। তাহার নিকট এখন কমলার সামীপ্য ও কমলার মধ্যে মধ্যে দরশনের তুলনায়, লাহোরের তখৎ কি, পৃথিবীর সব কিছুই, তুচ্ছ! সে চিন্তা করিয়া এক্ষণে কি করিবে মনে মনে স্থির করিল। দলসিংহকে বিনা ভূমিকায় কহিল, "ভাইজী, আমি টিক্কা।" সে বলিল, "আমি তাই সন্দেহ করছিলুম। তুমি পরশু চলে গেলে সবাই বলতে লাগল, আমাদের টিক্কাসাহেব ছাড়া এমন জোয়ান, এমন রূপবান আর এমন মধুরভাষী যে এ রাজ্যে আছে তা জানতুম না।" কুঁয়র কহিল, "আমি কোন গভীর কারণে অজ্ঞাতবাসে আছি। আমি যে কে, আর এখানে আছি, এ যেন কেউ টের না পায়। গ্রন্থসাহেবের উপরকার একটি ফুল আনো।" কুঁয়র পুষ্পটি মাথায় ঠেকাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল, আর ইহা স্পর্শ করিয়া দলসিংহকে শপথ করাইল যে সে তাহার কথা রাখিবে। কুঁয়র কি যাদু জানিত। তাহার অযথা অনুরোধও কেহ এড়াইতে পারিত না। দলসিংহ একমাত্র সর্ত্ত করিল। যদি কুঁয়রের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখে, তাহা

---

* সিখেরা "ভাইজী" বলিয়া সবাইকে সম্বোধন করে।

† মাঝার মেয়েরা গৌরবর্ণের, মুখের সুন্দর গঠনের ও বলের জন্য বিখ্যাত।

হইলে দরবারে নিজে গিয়া এত্তেলা করিবে। কমলা পাশতলার কাছে দাঁড়াইয়া-ছিল। কুঁয়রের পরিচয় শুনিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কুঁয়র দেখিল।

তিন চার সপ্তাহ ভুগিয়া কুঁয়র ক্রমে সারিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কমলার দুই বড় ভাই, যাহারা খালসা ফৌজে ছোটরকম ওহদেদার ছিল, ছুটি লইয়া বাড়ি আসিল। তাহারা কুঁয়রকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল। তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দলসিং, কমলা, কমলার মা, ও অন্য প্রতিবেশীরা যেমন কুঁয়রের সহিত অসঙ্কোচে ব্যবহার করিত, তাহারা কিছুতেই পারিল না। দলসিং তাহাদের, কুঁয়রের অজ্ঞাতবাসের কথা ও নিজের বচন* দিবার কথা, বুঝাইয়া দিল। তবুও কুঁয়র ডাকিলে, বা কুঁয়রের সম্মুখীন হইলে, তাহারা জঙ্গী সেলামী না দিয়া থাকিতে পারিত না। সহস্র চেষ্টাতেও তাহারা কুঁয়রের সম্মুখে উপবেশন করিতে পারিত না, জোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকিত। যখন অবসর বুঝিয়া একদিন কুঁয়র দলসিং ও তাহাদের ডাকাইয়া কমলার সহিত নিজের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিতেই পারো। কন্যার মা, বাপ, ভাইয়েরা এ বিবাহে কোন বাধা দেখিল না, কারণ ইহারাও জাট আর কুঁয়রও জাট।

তিব্বতের সরহদ্দ হইতে রাজপুতনার উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত এবং সতলজ হইতে আফগানিস্থান ও বিলোচিস্থানের পূর্ব্ব সীমানা পর্য্যন্ত—এ বিপুল ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে অধিকার করিবার পূর্ব্বে, রণজীত সিংহ, সিখেদের বারোটি মিসিলের মধ্যে একটি মিসিলের সর্দ্দার ছিলেন মাত্র। রণজীতের মিসিলের নাম ছিল "শুকরচাকিয়া"। ইহার সদর মোকাম ছিল লাহোরের পনের ক্রোশ উত্তরে গুজরানওয়ালা নগর। এখানেই তাঁহার জন্ম, আর এখানেই বারো বৎসর বয়সে পিতৃগদিতে বসিবামাত্র এমন সাহস, মানসিক বল ও কার্য্যতৎপরতা দেখান যে লোকে তাঁহাকে সেই শিশুকাল হইতেই বিষ্ণুর অংশ বলিতে লাগিল। রণজীতের উদ্দেশ্য ছিল যে টুকরা টুকরা সিখ সঙ্গতকে একীভূত করিয়া এক মহান অখণ্ড সিখ শক্তি সৃষ্টি করেন। তিনি যখন বাল্যকালে এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সফল করিবার জন্য কার্য্য আরম্ভ করেন

---

* বচন দেওয়া—কথা দেওয়া। সিখদের মধ্যে ইহা শপথেরও অধিক।

তখন তাঁহার নিজের মিসিল সকলের অপেক্ষা ছোট। তখন দুইটি মিসিল ছিল যাহাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশ লাখের উপর আয় ছিল আর লক্ষাধিক ফৌজ ছিল। ইহাদের নাম "রামগড়িয়া মিসিল", জাতে ছুতার, এবং "আহলু-ওয়ালিয়া মিসিল", জাতীতে শৌণ্ডিক। এই দুই মিসিল মিলিয়া একবার দিল্লী অধিকার করে। এ সকল চমক্‌প্রদ কেস্‌সা আর কোনো দিন তোমাকে শুনাইব। এক্ষণে, ইংরাজদের সময়, দুইটিমাত্র মিসিল জীবিত আছে যথা "আহলুওয়ালিয়া", যাহার নেতা মহারাজা কপূরথলা, আর "ফুলকীয়াঁ", যাহার চার ভাগের অধিনায়ক— মহারাজা পাটিয়ালা, মহারাজা নাভা, মহারাজা জীন্দ, ও রাজা ফরীদকোট। ইহারা চারজনেই এখন "স্বাধীন" নৃপতি।

সিখদের মধ্যে অবশ্য সকল জাতিই বিদ্যমান, কারণ এ একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় মাত্র। ইংরাজরা না জানিয়া কিংবা কূটনীতি অবলম্বন করিয়া, "সিখ নেশন" "সিখ বেস্‌" বলে। আমি ব্রাহ্মণ সিখ। জেনারেল হরিসিং নলুয়া, যাহার নাম করিয়া এখনও পাঠান মায়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়ায়, ক্ষেত্রী সিখ ছিল। গুরুগোবিন্দ সিংহ অনেক মেথরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাদের মঝবী সিখ বলে। ইহাদের মতো যোদ্ধা কমই আছে। জনসংখ্যায় কিন্তু "জাট"—অর্থাৎ চাষীজাত—প্রধান। সিখেরা স্বজাতির মধ্যেই বিবাহ করে। উচ্চজাতীয় সিখেরা সনাতন হিন্দু পদ্ধতিতেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করে। জাটেদের মধ্যে বড়লোকেরা ঐরূপ করে, গরীব জাটরা ও সকল নিম্নশ্রেণীর সিখরা গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রবর্ত্তিত, বাংলা মুলুকের বোষ্টমদের ন্যায়, এক সাদা-সিধা রীতিতে বিবাহ দেয়।

কুঁয়রও জাট্‌ আর দলসিংরাও জাট্‌, বিবাহে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু কমলা বাঁকিয়া বসিল। সে মাতাকে বলিল, এ রকম চোরের মত লুকাইয়া বিবাহ সে করিবে না। "আমি কি ফেলনা, যে একজন রাজাই হোক্‌ বাদশাই হোক্‌, এল আর আমায় বিয়ে করে নিয়ে গেল!" কুঁয়র মা, বাপকে সমস্ত খুলিয়া বলিল, মহারাণী জীন্দাঁর ভয়ে এখন এ বিবাহ তাহাকে কেন লুকাইয়া রাখিতে হইবে। বচন দিল যে সময়মত সে সিংহজীকে সমস্ত বলিবে, আর তিনি এমন পুত্রবৎসল, যে তিনি নিশ্চয় বধূকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। পর্দ্দার অপমান এ প্রদেশের হিন্দু সিখ মেয়েরা জানে না, তথাপিও তাহার

পাণিগ্রহণের কথা আরম্ভ হওয়া অবধি কমলা আর কুঁয়রের সাক্ষাতে বাহির হইত না। একদিন কিন্তু সে কুঁয়রের কাছে আসিল ও গম্ভীরভাবে নিজের আপত্তি সকল প্রকাশ করিল। "তোমরা রাজার জাত, আজ আমার প্রতি টান হয়েছে, কাল আবার ভুলে যাবে। আমি বাঁদীর মত মহলে থাকতে চাই না। তুমি আমাকে নিয়ে জীন্দাঁ মাইর কোপে পড়বে। তিনি না করতে পারেন কি? আমাদের ঝাড়ে বংশে মারিয়ে ফেলবেন। পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে ভুলে যাও। কেন এক তুচ্ছ পাড়গেঁয়ে কৃষাণীকে নিয়ে বিপদে পড়বে? তুমি আমার মায়া ছিঁড়তে পারবে না, বোলছো। আমি মুখখু মেয়ে বলছি পারবো, আর তুমি সাক্ষাৎ দেবতা, পারবে না? আমি রাজমহলের আদব কায়দা তো দূরের কথা, ও সব কাকে বলে তাই জানি না। কেন তুমি আমার জন্যে লজ্জিত হবে? তোমার এইটুকু কষ্ট দেখলে আমার তোমার বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছা করে। তুমি আমার জন্যে কষ্ট পাবে, আমি কি করে সহ্য করব?" কমলার মুখ গম্ভীরই রহিল কিন্তু শেষে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষণ

(৪)

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা রাষ্ট্রসমস্যা ও আশুভাবী 'Armageddon'-এর আলোচনায় বলিয়াছিলাম যে, বিশ্বমানবের একটা বিরাট সংসৎ—একটা World-State বা true League of Humahity-র প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ঐ সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। ঐরূপ সংসদের প্রতিষ্ঠা কালসাপেক্ষ—ঐ 'রোম'-কে বিলম্বিতক্রমে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা বিকট সমস্যা আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে—সেটা অন্নসমস্যা, বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য-সমস্যা। এ সমস্যার যদি আমরা অচিরে সমাধান করিতে না পারি, তবে মানব-সমাজ অন্তর্বিগ্রহের চিতানলে ভস্মীভূত হইবে—মানবীয় সভ্যতা ছারে-খারে যাইবে—আমরা জাহান্নবের অন্ধতমসে প্রবেশ করিব।

এই যে দারিদ্র্য-সমস্যা—লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ইহা কোন দেশ বিশেষে, নিরন্ন ভারতে বা চিনেই নিবদ্ধ নয়—ইহা সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী। এমন কি ধনিকের নন্দন বন—'God't own favoured land' মার্কিন মুলুকেও—

—'With its immense extraneous advantages, its very rich and highly developed natural resources and a society comparatively un-trammelled by class distinctions'

—এই দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। একজন অভিজ্ঞ মার্কিন লেখকের অভিমত শুনিবেন কি ?

Yet, in the face of this fact, millions are underfed and poorly clothed. Little children are robbed of their childhood, required to slave and permitted to go hungry. Fathers and mothers are required to dwell in poverty—not even are they permitted the poor privilege of earning by the sweat of their brows sufficient to feed and clothe themselves and their little ones. All over the (American) land, grim savage Poverty stalks all the ways of life.

ভারতবর্ষে আমরা অনশনের সপ্ত সুরের কথা শুনিতে পাই—আরও শুনিতে পাই ৩৫ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় ৯ কোটি লোক সারাজীবনে উদরপূর্তির সুখ কোনোদিন জানিতে পারে না। লক্ষ্য করুন—পৃথিবীতে যে অন্নবস্ত্রের অভাব এবং সেজন্য লোক নগ্ন ও নিরন্ন—তাহা নয়। 'There is dire *poverty* in the midst of huge *plenty*'. জগৎ যে নিঃস্ব তাহা নয়—তথাপি নিরন্ন! পৃথিবীময় অন্নপানের হ্রদ সৃষ্ট হইয়াছে—কিন্তু দরিদ্রেরা সে জল স্পর্শের অধিকার হইতে বঞ্চিত। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত এমেরিক্যান লেখক Upton Sinclair বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন—

We are told that people are starving because we have produced too much food, that men and women have only rags because we have woven too much cloth, that they cannot work because we have too many factories, that they must sleep in the open because we have built too many homes.

ইহাতেই বলিতে ইচ্ছা হয়—It is the political economy of Bedlam। এই over-production-জন্য বৈজ্ঞানিকের বিলক্ষণ দায়িত্ব আছে। The scientist has been able to fashion machines which multiply production up to fifty times and more, অর্থাৎ, বিজ্ঞানের কলে কৌশলে খাদ্য-উৎপাদন ও বস্ত্রবয়ন ৫০ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে—কিন্তু পরিবেশন বণ্টন বিভজন? Equitable Distribution-এর জন্য কি উপায় নির্ণীত হইয়াছে? এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক জোড (Joad) বলিতেছেন—

Science has in short provided in abundance the *means* to the good life, but has not taught us *how to live*। তবেই ত গোড়ায় গলদ ঘটিল!

আর একজন অভিজ্ঞের অভিমত শুনুন—

The problem of Production has been solved. It is proved beyond all doubt that there is *abundant* for all; what we are up against now is the amazing phenomenon of restricting and destroying plenty—rather than

getting to work for a sensible and equitable *Distribution* of that plenty to the starving millions. * * Artificial shortages of supply are being created and millions of tons of foodstuffs and essential raw materials are being destroyed.

এ সম্পর্কে আমার পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে * আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম ঃ—

Is there nothing wrong with a system if a man has more bread than he can eat, yet is unable to hand over the surplus to his hungry brother next-door ?

Thus there is a plethora of production ; but instead of right distribution, we have ruthless destruction. It is not that there is not enough, but there is too much.

Undoubtedly we are in an age of plenty, yet are thoroughly miserable about it. Why ? Our trouble, if we will ponder over it, is not over-production but under-consumption. "What we have produced up to now, does not belong to the people but to a comparative few" (Sinclair). "The sovereign people are dismissed and treated as a pack of parasitic beggars, when they demand a share, a mere modicum in the mounting abundance of goods", and their standard of living is suffered to continue "indescribably, unbelievably, pitifully" low, while industrial magnates indulge in hurtful rivalry and cut-throat competition, and accumulate multi-millions for which they have no sort of use. Meanwhile the Mammon of Millionairism stalks the land and is unconcernedly busy with its work of mass-production of unemployment !

অত্যধিক উৎপাদন ও সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত পরিবেশনের অভাব—ইহার ফল কিরূপ বিষময় হইয়াছে, পূর্বোদ্ধৃত 'Frustration of Science' প্রবন্ধে স্পিয়ার সাহেব তাহা বেশ নিপুণভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ঃ—

What do we find ? We see a glut of nearly every essential commodity to such an extent that foodstuffs are wasted and destroyed.

---

* See Theosophist for March 1935,

Wheat in Canada and U. S. A. and Coffee in Brazil, are fed in the furnaces of locomotives ; tea in India and rubber in Malaya are restricted so that people owning small estates find it profitable to let the bushes and trees grow rank and weed-covered ; pigs, cattle and sheep are destroyed, milk is poured down drains and fruit and cotton are ploughed back into the soil.

এ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বেঙ্গালোরের Life পত্রিকায় কতকগুলি অকাট্য Statistics সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন—নিম্নে তাহা সজ্জিত করিয়া দিলাম।

Since 1921 more than 3000000 acres of arable land have been lost.—Annual meeting of Farmers' Union, 1938। অর্থাৎ, বিগত ১৭ বৎসরে ১ কোটি বিঘা চাষের উপযুক্ত জমি ইচ্ছা করিয়া পতিত করা হইয়াছে।

Wheat (গম)—The chief producing countries (Canada, Australia, France etc) have entered into a pact to restrict their areas under wheat by hundreds of thousands of acres—causing wheat price to rise by 50 per cent. * * French farmers are rewarded for feeding animals on wheat (Daily Express of 30. 3. 33.) and are fined for increasing acreage (The Times of 16. 10. 33).

Coffee (কফি)—Brazil has destroyed over 20,000,000 bags of coffee (Evening Standard of 26. 3. 34). Brazil has burned 5300 million pounds of coffee at the cost of £ 100,000,000.

Tea (চা)—During 1937-38, 315 million lbs of tea were kept off the market, enabling tea companies to make 20 per cent higher profits than in the previous year. Tea is thus dearer by 6 d. a pound.

Potatoes (আলু)—By an agreement of the Potato Board, the production of potatoes is restricted and any farmer who increases his acres is fined £ 5 per acre.

Strawberries—Tons of strawberries have been ploughed into the ground in Cambridgeshire. (Daily Mirror of 1. 7. 36).

Cotton (তুলা)—In the United States, 2000000 tons are withheld from market and every third row is ploughed in. (New Democracy, October, 1933).

Pigs (শূকর)—America has wantonly destroyed 2000000 sows and 4000000 little pigs and Holland 100000 (New Democracy) and 6000000 dairy cattle (Social Credit Standard).

U. S. A. Government under the restriction scheme has paid, up to the end of January 1935, more than 182,000,000 dollars to 1531943 farmers for not producing corn or hogs. (New Democracy).

Fish (মৎস্য)—In order to keep up prices, fishermen are compelled to throw back into the sea all catches of herrings above a certain quota. Nearly 100 tons of herrings were dumped into the sea at the weekend off the Tyne (News Chronicle of 2. 6. 37).

Milk (দুগ্ধ)—Holland destroys 100000 milch cows, because of over production of milk (Daily Herald of 11. 6. 36).

British farmers are urged to feed more milk to pigs (The Times of 2. 1. 32) and the Government is to legislate to deal with 40,000,000 galon milk glut (Daily Express).

Los Angels pours 200000 quarts of milk down the sewers monthly.—The Right Hon' Thomas Johnston M. P.

Cloth (বস্ত্র)—During the last few months 48 mills have been bought up and scrapped at the cost of £ 412009 (News Chronicle of 10. 10. 37).

আর কত দৃষ্টান্ত দিব ?

কিছুদিন পূর্বে বিখ্যাত বক্তা মিঃ এ, এল, গিবসন (A. L. Gibson) লণ্ডনের Central Hall-এ ঐ সকল অঙ্কপত্রের সার সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছিলেন—

31½ million bags of coffee have been destroyed in Brazil, 12 million pigs and cattle have been destroyed in the United States, half a million cattle have been destroyed and incinerated in the Argentine. One of the

decisions embodied in the Ottawa agreement was that in North America, wheat should not be sown on 14,000,000 fertile acres which had been bearing wheat in the past. In America, they have paid farmers at least 20,000,000 dollars for not raising pigs.

ইহার পর অন্ন-সমস্যা যদি বিকট মূর্তি ধরিয়া সমাজের মধ্যে প্রকট হয়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু আছে কি ? ইহার ফলে যদি নির্ধনেরা—the 'Have-not's ধনিকের—the 'Haves'-দিগের চিরশত্রু হয়, যদি Red Revolution —রক্তাক্ত বিপ্লবের পক্ষপাত করে, যদি Carl Marx-এর সহিত সুর মিলাইয়া বলে—"Workers of the world ! Arise !—for, you have nothing to lose but your chains'—তবে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় কি ? এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া ডাঃ ভগবান্‌দাস লিখিয়াছেন—Humanity is in imminent danger of dying from *mutual hatred*,—born of lack of equitable distribution of sufficient bread.

এই অন্তর্বিদ্বেষকে লক্ষ্য করিয়া আমি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এইরূপ লিখিয়াছিলাম—"এই দুর্ভর দীনতার কথা আলোচনা করিলে কারলাইলের ভীষণ উপমাটা স্মরণ হয়। আকাশ-ব্যাপী দুই বিশাল তাড়িত-কটাহে যেন দুই প্রচণ্ড তাড়িত-শক্তি সঞ্চিত হইতেছে। শক্তিদ্বয় পরস্পর বিরোধী, এক পুষ্ট তাড়িত, অপর রুষ্ট তাড়িত। কবে বালকের অঙ্গুলি-চালনে বিরোধী শক্তিদ্বয়ের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে ! ঐ শক্তি-সংগ্রামের তুমুল আরাবে দিক্‌চক্র বিকম্পিত হইবে, তাহার পর বিমানচারী-গণ আর সূর্যকক্ষায় পৃথিবী-উপগ্রহের সাক্ষাৎ পাইবে না ; পৃথিবীর উপাদানভূত পরমাণুপুঞ্জ আকাশের কোথায়ও নীহারিকা-রূপে বিপর্যস্ত থাকিবে।"

ইতিপূর্বে বণ্টন-বিভ্রাট—mal-distribution-এর কথা বলিয়াছি—ইহার উপর আবার মুদ্রা-বিভ্রাট ! 'Added to this, we have a vicious system of currency, both national and international'। অতএব বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট ! স্পিয়ার সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন—

Investments and prices and profits matter more than human life and happiness—the motive not being the welfare of the community but

the accumulation of money, power, profits, prestige and supremacy into the hands of the rulers—the owners of labour and the owners and masters of scientists.

ফলে ? Meanwhile the industrial shoe pinches terribly, and there is not enough leather to make it a comfortable fit (Professor Armstrong).

আমি এ সম্পর্কে ঐ পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—

Money was given to us to be used to make men, but no, we use men to make money and "crucify humanity on a cross of gold'. So that Ben Tillet cries out in the bitterness of his heart : "I do not know which is worse, racketeer or rentier, but we have both of them, and they are a pair of bad lots." * * In addition we have cut-throat competition and ruthless exploitation. A handful of industrial magnates accumulate muiti-millions, while the sovereign people are left for the most part to starve—millions of them without work (অ্যামেরিকায় বেকারের সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক) and almost all without proper leisure.

এই অধস্তন নিরয় হইতে সমাজের উদ্ধার সাধনের উপায় কি ? এই social chaos-এর প্রতিবিধান কি ? এ প্রসঙ্গে ঐ স্পিয়ার সাহেব বলেন—The only proper solution is the abolishment of the present system and its replacement by one which would help the scientist to work for humanity.

সে প্রণালী কি ? Scientic Socialism—বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ।

পুনশ্চ স্পিয়ার সাহেব বলেন—There is only one such system and it is *Scientific Socialism*, where the needs of the people come first, before individual profits, before waste-ful so-called enterprise, where the labour of every member of the community is used for the good of all, where science can flourish and no

inventor be bought out and his inventions pushed to the wall, where education will enlighten the public and replace convention, bigotry, superstition, prejudice and fear—by knowledge and peace.

স্পিয়ার সাহেব Bolshevism-এর বেশ পক্ষপাতী—সেইজন্য তিনি বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের যে মনোরম চিত্র আঁকিলেন তাহাতে বল্‌সেভিসিমের দোষের দিক্‌টা দেখান হইল না। বল্‌সেভিষ্টগণ রুশিয়ার অনেক সামাজিক কল্যাণ সাধিয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।* কিন্তু তাহাদের সাম্যবাদ সার্বভৌম নহে—অধিকন্তু উহা দ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বেষকে ভিত্তি করিয়া কোন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। আমি নিজেও সাম্যবাদের পক্ষপাতী—অতএব Socialist ; কিন্তু আমার Socialism is the Socialism of Love—not the Socialism of Hate। সেইজন্য জগতের Economic dis-ease-এর প্রসঙ্গে আমি পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—

So we must fit out an expedition for the conquest of Bread, by the State-control of the key industries, including agriculture, and of the means of transport, and by the proper regulation of work and leisure.

In a word, we must engage ourselves, to the limit of our capacities, to establish what Madame Blavatsky used to call the "Socialism of Love" ; not the socialism of hate, in which the Have-nots and the Haves snarl at each other and are ready to fly at each other's throats.

---

* The Soviet authorities intend (and have to a certain extent carried out that intention) that none of the comforts, none of the pleasures, none af the stimuli, which awaken the power of a child born in Europe in a cultured middle-class home, shall be lacking to the children of the humblest Russian workers.—H. H. Brailsford. Children-সম্পর্কে যাহা বলা হইল, Adults সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশি করিয়া বক্তব্য।

অর্থাৎ, In this field we must work up a 'creative revolution' —'greater than the Renaissance and the Reformation of earlier epochs—a Revolution of the *spirit*, that breaks only to rebuild and regenerate' (Vaswani)—not of course by violence, which is untheosophical, but by a steady change of heart and rousing of the social conscience.

ডাঃ ভগবান্‌দাসও এই ধরণের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যদি জগৎকে আসন্ন সর্বনাশ হইতে উদ্ধার করিতে হয়—তবে একটা 'Organisation for world-prosperity' গঠিত করিতে হইবে—একটা *correct* Technique আবিষ্কৃত করিতে হইবে যদ্দ্বারা 'an equitable distribution of the world's work and wages, of necessaries and comforts and luxuries, of labour and leisure and pleasure' সিদ্ধ হইতে পারে—যে প্রণালী বা Technique 'will make practicable and ensure the service of "Each for All and All for Each'."

ডাঃ ভগবান্‌দাস আরও বলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈবস্বত মনুর প্রতিষ্ঠিত 'বর্ণাশ্রমধর্মে' ঐ আদর্শই অনুসৃত হইয়াছিল। ঐ চাতুর্বণ্য সমাজে শিক্ষক রক্ষক পালক ও ধারক—এই চতুর্ধা বিভক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের অঙ্গাঙ্গিভাবযুক্ত সহযোগ ও সহকারিতার ফলে সামাজিক স্বস্তি ও সম্পদ্ সিদ্ধ হইতে পারিয়াছিল—

It was made up of four subordinate, interlinked, interdependent organizations, Educational, Political (or Protective or Defensive or Executive), Economic and Industrial. It was framed by the ancient thinkers of India, who had discovered the greater, nobler, and, for Humanity, the far more useful complementary half-truth and fact of Human Evolution in accordance with the great "Law of Alliance for Existence."

কাল সহকারে ঐ পদ্ধতিতে অনেক দোষ প্রবেশ করিয়াছে এবং ঐ প্রণালী

প্রভৃত অকল্যাণের আকর হইয়াছে। It has obviously degenerated utterly and become a curse instead of a blessing।

সকলেই জানেন রুশদেশে সম্প্রতি জনহিতে লক্ষ্য রাখিয়া একটা নূতন সমাজপ্রণালী সংগঠনের চেষ্টা চলিতেছে। ঐ প্রণালীর মূলে কয়েকটি সাংঘাতিক ত্রুটি আছে এবং ঐ প্রণালী এখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই—কাজেই সংযোজন-বিয়োজন বির্জন-অর্জন বেশ চলিতেছে। চরমে উহা কি স্থায়ীরূপ গ্রহণ করিবে বলা যায় না।

The vast Russian experiment now in progress, is the second effort of mankind in the same direction, but, while it has achieved marvels, it has also committed many serious and cruel mistakes, is still undergoing great internal tribulations, and is correcting its errors.

সেইজন্য ভগবান্‌দাস বলিতেছেন—A new scheme should be thought out by the Scientists—যে প্রণালীতে বুদ্ধদেব যাহাকে 'মজ্ঝিমা পতিপদা' (Middle Path) বলিতেন, তাহাই যেন অনুসৃত হয়—'the right middle course between impossibly equalitarian communism and criminally inequitous capitalism'—এবং জগতের যাবতীয় বৈজ্ঞানিকদিগকে সনির্বন্ধে আহ্বান করিতেছেন—এস এস বৈজ্ঞানিক—যে যেথায় যে অবস্থায় আছ অগ্রসর হও—পৃথিবীর উদ্ধার-ব্রতে ব্রতী হও—ব্রতচারীর মত ঐকান্তিক আত্যন্তিকভাবে এই বিকট সামাজিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ কর—'for the mitigating and then the healthy finishing of the travail-agony of Mankind, for the formulation of a new and complete scheme of social structure (a newer and better বর্ণাশ্রমধর্ম) (of course not rigid by any means, but allowing ample room for national variations in details, within the limits of great and firm *general* principles); for the ushering in of a true Millennium, of a world-wide International Alliance and Co-operation for Existence, in place of struggle and

competition ; for the bringing to birth of the Organisation of World-Peace and World-Prosperity.

বৈজ্ঞানিক ! যদি অত্যদ্ভুত প্রতিভার বলে এবং আন্তরিক নিষ্ঠার ফলে এ গুরুতম সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে পার, তবে জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে তোমার নাম খোদিত থাকিবে এবং তুমি ধন্য হইবে এবং জগৎকে ধন্য করিবে—"The scientists who discover the effective solution of this problem will have made the greatest and most beneficent discovery of all ages and will win the veneration nay, the worship, of all mankind".

আমাদের বক্তব্য আরও কিছু অবশিষ্ট আছে—আগামী বারে তাহা বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রতিপক্ষ

মধ্যবিত্তের নাতিশীতোষ্ণ রক্তের আবহাওয়ায় এতকাল বেড়েছে প্রভাকর। বাইশটা বছর সে কাটিয়ে দিল। অনেক মনের অলিগলির সন্ধান নিয়ে, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে, বাইশ বছরেই প্রভাকর রীতিমত দার্শনিক হ'য়ে উঠ্‌ল। দশটা কি বারোটা বসন্ত যে তার সচেতন মনের উপর দিয়ে বয়ে' গেছে—এ অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

প্রভাকর এত অসুখী নয়, কিন্তু আনন্দ পায় না। সংসার বা সমাজের কোনও জিনিষই তার কাছে রহস্যপূর্ণ নয়। সে বোঝে সব, জানে সব। রহস্যের মাধুর্য্যে পুলকিত হবার অবকাশ তার হয় না। নিশ্চেতন ঈশ্বরদৃষ্টিতে যেন প্রভাকর সব জিনিষ দেখে। প্রভাকর এতে বিরক্ত হয়। হবে নাই বা কেন? কেন সে অন্য পাঁচজনের মত সাধারণভাবে চল্‌তে পারে না?—বাবা। এর জন্যে দায়ী প্রভাকরের বাবা। প্রভাকর তার বাবার যৌনজীবনের একমাত্র দেহী চিহ্ন। এবং তারই ফলে তার উপর বাবার আকর্ষণ কিছু বেশী। দশ থেকে বারোতে পা দিতেই প্রভাকরের শিক্ষা হ'ল সুরু। "মানুষ হ'তে হ'লে জীবনকে দেখা দরকার"—প্রভাকর বাবাকে বল্‌তে শুনেছে। মার আপত্তিকে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি প্রভাকরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে লাগ্‌লেন নানা স্থানে; বিভিন্ন রঙের জীবনের সঙ্গে প্রভাকরের হ'ল সংস্পর্শ। প্রভাকরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা হ'ত অবিশ্বাস্যভাবে স্পষ্ট। সামাজিক জীবনের কোনও দুর্ব্বলতাই তাদের কথাবার্ত্তাকে আড়ষ্ট কর্‌তে পারেনি। আর তার ফলে অনেক সন্দেহ আর অনেক অশ্রদ্ধা নিয়ে প্রভাকর এই বাইশে পা দিল। যুক্তিবাদী মন দিয়ে সে বিশ্লেষণ করে,—আর সেই বিশ্লেষণের ধারে মানুষের কোমল বা সবল বৃত্তিগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। প্রভাকর এতে বিরক্ত হয়। একটু না জান্‌তে পারলে হয়ত সে কত খুসীই হত।

দায়ী এর জন্যে মাও। কেন তিনি বাবার ঐ শিক্ষাপ্রণালীর বিরোধিতা কর্‌লেন না। প্রভাকরের জীবনের উপর বাবার চেয়ে মার দাবী কম নয়। কেন, কেন তিনি বল্‌লেন না যে এ শিক্ষা ভাল নয়—এতে ছেলে সুখী হ'বে

না? না, এ রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিরোধিতা করবার শক্তি মার নেই। মা সুশ্রী, সুন্দর, মার্জ্জিত—কিন্তু বিরোধ বা মতবিরোধ করবার বীজ মার মধ্যে নেই। নিজস্ব সত্তা মা বাবার পৌরুষের কাছে বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

মা সুশ্রী, মা সুন্দরী। চল্লিশে পা দিয়েও তাঁর দেহের কোনও প্রত্যঙ্গ হয়নি শিথিল। পঁচিশের পরিস্ফুট যৌবন এখনো তাঁর দেহকে আঁকড়ে আছে। অপরিচিতেরা প্রভাকরকে 'মা' ডাক্‌তে শুন্‌লে বিস্মিতই হ'বে। আর, সত্যি, মার মত সুন্দরী মেয়ে প্রভাকরের চোখে একটাও পড়েনি। সাদা মার্ব্বেল পাথরের উপর খোদাই করে যেন মার মুখ আঁকা হয়েছে। নাক, চোখ, গাল সব একেবারে নিটোল, নিখুঁত। মার যদি একটা মেয়ে হ'ত—প্রভাকর ভাবে, তার নিজের যদি একটা বোন থাক্‌ত; সে হয়ত' মার চেয়েও সুন্দরী হ'ত। তাহলে, ওঃ তাহলে কি হ'ত? প্রভাকর চঞ্চল হয়ে ওঠে। মার সবটুকু সৌন্দর্য্য নিঙড়ে সে মেয়ে বেড়ে উঠ্‌ত; আজ হয়ত সে মেয়ে ষোলো কি আঠোরোয় পা দিত। গোলাপী গাল, তীক্ষ্ণ চোখ, পাথরে খোদাই নাক—প্রভাকর আর ভাব্‌তে পারে না।

তবুও মা সুন্দরী। ষোলো বছর পর্য্যন্তও প্রভাকর মাকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছে—ষোলো বছর পর্য্যন্তও ও মার বুকের গহ্বরে মুখ গুঁজে ঘুমিয়েছে। আজই যেন তার বয়স বাইশ হয়েছে।

মাকে প্রভাকর চিরকালই ভালবেসে এসেছে—সে ভালবাসা মার প্রতি সন্তানের ভালবাসা নয়। ফ্রয়েডীয় কম্‌প্লেক্স্‌ই বা হয়ত সেটা। তবুও প্রভাকর মাকে না দেখে থাক্‌তে পারে না।

প্রভাকর খবরের কাগজ তুলে নিল। স্পেন আর চীনে সুরু হ'য়েছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণরক্ষার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আর ভুঁড়িওয়ালা মোটা মোটা দেশগুলো তাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কি করছে ইণ্টারন্যাশানল্ ব্রিগেড্? পারবে না—কখনো পারবে না ঐ সব স্বার্থান্বেষী শোষণকারীরা।

মা এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। প্রভাকর বুঝ্‌লো। ও তখন কাগজের এডিটোরিয়ালের অর্দ্ধেক নেমেছে। মা দাঁড়ালেন ঠিক ওর পিছনে। প্রভাকর জানে মা জিজ্ঞেস করতে এসেছেন বাবার কোনও চিঠি এসেছে কিনা। কাজের চাপে বাবাকে যেতে হয়েছে অনেক দূরে। মা খবর নিতে এসেছেন সেখানে তিনি

কেমন আছেন। কেন এই খবর নেওয়া? যে লোকের ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতেই মাসে অর্দ্ধাংশ চলে যায়, তার স্ত্রীর আবার স্বামীর জীবনের জন্যে ভাবনা কেন? প্রভাকরের কাছে জিনিষটা বিসদৃশ লাগে। বাবা যদি আজ মারাই যান। তাহলে মার কি অবস্থা হবে? হৃদয়ের বন্ধন তো অনেকদিনই ছিঁড়েছে—এ প্রভাকর জানে। আদৌ ছিল কিনা তা'তেই সন্দেহ! তবে! তবে মার কি হবে? অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই একটা মোটা টাকার অধিকারী হওয়া ছাড়া তাঁর আর কি হবে? বাবার সুবিবেচনা, প্রভাকর ভাবল, বাবার সুবিবেচনাকে প্রশংসা কর্‌তে হয়। ধরো, বাবার মৃত্যুর পর প্রভাকর তার মাকে খেতে দিল না। তখন, তখন মার কি অবস্থা হ'ত যদি বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মার-হাতে ঐ মোটা টাকাটা না আসত; কিন্তু এ সব বিষয়ে বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না। মাসের প্রারম্ভেই আগে তিনি প্রিমিয়াম শোধ করেন। তবে কেন মার এত শঙ্কা?

—"পড়ছিস্?" মা মৃদুভাবে কথাগুলো বল্‌লেন। এটা ভূমিকা। ঘাড় গুঁজে প্রভাকর এডিটোরিয়াল্ পড়তে লাগ্‌ল।

"ওঁর কোনও চিঠি এসেছে?" মা এবার প্রভাকরের মুখের দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস্ করলেন।

—"নাঃ"। প্রভাকরের মুখ দিয়ে একটামাত্র কথা বেরুল। ও রীতিমত লজ্জিত বোধ করছে মার এই ব্যবহারে। স্বামীর চিঠি আস্‌বে—তা ছেলের কাছে কেন জিজ্ঞেস্ করা? মা নিজেও তো চিঠি লিখ্‌তে পারেন। "শ্রীচরণকমলেষু" আর "কোটি কোটি প্রণাম" আর "ইতি তোমারই"—ব্যস্ ঊনবিংশ শতকের একখানা আদর্শ চিঠি। চিঠির ঐ তিনটে কথার ভিতরে মা নিজেকে প্রকাশ করছেন—তোমার শ্রীচরণে, অর্থাৎ তোমার পৌরুষের কাছে আমি আমার ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিচ্ছি। ইতি তোমারই সেবিকা ও চিরপরাধীনা স্ত্রী। এ ছাড়া অন্যভাবে মা কেন চিঠি লিখ্‌তে পারেন না? ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দেবার জন্যে কেন তাঁর এত আগ্রহ?—তারপর চিঠির বিষয়বস্তু। তুমি কেমন আছ, তোমার শরীর কেমন, ওখানকার আবহাওয়া কেমন, তোমার শরীরের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে তো? অনেকগুলো প্রশ্ন করে জানানো যে আমি তোমার স্ত্রী, যে এখানে আছে। সে তোমার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কত উদ্বিগ্ন! অতএব,

হে প্রভু, তুমি কি তার প্রতি একটু দয়াও দেখাবে না? নিজস্ব কথা লেখবার মধ্যে "আমি ভাল আছি"-টাই নিশ্চিত এবং সময়োপযোগী। কারণ শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ দিলে তিনি চটে যেতে পারেন; সুতরাং চিরকালই আমি ভাল থাক্‌ব। এবং এই জন্যে তুমি প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রিমিয়াম দিতে ভুলো না।

এই তো মানুষের মনের মূলকথা। স্ত্রী স্বামীকে তার ভালবাসার কথা জানাতে পারবে না—পাছে স্বামী মনে করেন যে স্ত্রী তাঁর উপর কোনও অধিকারের দাবী খাটাচ্ছে। এবং তার ফলে তিনি হয়ত ইন্সিওরেন্সগুলো (যাদের সমষ্টি করলে. একটা মোটা টাকায় দাঁড়ায়) ল্যাপ্স করে দিতে পারেন। সর্ব্বনাশ! স্ত্রী কিনা স্বামীর উপর দাবী খাটাচ্ছে! স্বামী তাঁকে একবার বিয়ে করেছেন. হয়ত নিজস্ব কোনও অভাব মেটাবারই জন্যে; তারপর তিনি ইচ্ছে কর্‌লে স্ত্রীকে ভালবাস্‌তেও পারেন, নাও পারেন—এ নিয়ে স্ত্রীর এত মাথা ব্যথা কেন? খেতে প'র্‌তে দিচ্ছেন, এই কি যথেষ্ট নয়?

প্রভাকরের মন ক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। মার দিকে ফিরে তাকাল সে। সেই সুন্দর, সুশ্রী মা। তবে এর মধ্যে এত ভণ্ডামি কেন? পৃথিবীকে সোজাসুজি দেখ্‌বার মধ্যে কিছু অপরাধ আছে নাকি? এক হিসেবে এটা হয়ত ভাল। এটুকু ভণ্ডামিও না থাক্‌লে মার সৌন্দর্য্য হয়ত রুক্ষতার মধ্যে রূপ পেত, ভালই হয়েছে। সত্যি, মাকে কত অসহায় দেখাচ্ছে—বাবার চিঠি না পেয়ে তিনি যেন একেবারে বসে পড়েছেন। কিন্তু সত্যি কি আর তাই?

"মলিনাকে এক কাপ চা করে' দিতে বলো না, মা", প্রভাকর মার কাছে নিজের অসহায়ত্ব প্রমাণ কর্‌ছে। মা এতে সন্তুষ্ট হন। তাঁর উপর নির্ভরশীল কাউকে দেখ্‌লে তিনি খুসী হন।

"এই অবেলায় আবার চা কেন?" নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে মা কর্ত্তৃত্ব করেন। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব যে খাট্‌বে না এ তিনি জানেন। সুতরাং—"ফল খাবি? পাশের বাড়ীর ওরা দিয়ে গেছে, বেশ ভাল ফল?"

মাকে নিরাশ কর্‌তে প্রভাকরের ইচ্ছে হয় না। "নাঃ ফল?" গলায় একটু কুণ্ঠা, "আচ্ছা, দাও ফলই দাও।"

কিছুক্ষণ পরে মলিনা ফল নিয়ে আসে।

মলিনা প্রভাকরের সম্পর্কে বোন। মার দিক দিয়ে। এখানে এসেছে কলেজে লেখাপড়া শিখ্‌তে। পুরুষের কর্ত্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ও লেখাপড়া শিখ্‌ছে। কোনও পুরুষের কাছে তাকে যেন অর্থনৈতিক দাস না হতে হয়—যেমন প্রভাকরের মাকে হতে হয়েছে। কলেজীয় বিদ্যা শেষ করে ও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। "একটা কিছু চাক্‌রী কি আর জুট্‌বে না?" মলিনা প্রভাকরকে বুঝিয়েছিল।

মেয়েদের চাক্‌রী বল্‌তে গেলে, অবিশ্যি, ঐ মাষ্টারি ছাড়া চোখে পড়ে না। সমুদ্রকূলের বড় বড় বণিকরা ব্যক্তিগত দিক্ দিয়ে মেয়েদের হয়ত পছন্দ করেন—এমন কি অতিমাত্রাতেই করেন বলা যায়; কিন্তু তাঁদের অফিসের কেরাণী বা বড়বাবু পুরুষ ছাড়া আর কেউ হতে পার্‌বে না। প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মেয়ে হওয়া চাই, কিন্তু ম্যানেজার পুরুষ না হলে চল্‌বে না। কে করল এই বিভাগ! মেয়েরা আবার অফিসের হিসাব মেলাতে পারে নাকি? ওদের ঐ সুশ্রী দেহ ছাড়া আর কি আছে? অর্থাৎ মেয়েরা তোমাদের মণখানেকের কাঁচা মাংস নিয়ে লম্পট স্বামীর সাধ্বী স্ত্রী হও, তার কুষ্ঠরোগভর্ত্তি দেহ ঘাড়ে করে' গণিকার গৃহে পৌঁছে দিয়ে এস, বণিক বা অর্থনৈতিক প্রভুর রাত্রির শয্যাসঙ্গিনী হও; কিন্তু খবরদার, হে মহীয়সী, তোমরা কেউ কখনো অফিসের বড়বাবু হতে চেয়ো না, পৃথিবীর পথে পুরুষের সঙ্গে একতালে পা ফেলবার দুরাকাঙ্ক্ষা কেউ কোরো না।

কিন্তু মলিনা এইসব অস্বীকার করে। জীবনের পথে একটা গ্রাজুয়েট মেয়ে একটা নন্‌ম্যাট্রিক ছেলের চেয়ে সমানের কথা দূরে থাক, কেন বড় হতে পার্‌বে না? বুদ্ধিকেই যদি প্রামাণ্য ধরা যায়, তবে ছেলের চেয়ে মেয়ে কম কিসে?

প্রভাকর হেসেছিল।

"পারবে না মলিনা", ও বলেছিল, "তুমি যতই চাকরী কর না কেন, যেদিন তুমি বিয়ে করবে, সেইদিনই তোমার স্বামীর কাছে তোমার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হবে। স্বাধীন সত্তা নিয়ে এ সমাজে আর যাই হোক্ না কেন, মেয়েদের বিয়ে করা চলে না।"

—"চালাকি নাকি?" মলিনা উড়িয়েই দিয়েছিল প্রায়। "আমিও তো ঘরে টাকা আন্‌বো।"

“তা আনো, প্রভাকর বল্‌ল, “কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে, ঘর বাড়ী জমির মত তোমরা মেয়েরাও পুরুষের কাছে একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া আর কিছুই নয় ; সুতরাং দাম্পত্যজীবনে যদি তোমরা স্বাধীনতা চাও, তবে পুরুষের অধিকারে ঘা লাগ্‌বে ; এবং বহুযুগের সঞ্চিত সংস্কারের জন্যে তারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবে না। ফলে হয় তোমাকে স্বামীর সম্বন্ধ ছিঁড়তে হবে, নয় সেই ভবিষ্যৎ স্বামীই তোমার সম্বন্ধ ছিঁড়্‌বেন।

তবু মলিনা বিশ্বাস করেনি।

সেই মলিনাই আজ সযত্নে একথালা ফল নিয়ে প্রভাকরের খাবার অপেক্ষা কর্‌ছে। মলিনাকে কুশ্রী বলা চলে না। সুন্দরী-ই ও। তবে মার যদি একটা মেয়ে হত, প্রভাকর ভাবে, সে মেয়ের মত সুন্দরী মলিনা নিশ্চয়ই নয়। তার নাক মলিনার মত অত উঁচু হত না—সে নাক আরও ধারালো, আরও তীক্ষ্ণ হত। গালের রক্তিমতা তার আরও বেশী হত। তবু, সাধারণভাবে বিচার করলে, মলিনা সুন্দরীই।

মলিনার মনের খবরও প্রভাকর পেয়েছে। মেয়েটা আসলে ভাবপ্রবণ, রোমান্টিক। দাম্পত্যজীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতা ওর একটা বিলাস। কারণ প্রভাকর জানে যে ও এখন যে কোনও পুরুষের পায়ের উপর নিজের অজস্র যৌবনভরা দেহ আর মনকে ঢেলে দিতে পারে ; নারীজীবনের এক মুহূর্ত্তের তথাকথিত স্বার্থকতায় ও আজই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে পারে। এবং ও যে থালা নিয়ে এখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, প্রভাকর আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে খেলেও যে ও এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—সেটাও ওর রোমান্টিক নারীমনেরই একটা পরিচয়। কারণ ও জানে যে অমূল্য প্রত্যেকদিন এই সময়েই আসে।

অমূল্য প্রভাকরের বন্ধু। রোজ ও একবার করে আসে—এই সময়েই প্রত্যেকদিন। আগে আস্‌ত না—মাস ছয়েক থেকে আরম্ভ করেছে। আর মলিনা প্রভাকরের বাড়ীতে আছে প্রায় মাস আষ্টেক। প্রভাকর লক্ষ্য করেছে মলিনা এই সময়েই প্রত্যেকদিন কোনও একটা অজুহাতে ওর ঘরে আসে—এবং কোনও কথার প্রসঙ্গ তুলে ও অনেকক্ষণ তর্ক করে। অবিশ্যি অমূল্য আসার সঙ্গে সঙ্গে তর্ক থেমে যায়।

অপ্রতিভ হেসে অমূল্য ঘরে ঢোকে। মলিনার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। প্রায়-রক্তিম গালের উপর দিয়ে নারীসুলভ ঢেউ খেলে যায়। মলিনা আসলে মেয়েই।

—"তারপর প্রভা খবর কি?" অমূল্য সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে।

মলিনা হঠাৎ তাড়া লাগায়। "এতক্ষণ কি এত খাচ্ছ? কি আল্‌সে!" অর্থাৎ অমূল্যকে লজ্জা ত্যাগ করতে বলা।

এবং সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যও: "এই যে মলিনাদেবী, কেমন আছেন?"

মলিনা একটু লাল হয়ে উত্তর দেয়—"আর আমাদের খবর!"

অন্তরালে ওরা পরস্পরকে তুমিই বলে। তবে প্রভাকরের সাম্‌নে এটুকু ভণ্ডামি কেন? কেন এত দুর্ব্বলতা? প্রভাকর কি ওদের ধরে জেলে দেবে? হায়! মলিনা বা অমূল্যর মনের এইটুকু স্বাধীনতাও নেই! আর তা ছাড়া ওরা এইরকম অভিনয় করে কি করে'? ঘণ্টাখানেক কি মিনিটকয়েক আগেও যাকে তুমি বলেছি, একচোট উচ্ছ্বাস যাকে শুনিয়েছি, কি করে', হায় ঈশ্বর, কি করে' তাকেই আবার কয়েক মিনিট পরে আপনি বলা যায়? নিতান্ত ভদ্রের মত তার সঙ্গে সংযত ব্যবহার করা চলে?

ওরা এখন পারস্পারিক সংবাদে ব্যস্ত। এরই ফাঁকে প্রভাকর হঠাৎ বলে ওঠে: "এই অমূল্য ফল খাবি?—এত আমি খেতে পারবো না, মলিনা, কেন এত নিয়ে এলে?"

প্রভাকর জানে যে মলিনা ফল কেটেছে শুন্‌লে অমূল্য অস্বীকার করবে না। কারণ ও মলিনাকে চটাতে চায় না—অন্ততঃ বিয়ের আগে পর্য্যন্ত। ফল ওর খারাপ লাগ্‌লেও, এখন যে অন্ততঃ ভাল লাগ্‌বেই সেকথা বল্‌তে ও বাধ্য।

হলও ঠিক তাই।

"ফল! কি ফল? পেঁপে? থালা টান্‌তে টান্‌তে অমূল্য বলে, "Oh! it's delicious! কি বলেন মলিনা দেবী?" যেন মলিনা দেবীর বলার উপরে ফলের 'deliciousness' নির্ভর কর্‌ছে।

প্রভাকরের হাসি পায়। অমূল্য সোজাসুজি বলুক না; মলিনা তোমার হাতের সব জিনিসই আমার কাছে খুব, খুব ভাল লাগে। কিন্তু এত সোজা কথায় সব করলে পৃথিবীতে এত গোলমাল হ'বে কেন? প্রভাকর একবার

নিজের অবস্থার উপর চোখ বুলাল। ও নিজে যে দু'টো নরনারীর আন্তরিকতার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করছে—এও বুঝতে পারল। সুতরাং নীতিশাস্ত্রের দিক দিয়ে এঘর থেকে ওর সরে যাওয়া উচিত—ওদের একটু নির্জ্জনতা এখন মানবতার পরিচায়ক।

বেরিয়ে আসার অছিলা অবিশ্যি প্রভাকরকে খুঁজ্‌তে হল না। স্বচ্ছন্দে ও বেরিয়ে এল। মাকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। মা রান্না করছেন। সাম্‌নেই লেটার বক্স্‌। একটা চিঠি এসেছে। পোষ্ট কার্ড। বাবা মাকে লিখেছেন। নিজস্ব নানা সংবাদ তিনি দিয়েছেন, প্রভাকরের খবর জিজ্ঞেস্‌ করেছেন, মার স্বাস্থ্যের একটু ইঙ্গিতও আছে। আর শেষে ইতি করবার আগে জানিয়েছেন, যে এমাসে তিনি হাজার টাকার আর একটা ইন্সিওরেন্স্‌ করেছেন।

মার মুখ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সুন্দর মুখ উনুনের আঁচে লাল্‌ হ'য়ে উঠেছে। প্রভাকরের হাতের চিঠি মা দেখ্‌তে পেয়েছেন—তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে একটা অসহায় ব্যগ্রতা। ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম বাবা ঠিক মত দিতে পেরেছেন তো? পাশের ঘর থেকে মলিনা আর অমূল্যর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—নভশ্চারী দুই পাখী! ওরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই 'তুমি' সুরু করেছে। প্রভাকর পোষ্ট কার্ডটা নিয়ে রান্নাঘরে যেতে লাগ্‌ল।

মা আর বাবা। মলিনা আর অমূল্য।

শ্রীরমাকৃষ্ণ মৈত্র

স্বদূর প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদ ও খৃষ্টধর্ম্ম

(১)

শ্রীযুক্ত আশানন্দ নাগ মহাশয় যে জাতীয়তাবাদ, কংগ্রেস, সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রভৃতির ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম্মের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করতে বসবেন তা আমি পূর্বে ভাবতে পারি নাই। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'পরিচয়ে' আমি তাঁর প্রবন্ধের যে আলোচনা করেছিলাম তা তাঁকে 'ভাবিয়ে' তুলেছে, হয় আমার পারলৌকিক গতির জন্য না হয় হিন্দু-ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কিন্তু আমার উক্ত সমালোচনায় খৃষ্ট-নিন্দা বা বুদ্ধ-প্রশংসা কিছুই ছিল না। তিনি বলেছিলেন যে চীন-জাপানের ইতিহাস হতে বোঝা যায় যে "জাতীয়তাবাদ ও খৃষ্টধর্ম্ম চির-শত্রু নয়"। আমি দেখিয়েছিলাম যে চীন-জাপানের ইতিহাস নাগ মহাশয়ের এই উক্তি সমর্থন করে না। কারণ জাতীয়তাবাদের অন্তরায় ঘটিয়েছিল বলেই জাপানীরা কঠোর দমন-নীতি অবলম্বন করে খৃষ্টধর্ম্ম নির্ব্বাসিত করে। প্রত্যুত্তরে নাগ মহাশয় বলতে চান যে সে ইতিহাসের "গোপন কথাটি" আমি "চেপে" গিয়েছি; "বৌদ্ধধর্ম্ম বিপন্ন" হয় বলে। তাঁর মতে জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসের আদি ও অন্তভাগ হতে বোঝা যায় যে শিক্ষিত জাপানী খৃষ্টধর্ম্মকে চেয়েছিল। সে ইতিহাসের মধ্য ভাগে খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার হলেও শেষ পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্ম জয়ী হয়।

জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের "ইতিহাসের গোড়ার ও শেষের দিক্‌টা বেমালুম ত্যাগ" করেছিলাম তার কারণ আমার বক্তব্যে তা ছিল অপ্রয়োজনীয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানী জাতি তার রাজশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং নিজেরা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। সুতরাং তারপর তার আর কোন সাবধানতা অবলম্বন করবার প্রয়োজন হয় নি। অতএব ১৮৭৩ সালে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন রদ করার কথা ছিল আমার বক্তব্যের বাইরে। কিন্তু নাগ মহাশয় যখন সেকথা ভুলে গিয়ে জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের প্রসারের ইতিহাস আলোচনা করেছেন তখন আমাকেও তাই করতে হবে। সে ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে আলোচনা

করলে বোঝা যাবে যে জাপানীরা সে ধর্ম্মকে কোন দিনই বিশেষ নেক-নজরে দেখে নাই, ১৮৭৩ সালের পরেও নয়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে যখন খৃষ্টধর্ম্ম জাপানে প্রথম প্রচারিত হয় তখন জাপানীরা সে ধর্ম্ম প্রচারে বাধা দেয় নি। বাধা না দেবার প্রধান কারণ খৃষ্ট-প্রেম নয়, নূতন ধর্ম্ম প্রচারে দেশে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে সম্বন্ধে তারা সজাগ ছিল না। উপরন্তু নানা দলের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল বলে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অনিশ্চিত। তিন জন শক্তিমান জাপানীর চেষ্টায় জাপানে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয় এবং দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এই তিন জন জাপানীর নাম নোবুনাগা, হিদেয়োশী ও ইয়েয়াসু। নোবুনাগা কিছুকালের জন্য বৌদ্ধদের উপর বিরূপ হয়েছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু নাগ মহাশয় এর যে কারণ দেখিয়েছেন তা তাঁর স্বকোপলকল্পিত। তিনি বলেন যে "বৌদ্ধেরা জাপানে অরাজকতা এনেছিল, তারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতো।" কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে যে "he harboured a strong antipathy against the Buddhists whose armed interference in politics had caused him much embarassment. He welcomed Christianity largely as an opponent of Buddhism" (Brinkley)। এই কথা নাগ মহাশয়ও জানেন, তবে তাঁর ভুল এইটুকু যে "armed interference in politics" মানে 'অরাজকতা আনা' আর 'উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন' করা নয়। নোবুনাগা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করলেও জনমত ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। এই জনমতের দ্বারা চালিত হয়েই ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে মিকাদো যখন খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে রাজাজ্ঞা প্রচারিত করলেন তখন নোবুনাগা মিকাদোর তোষামোদ করেই তা রদ করান। কিন্তু নোবুনাগা যে খৃষ্টধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন একথা মনে করবার কোন হেতু নাই—"It is not to be supposed however that Nobunaga's attitude towards the Jesuits signified any belief in their doctrines. In 1579 he took a step which showed plainly that policy as a statesman ranked much higher in his estimation than duty towards religion. For, in order to ensure

the armed assistance of certain feudatory, a professing Christian, Nobunaga seized the Jesuits in Kyoto and threatened to ban their religion altogether unless they persuaded the feudatory to adopt Nobunaga's side." (Brinkley).

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে নোবুনাগার মৃত্যু হলে রাজশক্তি হিদেয়োশীর হস্তগত হয়। নোবুনাগার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি প্রথমে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদের সহায়তা করেন। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হতে তিনি সহসা মত পরিবর্ত্তন করেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন তাতে জাপান হতে খৃষ্টধর্ম্ম চির-নির্ব্বাসিত হয়। এই দমননীতি অবলম্বন কববার কারণ দেখিয়েছেন নাগ মহাশয় দু'টি—একটি হচ্ছে "prohibition of more than one wife" আর একটি হচ্ছে খৃষ্টানদের খৃষ্টধর্ম্মে ও খৃষ্টে অচলা ভক্তি। এই উক্তির সমর্থনে নাগ মহাশয় Bryan-এর History of Japan নামক গ্রন্থ হতে নানা অংশ উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত গ্রন্থকারের গ্রন্থ আমি দেখি নাই, দেখবার প্রয়োজনও নাই। কারণ হিদেয়োশীর মত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ যে নাম-মাত্র 'prohibition of more than one wife' নিয়ে জাপানে একটা অতবড় কাণ্ড করবেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়, উপরন্তু খৃষ্টধর্ম্মে ও খৃষ্টে অচলা ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে খৃষ্টধর্ম্ম বিতাড়িত করতে বেশী দিন লাগেনি। হিদেয়োশীর এই দমননীতি অবলম্বন করবার প্রকৃত কারণ হচ্ছে অন্যরূপ। হিদেয়োশী ১৫৮৬ সালে কিউশু-দ্বীপ অধিকার করেন, কিউশু দ্বীপেই ছিল খৃষ্টানদের বড় আড্ডা। কিউশু-দ্বীপে ও অন্যান্য স্থানে জাপানী খৃষ্টানদের মনোভাব দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং অবিলম্বে প্রধান খৃষ্টান ধর্ম্মযাজককে জিজ্ঞাসা করে পাঠান—

"Why and by what authority he and his fellow propogandists had constrained Japanese subjects to become Christians ? Why he had induced their disciples and sectaries to overthrow temples ? Why they persecuted the bonzes ? Why they and other Portuguese ate animals useful to men, such as oxen and cows ?"

এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই অনুজ্ঞা প্রচার করেন—

Having learned from our faithful councillors that foreign priests have come into our estates, where they preach a law contrary to that of Japan and that they have even had the audacity to destroy temples...although the outrage merits the most extreme punishment, wishing nevertheless to show them mercy, we order them under pain of death to quit Japan within twenty days····.

হিদেয়োশীর প্রশ্ন ও অনুজ্ঞা হতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে খৃষ্টানেরা জাপানী বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করছিল। বিদেশী ধর্ম্মযাজকগণ নিজেরা না করলেও দীক্ষিত ক্ষমতাশালী জাপানীদের যে এ কাজে উৎসাহিত করছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এ সম্বন্ধে 'ব্রিটিশ বিশ্বকোষে' যা লেখা হয়েছিল তা পড়লে অনেকেরই খৃষ্টান-প্রীতি "রূঢ়ভাবে বিচলিত হবে"—

To the Buddhists priests this movement of Christian propagandism had brought an experience hitherto almost unknown in Japan—persecution solely on acount of creed. They had suffered for interfering in politics but the cruel vehemence of the Christian fanatic may be said to have now become known for the first time to men themselves usually conspicuous for tolerance of heresy and for receptivity of instruction. They had little previous experience of humanity in the garb of an Otomo of Bungo, who, in the words of Crasset, went to the chase of the bonzes as to that of wild beasts and make it his singular pleasure to exterminate them in his states."

এই কারণেই হিদেয়োশী খৃষ্টধর্ম্মের উপর বিরূপ হন এবং কঠোর দমননীতি অবলম্বন করেন। এই সময় হতে আরম্ভ করে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যা

ঘটে তা আমি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'পরিচয়ে' বিবৃত করেছি, এবং তা নাগ মহাশয়ও সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং সে সব ঘটনার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এ যুগে হিদেয়োশীর প্রবর্ত্তিত দমননীতি অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় এবং ফলে জাপান হতে খৃষ্টধর্ম্ম উৎখাত হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই দমননীতি রদ করা হয়, তার কারণ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেই জাপানী জাতি একতাবদ্ধ হয়, দলাদলি লোপ পায়, এবং রাজশক্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। এই restorationএর পর জাপানী জাতির আর কোন বহিঃশত্রু হতে ভয় করবার প্রয়োজন ছিল না। বিদেশী ধর্ম্মকে করতলগত করে রাখাও সহজসাধ্য ছিল, উপরন্তু খৃষ্টধর্ম্মকে একটু নেকনজরে দেখলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগের সুবিধা হতে পারে এ কথাও তারা বুঝতে পেরেছিল।

বর্ত্তমানকালে জাপানে খৃষ্টানের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ কিন্তু বৌদ্ধের সংখ্যা চার কোটির উপর এবং শিন্তো মতানুযায়ীর সংখ্যা দেড় কোটি। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে অন্তরায় না ঘটালেও জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। যে Japan Year Bookএর উল্লেখ নাগ মহাশয় করেছেন তাতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে দেখা যাক্—

From a practical point of view the religious denominations or sects which are officially recognised and come under the proper jurisdiction of the Bureau of Religions at present are Shinto and Buddhism. The Government gives no official recognition as regards the Christian denominations because they as such stand in no legal relationship to the Government.

নাগ মহাশয় বর্ত্তমান যুগের দু'একজন লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে জাপান নবজাগরণের প্রেরণা পেয়েছে খৃষ্টধর্ম্ম থেকে। জাপানে বৌদ্ধযুবসঙ্ঘ, বৌদ্ধমুক্তিফৌজ ইত্যাদি খৃষ্টানদের অনুকরণে গঠিত। এ গুলি যে খৃষ্টানদের অনুকরণে গঠিত হয়েছে তা সত্য। কিন্তু কেন গঠিত হয়েছে তা বোঝা অত্যন্ত সহজ। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদের উপায় ব্যাহত করবার জন্য। প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে, বিশেষতঃ হাওয়াই দ্বীপে, খৃষ্টান পাদ্রীদের এবং জাপানী বৌদ্ধদের মধ্যে কিছুকাল হতে যে নীরব সংগ্রাম

চলেছে সে সম্বন্ধে নাগ মহাশয় কোন সংবাদ রাখেন না। এই নীরব সংগ্রামের অস্ত্র হচ্ছে B. Y. M. A ; Buddhist Salvation Army, Sunday school ইত্যাদি।

আধুনিক কালেও জাপানীরা খৃষ্টধর্ম্মকে কি চোখে দেখে তা একটি ঘটনা হতে স্পষ্ট বোঝা যাবে। ১৯২৩ সালে মাৎসুওকা নামক জাপানের House of Commonsএর একজন প্রবীণ সদস্য Vaticanএ রাজদূত রাখবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই, উপরন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমস্ত জাপানে প্রবল আন্দোলন চালান হয়। মাৎসুওকা তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখান তা হতে বর্ত্তমান জাপানের খৃষ্টান প্রেমিকদের অন্তরের কথা বোঝা যাবে।

"Le Japon s'il veut conserver son rang de grande puissance doit entretenir des relations amicales avec tous les pays. Or dans presque tous les pays l'influence du catholicisme romain est considerable. Et notamment les pays qui interressent le plus le Japon, comme les republiqnes sud-americaines, sont catholiques…" (Le Japon et l'Extreme-Orient).

"জাপান যদি প্রধান রাজশক্তির মধ্যে নিজের স্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তাহলে সমস্ত দেশের সঙ্গেই তার প্রীতির সম্বন্ধ রাখবার প্রয়োজন। প্রায় সব দেশেই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রভাব প্রবল। বিশেষতঃ যে সব দেশ সম্বন্ধে জাপানের এখন সব চাইতে বেশী উদ্বেগ, দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্রগুলি, সেখানে ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত…"

সুতরাং জাপানে অত্যাধুনিক খৃষ্টান-প্রীতির হেতু হচ্ছে "দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি (ব্রেজিল, মেক্সিকো) ইত্যাদি"। এ প্রীতি খৃষ্টধর্ম্মরূপ "বালার্কের সুবর্ণ-চ্ছটায়" রঞ্জিত নয়। এর পেছনে যে প্রেরণা তা খৃষ্টধর্ম্মের নয়, Octopusএর।

এই হচ্ছে জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসের আদি এবং অন্ত, যা বাদ দিয়েছিলাম বলে নাগ মহাশয় আমাকে তিরস্কার করেছেন। কিন্তু সে আদি-অন্তও নাগ মহাশয়ের মত সমর্থন করে না। জাপানী মন আজও খৃষ্টধর্ম্মকে গ্রহণ করেনি, নোবুনাগা ও অত্যাধুনিক জাপান যেটুকু নেকনজর দেখিয়েছে তা রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য।

রাজনৈতিক প্রয়োজন না থাক্‌লে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে জাপানী কি ভাব্‌তে পারে তার প্রমাণ জাপানের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ১৭০৮ সালে সিদোত্তি নামক একজন ইতালীয় ধর্ম্মযাজক জাপানে গিয়ে পৌঁছান। তাঁকে তখনি কারারুদ্ধ করা হয় এবং হাকুসেকি নামক একজন বিচক্ষণ পণ্ডিতকে তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে বলা হয়। সিদোত্তির সঙ্গে হাকুসেকি অনেকদিন ধরে আলাপ আলোচনা করে যে বিবরণী প্রস্তুত করেন্ তার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই :

"Hakuseki reported that it was impossible to witness without emotion Sidotti's firm adherence to his own faith and he also spoke with warm appreciation of his kindly disposition and scientific knowledge. But when this man begins to speak of religion his talk is shallow and scarce a word is intelligible. All on a sudden folly takes the place of wisdom. It is like listening to the talk of two different men. *Hakuseki's attitude towards Christianity is essentially that of the educated Japanese at the present day.*" (Aston—History of Japanese Literature, p. 254).

অধ্যাপক আনেজাকি (আনেসখি নয় !) তাঁর একখানি গ্রন্থ St. Francis of Assisiর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন বলে নাগ মহাশয় মনে করেছেন যে আনেজাকির খৃষ্টধর্ম্মে প্রীতি আছে। St. Francis of Assisi বা যিশুর উপর ভক্তি বা শ্রদ্ধা থাকা এবং বর্ত্তমান যুগের খৃষ্টধর্ম্মে প্রীতি রাখা এক কথা নয়। বস্তুতঃ উপরোক্ত মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা করতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিতে হয় না। কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার missionaryরা জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মকে 'ন স্যাৎ' করবার জন্য এক বই লেখেন—Buddhism through Christian Eyes, আর আমার যতদূর মনে আছে, এ বইয়ের পাল্টা জবাব লেখেন স্বয়ং আনেজাকি—Christianity through Buddhist Eyes. বই দুখানি আমি ১৯২১ সালে জাপানে দেখেছিলাম, হয়ত এ পর্য্যন্ত এদেশে এসে পৌঁছে নাই ; তার কারণ তা মার্কিণ ও জাপানের নীরব সংগ্রামের এক পর্য্যায় মাত্র।

(২)

জাপানী বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নাগ মহাশয় বলেছেন—"আধুনিক জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের প্রভাব অর্দ্ধ শিক্ষিত ও ঈষৎ শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত-সমাজ এই ধর্ম্মকে বড় একটা গ্রাহ্য করতো না।" এ কথা যদি নাগ মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত না হয় তাহলে তিনি তা যে সব পণ্ডিতদের গ্রন্থ হতে গ্রহণ করেছেন তাঁরা যে জাপানের ইতিহাসের কিছু জানেন না তাতে সন্দেহ নাই। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম কি পরিমাণে রূপান্তরিত হয়েছে তা বর্ত্তমানে বিচার্য্য নয়। যে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে পাই তা জাপানীরা প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে কি ভাবে গ্রহণ করেছে তাই সংক্ষেপে বলবো।

শোতোকু তাইশি জাপানী সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। রাজশক্তি তাঁর হস্তগত হবার পূর্ব্বেই ৫৫২ খৃষ্টাব্দে (নাগ মহাশয়ের মতে ৫৮৩। কিন্তু সে তারিখ ভুল) প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। শোতোকু এই ধর্ম্মের প্রচারে সহায়তা করেন, কেন সহায়তা করেন তার কারণ তিনিই দেখিয়েছেন—"*Shinto* since its roots spring from the *Kami* came into existence simultaneously with the heaven and the earth, and this expounds the origin of human beings. Confucianism being a system of moral principles is coeval with the people and deals with the middle stage of humanity. *Buddhism the fruit of principles arose when the human intellect matured.* It explains the last stage of man .."

৬০৪ খৃষ্টাব্দে শোতোকু যে ১৭টি অনুজ্ঞা প্রচার করেন তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই—

"Reverence sincerely the Three Treasures—Buddha, the Law and the Priesthood for these are the final refuge of the four generated beings and supreme objects of faith in all countries. What man in what age can fail to revere this

law? Few are utterly bad: they may be taught to follow it. But if they turn not the Three Treasures wherewithal shall their crookedness be made straight?"

শোতোকুর অনুজ্ঞা প্রায় সমস্ত শিক্ষিত জাপানীই শিরোধার্য্য করে নিয়েছিল। শোতোকু বুঝতে পেরেছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন করে জাপানী জাতিকে শিক্ষিত করা এবং দেশকে উন্নত করা সম্ভব। শোতোকুর সময়ে শিতেন্নোজি নামক যে বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হয় তা যে কোন সভ্য জগতে আদর্শ হতে পারে, অন্ততঃ জাপানীরা কোন দিন সে আদর্শ অবহেলা করে নাই। এই বিহারে ছিল চারটি বিভাগ— (১) ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তন। (২) দরিদ্র ও বৃদ্ধদের আশ্রয় দেবার জন্য বাসস্থান। (৩) চিকিৎসালয় এবং চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তন। (৪) ভৈষজ্যালয়। শোতোকুর প্রচেষ্টাতেই যে জাপানী জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয় তা সকল জাপানী আজও স্বীকার করে, এবং সেই শোতোকুর আদর্শ স্থানীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত জাপানীই স্বীকার করে নেয়। শোতোকুকে জাপানীরা তাদের ইতিহাসে কি স্থান দেয় তা আনেজাকির কথা হতে বোঝা যাবে—

"En somme le prince nous apparait comme un homme aux vues larges et d'un haut idealisme. Homme d'etat superieur, il réussit a fair d'un amas de tribus divisés une nation unie; chef sagace il établit le Bouddhisme et organisa sur beaucoup de points l' œuvre de la civilisation c'est elle (Bouddhisme), qui inspira, guida, prefectionna la genie et les aptitudes de cet homme."

শোতোকুর পর বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুকাল অর্থশালী ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, খৃষ্টীয় ৮ম শতকে বা নারা যুগে (৭০৮-৭৯৪ খৃঃ অঃ) বৌদ্ধধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে। এই যুগে সম্রাট শোমু রাজপদ পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং রাজাজ্ঞায় নারার প্রসিদ্ধ "দাই-বুৎসু" (বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি) নির্ম্মিত হয়। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবার জন্য ৯৮৬,০৩০,০০০

পাউণ্ড তামা ও ৮৭০ পাউণ্ড সোণা লাগে এবং সমস্ত দেশবাসী তা স্বেচ্ছায় দেয়। খৃষ্টীয় নবম শতকে দেঙ্গো দাইশি এবং কোবো দাইশি নামক হুজন জাপানী মহাপুরুষ বৌদ্ধধর্ম্মকে যে পথে পরিচালিত করেন তা জাপানী জাতির অন্তরের পথ, এবং তাঁদের চেষ্টাতে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানী জাতির নিজস্ব ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়।

জাপানী জাতির অন্তরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের যোগসূত্র স্থাপিত হতেই সে ধর্ম্মকে অবলম্বন করে জাপানের সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা প্রভৃতি উন্নতি লাভ করল, এবং জাপানী সরকার এখনও যা National Treasures of Japanese Art বলে গণ্য করেন তা মূলতঃ এই বৌদ্ধের শিল্প সম্পদ।

জাপানের আর যে সব মহাপুরুষ এই বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এখানে তাঁদের নামোল্লেখ করাই যথেষ্ট। হোনেন (ত্রয়োদশ শতক), নিচিরেন (ত্রয়োদশ শতক), দোগেন (ত্রয়োদশ শতক) ইত্যাদি। এঁদের মহাপুরুষ বলে উল্লেখ করেছি তার কারণ জাপানীরাই এঁদের মহাপুরুষ বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

নাগ মহাশয় মোতোয়োরি ও হিরাতা নামক হু'জন জাপানী পণ্ডিতের বৌদ্ধ বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করেছেন। হু'জনেই অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যিক এবং তাঁরা বিদেশী বর্জ্জন করে জাতীয় সভ্যতার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; বৌদ্ধধর্ম্মকে বিদেশী ধর্ম্ম মনে করে স্বদেশী শিন্তোকে পুনরায় স্থাপিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। নাগ মহাশয় হয়ত জানেন না যে এঁরা কেউই সফলকাম হন নি। তার কারণ অষ্টাদশ শতকে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানী সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল, তাকে বর্জ্জন করা সম্ভব ছিল না। আর এঁদের সম্বন্ধে নাগ মহাশয় যে Aston-এর মত উদ্ধার করেছেন সেই Aston-ই কি বলেন তা দেখা যাক—

Motoori's efforts on behalf of the Shinto religion produced little tangible result. It was too late to call back the deities of the old pantheon from the hades to which the neglect of the nation had consigned them. In his own life-time nothing was done, and although a half-hearted, perfunctory attempt

to re-establish was made in 1868, the efforts of its supporters were soon relaxed ..

In them (his books) Hirata has undertaken the easy task of ridiculing popular Buddhism in Japan. They are racy and entertaining diatribes but are disgraced by scurrilous abuse quite unworthy of the would-be founder of a new form of religion. (*A History of Japanese Literature*, p. 325).

আমি পূর্ব্বে বলেছিলাম যে "জাপানে একমাত্র ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম। শিন্তো কোন ধর্ম্ম নয়।" কিন্তু নাগ মহাশয় সে কথা বিশ্বাস করেন না, তিনি মনে করেন যে "বৌদ্ধপ্রীতির বশবর্ত্তী হয়ে" শিন্তোকে ছোটো করার চেষ্টা করেছি। শিন্তো কেন ধর্ম্ম নয় তা নাগ মহাশয়ের উল্লিখিত গ্রন্থাবলী হতেই দেখানোর চেষ্টা করবো। Japan Year Book-এ শিন্তো সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

Shintoism has had little to do with the thought and life of the people, apart from its relation with the functions of the guardian deities national & local. (p. 721)

Aston বলেছেন—

"It was essentially a nature worship upon which was grafted a cult of ancestors. It tells us nothing of a future state of rewards and punishments and contains the merest traces of moral teaching . A mythical history of the creation of the world and of the doings of a number of Gods and goddesses...Add to this a ceremonial comprising liturgies in honour of these deities .." (*A History of Japanese Literature*, p. 328)

দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে এ শিন্তো জাপানে ধর্ম্ম হিসাবে গণ্য হত বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হবার পর জাপানীদের বুঝতে দেরি লাগে নাই যে ধর্ম্ম হিসাবে শিন্তোর কোন মূল্য নাই। এ কথা জাপানী ঐতিহাসিকও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন—

"The Shinto possessed no intrinsic power to assert itself in the presence of a religion like Buddhism. At no period has Shinto produced a great propagandist. No Japanese sovereign even thought of exchanging the tumultous life of the throne for the quiet of a Shinto shrine nor did Shinto even become a vehicle for the transmission of useful knowledge." (*Kikuchi* p. 229)

এ শিন্তোকে কোন জাপানী আজও ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করে না। জাতীয় অনুষ্ঠান হিসাবেই তা গণ্য হয়, এবং যে সব শিন্তো মন্দির আছে তার বেশীরভাগই জাপান সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করেন, মূলতঃ একটা প্রাচীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে। জাপানে বর্ত্তমানে শিন্তো মন্দিরের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ অথচ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৭১০০০; শিন্তো মন্দির সরকারী খরচায় চলে, কিন্তু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান চলে জাপানী বৌদ্ধদের সহায়তায়। ১২টি জাপানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিরই এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, দু' একটি সম্প্রদায়ের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, অথচ শিন্তোর কোন শিক্ষায়তন নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মকে জাপানীরা কি চোখে দেখে তা Japan Year Book হতেই দেখানো ভাল—

Buddhism has had a still greater influence on all phases of Japanese life. Its fatalism has had a retarding effect on the material progress of the Japanese as with other oriental nations but has induced a habit of dauntless composure in their behaviour and its broad philanthropy has given rise to a spirit of mutual help among the people subduing egoism or individualism. Its philosophical literature fed the national thought while its fine art has left many masterpieces enriching the cultural life of the Japanese. Buddhism is still the most powerful among the religions in Japan.

(৩)

চীনদেশে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম যে "খৃষ্টধর্ম্মের পেছনে যদি ইউরোপীয় রাজশক্তি না থাকত এবং চীনাদের যদি ভাগ্যবিপর্য্যয় না ঘট্‌ত তাহলে তারা খৃষ্টধর্ম্মকে তাদের দেশে কি স্থান দিত তা ভাববার কথা। চীনদেশে জাতীয়তাবাদ যে দিন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করবে সে দিন বৌদ্ধধর্ম্মের মত খৃষ্টধর্ম্মও সে দেশ হতে নির্ব্বাসিত হবে এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয়।" এ কথায় নাগ মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন—"চীনদেশ সম্বন্ধে বাগচী মহাশয় যা বলেছেন তাতে নিজের ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই ভাবেন যে তাঁদের অবরুদ্ধ বাসনার বোঝা বহন করা ছাড়া ইতিহাসের অন্য কোন জরুরি কাজ নেই। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ আকাজ্ক্ষা সাফল্যমণ্ডিত করা যে ইতিহাসের চরম লক্ষ্য নয়, ইতিকথা যে নিজের গরবে গরবিনী এ সব সত্য তাঁরা মনে রাখতে পারেন না।"

নাগ মহাশয় হয়ত ভুলে গেছেন যে ঐতিহাসিক দর্শনের মামুলী বুলি নিয়ে 'ফষ্টিনাষ্টি' করেন না। ইতিকথার ঘটনা-পরম্পরা তাঁকে যে পথ নির্দ্দেশ করে তিনি সেই পথেই চলেন। সেই কারণে আমি চীনদেশে খৃষ্টধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা বলেছিলাম তা হিন্দুপ্রেমিকের অবরুদ্ধ বাসনা নয়। চীনদেশে খৃষ্ট-ধর্ম্মের অবস্থার মধ্যে যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেই দিকেই নাগ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। নাগ মহাশয় যখন সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে নারাজ তখন পরম খৃষ্টভক্তদের কথা উদ্ধৃত করেই আমার 'অবরুদ্ধ' বাসনার যাথার্থ্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করব।

নাগ মহাশয় প্রথমে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "নব্য চীনের অগ্রদূত Sun Yat-sen খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন" এবং চিয়াং কাইসেকও খৃষ্টের উপাসক। কিন্তু চীনা খৃষ্টান যে কি পরিমানে খৃষ্টান তা নাগ মহাশয় জানেন না। তিনি Vine-এর "The Nestorian Churches" নামক গ্রন্থ হতে সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে Nestorian ধর্ম্মযাজকেরা সিরিয়া হতে চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচার করে এবং চীনেরা সে ধর্ম্মকে তখন নেকনজরে দেখেছিল। এ সম্বন্ধে লম্বা quotation না দিলেও চলত,

কারণ সে কথা সকলেই জানে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নাগ মহাশয় ভুলে গেছেন যে ষোড়শ শতক হতে প্রাচ্যে যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা চলছে তা Nestorian খৃষ্টধর্ম্ম নয়। বর্ত্তমান যুগের খৃষ্টধর্ম্মের পেছনে রয়েছে ইউরোপীয় রাজশক্তি, আর Nestorian missionaryদের অবলম্বন ছিল শুধু খৃষ্টভক্তি। ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকদের মনোভাব হচ্ছে—"অসভ্য প্রাচ্যকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে সুসভ্য করা", আর Nestorian ধর্ম্মযাজকদের মনোভাব ছিল—"সুসভ্য প্রাচ্যে খৃষ্টের মন্ত্র প্রচার করা"। এই মনোভাবের জন্য তারা চীনাদের হেয় জ্ঞান করত না, এবং বৌদ্ধধর্ম্মযাচকদের সাহায্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হত না। এ সম্বন্ধে *Rev.* Joseph Edkins *D. D.* তাঁর Chinese Buddhism নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—

"The Syrian Christians extended their missions in China at a time when Buddhism was in the ascendant, and *adopted terms from the professors of that religion* which indicate a more extensive principle of imitation than either the Roman Catholics or the Protestants have in later times thought of adopting....The fact that the Nestorian monks called themselves *seng*, as the Buddhist do, has some light thrown on it by an incident in the life of Mathew Ricci. He adopted a Buddhist priest's dress and shaved his head." (p. 355).

কিন্তু ধর্ম্মযাজকদের এ চেষ্টা সত্ত্বেও Nestorian খৃষ্টধর্ম্ম চীনদেশে প্রসার লাভ করেনি। ইউরোপের "নয়া" খৃষ্টধর্ম্ম চীনদেশে ষোড়শ শতকে প্রচারিত হয়। চীনারা বহুবার এ ধর্ম্মকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাজশক্তির অক্ষমতা হেতুই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই নূতন বিপজ্জালের সৃষ্টি করেছে। চীনাদের এই প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ ইতিহাস এখানে না দিলেও চলবে—১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনদেশে ভীষণভাবে খৃষ্টান-দমন চলে, পরে বিগত শতকের শেষভাগে Boxersদের যে সমিতি গঠিত হয় তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টান-দমন। এই সমিতি যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল বিদেশী রাজশক্তি তা কি ভাবে দমন করেছিল তা সকলেই জানে।

বর্ত্তমানকালে চীনদেশে খৃষ্টধর্ম্ম কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে সে সম্বন্ধে কিছু বলেই এ বাদানুবাদ শেষ করব।

খৃষ্টান চীনারা বুঝতে পেরেছে যে খৃষ্টধর্ম্ম তাদের জাতীয়তা লাভের অনুকূল নয়। তার প্রধান কারণ চীনদেশের খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলি পরিচালিত হয় বিদেশী সম্প্রদায়ের মতানুসারে, দ্বিতীয় কারণ, নানা পরস্পর বিরোধী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সৃষ্টির জন্য চীনারা একতাবদ্ধ হতে পারে না, এবং তৃতীয় কারণ এই সমস্ত সম্প্রদায়কে চালিত করা হয় বিদেশী অর্থের সাহায্যে।

[Tous les chinois sont unanimes a affirmer que ce qui fait considerer le christianisme comme une chose exotique et les Eglises comme des communautés non-chinoises, c'est le *gouvernement exerce sur les chretiens par des etrangers*...une autre chose qui exaspere les chrétiens chinois c'est le *denominationalisme.* Ces divisions rendent impossible toute action commune...Une autre question peut aussi être considérée comme definitivement jugée par l'opinion publique, c'est celle de la *discipline etrangere*....Vient ensuite la question dite des *finances etrangers.*—Mr. Timothy, the Dean of the Faculty of Theology, Peking University in *Chinese Recorder*, 1922, p. 297.—Father L. Wieger S. J.—*Chine Moderne III.*]

Rev. Frank Rawlinson নামক এক বিচক্ষণ পাদ্রী "মিশন" কলেজ ও স্কুলের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদের সম্বন্ধে কি বলেছেন তা অবধানযোগ্য। তিনি বলেন যে "সমস্ত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা বাইরে খৃষ্টান, তারা নিয়ম কানুন মেনে চলে, শাস্তির ভয়ে। কিন্তু তাদের অন্তর অন্যরূপ। অন্তরে তারা যে খৃষ্টধর্ম্মের শত্রু তা নয়, খৃষ্টধর্ম্মকে যে তারা তাচ্ছিল্য করে তাও নয়, তাদের মনোভাব নূতন ধরণের। এই মনোভাব দেখলে খৃষ্টধর্ম্মের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ মনে হয় না। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬৭জন খৃষ্টান, বাকী ছাত্রেরা কোন খৃষ্টান-সম্প্রদায়ভুক্ত হতে সম্পূর্ণ নারাজ। স্কুলের ছাত্রেরা সকলেই এই মনোভাব-সম্পন্ন। কিন্তু যারা খৃষ্টান তারাও খৃষ্টধর্ম্মকে ধর্ম্ম

হিসাবে নেয় না, চীনদেশের সামাজিক সুখ সুবিধা লাভের জন্যই তা গ্রহণ করে, এই মনোভাবের পেছনে রয়েছে, প্রচীন চীনা সমাজ-বিধান, ও কনফুসীয় প্রভাব।"

[Ne nous laissons pas tromper par les eleves qui feindrraient....S'ils observent la discipline, c'est par craintes des sanctions L'exterieur est correct. Qu'en est il de l'interieur ? ...ce n'est par l'hostilité contre le christianisme ; ce n'est pas l'indifference dedaigneuse, c'est une attitude nouvelle, bien singuliére, et qui donne fort a penser pour l'avenir....c'est le bien social pouvant resulter de christianisme pour la Chine que seul excite l'enthousiasme....un reste de confuciisme latent est an fond de cette mentalité...*Chinese Recorder*, 1922].

চীনদেশের শিক্ষিতা মহিলারা খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করে তাও অবধানযোগ্য—"ঈশ্বরের প্রেম যদি অসীম হয় তবে সম্প্রদায়ভুক্ত হবার প্রয়োজন কি ? অসীম প্রেমের ভাগ সকলেই পেতে পারে। সমস্ত প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হবার জন্য কাউকে বাধ্য করা উচিত নয়, কারণ তাতে মানবচরিত্রের অবনতি ঘটে। আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু তার জন্য সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন নাই"।(Father L. Wieger S. J.— *Chine Moderne*, III, p. 148).

চীনদেশের অত্যাধুনিক যুব সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করে তার উল্লেখ করলেই এ আলোচনা সম্পূর্ণ হবে। "খৃষ্টধর্ম্ম মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে বটে কিন্তু তার logic অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আর সে logic ভ্রমাত্মক। এ ধর্ম্মকে বাধা দেবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তার জন্য যে propaganda করা হয় তা দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক। এ ধর্ম্ম চীনা খৃষ্টানদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে খর্ব্ব করে। এবং সেই কারণে আমাদের constitutionএ তার কোন স্থান হতে পারে না। সে ধর্ম্মের প্রসার হতে না দেওয়াই দেশের পক্ষে হিতকর।"

[...Un systeme logique très serré...le systeme a été reçonnu faux. On pourrait le laisser passer, n'etait la danger-

euse propagande qui l'accompagne···Donc le christianisme ne tombe pas sous le paragraphe de la liberte de pensee et de croyance dans notre constitution...*Journal de la Jaune*। *Chine*, Wieger, p. 168].

এ সম্বন্ধে আর বেশী নজির উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নাই। যে সব মতামতের উল্লেখ করেছি তা হিন্দুপ্রেমিক বা বুদ্ধভক্তদের নয়, যে সমস্ত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক চীনদেশে বহুদিন ধরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন বা করছেন এ মতামত তাঁদের। এঁদের কথা হতেই স্পষ্ট বোঝা যাবে, চীনদেশে খৃষ্টধর্ম্ম কেন জাতীয়তার অন্তরায় ঘটিয়েছে এবং কেন তার ভবিষ্যৎ বালার্কের অরুণরাগে রঞ্জিত নয় বরং ঘোর তমসাচ্ছন্ন। এ কথা মাসিক পত্রিকার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্ত করে বলবার প্রয়োজন হত না যদি নাগ মহাশয় 'বৃহত্তর ভারত সমিতি' বা 'গোলদিঘির বিহারে' যা শুনেছিলেন তা "ইংরিজি কায়দায় with a grain of salt" না নিতেন, কারণ সেখানে যাদের কথা শুনতেন তাদের মধ্যে হয়ত বা কারু চীন জাপানের সঙ্গে যে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল তা 'American tourist'-এর পরিচয় নয়। আর বাঙ্গালীর পক্ষে "ইংরেজি কায়দার" মত "অব্যাপারেষু ব্যাপারে-" যে সত্যপথের সন্ধান দেয় না তা নাগ মহাশয়কে বলবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

অহিংসা

চার

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ উঠিল, বিপিনের দাঁতের ব্যথা কমিয়া গেল, কিন্তু তার মুখের ব্যথিত ভাবটা যেন ক্ষুব্ধ বিষাদের মেকী ইস্পাতে গড়া মুখোসের মত হইয়া রহিল কায়েমী। রাগ হইলে বীররসের মধ্যে সেটা প্রকাশ করা বিপিনের অভ্যাস নয়। সদানন্দের মত যারা তার খুব বেশী অন্তরঙ্গ তাদের কাছে কদাচিৎ তাকে রাগ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেও যেন কেমন এক খাপছাড়া ধরণের রাগ। রাগ বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, ঠোঁট বাঁকাইয়া, মুখের চামড়া এখানে ওখানে কুঞ্চিত করিয়া বাঁকা চোখে চাহিবার একটা আশ্চর্য্য কৌশল সে কোন এক সময় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আয়ত্ত রাখার জন্য রাগ করার সুযোগে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছে। এবার বিপিনের মুখ দেখিয়া সদানন্দও বুঝিতে পারিল সে রাগ করিয়াছে, কিন্তু আগেকার রাগ করার ভঙ্গির সঙ্গে একেবারে মিল না থাকায় ভাবনায় পড়িয়া গেল।

'তোর কি হয়েছে রে বিপিন ?'

'কিস্‌সু না। হবে আবার কি ?'

বিপিনের কি হইয়াছে বোঝা গেল না, কিন্তু জবাবটা বোঝা গেল। বিপিন নিজেই জানে না তার কি হইয়াছে। এ রকম ব্যাপার সকলের জীবনেই সর্ব্বদাই ঘটিতেছে, নিজের কিছু একটা হয় কিন্তু নিজের কাছে সেটা দুর্ব্বোধ্য থাকে, এমন কিছু গুরুতর ঘটনা এটা নয়, সদানন্দ তা জানে। তবে নিজের কি হইয়াছে বুঝিবার চেষ্টাটা প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে দাঁড়াইয়া গেলে তখন হয় বিপদ, অধ্যবসায়টাই সাংঘাতিক গুরুত্ব পাইয়া বসে। এবং মাঝে মাঝে কম বেশী সময়ের জন্য এ রকম অধ্যবসায় মানুষের আসে বৈকি। বিপিনের কি তাই হইয়াছে ?

'কি ভাবছিস ভাই ?'

ভাই ? সদানন্দের সম্বোধনে বিপিনের তো রীতিমত চমক লাগেই, মনেও হয় যে সে বুঝি তাকে হঠাৎ গাল দিয়া বসিয়াছে। এমন সম্পর্ক তো তাদের নয় যে এমন গভীর স্নেহার্ত্ত সুরে ভাই বলিতে হইবে, এতখানি আবেগময় আন্তরিকতার সঙ্গে ? পরস্পরকে জানিয়া বুঝিয়া তাদের বন্ধুত্ব, পরস্পরের কাছে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে যেমন তাদের লজ্জা করে না, মনের দুর্ব্বলতা আর বিকৃতি মেলিয়া ধরিতেও তেমনি ভয় বা সঙ্কোচ হয় না, অন্ততঃ কিছুকাল আগে তাই ছিল। এভাবে দরদ দেখানো তাদের মধ্যে চলিবে কেন ? কি হইয়াছে সদানন্দের আজ, সাতদিন ঘরের কোণে কাটাইবার পর ? বিপিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, সে দৃষ্টির বিশ্লেষণ-পটুতা অসাধারণ। বিপিন উসখুস করে, সেটা তার শারীরিক অস্বস্তিবোধের চরম প্রমাণ।

তখন দুপুর বেলা, ঘণ্টা দুই আগে দুজনেরই মধ্যাহ্ন-ভোজন হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাতদিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়া মনকে আরও বেশী অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য্য আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত সদানন্দ গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সকালে তাই হঠাৎ মাধবীলতাকে আজই রাত্রে ঘরে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। কে জানিত মাধবীলতাকে এমনভাবে সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে ? সকালে নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে চোখে পড়িল স্নানরতা রত্নাবলী আর উমাকে, তাই মাধবীলতাকে খুঁজিতে সে জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল আশ্রমের দিকে। মাধবীলতাকে দেখা গেল এক আম গাছের তলে। আশ্রমে যে গোয়ালা দুধ যোগায়, তার বৌ-এর সঙ্গে গল্প করিতেছে। গোয়ালা-বৌ-এর কাঁখের শিশুটি প্রাণপণে স্তন চুষিতেছিল, দুধের কারবার করে বটে গোয়ালা-বৌ, নিজের বুকে যে তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ জন্মে না, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়।

সদানন্দকে দেখিয়া গোয়ালা-বৌ সরিয়া গিয়াছিল।

'রাত্রে একবার আমার ঘরে আসবে মাধু ?'

আদেশ নয়, অনুরোধ। মাধবীলতা নয়, মাধবী নয়, মাধু। পরে দুপুর বেলা বিপিনকে ভাই বলার ভূমিকার মত।

'রাত্রে ? কখন ?'

'যখন তোমার সুবিধা হয়।'

'সন্দেবেলা ?'

'না, একটু রাত করে এসো। এই এগারটা সাড়ে এগারোটার সময়।' অনুরোধ নয়, আদেশ। এতক্ষণে মাধবীলতা বুঝিতে পারিয়াছিল, আহ্বানটা খাঁটি অভিসারের, ধর্ষণের ফলে প্রেমের জন্ম হওয়ায় এতদিন যে পূর্ব্বরাগের পালা চলিতেছিল আজ তার সমাধি।

'আজ নয়, পর্শু যাব।' একটা হাত বাড়াইয়া মাধবী আমগাছের গুঁড়িতে স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে ছিল পিঁপড়াদের সাড়ি বাঁধিয়া যাতায়াতের পথ।

'না, আজ।'

আদেশ নয়, প্রায় ধমক।

'আজ নয়, পর্শু।

মিনতি নয়, মৃদু কোমল নিরুপায় বিদ্রোহ।

সদানন্দ তখন অন্ধ আর বোকা হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচ বছরের প্রিয়াকে লজেঞ্জসের লোভ দেখানোর মত কোমল কণ্ঠে বলিয়াছিল, 'তুমি কিছু বোঝ না মাধু। আজ ত্রয়োদশী, মেঘ টেঘ না করলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠবে, জ্যোৎস্নায় বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব। এসো কিন্তু।'

পরশু কি জ্যোৎস্না উঠিবে না ? পরশু কি জ্যোৎস্নায় বসিয়া গল্প করা চলিবে না ? কিন্তু প্রতিবাদের যতটুকু শক্তি মাধবীর ছিল এতক্ষণে প্রায় সবটুকুই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার যদি সদানন্দ রাগিয়া যায় ? দুঃশাসন জানিয়াও যা বোঝে নাই, সদানন্দ কি না জানিয়া তা বুঝিবে ? তবু মাধবী অন্যভাবে চেষ্টা করিয়াছিল।

উমাশশী,কুন্দ ওরা টের পাবে যে ? একটা কেলেঙ্কারি হবে।'

'আমি সে ব্যবস্থা করব।'

সদানন্দ নিজেই যখন ব্যবস্থা করিবে তখন আর কার কি বলিবার থাকিতে পারে ? একটিবার পশ্চিমে উঠিবার সাধ যদি সূর্য্যের থাকে, একমাত্র

সদানন্দের হুকুমের সুযোগেই সাধটা মিটাইবার সম্ভাবনা কি তার সব চেয়ে বেশী নয় ?

এইজন্য সদানন্দ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পারে নাই। আহারে রুচি ছিল না। এখন সদানন্দের তাই ক্ষুধা পাইয়াছে। এদিকে দাঁতের ব্যথা না থাকায় কদিন প্রায় উপবাস করিয়া থাকিবার শোধ তুলিবার জন্যই বোধহয় বিপিন এত বেশী খাইয়া ফেলিয়াছিল যে এখন অম্বলে বুক জ্বলিতেছে। নিজেকে বিপিনের বড়ই ভোঁতা মনে হইতেছিল। সদানন্দের আদরের জবাবে সে তাই বলিল, 'ভাবছি তোর মাথা।'

তারপর ঘরে আসিল মাধবী। ঘরে ঢুকিয়াই বিপিনকে সদানন্দের সঙ্গে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সদানন্দ বলিল, 'কি মাধবী ?'

'কিছু না, এমনি এসেছিলাম।' বলিয়া বোকার মত একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মাধবী চলিয়া যায়। সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তার কাছে গেল।— 'শোন মাধু, শোন।'

কাছে গিয়া গলা নামাইয়া বলিল, 'কিছু বলবে ? চল বাইরে যাই।'

দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল, বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকা চোখে চাহিয়া রহিল খোলা দরজার দিকে।

মাধবীলতা বাহিরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বলে না। সদানন্দ চিবুক ধরিয়া তার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরেন। এটা সদানন্দের যেন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

'কি বলবে বল ?'

কি আর বলিবে মাধবী, সেই পুরাতন কথা। আবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া আজ রাত্রির অভিসার পিছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছে।

সদানন্দ জোর করিয়া মাধবীর মুখ উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ হাত সরাইয়া নেওয়ায় মাধবীর চিবুক প্রায় কণ্ঠার সঙ্গে ঠুকিয়া গেল। কিন্তু সদানন্দের মন সত্যই একটা চিন্তার সঙ্গে ঠোক্কর খাইয়াছে। কেন যে হঠাৎ

সদানন্দের মনে হইল বড় পাকা মেয়ে মাধবীলতা, বড় ঝানু, প্রায় বাজারের বেশ্যার মত! দেহটা যে বেশী-পাকা আমের মত কোমল আর রঙীন মাধবীর, আদর করিয়া তার দেহে হাত বুলানোর সময় আঙ্গুলগুলির যে পাখীর পালকের মত কোমল হইয়া যাওয়া খুবই উচিত, সদানন্দ তা জানে। কিন্তু মাধবীর ভিতরটা শুধু শক্ত নয়, পাথর। বোঁটা-ছেঁড়া ফলের মত বছরের পর বছর ধরিয়া শুকাইয়া কুঁকরাইয়া যাইতে পারিলে যেমন হইতে পারে সেইরকম শক্ত, এই ধরণের একটা চিন্তা মনে আসায় সদানন্দের কাছে মাধবীর দেহটা পর্য্যন্ত রঙচটা কাঠের খেলনার মত কুৎসিৎ হইয়া গেল।

কিন্তু—

কথাটা মনে হইল মাধবীকে বিদায় দিয়া ঘরের মধ্যে বিপিনের কাছে চৌকীতে গিয়া বসিবার পর: আশ্রমে যে আসিয়াছিল কুমারী মাধবী? তাই তো!

•

ঠিক এই সময় সদানন্দ আর বিপিনের মধ্যে একটু কলহ হইয়া গেল। কত কলহ-বিবাদই আজ পর্য্যন্ত দুজনের মধ্যে হইয়াছে, কি তীব্র ঝাঁঝ সে সব ঝগড়ার, মনে হইয়াছে জীবনে বুঝি আর দুজনের মধ্যে মিল হইবে না, কেহ কাহারও মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিবে না। কিন্তু কখন আবার বিনা ভূমিকায় দুজনে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে নিজেদেরই তাদের খেয়াল থাকে নাই। আজিকার কলহটা একেবারেই সে রকম হইল না। দুজন পুরুষের মধ্যে, বিশেষতঃ বিপিন আর সদানন্দের মত দুজন পুরুষ বন্ধুর মধ্যে এত মৃদু, এতখানি ভদ্রতাসম্মত কলহ হইতে পারে, এতদিন কে তা ভাবিতে পারিত?

বিপিন বলিল, 'ওটাকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছিস সদা।'

সদানন্দ বলিল, 'তুই তো সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দেখিস।'

বিপিন বলিল, 'ওকে আশ্রমে এনেছি আমি।'

সদানন্দ বলিল, 'তাই বলে ওর ওপরে তোর অধিকার জন্মেছে নাকি?'

বিপিন বলিল, 'অধিকারের কথা নয়। ওর ভালমন্দের একটা দায়িত্ব তো আমার আছে?'

সদানন্দ বলিল, 'অ! ভালমন্দের দায়িত্ব!'

তারপর বিপিন চলিয়া গেল নিজের ঘরে, সদানন্দ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল নদী। এ কি কলহ? এতো নিছক কথোপকথন, অলস মধ্যাহ্নের স্বাভাবিক আলাপ। কিন্তু নিজের নিজের ঘরে বসিয়া বিপিনের উপর সদানন্দের আর সদানন্দের উপর বিপিনের রাগে গা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। একজন আরেকজনের কত অন্যায়, কত অবিচার, কত স্বার্থপরতা আজ পর্য্যন্ত সহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর সত্যই সহ্য হয় না। একেবারে যেন পাইয়া বসিয়াছে।

সেদিন রাত্রে সত্যই জ্যোৎস্না উঠিল। আকাশে একেবারে যে মেঘ রহিল না তা নয়, বর্ষাকালের আকাশ তো। কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলেই তো জ্যোৎস্নার শোভা বাড়ে, অনেকদিনের বিশ্বাস এটা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিপিন বাহির হইয়া পড়িল, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল আশ্রমের এক কুটীর হইতে অন্য কুটীরে। যে কোন সময় আশ্রম পরিদর্শনের অধিকার বিপিনের আছে। রাত্রির অসংখ্য বিচিত্র শব্দ আছে, কত তুচ্ছ অদৃশ্য প্রাণী শুধু শব্দের মধ্যে প্রাণের পরিচয় ঘোষণা করিয়া চলে, তবু দিনের চেয়ে রাত্রিতে স্তব্ধতা গভীরতর। দিবারাত্রি আশ্রমকে ঘিরিয়া যে নিবিড় শান্তি বিরাজ করে, বাহিরের তপ্ত মানুষকে যা জুড়াইয়া দেয় চোখের নিমেষে, রাত্রে যেন সেই শান্তির ভাব আরও বেশী অপার্থিব হইয়া ওঠে। চোখ জুড়াইয়া যায় বিপিনের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া, মন ভরিয়া যায় মন-জুড়ানো আনন্দে, কোন কোন রাত্রে নিজেকে ভুলিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্ন পর্য্যন্ত যেন সে দেখিতে আরম্ভ করিয়া দেয়—অবাস্তব, অর্থহীন, কোমল মধুর স্বপ্ন: আদর্শের যে অবাধ্য, অপরিত্যজ্য লেজুড়কে বিপিন ঘৃণাই করে চিরদিন।

আজ স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, একটু গর্ব্ব পর্য্যন্ত বিপিন অনুভব করিল না। নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আশ্রমের ছড়ানো কুটীর আর রহস্যময় ছায়ালোকবাসী নির্ব্বাক নিশ্চল দৈত্যের মত ছোট বড় গাছগুলি দেখিয়া

গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তার শুধু মনে হইল, কি অকৃতজ্ঞ সদানন্দ, কি স্বার্থপর সদানন্দ, কি বিশ্বাসঘাতক সদানন্দ! নিজে রাজ্য সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া সদানন্দকে রাজা করিয়াছে যে, আজ সদানন্দ তাকেই হীন মতলববাদ মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ করে; অন্যমনে বিপিন এক কুটীরের অধিবাসীদের সঙ্গে দুটি একটি কথা বলিয়া অন্য কুটীরে চলিয়া যায়। কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ শয়নের আয়োজন করিতেছে, কেহ আসনে বসিয়া চিন্তা-সাধনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে, কেহ বারান্দায় বসিয়া করিতেছে মেঘের গতিতে চাঁদের গতি সৃষ্টির ভ্রান্তিকে উপভোগ।

উমা আর রত্নাবলীর কুটীরের সামনে আসিয়া বিপিনের অন্যমনস্কতা ঘুচিয়া গেল। বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া আছে শশধর, বারান্দায় থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া তার সঙ্গে কথা বলিতেছে রত্নাবলী।

চিনিতে পারিয়াও বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে?'

শশধর উৎসাহের সঙ্গে বলিল, 'আমায় চিনলেন না? সেই যে সেদিন—'

রত্নাবলী সোজাসুজি বলিল, 'উনি মহেশবাবুর ভাগ্নে।'

বিপিন বলিল, 'এত রাত্রে আপনি এখানে কি করছেন?'

বিপিনের গলার সুরে শশধরের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছিল, সে আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'মহেশবাবু বললেন কিনা—'

তার হইয়া রত্নাবলী কথাটা পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিল, 'মহেশবাবুর খুব অসুখ, একশ চারে জ্বর উঠেছে; মাধবীকে একবার দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। শশধরবাবু তাই বলতে এসেছেন, মাধবী যদি একবার যায়—'

'এত রাত্রে? দিনের বেলা বলতে এলেই হত।'

বিপিনের আবির্ভাবেই রত্নাবলী যেন বিরক্ত হইয়াছিল, জেরা আরম্ভ করায় সে যেন রাগিয়া গেল।—'আপনি বুঝছেন না। দিনের বেলা অতটা ব্যাকুল হন নি! এখন এতবেশী ছটফট করছেন যে শশধরবাবু ভাবলেন, মাধবীকে যেতে বলে গেছেন এ খবরটা জানালে হয়ত একটু শান্ত হবেন। তাই এখন বলতে এসেছেন। নইলে এতরাত্রে ওঁর আশ্রমে আসবার দরকার!'

এত কথা এক সঙ্গে রত্নাবলী কোনদিন বলে না। চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়, রত্নাবলীর দাঁতগুলি কি ধবধবে। ব্যাপারটা বিপিনের একটু জটিল মনে হইতে লাগিল। মহেশ চৌধুরীর খুব অসুখ হইয়াছে, মাধবীকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন, শুধু এই ব্যাপারটুকুই কম জটিল নয়। জগতে এত লোক থাকিতে মাধবীলতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা কেন? কতটুকুই বা তার পরিচয় মাধবীর সঙ্গে! মাধবীলতাকে কথাটা জানাইতে এত রাত্রে আশ্রমে আসিয়া রত্নাবলীর সঙ্গে শশধরের গল্প জুড়িয়া দেওয়াটাও জটিল ব্যাপার বৈকি। উমা আর মাধবীলতার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা আরও বেশী জটিল।

জিজ্ঞাসা করায় রত্নাবলী বলিল, 'ওরা খাচ্ছে।'

'এখনও খাওয়া হয় নি কেন?'

রত্নাবলী মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁঝালো গলায় বলিল, 'কারণ আছে, ওসব মেয়েদের ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। পারি না বাবু আর আপনার কথার জবাব দিতে!'

মনে মনেও কোন রকমেই বিপিন রাগ করিতে পারিতেছিল না, আশ্রমের নিয়ম-ভঙ্গ করা, তার উপর এখন কড়া কথা বলা কিছুই যেন তার কাছে গুরুতর মনে হইতেছিল না। আশ্রমের নিয়মেই যেন এসব ঘটিতেছে, আগাগোড়া যেন তার নিজেরও সমর্থন আছে। একটু ভাবিল বিপিন, তারপর কোন রকমে গলা গম্ভীর করিয়া বলিল, 'আপনি ভেতরে যান, রাত্রে কেউ কোন দরকারে আশ্রমে এলে এবার থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি বাড়ী ফিরে যান শশধরবাবু, মহেশবাবুকে বলুন গিয়ে মাধবীকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি যাচ্ছি।'

'আজ রাত্রেই যাবেন?'

'অসুখ বিসুখের সময় কি দিন রাত্রির বিচার করলে চলে? সময় বুঝে মানুষের অসুখ হয় না। বুড়ো মানুষ, এমন অসুখে পড়েছেন, তাঁর সামান্য একটা ইচ্ছা যদি আমরা না পূর্ণ করতে পারি, আমাদের আশ্রমে থাকা কেন? নিজেরা সুখে থাকার জন্য আমরা আশ্রম-বাস করি না শশধরবাবু।'

শশধরবাবু অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিপিন তাগিদ দিয়া বলে, 'দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনি যান। বলুন গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা যাচ্ছি।'

শশধর চলিয়া গেলে রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল, 'এতদূর রাস্তা যাবেন কি করে? হেঁটে?'

'সে ভাবনা তো আপনাকে ভাবতে বলিনি? আপনাকে যা বললাম তাই করুন, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

রত্নাবলী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি সঙ্গে যাব না?'

বিপিন বলিল, না।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রেনে গ্রুসের ভারতবর্ষ

ভূমিকা

বাল্যকাল থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের কাছে নিরেট পাঠ্য-পুস্তকরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ ওটাকে জানি ম্যুজিয়মের জিনিস। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আমাদের কাছে এই ইতিহাস পাঠের সজীবতা ছিল না। ওর সমগ্র রূপটা পাইনি। বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের কাছে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ওর প্রথম আবির্ভাব হয়েছে কবন্ধরূপে। গজনির মহম্মদ এই নাট্যের প্রথম যবনিকা উদঘাটন করেছেন। তার গোড়ার অঙ্কগুলোর কোনো সংবাদই পাইনি। এ ঠিক যেন দিনের প্রথম দিকে ঘোর কুয়াশা, দিনকৃত্যের উপক্রমণিকা রইল গোপনে, স্পষ্ট করে আলো দেখা দিয়েছে অকস্মাৎ বেলা দশটার পর থেকে। তখন থেকে ইস্কুলের ক্লাস বসল।

কিছুকাল ধ'রে পৃথিবীর সমস্ত মগ্ন সভ্যতার উদ্ধারের কার্য জোরের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছে। প্রচ্ছন্ন পুরাতনের অংশ এখান ওখান থেকে জেগে উঠছে,—ইতিহাসের স্মৃতির ফলকে ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে সব লিপি, অনুমান ও প্রমাণের সাহায্যে তাদের আবার তোলা হচ্ছে উজ্জ্বল ক'রে, তাদের ধারাবাহিক অর্থ উঠেছে ফুটে। তাই বহুকাল আমাদের পাঠ্যপুস্তক ভারত ইতিহাসের যে নির্মূল খণ্ড দৃশ্য আমাদের সামনে খাড়া রেখেছিল এখন ক্রমে ক্রমে তার মূলগুলো পড়েছে ধরা। তার জমির ভিতরকার রহস্য বেরিয়ে পড়ল। এখন এই ইতিহাসের সমগ্র ও সজীব রূপ অন্তরে ধারণ করবার সময় এসেছে। ফরাসী লেখকের লেখনী প্রাণ সঞ্চারের মন্ত্র জানে। ছোটো আয়তনের মধ্যে এই ইতিহাসকে রূপ দিয়েছেন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রেনে গ্রুসে। কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা যখন এই বইখানির তর্জমার খসড়া আমাকে দেখতে দিলেন আমি খুশি হলুম। তার বিশেষ কারণ এই যে আমার আশা হোলো লোকশিক্ষা-সংসদকে আশ্রয় ক'রে এই বইখানিকে সমস্ত বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে পারব। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে কিছু ছাঁটা ছুঁটির দরকার করে। তা করা

হয়েছে। সংবাদগুলিকে স্থানে স্থানে বিরল ক'রে দিয়ে মোট জিনিসটাকে আমাদের জনসাধারণের সহজে গ্রহণযোগ্য করে দেওয়াতে মূল গ্রন্থের সাংঘাতিক ক্ষতি করা হয়েছে ব'লে মনে করিনে। কেননা সাধারণের পাকস্থলীর প্রতি অবজ্ঞা করে জলমিশোনো প্রাক্‌জীর্ণ খাদ্যকেই যে তাদের পথ্যরূপে গ্রহণ করতে হবে এ আমার মত নয়। ভোজের নিমন্ত্রণে তাদের পাত শূন্যপ্রায় করে দিয়ে তবেই যে তাদের প্রতি সুহৃদের উপযুক্ত ব্যবহার করা হয় এ কথা সত্য নয়। যা পুষ্টিকর ও তুষ্টিকর তা প্রায় সবই রাখা যেতে পারে। যাঁরা ভোগ করবেন তাঁরা আপন রুচি ও শক্তি অনুসারে নিজেরাই কিছু কিছু বাছাই ক'রে চলতে পারবেন।

শেষকালে একটা কথা ব'লে রাখি। এই রচনাটির সঙ্গে আমার নাম বড়ো অক্ষরে জড়িত করা হয়েছে, তাতে আমি কুণ্ঠিত। সমস্তটার গাঁথুনি যাঁর হাতে, কীর্তি তাঁরই একলার—শেষের পালায় যে লোকটা চুনকাম করতে এল তার নাম কি স্মরণীয়?

'পুনশ্চ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪।৮।১৯

প্রাগৈতিহাসিক ভারতের মানুষ—মুণ্ডা ও দ্রাবিড় জাতি

ভাষার দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য অধিবাসীদের দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: এক দলের ভাষা ছিল মুণ্ডা, আর এক দলের দ্রাবিড়।

বহুবিস্তৃত ঐ মুণ্ডা ভাষার জ্ঞাতিবর্গ। ইন্দোচীন বা পেগু-কম্বোজের মন-খ্মের ভাষা, মলয়-উপদ্বীপের অষ্ট্রো-এসিয়া শ্রেণীভুক্ত একাধিক উপভাষা ও মলয়-পলিনিসিয়ার সবগুলি ভাষাই মুণ্ডাভাষার স্বগোত্র। বাংলাদেশের সাঁওতাল, ছোট নাগপুরের মুণ্ডা ও কোল, বিন্ধ্যাচলের ভীল প্রভৃতি নানা আদিম জাতি এই ভাষায় কথা বলে; এদের মোট লোক সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের উপর। সিলভ্যাঁ লেভি মহোদয় নাকি কাশ্মীর থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যভারত পর্য্যন্ত বহু ভৌগোলিক নামের মধ্যে মুণ্ডাভাষার জ্ঞাতিস্থানীয় সব উপভাষার ছাপ দেখতে পেয়েছেন।

দ্রাবিড় ভাষাগুলি একেবারে ভিন্ন পর্যায়ের। ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে এদের নাড়ির যোগ। মনে হয় কোনো এক সময় দ্রাবিড় জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, কেননা, এদের দর্শন মেলে দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চল থেকে কর্ণাটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ; আবার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেলুচিস্থানের ব্রাহুইরা কথা বলে দ্রাবিড়ের একটি উপভাষায়।

আর্যেরা ভারতবর্ষে আসার পর দ্রাবিড়রা গেল দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে, আর মুণ্ডাভাষী জাতিরা আশ্রয় নিল মধ্যভারত ও বাংলাদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাক-আর্য অধিবাসীদের অনেকেই গেল আর্যদের সঙ্গে মিশে। যথা, মরাঠা জাতি। এরা নাকি এককালে ছিল দ্রাবিড়। কিন্তু এদের ভাষা এখন বিজেতা আর্যদের ভাষা, এমন কি মহারাষ্ট্রী নামে এদের ভাষার একটি শাখা সাহিত্যিক প্রাকৃতের পদবী লাভ করেছে। দক্ষিণ-ভারতবর্ষের অন্ধ্র, কানাড়া, ও তামিল অঞ্চলের দ্রাবিড় অধিবাসীরা ধর্ম্ম ও সমাজ সংগঠনে আর্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সত্ত্বেও শুধু যে নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সঙ্ঘবদ্ধভাবে রক্ষা করেছে তা নয়, বিশ লক্ষের উপর আদিম জাতিসমূহের লোকেদের ভাষার উপর নিজেদের ভাষার আধিপত্য এরা বিস্তার করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে গোণ্ডওয়ানার গোণ্ডদের। ভারতীয় সভ্যতার সৌধ নির্ম্মাণে মূল্যবান মাল মশলার যোগান এরা দিয়েছে, সুতরাং নিকৃষ্ট বা বর্ব্বর জাতি বলে এদের উপেক্ষা করার কোনো হেতু নাই।

আর্য হিন্দুদের প্রতিভার ক্রমবিকাশে দ্রাবিড়দের প্রভাব সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ গবেষণা এখনো হয় নাই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই প্রভাব অনুমান করা সম্ভব। প্রথমত, ধরা যাক ধর্ম। একাধিক সাম্প্রদায়িক ধর্মের (শৈব বা বৈষ্ণব), এমন কি বোধ হয় জন্মান্তর বাদ ও জাতিভেদ প্রথার মূলেও, রয়েছে যে-প্রভাব, লেভি মহোদয়ের মতে তা আর্য মনীষার স্বকীয় দান নয়। তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও মেইয়ে (Meillet) মহাশয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য : প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই তথাকথিত মূর্দ্ধ বর্গ পাওয়া যায় একে মোটেই দৈব ঘটনা বলা চলে না ; কেন না এগুলি পাওয়া যায় দ্রাবিড় ভাষায়, এবং এই দ্রাবিড় ভাষার স্থান কতক পরিমাণে দখল করেছে সংস্কৃত ভাষা।

প্রাক-আর্য্য সিন্ধু-সভ্যতা

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের স্যর জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহনি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কিছুকাল আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মৃত্তিকাগর্ভে আবিষ্কার করেছেন প্রাক্-আর্য ভারতবর্ষের দুটি প্রধান সহরের ধ্বংসাবশেষ—একটি সিন্ধুদেশের মাহেঞ্জো-দারো, আর একটি পঞ্জাবের অন্তর্গত হারাপ্পা। ফলে, উদ্ভব হোলো নতুন এক সমস্যা: প্রাক-আর্য ভারতবর্ষের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার কি সম্বন্ধ ? এই দুটি সহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে যা পাওয়া গেছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে সিন্ধু-উপত্যকায়, বিশেষ ক'রে মাহেঞ্জোদারোয়, এমন এক জাতির বাস ছিল যারা সভ্যতার উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিল—যদি সভ্যতার মাপকাঠি হয় বাহ্য উপকরণের বহুলতা ও বৈচিত্র্য। "নব পাষাণ" যুগ অতিক্রম ক'রে এই জাতি পদার্পণ করেছিল "পিত্তল যুগে"। এদের নিদর্শন আজ আমরা পাই পালিশ-করা পাথরের এক প্রস্থ যন্ত্রে, পিতলের জিনিষপত্রে, সোনারূপার গহনায়, শাদা ও নীল রঙ মেশানো চকচকে মাটির বাসনে—এশিয়া মাইনরের প্রাচীন মৃৎশিল্পের সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে। এরা আরো রেখে গেছে খোদাই-করা মূর্তিসমেত অনেকগুলি সীলমোহর, আর এক রকম ছবির লেখা যার সঙ্গে হাইরোগ্লেফিক-এর সম্পর্ক তখনো ছিল নিকট। অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রাত্নতাত্ত্বিক অভিযান ১৯২৩ সালে কিষ (Kish) নগরে প্রাচীনতম সুমেরীয় স্তরে (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ) আদিম ক্যালডিয়ার যে সীলগুলি আবিষ্কার করে সেগুলির উপরে খোদিত ষাঁড়ের মূর্তির সঙ্গে মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার সীলের ষাঁড়ের মূর্তির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। মাহেঞ্জোদারোতে আবার এক দাড়ি-ওয়ালা মানুষের চূনের মূর্তি পাওয়া গেছে যার মাথার গড়ন চওড়া (brachycephalic) আর চোখ সরু ও লম্বা। চারুশিল্পের ঐতিহাসিক গোলোবিউ ও আসীরীয়তত্ত্বজ্ঞ ডেলাপোর্ট মনে করেন এই মূর্তিটি সুমেরীয় ধাঁচের।

সুমেরীয় ক্যালডিয়া ও প্রাক-আর্য্য ভারতবর্ষের সঙ্গে যে যোগাযোগ ছিল এই সব সীল আর মূর্তি দেখলে তা স্বতই মনে হয়। কিন্তু তাই ব'লে সিন্ধুতীর-বাসী ও ইউফ্রেকসতীরবাসী এই দুই জাতির মধ্যে যে একেবারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

ছিল এমন সিদ্ধান্ত করার কোনো হেতু নাই। স্যর জন মার্শাল বলেন এই বিষয়টিকে দেখা উচিত ব্যাপকভাবে, কেন না সিন্ধুনদের প্রাক-আর্য সভ্যতা ছিল এমন এক বহুবিস্তৃত সংস্কৃতির অঙ্গ যা শুধু উত্তর-পশ্চিম ভারত বা মেসোপটেমিয়াতে আবদ্ধ ছিল না, প্রাক-আর্য ইরান ও পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের বৃহৎ অংশও ছিল এই সংস্কৃতির অঙ্গীভূত; এমন কি ভূমধ্যসাগরের ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এই সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। মাহেঞ্জোদারোর ও ঈজিয়ান মৃৎপাত্রের মতন চিত্রিত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে কোয়েটা সহরের ২৫০ মাইল দক্ষিণে নাল নামক এক গ্রামে; মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধুনদের মধ্যে এই হোলো প্রথম পথনির্দ্দেশক চিহ্ন।

তবু কিন্তু স্যর জন মার্শাল মনে করেন যে, সিন্ধুনদের সংস্কৃতি বিরাট ও অখণ্ড ভারত-সুমেরীয় সংস্কৃতির একটি অংশমাত্র হলেও তার এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা তার সম্পূর্ণ স্বকীয়। মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার সীলের উপর পাওয়া যায় গোরু, বাঘ, হাতি, গণ্ডার ও অশ্বত্থ গাছের নকসা—এ সবই ভারতবর্ষের জন্তু জানোয়ারি ও গাছপালার নিদর্শন; কিন্তু পাওয়া যায় না ঘোড়া, কারণ ঘোড়া এদেশে আসে অনেক পরে, আর্য্যেরা যখন ভারত আক্রমণ করেন তাঁদের সঙ্গে। এই সব কারণেই স্যর জন অনুমান করেন যে সিন্ধুতীরের প্রাক-আর্য সহরগুলির সংস্কৃতি যদিও আর্য্য ইরানের সুমেরীয় সংস্কৃতির সমগোত্রীয় ছিল, তবু ঐ সহর-গুলির অধিবাসীরা ছিল একেবারে খাঁটি ভারতবর্ষের মানুষ; বেলুচিস্থানের ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতির পূর্ব্বপুরুষ হয়তো এরাই। এদের সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছিল সম্ভবত আর্যদের আক্রমণে; যেমন, ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গৌরবময় সভ্যতাও প্রায় একই সময়ে ধ্বংস হয়েছিল বোধহয় প্রাচীন গ্রীকদের আক্রমণে।

কিন্তু সিন্ধু-উপত্যকার এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা কি এমন সম্পূর্ণভাবে লোপ পেল যে ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষে তার কোনো ধারাই সঞ্চারিত হয় নাই? এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, কেন না আমাদের নির্ভর শুধু অনুমান। স্যর জন মার্শালের সঙ্গে শুধু এইটুকু বলে আমরা ক্ষান্ত হতে পারি যে, মাহেঞ্জোদারোতে একটি ফলকের উপর দেখা গেছে, বুদ্ধমূর্তির মতন পদ্মাসনে আসীন এক মূর্তি, চার পাশে প্রণাম করছে ভক্তবৃন্দ, আর পিছনে রয়েছে উদ্যতফণা এক সাপ।

আর্যজাতি

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সভ্যতার প্রবর্ত্তক আর্যজাতি। বিস্তৃত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এই আর্যদের ভাষা। জার্ম্মান, ইটালো-কেল্‌টিক্, গ্রীক, আর্ম্মানি, বল্‌টোশ্লাভ ও ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবলী এই পরিবারেরই শাখা-প্রশাখা। এমন কি তুখারীয় ও হিটাইট ভাষার ইন্দো-ইউরোপীয় অংশও এর অন্তর্ভুক্ত।

এই যে বহুবিস্তৃত আর্যজাতি, কোথায় ছিল এঁদের পূর্ব্বপুরুষদের আদিম নিবাস? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, হয় পশ্চিম সাইবেরিয়ায়, নয় রুষীয় বা চৈনিক তুর্কিস্থানে, কিম্বা দক্ষিণ রুষদেশে। কিম্বা হয়তো দান্যুব নদীর কোলে বোহেমিয়া-হাঙ্গেরি-রুমেনিয়া অঞ্চলে, বা জার্ম্মানি ও পোল্যাণ্ডের যে-অংশে 'বীচ' (Beach) গাছ জন্মায় সেই জায়গায়। ইন্দো-ইউরোপীয় সব ভাষাতেই এই 'বীচ' গাছের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কোনিগসবার্গ (Koenigsberg) থেকে ক্রিমিয়া (Crimea) পর্য্যন্ত যদি সোজা লাইন টানা যায় তার পূর্ব্বদিকে এই গাছ জন্মায় না।

যা হোক, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই রকম কোনো একটি অঞ্চলে আর্যদের পূর্ব্বপুরুষেরা করতেন একত্রে বসবাস। তারপর এখন থেকে আড়াই হাজার ও দুই হাজার বছর আগেকার মাঝামাঝি কোনো একটা সময়ে—যাকে সচরাচর ইউরোপীয় পিত্তল-যুগ বলা হয় সেই যুগে—এই আদিম বাসস্থান ছেড়ে এঁদের প্রস্থান সুরু হোলো, বিশেষ ক'রে ইন্দো-ইরানীয়দের পূর্ব্বমুখী যাত্রা। অবশ্য এই যে সব যুগ-নির্দ্দেশ তা সম্পূর্ণ আনুমানিক।

এই জাতীয় একটি অনুমানে হার্ট ও মাসপেরো নামক পণ্ডিতদ্বয়ের বিশেষ আস্থা আছে। তা হোলো এই যে, আর্যদের ইন্দো-ইরানীয় শাখা এসিয়ায় প্রবেশ করেন দক্ষিণ রুষদেশ ও ককেসাস পর্ব্বতের পথে। বাস্তবিকই প্রায় ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে দক্ষিণ রুষদেশে যে এক সমৃদ্ধ সভ্যতা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দুই হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের কিছু পরে ইন্দো-ইরানীয়গণ ককেসাস পর্ব্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে পৌঁছে সম্ভবত আরান নামক জায়গায় কিছুকাল বিশ্রাম

করেছিলেন। প্রাচীন ইরানীয় ধর্ম্মগ্রন্থে 'অয়রিনায়াম বায়্জো' নামে যে-জায়গার বর্ণনা পাওয়া যায় বোধহয় সেই জায়গাই হোলো এই আরান। অবশ্য এই মত শুধু একদল পণ্ডিতের। জাইলস প্রভৃতি আর একদল পণ্ডিত বলেন, ইন্দো-ইরানীয়গণ এসিয়ায় এসেছিলেন বস্ফরাসের পথে। এই মতের পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। আবার তৃতীয় একদল, যথা মর্গ্যান ও মোরে, বলেন, ইন্দো-ইরানীয় সম্প্রদায় পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে তুর্কিস্থান ও ইরানে নেমেছিলেন।

কিন্তু উত্তরকালে ইন্দো-ইরানীয়গণ যে-পথেই যাত্রা করুন না কেন, উপস্থিত সমস্যা হোলো, তাঁরা ইরানে এসেছিলেন ঠিক কোন সময়ে? এই সময়-নির্ণয়ে কিছু সাহায্য পাওয়া আসিরীয়-তত্ত্বের যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের কাছ থেকে। এঁরা বলেন, খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ১৯০০ বৎসর আগে ক্যালডিয়ার সীমান্ত-প্রদেশে, ইরান উপত্যকার পশ্চিম কিনারায়, ক্যাসাইট নামক এক নতুন জাতির আবির্ভাব হয় ও দেড় শতাব্দী পরে তারা ঐ প্রদেশ দখল করে বসে। মনে হয় এই ক্যাসাইট জাতির মধ্যে আর্যরাও কিছু কিছু ছিলেন—এদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি গ্রামে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে-যোগ ছিল তার আভাস পাওয়া যায়। সে যাই হোক, ক্যালডিয়ায় ঘোড়ার আমদানি করেন এঁরা—এঁদের আগে ঐ দেশে ঘোড়া ছিল অজ্ঞাত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৯০০ সনের কাছাকাছি ক্যালডিয়ায় ঘোড়ার আগমনের প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মতে ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিলেন ইন্দো-ইউরোপীয়গণ (আর্যজাতি), আর যেখানে তারা গিয়োছিলেন ঘোড়া ছিল তাঁদের সঙ্গী। সুতরাং ক্যাসাইটরা হয় আর্যদের অগ্রবাহিনী, নয় এমন এক জাতি আর্যদের আগমনে যারা প্রতিহত হয়েছিল। যে-দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে ইরান-উপত্যকায় এদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খৃষ্ট-জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে। আমরা আরও জানি, পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় বা প্রাচীন মিটান্নিতে কয়েকটি আর্য গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; কয়েক শতাব্দী পরেও তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যদি সাইবেরিয়া বা সার্ম্ম্যাসিয়া সম্বন্ধে অনুমান ঠিক হয়, তাহলে এরা পশ্চিম আর্য অভিযানের অগ্রবাহিনী, অপর পক্ষে যদি জার্ম্মান-বলটিক বা

ড্যান্যুব নদীর পথে আর্যেরা এসেছিলেন এই অনুমান সত্য হয়, তাহলে এঁরা ছিল তাঁদের অনুবর্ত্তী। আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিলালিপিতে মিটান্নীয় দেবসভার মধ্যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অশ্বিনী প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উপরন্তু, মিটান্নীয় রাজাদের নামে—মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ছিল—আর্য নামের আদল মেলে। কিন্তু এঁরা ছিলেন, যূথভ্রষ্ট গোষ্ঠীমাত্র, কেননা ইন্দো-ইরানীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আসিরীয় ক্যালডীয় রাজ্যের পাশ কাটিয়ে বাসা পত্তন করেছিলেন আরও পূর্ব্বদিকে ইরাণ দেশের বিপুল অধিত্যকা ভূমিতে, উর্ম্মীয় হ্রদ থেকে একেবারে কাবুল পর্য্যন্ত।

তারপর একদিন এই জাতির পূর্ব্বতম শাখা, অর্থাৎ ভারতীয় আর্যদের পূর্ব্বপুরুষেরা, মীদ, পারসিক, ব্যাক্ট্রীয় ও সুগদীয় জাতিদের ইরানে পরিত্যাগ ক'রে কাবুল নদী বেয়ে নামলেন নীচে, তারপর ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন সিন্ধু নদ পার হয়ে। ক্রমের শত্রু হাত হাত থেকে তাঁরা জয় করে নিলেন সিন্ধুনদ ও সরস্বতী নদীর মাঝালাঝি সমতল ভূমি। বেদে যে রাক্ষস বর্ব্বর দস্যু প্রভৃতির বর্ণনা আছে সম্ভবত তারাই এই শত্রু; হয়তো, এরা ছিল দ্রাবিড় বা মুণ্ডা জাতি, আর প্রাগৈতিহাসিক হারাপ্পার অধিবাসীও ছিল এরা। আর্যরা ঠিক করে যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তা কেউ জানে না; মোটামুটি বলা চলে এই ব্যাপার ঘটেছিল খ্রীষ্ট-জন্মের দু'হাজার থেকে একহাজার বছর আগে কোনো এক সময়ে।* যাই হোক, ভারতবর্ষে পৌঁছে কিছুকাল তাঁরা ছিলেন পঞ্জাবে, তখন সরস্বতী নদী ছিল তাঁদের পূর্ব্ব সীমানা। কিন্তু আবার পূর্ব্বদিকে তাঁদের যাত্রা সুরু হোলো, আর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা শত্রুজয় ক'রে গঙ্গার উপত্যকা অধিকার ক'রে বসলেন। এইভাবে প্রথমে তাঁদের দখলে এল কুরুক্ষেত্র (অর্থাৎ শতদ্রু ও যমুনা নদীর মাঝামাঝি সরস্বতী নদীর উপরিভাগ, বর্ত্তমান সিরহিন্দ নামে যা পরিচিত) আর মধ্যদেশ (যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব), তারপর মধ্য গঙ্গার তীর বা প্রাচীন ভারতের কোশল, অর্থাৎ বর্ত্তমান অযোধ্যা ও

---

* এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে এই সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০০ ও ১৫০০ বর্ষের মধ্যে; মিলভ্যাঁ লেভি মহোদয়ের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০ বর্ষের অল্পকাল পরেই।

কাশী অঞ্চল। সর্ব্বশেষ তাঁরা জয় করলেন নিম্ন গঙ্গার উপত্যকা-ভূমি, অর্থাৎ প্রাচীন মগধ বা বর্ত্তমান দক্ষিণ বিহার, আর অঙ্গ বা বঙ্গদেশ। কিন্তু বৌদ্ধ যুগের আগে এই শেষোক্ত প্রদেশগুলি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেনি। বহুকাল পর্যন্ত আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ও ব্রাহ্মণত্বের পুণ্যভূমি ছিল কুরুক্ষেত্র ও মধ্য দেশ।

আর্যরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষে জয় করেছিলেন শুধু গঙ্গার দুই তীরস্থিত অঞ্চল ও এই অঞ্চলেরই অঙ্গস্বরূপ মালব অধিত্যকা। পরে এই সমগ্র অঞ্চলটির নামকরণ হয় "আর্যাবর্ত্ত"। আগেই বলা হয়েছে, তা ছাড়া বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র-দেশবাসী দ্রাবিড়দেরও তাঁরা নিজেদের দলভুক্ত ক'রে নেন, ফলে, উত্তরকালে তারাও 'আর্য' আখ্যা লাভ করে। আরও দক্ষিণে, তেলেগু, তামিল ও কানাড়ি প্রভৃতি ভাষাভাষীরা নিজ নিজ স্বাধীনতা ও ভাষা আর্যদের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারলেও, ক্রমে ক্রমে ইন্দোচীন, মলয়, কম্বোজ ও যবদ্বীপের অধিবাসীদের মতন তারাও আর্য সভ্যতার প্রভাব স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে বিনা যুদ্ধে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

এই কথা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে আর্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার ও জাতিভেদ প্রথা কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। সম্ভবত আর্যরা স্বজাতির শুদ্ধতা রক্ষার জন্যে দ্রাবিড়দের ও নিজেদের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করেছিলেন, ও নীচ শূদ্র বলে দ্রাবিড়দের তাঁরা গণ্য করতেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ করবার বিষয় এই যে সংস্কৃত ভাষায় জাতিভেদের 'জাতি'র প্রতিশব্দ বর্ণ, অর্থাৎ গায়ের রঙ। কালক্রমে, ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা (পরে অভিজাতবর্গ) ও বৈশ্য বা চাষী—আর্যদের এই তিন উচ্চ শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যে তাঁরা একাধিক ব্যবধান রচনা করলেন। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীকে বিধিবদ্ধ ও স্থায়ী জাতির গণ্ডীতে পরিণত করেছিলেন সম্ভবত ব্রাহ্মণেরা—নিজেদের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে। জাতিভেদ প্রকার সঙ্গে জন্মান্তরবাদকে জড়িয়ে তাঁরা এই শ্রেণীবিভাগকে ইহকাল থেকে পরকাল পর্যন্ত প্রসারিত করতে পেরেছিলেন।

এই মত অবশ্য সকলে গ্রহণ করতে না পারেন। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে ভালে পুঁসা প্রমুখ একাধিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনে করে যে, জাতিভেদ প্রথার মূলমন্ত্র যে স্বজাত-বিবাহ, তা আর্য সভ্যতার ফল। অপর পক্ষে, ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে, যে সিলভ্যাঁ লেভি প্রভৃতি অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে জাতিভেদ প্রথা ও জন্মান্তরবাদ আর্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নয়—স্থানিক পরিবেষ্টনের প্রভাবে এদের উৎপত্তি। কারণ যাই হোক না কেন, এর ফলে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল বিশেষভাবে যা ব্রাহ্মণদের স্বার্থের অনুকূল।

পরস্পর

তবু ভুলে থাকি।
দেহের প্রাসাদ হ'তে এই আত্মা জাগিবে একাকী,
পৃথিবীতে চেতনার শ্মশান যে দিন
পিশাচ মৃত্যুর ছায়া-কঙ্কাল ভাষায়
খুলে দেবে গাঢ় পথ ঋভুলোক-পানে ;
পার্ব্বত্য বিস্মৃতি, আর
স্তব্ধতার স্তিমিত তুষার
শ্বাসরুদ্ধ শূন্যতায় হানিবে কঠোর ;
যে দিন উধাও বেদনায়
সর্ব্ব পরিচয় হ'তে চলে যাব কোনো এক বিমূঢ় শ্মশানে :
মৃত্যু হবে মোর ॥

•

আয়ুর মুহূর্ত্তগুলি
জীবনের চক্রপথে শত সূর্য্য রজত রেখায়
আবর্ত্তিয়া ফেরে আজো প্রাগূষা-গোধূলী।
সে বৃত্ত অপূর্ণ মৃত্যু-রাহুর ছায়ায়
অকস্মাৎ। পৃথিবী বিশাল,
বিজন অনন্তকাল,
অতঃপর আমি-হারা দুর্জ্জেয় আঁধার।
আমার ইন্দ্রিয়, মন,
জানিবে না আগন্তুক কোনো সমাচার।
অনাত্মীয় নির্ব্বাসন
ভয়াবহ বিস্মৃতির দিগন্ত চূড়ায়,—
পিশাচ ইঙ্গিতে মৃত্যু দিয়ে যাবে এই পুরস্কার ॥

আমার আরক্ত প্রেম ক'রে দেবে ম্লান
মৃত্যু। হবে ধূলিসাৎ
আশার তোরণ।
আমার স্মরণে, কণ্ঠে, ছেয়ে দেবে অলৌকিক স্থির পক্ষাঘাত
আচম্বিত ইন্দ্রজালে চতুর মরণ
জানি ; তবু ভুলে থাকি।
তবু নিত্য ক্ষুরধার প্রেম,—আশা,—আশার স্বপন ;
জীবিকা সংস্থান,
অতুষ্টি, কলহ, অভিমান ;
পৃথিবীতে তবু বাঁচি জীবনের বলিষ্ঠ বিলাসে
প্রতি পলে, দণ্ডে দণ্ডে, প্রহরে প্রহরে।
কালের তমিস্র গর্ভে সৌর প্রতিভাসে
আমাদের জ্বলে ওঠা বুদ্বুদ শিখরে।
ফেটে পড়ে প্রাণবায়ু মৃত্যুর অসহ্য উপহাসে।
তবু ভুলে থাকি॥

২

ভুলে থাকি। এই ভ্রান্তি সর্ব্ব মানবের
যুগ যুগান্তের।
বিষাক্ত বিদ্রূপে আমি ইহারে দেব না অপবাদ।
মৃত্যু আছে কে না জানে ?
আঁধারের মত ঘোরে আয়ুর শ্মশানে
গলিত মৃত্যুর ছায়া, মৌন নির্নিমেষ।
কে না জানে জীবনের উচ্চকিত শেষ।
তবু তারে ভুলে থাকা,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা
গতিষ্ণু দিনের,
রঙ্গীন উত্তাল স্বপ্ন মহা জীবনের,

প্রেম, আশা, মমত্বের কবোষ্ণ প্রসাদ,—
ইহারে দেব না অপবাদ।

মানুষের মৃত্যু নেই।
মৃত্যু শুধু বিশেষের, আমার তোমার।
বিবর্ণ স্তম্ভিত মৃত্যু উদ্বোধিত নব জীবনেই।
বিরাট কালের প্রান্তে মরণের স্খলিত প্রহার
সমন্বিত জয়যাত্রা করে না স্বীকার।
মানুষের মৃত্যু নেই,
মৃত্যু শুধু, আমার তোমার।

মণীন্দ্র রায়

হারানো সুর

লঘু ভাবনার স্রোতে কত কি যে আসে আর যায়।
সেদিন গেল একটি ভাবনা মন থেকে
গেল কোথায় স'রে।
যেন একটি ছোট ছেলে হারিয়ে গেল
বন থেকে বনান্তরে
ঘন নিবিড় গাছের আড়ালে আড়ালে
নদীর ধারে ধারে
নিরুদ্দেশ।
যেন খ'সে গেল একটি তারা
তা'র জ্যোতির্বলয় নিয়ে
আর্কষণের কাটাকাটির মধ্যে
অসীমায়।
যেন ডুবে গেল একটি ছেলে
দলছাড়া হ'য়ে নদীর স্রোতে
ঘনশৈবালের আলিঙ্গনের মধ্যে
অচেনা অস্পষ্ট জগতে!

সে দেখ্‌বে না আর রৌদ্র,
দেখ্‌বে না এই হাসি, এই আলো, এই মেলা।
মনের মধ্যে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে দেখ্‌লাম
জাল ফেল্‌লাম মনের নদীতে
লোক পাঠালাম বন থেকে বনান্তরে
নিয়ে এলাম দূরবীক্ষণ
হারানো তারাটির সন্ধানে—
সে কি পাওয়া যায় ?

*

সান্ত্বনা এই—
যদি কোনোদিন
এই পৃথিবীর পথের 'পরে
এই পৃথিবীর আলোতে ছায়াতে
অনেক হাসি, অনেক চেনা-শোনা
অনেক আনাগোনার মধ্যে,
পথের কোনো এক বাঁকে,
কোনো ফাল্গুনের উদাস-করা সন্ধ্যায়,
কিংবা কোনো চৈত্র রাত্রে,
কিংবা কোনো ঘন বরষণের
উদাসীন অবিরাম রিমিঝিমিতে,
কিংবা কোনো শীতের
উত্তপ্ত নীড়ে,
হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতে পারে
তা'র সঙ্গে—
এমন ত কত হয়!
তখন হেসে বল্‌ব,
'কোথায় ছিলে এতদিন ?'

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

দেশ-বিদেশ

ফেডারেশন

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত: এক ভাগ প্রাদেশিক শাসন-সংক্রান্ত, অপর ভাগ কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রে এই আইন অনুযায়ী যে-পরিবর্ত্তন হয় তাহার ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্বায়ত্বশাসনের অর্থ, প্রথমত, প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের প্রাধান্য; দ্বিতীয়ত, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের অন্তর্ভুক্ত ও তাহাদের অধীন মন্ত্রিমণ্ডলের উপর প্রাদেশিক শাসনভার অর্পণ। অবশ্য সর্ব্বোপরি রহিয়াছেন প্রাদেশিক গভর্ণর এবং তাঁহার হাতে যে-বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলের স্বাধীনতা তিনি বহুল অংশে খর্ব্ব করিতে পারেন; কিন্তু তৎসত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। এই ক্ষমতার প্রয়োগে গভর্ণরের যথেষ্ট বাধা দিবার অধিকার থাকিলেও গভর্ণর বাধা দিবেন না, প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণের পূর্ব্বে, মোটামুটি এই রকম একটি চুক্তি কংগ্রেস আদায় করিয়া লইয়াছে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কিন্তু আরও একটি অর্থ হয়: কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা ও প্রভাব হইতে প্রাদেশিক সরকারের মুক্তি। এই হইল ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রের মর্ম্ম, অর্থাৎ ফেডারেশন বলিতে বুঝায় এইরূপ স্বাধীন "রাষ্ট্র" বা অঞ্চলসমূহের সমষ্টি। আপাতত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্বায়ত্বশাসনাধীন হইলেও সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের চরম শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে; বড়লাট বা গভর্ণর-জেনারেলকে তাই ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনযন্ত্রের সর্ব্বাধ্যক্ষ বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় 'ইউনিটারি' বা একতান্ত্রিক। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের দ্বিতীয় অংশের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহারই পরিবর্ত্তে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত

কার্য্যে পরিণত হয় নাই, শীঘ্রই যাহাতে হয় তাহার জন্য তোড়জোড় চলিতেছে।

এই স্থলে ভারতীয় ফেডারেশন-পরিকল্পনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত : এক ভাগ ব্রিটিশ ভারত, আর এক ভাগ দেশীয় রাজ্যসমূহ। সংখ্যায় এই দেশীয় রাজ্যগুলি পাঁচশতের অধিক এবং তাহাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা একেবারে মধ্যযুগীয় অর্থাৎ স্বৈরতান্ত্রিক; কিন্তু এক ছাঁচের স্বৈরতান্ত্রিকতা নহে, রাজ্যভেদে ইহার প্রকৃতি বিভিন্ন।* ব্রিটিশ ভারতের ন্যায় এই রাজ্যগুলিরও সর্ব্বময় কর্ত্তা বড়লাট—কেননা তাঁহারই চরম নির্দ্দেশে এই রাজ্যগুলির শাসকসম্প্রদায় ওঠেন ও বসেন। কিন্তু এই ওঠা বসার অবকাশে প্রজাবর্গের উপর যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো বাধা তাঁহারা পান না, কেননা সন্ধি, সনদ ও অন্যান্য চুক্তির দ্বারা তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার লইয়াছে, অর্থাৎ, সহজ ভাষায়, নিজেদের স্বার্থে যতক্ষণ না বাধে ততক্ষণ এই সব রাজ্যে অত্যাচার অনাচার যতই হোক না কেন তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ব্রিটিশ রাজনীতি অনুমোদন করে না। কিন্তু তথাপি দেশীয় রাজ্য এমন একটি নাই, যাহা রেসিডেণ্ট এজেণ্ট প্রভৃতি বড়লাটের কোনো না কোনো প্রতিনিধির কড়া পাহারাধীন নয়। এই পাহারা এক এক সময়ে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে—নজরবন্দী রাজাদের পক্ষে। কিন্তু মাঝে মাঝে এইরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিলেও এই সব রাজন্যবর্গ যে খুব দুঃখে আছেন তাহা বলা চলে না, কেননা, প্রজারা প্রাণপাত করিয়া কর দেয় এবং সেই করলব্ধ টাকার গাদার উপর বসিয়া তাঁহারা প্রজাদের ঐহিক, ও কোনো কোনা স্থলে পারত্রিক, মঙ্গলামঙ্গল যথেচ্ছ বিধান করিয়া থাকেন। এই কার্য্য যেমন ব্যয়সঙ্কুল তেমনই ক্লান্তিকর, কিন্তু ইহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান এত প্রখর যে ইহার পরও স্বদেশে ও বিদেশে নিজ নিজ উন্নত রাজোচিত রুচির বিকাশের জন্য প্রভূত সময় ও অর্থব্যয় করিতে ইহারা কুণ্ঠিত হন না।

এই ছিল এতদিনকালকার হাল; কিন্তু প্রস্তাবিত ফেডারেশন প্রবর্ত্তিত হইলে

* সম্প্রতি একাধিক রাজ্যে এই মধ্যযুগীয় কাঠামোর উপর হাল ফ্যাশানের পালিশ প্রয়োগ করা হইয়াছে; ইহার বর্ণ-বৈচিত্র্য যেমন চমকপ্রদ, তেমনি মেকি ইহার মালমশলা।

ইহার ব্যত্যয় ঘটিবে। কেননা, নূতন ভারতশাসন আইনের দ্বিতীয় অংশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ অখণ্ড নিখিল-ভারত ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির পক্ষে ইহার অন্যথা অসম্ভব। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে এই ফেডারেশনে যোগ দেওয়া বা না দেওয়া সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, কেননা সন্ধি সনদ প্রভৃতির অবিচ্ছেদ্য সূত্রে ব্রিটিশ রাজের সহিত তাহাদের যে-সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, সেই অতিপবিত্র সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হইতে পারে কেবল তাহাদের ইচ্ছানুসারে, নতুবা যে-সত্য ও সততা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ তাহা বিচলিত হইবে! অবশ্য যাহাতে তাঁহাদের এই সদিচ্ছা হয় সেই উদ্দেশ্যে ফেডারেল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠানে রাজন্যবর্গকে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অনেক বেশি অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং যে-সম্মতি-পত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী তাঁহারা ফেডারেশন-ভুক্ত হইবেন বারবার তাহার অদলবদল করিয়া রাজন্যবর্গের তুষ্টি বিধানের চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য তলে তলে যে মুষ্টি প্রয়োগের ব্যবস্থাও হয় নাই এমন কথা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারে না। তথাপি, রাজন্যবর্গ এই আপত্তি করিয়াছেন যে ফেডারেশন-ভুক্ত হইলে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিগণের উৎপাতে প্রাচীন মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রজাপালনে তাঁহাদের সমূহ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। শেষ পর্য্যন্ত এই আপত্তি বাহাল থাকিবে মনে হয় না, কেননা, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ফেডারেশন প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে এই ব্যবস্থা হইতে বাদ দেওয়ায় তাঁহাদের মোটেই উৎসাহ নাই। যাহাই হউক, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে রাজন্যবর্গের আপত্তি প্রবলভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু আরও প্রবলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতের আপত্তি: প্রস্তাবিত ফেডারেশন-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে, ফেডারেশন-নীতির বিরুদ্ধে নহে, কেননা, কোনো না কোনোরূপ ফেডারেশন ছাড়া যে নিখিল-ভারত শাসন-তন্ত্রের পরিকল্পনা সহজ নহে একথা সকলেই স্বীকার করেন।

এই আপত্তির এক কারণ ব্রিটিশ-ভারতের ও দেশীয় রাজন্যবর্গের গোত্রবৈষম্য। তদুপরি যে ক্ষমতা তাঁহারা পাইবেন কোনো নীতি অনুসারেই তাহা সমর্থন করা চলে না। তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা থাকিবে কেন্দ্রীয় বিধিবিধানের

বহির্ভূত ; তাঁহাদের প্রজাবর্গ ফেডারেল ভারতে যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইবে না ; কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং ব্রিটিশ ভারতীর পলিটিক্‌স্‌-এ হস্তক্ষেপ ও অনর্থ সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন, এমন কি প্রয়োজন মত সমবেত প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণের মত তাঁহারা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিবেন। ইহাপেক্ষা বড় কারণ এই যে ফেডারেশন-পরিকল্পনায় স্বায়ত্বশাসন যে-টুকু আছে তাহা নামমাত্র—প্রকৃত ক্ষমতা থাকিবে বড়লাটের হাতে, ফলে ব্রিটিশ ইমপিরিয়্যালিজম্‌ দেশীয় রাজন্যবর্গের সহায়তায় প্রবলতর হইয়া উঠিবে এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রগতির পথে অন্তরায় বাড়িবে। এই আপত্তি হইল ব্যাপকভাবে ন্যাশন্যালিষ্ট ভারতের ও বিশেষভাবে কংগ্রেসের।

ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের আপত্তি হইয়াছে মুসলমানদের তরফ হইতে—সকল মুসলমানের না হইলেও অনেকের। ইহারা আশঙ্কা করেন ফেডারেশনে প্রবর্ত্তিত হইলে হিন্দুদের ক্ষমতা আরও বাড়িবে এবং ফলে মুসলমানদের স্বার্থহানি হইবে।

সুতরাং ফেডারেশন সম্বন্ধে বিভিন্ন পক্ষ হইতে যে-আপত্তি হইয়াছে তাহা বিভিন্ন কারণে এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থের প্রভাবে। তাই ফেডারেশন প্রতিরোধ করিতে হইলে এই তিন পক্ষের সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে মনে হয় না। যাহারা প্রগতিশীল পলিটিকস্‌ এ বিশ্বাস করে তাহাদের পক্ষে ফেডারেশন প্রতি-রোধের একমাত্র উপায় কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের সংহতি সাধন ও শক্তিবৃদ্ধি—নান্যঃ পন্থা। যাঁহারা কর্ম্মে ও বাক্যে এই সংহতির পরিপন্থী ফেডারেশন-প্রবর্ত্তনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তাঁহারাই আজ সহায়ক। মুসলিম লীগ, হিন্দুসভা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল যে এই পদলাভের জন্য প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আশ্চর্য্য এই যে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া ফরওআর্ড ব্লক-ও এই সব দলের কার্য্যসিদ্ধির পথ সুগম করিতেছে। এই বিচ্যুতি সম্ভবত অজ্ঞানকৃত, সুতরাং ভগবান তাহাদের ক্ষমা করিতে পারেন ; কিন্তু ইতিহাস করিবে না।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

পুস্তক-পরিচয়

Beware of Pity—by Stefan Zweig (Casell).

অবশ্য ভাল বই, লেখক নামজাদা, গল্প একটানা স্রোতের মতন বইছে, বাছা-বাছা সমালোচকবৃন্দ সুখ্যাতিতে শতমুখ, অবাধে প্রত্যেকেই আত্মচরিত বলে যাচ্ছে—অর্থাৎ উপভোগের উপকরণে কোনো ত্রুটি নেই। তবু যেন জিভে তিতো ঠেক্‌ছে।

বিষয় হল 'করুণা'। করুণা দুই প্রকার, সাঁচ্চা ও ঝুটা। ঝুটা করুণা স্বার্থ-পর ভাববিলাস, খাঁটি করুণায় অনন্তকালের জন্য সংযম ও সহ্যগুণের প্রয়োজন। যেটি ভাল সেটি অসহ্য এই তথ্যটি নতুন নয়। অবশ্য যেটি অসম্ভব রকমের ভাল তার বর্ণনাতেও যথেষ্ট পরিমাণে ভাবালুতা আশ্রয় করতে পারে, বিশেষতঃ সেই জঘন্য ভাবালুতা যেটি আদর্শের ছায়ায় ঘেঁটুফুলের মতন ফুলতে থাকে। এ বিপদ কিন্তু সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তাই তাতে কিছু আসে যায় না, যদি লেখক বুদ্ধির সাহায্যে সতর্ক হন। এক্ষেত্রে লেখক খানিকটা সাবধান হয়েছেন, পুরোপুরি নয়, কারণ নায়কটিকে পয়লা নম্বরের প্রীগ্‌ মনে হল।

বাস্তবিক পক্ষে বইখানা সঙ্কীর্ণ। তার প্রধান কারণ এই যে লেখকের উদ্দেশ্যই হল করুণাকে চারপাশের জ্ঞাতি-প্রবৃত্তি থেকে পৃথক করা। অতএব বইখানির পাতায় পাতায় গোঁড়ামি ধরা পড়ে। টনি হফ্‌মিলার, অষ্ট্রিয়ান অশ্বারোহী দলের অফিসার, ছোট হলেও অফিসার, একটা পাড়াগেঁয়ে সহরের সেনানিবাসে থাকবার সময় একজন হঠাৎ-বড়লোক পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হলেন। সে ভদ্রলোকের অতীত খুব সাফ্‌ ছিল না, কিন্তু তাঁর খোঁড়া মেয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি যেন সর্ব্বক্ষণই প্রায়শ্চিত্ত করছেন। টনি এই মেয়েটি, ঈডিথের সঙ্গে করুণাপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। ঈডিথ কিন্তু প্রেমে পড়ে গেল। টনি ওধারে করুণাকে শুদ্ধ অর্থাৎ প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেষ্টা করলেন। বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ খোঁড়া মেয়েটিরই তাগিদে টনি বিবাহ পর্য্যন্ত করতে মত দিলেন। কিন্তু, সামান্য ভুলচুকের জন্য মেয়েটি যখন বুঝলে-যে টনি তাকে প্রকৃতপক্ষে

ভালবাসে না, মাত্র তার প্রতি অনুকম্পান্বিত, তখন আত্মহত্যা করলে। টনির করুণা দুর্ব্বল, ঝুটা।

অন্যধারে ডাক্তার কণ্ডরের করুণা বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ সাচ্চা। তিনি রোগীকে—ঈডিথকে অন্যায় আশ্বাস দিতে চান না, টনিকে লম্বা লম্বা সৎ পরামর্শ দেন, যথা Beware of Pity এবং বিশুদ্ধ করুণার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক অন্ধ নারীকে সহধর্ম্মিণী করেছেন। প্রেমে পড়ে ঐ কার্য্য করেছিলেন কিনা প্রমাণ নেই, এমনকি তারপর অন্ধ নারীকে ভালবাসতেন কিনা তাও বোঝা যায় না। তবু দু ধরণের করুণার তুলনার জন্য কণ্ডর নিতান্ত উপকারী।

কেবল তাই নয়। টনি বেচারী অষ্ট্রিয়ান অফিসার, তাই শ্রেণীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে নিজেই সঙ্কীর্ণ। যুদ্ধে সে যেমন সাহসী, প্রেম-ব্যাপারে সে নিতান্ত ভীরু। চার-চার বার সে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে, শেষবারে মহাসমরে যোগদানের সাহায্যে। তখনই বুঝলে খোঁড়া মেয়েটিকে খুন করবার পাপ কোথায় ভেসে গিয়েছে সেই সার্ব্বজনীন নরহত্যায়।

এই মহানিষ্ক্রমণ আমাদের সনাতন ও শাস্ত্রীয় পন্থা। করুণারই জন্য ভগবান বুদ্ধদেব থেকে চৈতন্য, রামানুজ, তুলসীদাস, ম্যয় আমার গল্পের নায়ক পর্য্যন্ত সংসারত্যাগী। অতএব এই প্রক্রিয়ায় আমার কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। খিচ্ মাত্র এই, পালাবার সময়টিতে মুখে কাপড় দিতে হয়, তাও আবার রাতভিতে পালাতে হয়, পরের দিন সকাল বেলা মুখ তিতো হয়ে ওঠে। যখন সূর্য্য ওঠে তখন মনে হয়, প্রবৃত্তিগুলো কি এতই পৃথক, এতই ভিন্নধর্ম্মী ?

পাঠক হয়তো ভাববেন আমি সাহিত্য-সমালোচনা করছি না। আমার বিশ্বাস আমি তা ছাড়া আর কিছু করছি না। এই প্রকার সঙ্কীর্ণ একমুখীনতায় গল্পের খুব সুবিধা। গল্প প্রবন্ধের মতন একটানা বইতে থাকে, পাঠক একদমে বই শেষ করতে পারে, ভাষা বেশ সতেজ হয়। পাঠকের মন বিক্ষিপ্ত না হওয়ার দরুণ লেখকের প্রতি, রচনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে। সাহিত্যের বৈঠকে একেই আর্ট বলা হয়, অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কি উদ্দেশ্য! যেমন, এঞ্জিনের সৌন্দর্য্য রেল-লাইন থেকে বিচ্যুত না হয়ে প্যাসেঞ্জারকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাবার ক্ষমতার দরুণ। যেমন, সঙ্গীতের আসরে মালিগৌরাকে পূরিয়া-ধ্যানশ্রী থেকে এক মিনিটের জন্য বাঁচাতে পারার দরুণ গায়ক-বাদকের কৃতিত্ব অর্ঘায়। কিন্তু

—ঐ এক মিনিটের জন্য। পরে মনে ওঠে পাল তুলে ভেসে যাওয়া মন্দ নয়, আধঘণ্টা ধরে পূরিয়ার আলাপ চললে কি সর্ব্বনাশ হত, তার মধ্যে কি মালিগৌরার আমেজ দেখান যেত না? সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বালজাকের কথা আসে। তিনিও একটি মাত্র 'প্যাশন' নিয়ে ব্যবসা করতেন। তাঁর 'ক্যজিন্ পন্স্' নামে একটা নভেল আছে, যার বিষয় হল পরের বাড়ি খেয়ে বেড়ানর প্রবৃত্তি, passion for dining abroad। বইটা বালজাকের শ্রেষ্ঠ বই নয়, বিষয়টিও হয়ত সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কিন্তু এই নিম্নশ্রেণীর প্রবৃত্তির চারধারে কত না ছোট বড় প্রবৃত্তির খেলা চলছে। তাই মনটা প্রশস্ত হয়, চিত্ত ভরে ওঠে। Beware of Pity চমৎকার বই মানছি, কিন্তু ঐ শ্রেণীর নয়। যাঁরা বালজাক পড়ে রুচি তৈরী করেছেন তাঁদের প্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণতায় আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু সমধর্ম্মী রচনার বিচারে তাঁরা খুঁৎখুঁতে হতে বাধ্য। আবার বলছি একটি কোনো প্রবৃত্তি কিংবা ভাবকে আশ্রয় করাতে আমার কোনো প্রকার আপত্তি নেই, যদি সেটা ট্রাজেডীতে পরিণত হয়েছে দেখি। পাথরের নুড়ীকে নারায়ণ ভাববার সুযোগ মেলা চাই। মজা এই যে বইখানির দু'একটি স্থানে সঙ্কীর্ণতা খসে গেছে, সেখানেই করুণা লোপ পেয়েছে, সেখানেই বুঝেছি যে লেখক সাধারণ নন। তবু মোটের ওপর মনে হয়েছে যে টনির জীবনের ঘটনাসমাবেশ gaucherie মাত্র। এতে চমৎকার বই লেখা হয়, কিন্তু বড় বই-এর জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

চৈতন্যচরিতের উপাদান সংগ্রহ-কারক, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের যে কি বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে তার পরিচয় পুস্তকখানির আকারেই পাওয়া যায়। এ পুস্তকের পত্রসংখ্যা ৮০০।

এ রকম বই পড়াই কঠিন। লেখায় যে কি অসাধারণ যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তা বলাই বাহুল্য।

এ সংগ্রহকার্য্যে, তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা আমাদের মত

অবৈষ্ণবদেরও অনুমত। তিনি এ পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলেছেন। অর্থাৎ চৈতন্যচরিতের বিপুল সাহিত্য তিনি যাচিয়ে নিয়েছেন। এবং পূর্ব্ব চরিতকারদের কোন কথা গ্রাহ্য আর কোন কথা গ্রাহ্য নয় সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেছেন। এ হচ্ছে আসলে চৈতন্য-সাহিত্যের critical stady, মহাপ্রভুর biography উদ্ধার করতে হলে এরূপ critical study নিতান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সত্য উদ্ধার করতে হলে সব পূর্ব্ব দলিলগুলির উপর নির্ভর করা চলে কি না, তা আমাদের পক্ষে জানা নিতান্ত দরকার। নইলে আমরা জাল দলিলও গ্রাহ্য করে বসব। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের critical study সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।

চৈতন্য-সাহিত্য বিপুল সাহিত্য এবং পাঁচ ভাষায় লিখিত, সংস্কৃত, বাঙলা, উড়িয়া, হিন্দি ও আসামী ভাষায় মজুমদার মহাশয় এই সকল ভাষার গ্রন্থাবলির আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বিচারের ফলে দাঁড়িয়েছে যে চৈতন্যচরিতের মূল উপাদান হচ্ছে—

মুরারিগুপ্তের কড়চা (সংস্কৃত)

কবি কর্ণপূরের—চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য (সংস্কৃত)

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত (বাঙলা)

কবিরাজ গোস্বামীর—চৈতন্য চরিতামৃত (বাঙলা)

গোবিন্দদাসের কড়চা (বাঙলা)

মুরারি গুপ্ত ও কবি কর্ণপূর মহাপ্রভুর সমসাময়িক। উভয়েই eye witness। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের আদেশে তাঁর পুস্তক লেখেন এবং কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যের তিরোভাবের বহু পরে বৃন্দাবনে বসে চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন কতকটা রঘুনাথ দাস প্রভৃতির মুখে শুনে এবং কতকটা কবি কর্ণপুরের গ্রন্থাবলী থেকে facts উদ্ধার করে। "গোবিন্দদাসের কড়চা" পুরাপুরি জাল নয়।

তা ছাড়া তিনি জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলকেও প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেন। আমার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাঁরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত এবং স্বভাবতঃ sentimental নন্ অথচ চৈতন্য চরিতামৃতে যাঁদের কৌতূহল আছে, মজুমদার মহাশয়ের কথা শুনে তাঁরা বাঁচবেন। আমরাও ইচ্ছে করলে এই মূল উপাদানের প্রসাদে চৈতন্যচরিত উদ্ধার করতে পারি। তিনি যে সব গ্রন্থকে প্রামাণিক রূপে স্বীকার করেন নি, আমরা নির্ভয়ে সে সব গ্রন্থকে উপেক্ষা করতে পারি।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে মজুমদার মহাশয় বাঙলার বৈষ্ণব বিষয়ক ইতিহাস লেখেন নি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 'চৈতন্যচরিতের' একটা পরিচ্ছিন্ন রূপ আবিষ্কার করা। এ সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও ডাঃ সুশীলকুমার দে'র "পদ্যাবলীর" সম্পাদনের উদ্দেশ্য এক নয়। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁর গ্রন্থের যে চমৎকার ভূমিকা ও পরিশিষ্ট লিখেছেন তার থেকে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস অনেকটা জানতে পাই।

আমাদের মনে চৈতন্যচরিত' সম্বন্ধে যেমন জিজ্ঞাসা আছে, বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তেমনি জিজ্ঞাস্য আছে। সুতরাং যে সব বৈষ্ণব গ্রন্থ মজুমদার মহাশয় প্রত্যাখ্যান করেছেন অন্য হিসেবে তার যথেষ্ট মূল্য থাক্‌তে পারে—অন্ততঃ চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বাঙলায় ক্রম বিস্তার ও ক্রম বিকাশের সন্ধান আমরা এই গ্রন্থে প্রথম পেতে পারি এবং নিত্যানন্দ চরিতেরও। নিতাই সম্বন্ধে মজুমদার মহাশয় এক রকম নীরব। যদিচ গৌর-নিতাই ঘনিষ্টভাবে জড়িত। মজুমদার মহাশয় আরম্ভেই বলেছেন যে—

"ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিতে বসিয়াও আমি জন্মগত অভ্যাস ও আবেষ্টনীর প্রভাব একেবারে বর্জ্জন করিতে পারি নাই।"

এরকম মনোভাব ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখবার পক্ষে যুগপৎ সহায় ও অন্তরায়। আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ না থাকলে এ জাতীয় বৃহৎ গ্রন্থ লেখা সম্ভব নয়। আমাদের মত অবৈষ্ণবদের পক্ষে এ জাতীয় একনিষ্ঠ আলোচনা করা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে আমাদের যতই কৌতূহল থাকুক না কেন। কেননা আমাদের মনে সাম্প্রদায়িক ভক্তির প্রেরণা নেই। অপর পক্ষে কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক বিচার করতে হলে সাম্প্রদায়িক মতামত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নইলে critical বুদ্ধির লাগাম পুরো ছাড়া যায় না।

সাম্প্রদায়িক মত মাত্রেই কিম্বদন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কিম্বদন্তির গাছ কেটে ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এর ফলে ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বসম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হওয়া অনিবার্য্য। আর বৈষ্ণব সমাজও যে সম্পূর্ণ নিরীহ নয়, তার প্রমাণ মজুমদার মহাশয়ের কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে—

"আমি যখন ফোর্থ কিম্বা থার্ড ক্লাসে পড়ি অর্থাৎ ১৯১৩।১৪ খৃষ্টাব্দে,

তখন নবদ্বীপের বড় আখড়ার নাটমন্দিরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিচারের একটি সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং বড় বড় বৈষ্ণব পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বদেশী সভায় লাঠালাঠি হয় পরে দেখিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণব সভায় লাঠি চলিতে সেই প্রথম দেখি। সভা আধঘণ্টার মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়।”

উক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে ঐতিহাসিক আলোচনায় সাম্প্রদায়িক মতামতের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে। মজুমদার মহাশয়ের পুস্তক নূতন সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা মজুমদার মহাশয় অনেক ভুল ধারণার উপর হস্তক্ষেপ করলেও কারও গায়ে হাত দেন নি। পুস্তক পড়ে আমি মনে খুসি হয়েছি কিন্তু এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে আমি অপরকে অনুরোধ করব না কারণ সে অনুরোধ কেউ রক্ষা করবেন না। কারণ তা করা ঈষৎ কষ্টসাধ্য।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

প্রেমধর্ম—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, প্রকাশক—শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২॥০ টাকা।

শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রবাবু বাঙ্গালী পাঠক সমাজের জন্য যে কয়েকখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়া কিছুকাল হইল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রেমধর্ম অন্যতম। মনে পড়ে, বাঙ্গালা ১৩১২ সালে তাঁহার ‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’ প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই হইতে ভাগবত ধারা বিবৃত করা হীরেন্দ্রবাবুর সাহিত্য-সাধনার এক বিশেষ লক্ষণ। ‘প্রেমধর্মে’ এই বিবৃতির একদেশের পরিচয় পাইতেছি, আর পাইতেছি তাঁহার জীবনব্যাপী জ্ঞানস্পৃহা ও অধ্যয়নের ফল। অবশ্য ভূমিকায় তিনি আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন, ‘রাসলীলা’র সঙ্গে মিলাইয়া, তাহার উপক্রমণিকা স্বরূপে, ‘প্রেমধর্ম’ পড়িতে হইবে। প্রেমের স্বরূপ অবগত না হইলে আমরা রাসলীলার মাধুর্য সম্যক্ উপভোগ করিতে পারিব না। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ‘রাসলীলা’ না পড়িলে ‘প্রেমধর্ম’ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে—উহারা companion volumes, পরস্পর সংযোগে সম্পূর্ণ।

দেশভেদে কালভেদে আমাদের জিজ্ঞাসার রূপে হয়তো কিছু অদল-বদল হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম সনাতন—জিজ্ঞাসাও সেই এক—ঘুরিয়া ফিরিয়া মানুষকে

বলিতেই হয় "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ ?" সংসারিক বিবর্তের মধ্যে (স্বভাবগুণে আমরা বিবর্তকে আবর্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া হাবুডুবু খাইতে থাকি) এই একটি সুর যুগ যুগ ধরিয়া মানবকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। অথচ এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ—এই যে মানুষের হাতে-গড়া সমাজের আচারবিধি—ইহার সঙ্গেও খাপ খাওয়াইতে হইবে। কোন্‌টি বৃহত্তর ? কোন্‌টি মানিব ? কোন্‌টি বুঝিব ? কোন্‌টি পালন করিব ? 'চল্‌তি চক্কি' দেখিতেছি, তাহার "কীল" তো কেহ দেখি না—কবিরের ভাষায়,

"চল্‌তি চক্কি সবকোই দেখে, কীল দেখে না কোই"—

এই "কীল" দেখিতে চাহিলে সাধককে প্রেমের চক্ষু দিয়াই জগৎকে দেখিতে হয়। বর্তমান যুগের জনৈক প্রবীণ সাধক কথাটি আমাদিগকে সুন্দরভাবে বলিয়াছেন,—

In order to get back, then, from the egoistic forms of activity, the sadhaka has to get rid of the sense of an "I" that acts. He has to see everything happening in him by his mental and bodily instruments according to the action of Nature. He himself becomes quiescent and realises himself as the individual soul witnessing the acts, accepting tranquilly the results, sanctioning or withholding his sanction from the impulse to the act which nevertheless often takes place as the result of fixed Nature and past storage of energy independent of his sanctions. Finally, he becomes aware of the higher Self within him which is the seeing and knowing, the source of the sanction, the source of the acceptance and the rejection. This is the God.

তাই সর্বদর্শনে সুপণ্ডিত হইয়াও হীরেন্দ্রবাবুকে প্রেমধর্ম বুঝিতে ও বুঝাইতে হয়, এবং তাঁহার উল্লিখিত 'কল্যাণ কল্পতরু'র ছদ্মনামধারী 'মাধব' জ্ঞান, অনুভূতি, দৃঢ়চিত্ততা সত্ত্বেও প্রেমানন্দে বিভোর।

কিন্তু "প্রেমধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ"—ইহা বহু সাধনার বহু

আকুল প্রার্থনার ফল। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব লুটাপুটি খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "মা, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।" বৈষ্ণব কবি এই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন,—

শুইলে শোয়াস্তি নাই নিঁদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥

আর কবির? তিনি বলিয়াছেন, এ রাস্তা তো ভারি মজার, আমি ঢুকিলে গুরু ঢুকিতে পারিবেন না, গুরু ঢুকিলে আমি ঢুকিতে পারি না—বড় সরু গলি।

জব মৈঁ থা তব গুরু নহীঁ অব গুরু হৈঁ হম নাহিঁ।
প্রেম গলী অতি সাঁকরী তা মেঁ দো ন সমাহিঁ॥

পর পর তিনটি সোপানে লেখক গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়াছেন—প্রথম খণ্ডে প্রেমধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বা বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি স্থাপন, দ্বিতীয় খণ্ডে তত্ত্বের রূপ অঙ্কন, তৃতীয় খণ্ডে রসের পূর্তি ও তত্ত্বের পরিবেশন। ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে কৃষ্ণচরিত্রে, সেই কৃষ্ণচরিত্রের প্রস্ফুটিত কমল,—অভিসার ও সঙ্গম, মাথুর ও মিলন—মহাজনবাণীর শোভা-সম্পদে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলেন, হীরেন্দ্রবাবু কৃষ্ণচরিত্রকে ভিত্তি করিয়া প্রেমধর্ম বুঝিতেছেন ও বুঝাইতেছেন।

নানাস্থান হইতে সংগৃহীত ভক্তদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বাণী শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁহার এই সন্দর্ভের মধ্যে পাঠককে উপহার দিয়াছেন, তাহাতে মাঝে মাঝে কিছু বেসুরা শোনায়। বিশেষতঃ এভেলিন আণ্ডারহিলের দীর্ঘ উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা সরস নহে, বরং মাঝে মাঝে রসবোধের ব্যাঘাত জন্মায়। এখার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য মিষ্টিক্‌দের অনুভূতি তত্ত্বের দিক হইতে ভাল লাগে সন্দেহ নাই, আর তাহাতে ধর্মের সনাতন রূপও প্রতিপন্ন হইতেছে স্বীকার করি, কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের সেই পরম সুমধুর সদুক্তি কর্ণামৃতের সঙ্গে তাহার তুলনা কোথায়? তাহা সত্ত্বেও 'প্রেমধর্ম' পড়িতে পড়িতে লেখকের আবেগ সত্যই যেন পাঠকের মনে কিছু পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। তিনি তো এখানে শুষ্ক পাণ্ডিত্য পরিবেশন করেন নাই, মধুর সাধনার আনন্দঘনরসে নিজে ডুবিয়া থাকিতে ও পাঠককে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শবরীর যে প্রেম, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোষ্ঠীর যে আকর্ষণ, ভগবানের প্রতি ভক্তের যে দুর্দমনীয় টান, মদনভস্মকারী যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্করের প্রতি পার্বতীর যে মনোভাব, রাধাকৃষ্ণ যুগলমিলনের লোকোত্তর বৃত্তান্ত—এই চিত্রপঞ্চকে প্রেমধর্ম সমুদ্ভাসিত। পড়িয়া উল্লাসে বলিতে হয়,—"ধন্যেয়মদ্য ধরণী।"

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

শ্রীমধুসূদন (নাটক)—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।
(ডি, এম, লাইব্রেরী)।

মানস-বিরহ (কবিতার বই)—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী।
(বাগ্‌চী এণ্ড সন্স)।

বুভুক্ষা (উপন্যাস)—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।
(আর্য্য পাবলিশিং কোং)।

জন্মের দায় (উপন্যাস)
পথের বোঝা („) } —শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ।

বাংলা সাহিত্য নাটকের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হয় নি। আধুনিক যুগে কবিতা ও ছোট গল্পের কিছুটা উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত নাট্যকারের অভাবে নাটকের দৈন্য এখনও ঘোচেনি। ভাবপ্রবণতা আমাদের মজ্জাগত ব'লেই হয়ত' বা মন্ময় জগৎ নিয়ে আমরা মাতি, তন্ময় জগৎ তফাতেই থেকে যায়। তা ছাড়া নাটকের রচনা-রীতি সম্পর্কে বাঙালী নাট্যকারগণ মাথা ঘামাতে নারাজ; প্রাচীরপত্রে তাঁদের নাম ঘোষিত হ'লেই তাঁরা ধন্য হ'য়ে যান। এসব বিষয়ে বোধ করি তাঁরা 'বিদেশী বর্জ্জনের' পক্ষপাতী; যদিও নাটকাভিনয়ের ফলে কাউকে লক্ষপতি হতেও শোনা যায় নি। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নাটকখানি সাধারণ বাংলা নাটকের পর্য্যায় পড়ে না। 'কিছুক্ষণ' নামক উপন্যাসে তাঁর যে লিপি-চাতুর্য্যের পরিচয় পেয়েছিলাম, তা আমাদের দেশের নব্য লেখকদের ঈর্ষার যোগ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন নাটকের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত করা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ মাইকেলের জীবনে নাটকীয় উপাদান এতই প্রচুর আছে যে, সেগুলিকে কয়েকটি

দৃশ্যের মধ্যে গুছিয়ে প্রকাশ করা নাট্যকারের সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এই নাটকখানি সতেরোটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। অঙ্কগুলির মধ্যে সময়-সাম্য বজায় রাখা যাবে না ব'লে নাটকটিকে অঙ্কে ভাগ করবার চেষ্টা নাট্যকার করেন নি। মাইকেলের সমগ্র জীবনকে নাটকের বিষয়বস্তু করতে গিয়ে অন্যান্য চরিত্রগুলো বিশেষ ফোটেনি। ফলে, নাটকের রস তেমন জমেনি। মাইকেলের জীবনের কোনো এক অংশকে নিয়ে নাটক লিখলে সম্ভবত এই দোষ ঘটত না। পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন যুগের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মধুসূদন, রাজনারায়ণ দত্ত, জাহ্নবী, হেনরিয়েটা প্রভৃতি চরিত্রগুলো নাট্যকারের কৃতিত্বে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ দৃশ্যে যে ঘটনার অবতারণা তিনি করেছেন তাঁর মতো লেখকের পক্ষে তা সঙ্গত হয় নি।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক কবি। তাঁর কবিতাগুলি ছন্দোবদ্ধ, সমিল ও সুবোধ্য। প্রগতিবিলাসী কবিদের প্রভাব তাঁর কাব্যে নেই। রবীন্দ্রধারার তিনি অনুবর্ত্তী। তাঁর কবিতাগুলিকে গীতধর্ম্মী বলা যেতে পারে। রসের মূর্চ্ছনায় ও ভাবের নিবিড়তায় তাঁর এই কাব্যপুস্তিকা পাঠকের মন আকৃষ্ট করবে। তাঁর কবিতায় যে স্নিগ্ধতা আছে, তার পরিচয় আজকাল বড় একটা পাওয়া যায় না।

'বুভুক্ষা' হামসুনের 'সুল্ট্' বা 'হাঙ্গার'-এর অনুবাদ। ১৩৩৫ সালে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এত দিনে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হলো। বাংলাদেশে অনুবাদ-গ্রন্থও যে সমাদৃত হয়, তার প্রমাণ এই 'বুভুক্ষা'। অনুবাদে পবিত্রবাবু সিদ্ধহস্ত। তাঁর অনুবাদ যেমন স্বচ্ছ, তেমনি প্রাঞ্জল; কোথাও আড়ষ্টতা নেই। আসল কথা হলো, অপটু অনুবাদ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে না। মূল গ্রন্থখানি এতই সুপরিচিত ও বিখ্যাত যে, সে সম্বন্ধে নূতন ক'রে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

পুরকায়স্থ মহাশয়ের উপন্যাস দুখানি সুখপাঠ্য। বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশেষত্ব না থাকলেও গল্প দুটির পরিণতি আমাদের ভালোই লাগল। লেখকের ভাষা সহজ ও সুন্দর। কয়েকটি চরিত্রও বেশ ফুটে উঠেছে।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

উপমা কালিদাসস্য—শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত।

কালিদাসের সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যথেষ্ট আলোচনা হয় নি। মহাকবির সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেই একটা অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন ধারণা পোষণ করি। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে শেক্সপীয়র ও কালিদাস-এর পারদর্শিতা তুল্যমূল্য—একথা জেনেও, প্রথমোক্তের প্রতি আমাদের যেমন আগ্রহ, শেষোক্তের প্রতি প্রায় সমান্ ঔদাসীন্য। সুতরাং "উপমা কালিদাসস্য" চিন্তাশীল ও সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর "বাঙলা সাহিত্যের নব যুগ" নামের একখানি বই পড়ে আনন্দ পেয়েছি। বর্ত্তমান বইখানিও আমার ভালো লেগেছে।

বীক্ষাশক্তি (Aesthetic faculty) এবং প্রকাশশক্তি কবির পক্ষে যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত,—একথা ক্রোচে স্বীকার ক'রেছেন। পরবর্ত্তিকালে মিড্‌ল্‌টন্ ম্যরে-ও শৈলী-বিষয়ক এক আলোচনায় তাই ব'লেছেন। অর্থাৎ, কবির মননের বৈশিষ্ট্যেই প্রকাশের মৌলিকতা। এই প্রকাশ আবার প্রকার ভেদে সঙ্গীতধর্ম্মী এবং চিত্রধর্ম্মী। শব্দালঙ্কার এই সঙ্গীতধর্ম্মী এবং অর্থালঙ্কার চিত্রধর্ম্মী। মহাকবির নানা গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সহকারে দাশগুপ্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে, কালিদাসের উপমার ঔচিত্যবোধ, উপমান-উপমেয়ের আনুপাতিক গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধে মতামত আছে। উদ্ধৃতিগুলি চমৎকার এবং এ বইখানি কালিদাসের ভূমিকা হিসাবে পড়লে নিঃসন্দেহে খুশি হওয়া যায়।

হরপ্রসাদ মিত্র

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

রবীন্দ্ররচনাবলী

শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনার ধারা স্বভাবতই তাঁহার জীবনের ধারার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং নূতন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা নব নব রূপে নানা বাঁকে মোড় ফিরিয়াছে। অল্প পরিসরের মধ্যে বালক কবির সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পর্ব্বের মধ্যে দিয়া তাঁহার কবি-জীবনের অভিব্যক্তি ও তার পরিণতির সম্পূর্ণ রূপটি জানিতে পারিলেই কবির রচনার আদর্শ প্রস্ফুট হইয়া ওঠে এবং তাঁহার জীবনের মূল সত্যটিকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়। কবির সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির অধ্যক্ষেরা, রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে, তাঁহার সমগ্র বাংলা রচনা একত্র করিয়া ধারাবাহিক-ভাবে সাজাইয়া ছাপাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন অনুসারেই এই রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি সাধারণ ও একটি শোভন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটি ভাগ থাকিবে যথা—(১) কবিতা ও গান (২) উপন্যাস ও গল্প (৩) নাটক ও প্রহসন (৪) বিবিধ প্রবন্ধ। রচনাগুলি মোটামুটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত প্রথম খণ্ড আগামী আশ্বিন মাসের প্রথমেই প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে এবং প্রতি দুইমাস অথবা তিন মাস অন্তর একটি করিয়া খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এইরূপে প্রায় পঁচিশটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্রে গ্রথিত হইবে। প্রতি খণ্ডে ৬২০ হইতে ৬৬০ পৃষ্ঠা থাকিবে এবং কাগজ ও বাঁধাইয়ের তারতম্য অনুসারে মূল্য হইবে ৪॥০, ৫॥০ ও ৬॥০ টাকা; রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ও শোভন কাগজে মুদ্রিত পরিমিত সংখ্যক চামড়ার বাঁধাই প্রতি খণ্ডের মূল্য হইবে ১০৲ টাকা।

রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি বিশেষ আকর্ষণ হইবে ইহার চিত্রসম্ভার। ইহাতে রবীন্দ্র-নাথের নানা বয়সের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব নানা ফটোগ্রাফ; অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, ও পুস্তকচিত্রণ, রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং কবির অঙ্কিত চিত্রও থাকিবে।

৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৪৬

পরিচয়

বঙ্গসাহিত্যের মনঃসমীক্ষণ

হিষ্টিরিয়া (Hysteria) নিউরোসিস্ (Neurosis) মেলানকোলিয়া (Melancholia) প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক ব্যাধির তথ্য আবিষ্কার ও চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রণালী আবিষ্কারের জন্য যে গবেষণা হয় তাহার ফলেই নব্য মনস্তত্ত্ব প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া নব্য মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া বুঝা কঠিন। অল্প সময়ের আলোচনায় সেরূপভাবে মনস্তত্ত্বের এই নব বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। কিন্তু আরও একদিক দিয়া আমরা সাধারণভাবে ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝিতে পারি। প্রচলিত প্রথাগুলি প্রবর্ত্তনের হেতু বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া, অথবা ধর্ম্ম ও সমাজনীতির মূলে কি আছে তাহার গবেষণা করিয়া, আমরা এই নব্য মনস্তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকটা যেমন ধরিতে পারি, সেইরূপ আর একভাবে সাহিত্যের মধ্য দিয়াও তাহার স্বরূপ ধরিতে পারি। কিন্তু আমার মনে এ বিষয়ে যে কল্পনার উদয় হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার মত সাহিত্য-জ্ঞান আমার নাই। তবে, এইরূপ ভাবে নব্য মনস্তত্ত্ব আলোচনা যে সম্ভব হইতে পারে, এই প্রবন্ধ সেই দিকে সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।

প্রাচীন কবিদিগের রচনা—যেমন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি যাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে অবচেতন মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে যদি

অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে অনেক স্থলেই তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন। সেকালের হাস্যরসের কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—

"ছলে বলি-মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে
খান দেবী পিতৃমাথা বিশ্বমাতা হয়ে।"

এখানে 'পিতৃমাথা' বলিতে দক্ষের অজমুণ্ডকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে; সাধারণভাবে যদিও ইহাই বুঝায়, তবু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার আবার একটি গভীর অর্থও আছে। Animal Sacrifice বা পশুবলি সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানে ও নৃবিজ্ঞানে বহু আলোচনা আছে। ডাক্তার ফ্রয়েড মানবের আদিম যুগের ধর্ম্মবিশ্বাস, সামাজিক বিধি, প্রথা, রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "Totem and Taboo" নামক বিখ্যাত পুস্তকে বলিদান সম্বন্ধে মনীষিগণের মত সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন যে এই সংগৃহীত বিভিন্ন বিবরণগুলির উপর মনস্তত্ত্বের আলোক নিক্ষেপ করিলে আমরা একটি কৌতূহলপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। তাহার সারকথা এই যে—"বলির পশুগুলি বলিদানকারীগণের পিতৃপুরুষগণের প্রতীক।"

এই সিদ্ধান্তের কথা যাঁহারা শুনিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, এবং ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বতঃই ইতস্ততঃ করিবেন। কিন্তু মনঃসমীক্ষণে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া আমরা যদি নিজ নিজ অবচেতন মনের প্রবৃত্তিগুলির যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি তাহা হইলে দেখি যে আমাদের মনের গভীর স্তরে কতই না অসামাজিক প্রবৃত্তি বিরাজ করিতেছে। কেবল অসামাজিক নয়, কুৎসিত প্রবৃত্তিগুলি মনের গভীর স্তরে থাকিয়া কি ভাবে ভিন্নরূপে ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, যাহার ছলনায় আমরা নিজের সম্বন্ধেই নিজে প্রতারিত হইতেছি। কিন্তু ইহাও অতি আশ্চর্য্য যে মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড বহু গবেষণায় যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ফ্রয়েডের বহু পূর্ব্বে বাংলা দেশের একজন কবি, যাঁহার খ্যাতি খুব অধিক নহে তাঁহারই লেখনীতে কবিতায় পরিহাসছলে সেই সত্যটি বাহির হইয়াছে।

চার্ব্বাকের মত একজন নাস্তিক পণ্ডিত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে শ্লোক লিখিয়াছেন তাহাতেও আমরা অনুরূপ কথাই পাই:—

পশুশ্চেৎ নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্ব পিতা যজমানেন তত্র কস্মাৎ ন হিংস্যতে ?

অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে যে পশুকে হনন করা হয়, সে পশু স্বর্গে গমন করে, যদি ইহাই হয়, তবে যজমান পশুর পরিবর্ত্তে নিজের পিতাকে যজ্ঞে হনন করে না কেন ?

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি ডাক্তার ফ্রয়েডের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম ও একটি স্বরচিত প্রবন্ধও পাঠাইয়াছিলাম। প্রবন্ধটির নাম "A conversion phenomenon in the life of Dramatist Girish Chandra Ghosh"। ঐ পত্রে তাঁহাকে আমি লিখিয়াছিলাম যে সাইকোঅ্যানালিসিসের আমি একজন শিক্ষানবীশ মাত্র। যদি সম্ভব হয় তবে আমার এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানাইয়া যেন তিনি আমাকে অনুগৃহীত করেন। জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রয়েড আমাকে অতি সদয় প্রত্যুত্তর দিয়া জানাইয়াছিলেন যে "তোমার আলোচনাটি ঠিকই হইয়াছে। আমি এইটি revise করিয়া International Journal of Psycho-Analysis পত্রিকায় ছাপাইয়া দিব।" তাহার কিছুদিন পরে আমার প্রবন্ধটি ওই আন্তর্জাতিক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধটির বিষয় ছিল গিরীশচন্দ্রের মনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন। আমাদের দেশে conversion বা আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বহু দৃষ্টান্ত আছে। বিলাসী বিল্বমঙ্গল একদিনে সকল পার্থিব কামনা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-প্রেমে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা আমরা গ্রন্থে পড়িয়াছি। লালাবাবুর দৃষ্টান্ত অধিক দিনের কথা নয়। তিনি ধনী, সম্ভ্রান্ত বংশের উত্তরাধিকারী ও অতিশয় বিলাসী ছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার এমন পরিবর্ত্তন হইল, যে বিপুল ধন সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন এবং দ্বারে দ্বারে শুখনো রুটির টুকরা মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের মূলে যে গভীর মনের ক্রিয়া নিশ্চয়ই থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গিরীশচন্দ্রের জীবনের যে ঘটনা ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বাংলা ১২৯০ সালে তাঁহার ষ্টার থিয়েটারে যোগ দিবার

অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এই ঘটনাটি স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মতিলাল মহাশয় তাঁহার 'গিরীশচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন (১৩২০ সাল, বৈশাখ সংখ্যা উদ্বোধন ২০০-২০১ পৃষ্ঠা)। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সেই বিবরণ তাঁহার 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকেও উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বর্গীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকটেও এই ঘটনার বিষয় শুনিয়াছিলাম। সংক্ষেপে ঘটনাটি এইরূপ ঃ—

গিরিশবাবু যখন থিয়েটারে অভিনয় করিতেন তখন যখন যে চরিত্র তিনি অভিনয় করিতেন, তাহাতে একেবারে এমনভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন যে তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিত না। এই ভাবে অভিনয় অন্তেও কিছুক্ষণ তাঁহার সেই বিভোর ভাব থাকিত। একদিন অভিনয়-অন্তে গিরীশচন্দ্র এইরূপ বিভোর ভাবে নিজের কক্ষে বসিয়াছিলেন সহসা তাঁহার অনুভব হইল যেন শ্রীশ্রীকালী সেই কক্ষে অদৃশ্যভাবে আগমন করিয়াছেন এবং এখনই যেন তিনি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গিরীশচন্দ্রকে দর্শন দিবেন এইরূপ অভিলাষ করিতেছেন। প্রত্যক্ষরূপে কালী মূর্ত্তি তাঁহার চোখের সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন ইহা ভাবিয়া গিরীশচন্দ্রের মনে শঙ্কার উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল জগজ্জননী যদি ঐ ভাবে তাঁহাকে দর্শন দেন, তবে তাঁহার সম্মুখে আর কি গিরীশচন্দ্রের এই পাঞ্চভৌতিক মরদেহ থাকিবে? সেই দিব্য তেজে তখনই তাহা লয়প্রাপ্ত হইবে। যদি তাঁহার এইভাবে এখনই দেহান্ত ঘটে—তবে তাঁহার আত্মীয় পরিজন অনাথ হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল মনে দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাইলেন যেন তিনি শরীরী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত না হন। গিরীশচন্দ্রের মনে হইল, দেবী যেন তাঁহার এইরূপ শঙ্কা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই ক্রোধে তাঁহার কোন অনিষ্ট না ঘটে, এই জন্য তাঁহাকে এমন কিছু উৎসর্গ করিতে বলিলেন যাহা তিনি খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ক্রোধ শান্তি করিবেন। তখন যে অভিনয়-তন্ময়তা গিরীশচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু, গিরীশ তাহাই দেবীকে উৎসর্গ করিলেন এবং দেখিলেন ইহা যেন দেবীর হস্তস্থিত খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর গিরীশচন্দ্রের অভিনয় কালের তন্ময়ভাব আর রহিল না, কিন্তু আর এক দিক দিয়া তাঁহার শক্তির বিকাশ হইল তিনি পূর্ব্বে অভিনয়

করিতেন কিন্তু কোন নাটক রচনা করেন নাই, এখন তিনি নাটক রচনায় নিজের শক্তি নিয়োগ করিলেন। তিনি নাটক রচনা করিতেন কিন্তু স্বহস্তে লিখিতেন না, নাটকের ভূমিকাগুলি অভিনয় করিয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। দুই জন লেখক উপস্থিত থাকিত, তাহার সেই আবৃত্তি লিখিয়া লইত। তাঁহার প্রথম নাটক দক্ষ-যজ্ঞের কাহিনী লইয়া লিখিত। এই নাটক রঙ্গালয়ে অভিনয়ের পূর্ব্বে তিনি কালীঘাটে কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে মায়ের মন্দিরের সম্মুখে প্রথম অভিনয় করেন।

মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের মতে বাল্য জীবনের ঘটনার বীজই পরবর্ত্তী জীবনে ঘটনারূপে প্রকাশিত হয়। সেই জন্য মা কালীর সম্বন্ধে অনুভূতি গিরীশচন্দ্রের জীবনে যেভাবে দেখা দিয়াছিল, তাহার মূল অনুসন্ধানের জন্য গিরীশচন্দ্রের কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

সন ১২৫০ সালে গিরীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার অষ্টম সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর অষ্টম সন্তান ছিলেন, সে জন্য অষ্টম গর্ভের সন্তান যদি জীবিত থাকে—তাহা হইলে সে বিশেষ কোন শক্তির অধিকারী হইবে অথবা দৈবী ক্ষমতা লাভ করিবে ইহাই হিন্দুর সংস্কার। এই সংস্কার অনেক হিন্দুর মনে এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু মহিলার মনে দৃঢ়ভাবে আছে।

গিরীশচন্দ্রের জননী সে কালের ধর্ম্মপ্রবণা হিন্দু নারী, তাঁহার মনে এ সংস্কার বিশেষভাবে ছিল। শৈশবে গিরীশচন্দ্র জননীর স্তন্যদুগ্ধ পান করিতে বা তাঁহার ক্রোড়ে লালিত হইতে পান নাই, গিরীশচন্দ্রের জন্মের পরই তাঁহার জননী গুরুতররূপে পীড়িতা হন এবং দীর্ঘকাল শয্যাগতা থাকেন, সেই জন্য একজন স্বীয় জাতীয়া দাসীর নিকট শিশু গিরীশচন্দ্র লালিত হন। ইহার পর জ্ঞানোদয় হইলে মাতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষায় গিরীশচন্দ্র জননীর নিকট যাইলে স্নেহের পরিবর্ত্তে কারণে ও অকারণে তিরস্কার ও কঠিন ব্যবহারই পাইয়াছেন, মাতৃস্নেহপিপাসু পুত্রের মাতৃস্নেহ লাভের আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহার ফলে তিনি একগুঁয়ে ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। সামান্য অন্যায় করিলেও তিনি জননীর নিকট কঠোর শাস্তি পাইতেন। একদিন তিনি কোন এক জনকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন বলিয়া শাস্তি স্বরূপ তাঁহার মুখে গোবর পুরিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু বাহিরে যে জননীর সন্তানের উপর এমন নির্ম্মম কঠোর ব্যবহার ছিল সেই জননীরই অন্তরে পুত্রবাৎসল্যের স্নিগ্ধ ফল্গুধারা প্রবাহিত হইত, অথচ সম্মুখে তাহা তিনি প্রকাশ হইতে দিতেন না। কিন্তু একদিন ঘটনা ক্রমে গিরীশচন্দ্র মায়ের সেই স্নেহের পরিচয় পাইলেন।

গিরীশচন্দ্রের নয় বৎসরের বয়ঃক্রমের সময় দারুণ জ্বরে গিরীশচন্দ্র সংজ্ঞা-শূন্য অবস্থায় ছিলেন, সেই অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় শুনিতে পাইলেন জননীর করুণ বিলাপ। গিরীশচন্দ্রের জননী কাঁদিয়া কাঁদিয়া গিরীশচন্দ্রের পিতাকে বলিতেছেন, "গিরীশ কি আমার বাঁচবে না? বাছাকে একদিন আমি ভাল মুখে কথা বলি নি। কতবার একটু আদর পাবার জন্য আমার কাছে এসেছে, আমি কঠিন কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন যে তেমন করেছি তা কেবল ভগবানই জানেন। আমি ডাইনি, আমার প্রথম সন্তানকে আমি খেয়েছি। গিরীশ আমার অষ্টম সন্তান, এমন ভাগ্যবান ছেলে সহজে বাঁচে না। আমার মত ডাইনি মায়ের নিঃশ্বাসে সে বাঁচবে না বলেই তাকে কোলে নিই নি, কোনও দিন মিষ্ট কথা বলি নি। বাছা কত আশা করে আমার কাছে আস্‌তো, আর আমার কঠিন ব্যবহারে মলিন মুখ নিয়ে ফিরে যেতো। সেই ছেলে আজ আমার যেতে বসেছে, কি করে আমি প্রাণ ধরবো বল।"

পরবর্ত্তী জীবনে গিরীশচন্দ্র যে জগন্মাতাকে খড়্গধারিণী কালীরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার শৈশব জীবনের ও বাল্য জীবনের সহিত সেই দর্শনের কি সম্বন্ধ তাহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা করিলে তাহাতে অনেকটা আলোক-পাত হয়। মনোবিজ্ঞান বলে, মাতা ও পিতার ভাব ও মাতা ও পিতা সম্বন্ধে ধারণা আমাদের অচেতন মনকে আশ্চর্য্যভাবে প্রভাবান্বিত করে। নিজের পিতা ও মাতা সম্বন্ধে ধারণা ও ভাবের মধ্য দিয়া আমরা জগৎপিতা ও জগন্মাতার ভাব ও ধারণা মনের মধ্যে সৃষ্টি করি। জগন্মাতা কালীরূপে গিরীশচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি জননী অথচ খড়্গধারিণী এবং অতি কঠোরা। আবার তিনি জগৎহিতকারিণী ও করুণাময়ী। অভিনয়রূপ তুচ্ছ বিষয়ে গিরীশের আসক্তি তিনি লক্ষ্য করিলেন। মাতা যেমন ক্রীড়ামোদী সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিকাশের জন্য তাহার তুচ্ছ ক্রীড়ামত্ততা তাহার নিজের প্রীতিকর হইলেও দূর করিতে চাহেন, জগন্মাতা সেইরূপ গিরীশের অভিনয়াসক্তি

হরণ করিয়া লইলেন। এবং তুচ্ছ কার্য্য ছাড়িয়া উচ্চ কার্য্য নাটক রচনায় শক্তি নিয়োগ করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন।

গিরীশচন্দ্রের রচনা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনি তাঁহার জননীকেই জগন্মাতার প্রতীক করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সেই জননী যিনি পুত্রবৎসলা, করুণাময়ী অথচ পুত্রের কল্যাণের জন্যই নির্দ্দয়রূপে পুত্রের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। জননীর উপর গিরীশচন্দ্রের ভক্তি ও ভালবাসার সীমা নাই, অথচ ভয়ও আছে, কেন না তিনি সামান্যা নহেন, তিনি জগজ্জননী। তাঁহার গোবরা নামক ছোট গল্পে তাঁহার শৈশব জীবন ও জননীর চিত্র তিনি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

বিল্বমঙ্গল নাটকে পাগলীর গান,—

"ওমা, কেমন মা তা কে জানে।
মা বলে মা ডাকছি কত
বাজে না কি মা তোর প্রাণে।"

এই যে জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে উক্তি, ইহাও তাঁহার গর্ভধারিণীর উদ্দেশে উক্তি বলা যাইতে পারে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া লেখকগণের রচনা বিশ্লেষণ করিলে একটি বিষয় দেখা যায় যে অধিকাংশ লেখকের রচনার একটি নির্দ্দিষ্ট কাঠাম আছে। আবার কতকগুলি এমন লেখক আছেন যাঁহাদের রচনার প্রতিভা বহুমুখী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক লেখকের রচনার যে একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে ইহা অনেকটা নিশ্চয়রূপে বলা যায়। এই নিজস্ব ভঙ্গী ধরিয়া পূর্ব্বকালের লেখকগণের রচনার মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত রচয়িতা নির্ণয় করার সুবিধা হইতে পারে। যেমন চণ্ডীদাস কয়জন ছিলেন, ইহা লইয়া সাহিত্য সমাজে প্রশ্ন উঠিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস—ভনিতার এই বিভিন্নতায় অনেকে মনে করেন, চণ্ডীদাস তিনজন ছিলেন। মীরাবাই-এর নামে যে সকল ভজন গান প্রচলিত আছে, সে সকলের মীরাবাই একজন অথবা অনেকজন "মীরাবাই" নামের ভনিতা দিয়া রচনা করিয়াছেন এ বিষয়েও একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। Beaumont ও Fletcher নামক দুইজন প্রসিদ্ধ নাট্যলেখক

একসঙ্গে কতকগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন অংশ কে লিখিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হইয়াছে। সেইরূপ চণ্ডীদাস ও মীরাবাই-এর রচনা সম্বন্ধেও চেষ্টা করা যাইতে পারে। এইভাবে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ সাহিত্য-বিষয়ক প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

যে সকল কবির কবিতা অন্তর্দৃষ্টিমূলক, নির্জ্জান মনের রহস্যই তাঁহাদের কবিতার প্রধান উপাদান। সেই জন্য তাঁহাদের কবিতায় বিগ্রহ বা symbolism অধিক পরিমাণে থাকে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত রচনা করিয়াছেন, কবির অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে সেই সমস্ত রচনাতেই নির্জ্জান মনের রহস্য বিগ্রহের ভিতর দিয়া নানা আকারে পরিস্ফুট হইয়াছে। বিগ্রহের ভিতর দিয়া ভাব ও রসকে মূর্ত্তিদান করিতে যাঁহারা পারেন তাঁহারা কেবল শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌ই নহেন, মানব মনের গভীরতম রহস্য তাঁহারা অন্তর দিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই ক্ষমতা অনন্য-সাধারণ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার কি কবিতা, কি উপন্যাস অথবা ছোট গল্প সকলের মধ্যেই ইসারা ইঙ্গিতে মানব মনের অতি গূঢ়তম রহস্য পাঠকের মনের তন্ত্রীতে আসিয়া প্রতিঘাত করে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে কয়েকটি symbol বা প্রতীক লইয়া আমি ১৯২৮ সালের Calcutta Review পত্রিকায় এবং ১৯৩৮ সাল অর্থাৎ গত বৎসরের বিচিত্রা পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় কিছু আলোচনা করিয়াছি।

কান্ত কবি রজনীকান্ত যখন ক্যানসার রোগে পীড়িত হইয়া মেডিক্যাল কলেজের কটেজ ওয়ার্ডে ছিলেন তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিতে যান। রজনীকান্ত গলায় ক্যানসার হইয়া কথা বলিতে পারিতেন না, কাগজে লিখিয়া কথার উত্তর দিতেন ও বক্তব্য বলিতেন। রবীন্দ্রনাথকে কান্ত কবি লিখিয়া জানান "যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার "রাজা ও রাণী" একবার আপনার কাছে অভিনয় করে শুনাতাম। আমি রাজার অভিনয় করেছি; এমন কাব্য, এমন নাটক কোথায় পাব। রাজার পার্ট আজও মুখস্থ আছে। এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার, যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়া পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

রবীন্দ্রনাথ ইহার পর রজনীকান্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—প্রীতিপূর্ণ নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া অমরাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি, মাংস, স্নায়ু, পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোন মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি "রাজা ও রাণী" নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—"এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার, যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়া পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়।"

এই কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ দুঃখ বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারে প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে যন্ত্রণা পরাভূত করিতে পারে নাই। কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এ পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরও তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি, মাংস ও ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্যে নাই, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

কি ভাবে রজনীকান্তের উদাহরণস্বরূপ "রাজা ও রাণী"র ঐ কয় ছত্র মনে পড়িয়াছিল, অবচেতন মনের ক্রিয়া অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বুঝিবার ক্ষমতায় রবীন্দ্রনাথের মনে ঠিক যেন তাহার স্বরূপটিই উদয় হইয়াছিল।

নব্য মনস্তত্ত্ব প্রমাণ করিয়াছে যে মানুষের অনেকগুলি সহজাত সংস্কারমূলক প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে ভোগের পথে টানিয়া লইতে চায়, কিন্তু নির্জ্জান মনের ক্রিয়া এই প্রবৃত্তিগুলির ভোগের দিকে গতির মোড় ফিরাইয়া বিকাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। মানুষের মনের ভিতর যতগুলি সহজাত সংস্কার আছে, তাহাদের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তিই বিশেষ ভাবে

প্রবলতম প্রবৃত্তি। কিন্তু এই প্রবৃত্তির শক্তি যে মোড় ফিরাইয়া উচ্চতর পথে প্রযুক্ত করা না যায় এমন নয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"কামকেই কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত করিতে হইবে।" নব্য মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হইতেও আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্তই পাই। নব্য-মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, মানব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি যাহা যুগ যুগ ধরিয়া ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা যৌন-আকাঙ্ক্ষা সংযম ও যৌন প্রবৃত্তির শক্তিকে মহত্তর প্রকাশ ও গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োগের ফলেই হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ইহাকেই sublimation of the sexual energy বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" পুস্তকে আমরা বিনোদিনীর চরিত্রে নিম্নতর ভোগের প্রবৃত্তি কি রূপে জীবনের মহত্তর শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার ছবি দেখিতে পাই। এবং এই ব্যাপারে আর একটি মনস্তত্ত্বের রহস্যেরও আমরা পরিচয় পাই, তাহা Introjection বা অপরের মহত্তর প্রভাবকে আপনার মধ্যে আহরণ করিয়া আত্মসংগঠন।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত স্বদেশী ডাকাতি মামলার বিবরণ হইতে একটি introjection process-এর দৃষ্টান্ত এখানে প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হইল।

কাকোরী মামলার আসামী কতকগুলি স্বদেশী যুবক একখানি চলন্ত ট্রেন থামাইয়া ডাকাতি করে ও পরে ধরা পড়ে। বিচারে এই ধৃত আসামীগণের ভিতর তিনজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তাহাদের ভিতর একজন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অপর দুইজনের মধ্যে একজন হিন্দু এবং আর একজন মুসলমান। ইহাদের নাম রামকিঙ্কর ও আসগর আলি।

রামকিঙ্কর ও আসগর আলি একই সহরে বাস করিত, কিন্তু পরস্পরের আলাপ পরিচয় ছিল না। আসগর আলি দূর হইতে রামকিঙ্করকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। কি সুন্দর তেজস্বী মূর্ত্তি। কি নির্ভীক চাল চলন। আসগর আলি ভাবিল, উহার সহিত পরিচয় হইলে আমি ধন্য হইতাম।

কিছুদিন পরে একটি স্বদেশী মামলায় রামকিঙ্কর অল্পদিনের জন্য জেলে গেল, আস্‌গার আলি এই সূত্রে জানিতে পারিল যে রামকিঙ্কর একজন দেশকর্ম্মী। আস্‌গর আলি রামকিঙ্করের নিকট গিয়া প্রার্থনা জানাইল যে তাহাকেও স্বদেশ সেবার কর্ম্মে লওয়া হউক। রামকিঙ্কর প্রথমে ইতঃস্ততঃ করিয়া পরে

আস্‌গর আলির ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া তাহাকে দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইল।

এই সময় একদিন আস্‌গর আলি প্রবল জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় ক্রমাগত "রাম রাম" বলিতে লাগিল। আস্‌গর আলি মুসলমান, তাহার মুখে ঐ ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় "রাম রাম" শুনিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজন মনে করিল যে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে, তাহারা রোজা ডাকিয়া আনিল। ইতি মধ্যে রামকিঙ্কর আস্‌গর আলীর অসুখের খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে আসিল। রামকিঙ্কর যখন শয্যায় বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, তাহাতেই আস্‌গর আলি অনেক সুস্থ বোধ করিল।

কাকোরী মামলায় একটি লোক খুন হইয়াছিল, সে লোকটি আস্‌গর আলির বন্দুকের গুলিতেই মারা পড়ে এমনি প্রমাণ হয়। আস্‌গর আলির জীবন ভিক্ষার জন্য আত্মীয় স্বজন একটি দরখাস্ত করিয়া তাহাতে তাহার সই লইতে গিয়াছিল, কিন্তু আস্‌গর আলি সে দরখাস্তে সই করিতে কিছুতেই রাজী হইল না। সে বলিল "রামকিঙ্কর ফাঁসী কাঠে ঝুলিবে আর আমি প্রাণভিক্ষা লইয়া বাঁচিয়া থাকিব ইহা অসম্ভব।" এই ঘটনার কাহিনী হইতে বুঝা যায়, আস্‌গর আলি রামকিঙ্করের ব্যক্তিত্বের সহিত নিজের ব্যক্তিত্ব এমন ভাবে মিশাইয়া ফেলিয়াছিল যে রামকিঙ্করের মৃত্যুর পরও সে বাঁচিয়া থাকিবে এরূপ চিন্তাও সে মনে স্থান দিতে পারে নাই।

নব্য মন-বিজ্ঞানে ইডিপাস কম্‌প্লেক্স (Œdipus complex) নামে একটি উদ্ভট মনোবিকারের বিবরণ আছে। উন্মাদ রোগ প্রভৃতি প্রবল মানসিক ব্যাধির মূলে, অনেক স্থলে ইহাই হেতু স্বরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, ইহা নব্য মনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্ত। এই ইডিপাস কমপ্লেক্সের অর্থ জননী কি মাতৃস্থানীয়া কোনও রমণীর প্রতি কামজ আকর্ষণ। একজন পুরুষের কোনও নারীর প্রতি কামজ আকর্ষণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার প্রতি ঐরূপ মনের ভাব হওয়া অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই অস্বাভাবিক ভাব যাহার মনে উদয় হয়, তাহার মনের স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থতা থাকিতে পারে না ইহা সহজেই বুঝা যায়।

অনেক সময় জাগ্রত অবস্থায়, নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়ার গতি বুঝা যায় না কিন্তু স্বপ্নের মধ্য দিয়া ইহার বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফ্রয়েড বলেন—

"নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া বুঝিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার পথ হইতেছে স্বপ্ন বিশ্লেষণ।" শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ফ্রয়েড এই তথ্য আবিষ্কার করিবার অনেক পূর্ব্বে এই স্বপ্ন সম্বন্ধীয় তথ্যটির মর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার শিষ্য স্বর্গগত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ পাঠ করিয়া জানিতে পারি। গোস্বামী প্রভু কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা দান করিয়া সাধনের সময় তিনি নিদ্রাকালে যাহা স্বপ্ন দেখিবেন তাহা যতটা স্মরণ থাকে লিখিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় তদনুসারে তাঁহার সাধন অবস্থার কতকগুলি স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীসদ্গুরু হইতে একটি স্বপ্নবিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল।* * জাগ্রত কি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম জানি না। অকস্মাৎ আমার পায়ের দিকে কামিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে কাতর স্বরে আমাকে বলিল, "ও কি ভাবছো? এই যে এসেছি, এখন তোমার যা ইচ্ছা।" * * * আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কখন আমি তোমাকে ডেকেছি? কে তুমি? এখানে কেন?"

কামিনী বলিলেন, "তোমার অদম্য কামভাবে আমার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হয়েছে, তোমার বিকার থাকতে আমার নিস্তার নাই। এখন বাসনার পরিতৃপ্তি কর, ঠাণ্ডা হও। আমিও বাঁচি।"

আমি অমনি উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম, "তুমি কে, বল না কেন?" রমণী তখন তক্তপোষের ধারে বামপার্শ্বে আসিয়া দাড়াইলেন এবং মধুরভাবে বিনয় সহকারে বলিলেন, "একবার আমাকে ধরে আলিঙ্গন কর না। পরিচয় পাবে এখন।" আমি উহাকে ক্রোড়ে বসাইবার অভিপ্রায়ে যেমন উহার কটিদেশে কর সংযোগ করিলাম, রমণীর অলৌকিক রূপ দেখিয়া অমনি বিস্ময়ে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলাম। আমার শিথিল হস্ত খসিয়া পড়িল। * * * দেখিলাম নীল দ্যুতিসম্পন্না সুন্দরী, শ্যামা উলঙ্গিনী বেশে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। * * আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া উহাকে আবার ধরিতে হাত বাড়াইলাম, রমণী তখন পশ্চাৎ দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আমাকে বলিলেন, "—আর কেন? যথেষ্ট হয়েছে। আর কাম কল্পনা কোরো না, আমাকে টেনো না। এবার ভেবে দেখ, আমি কে? এখন যাই।" এই বলিয়া উলঙ্গিনী কামিনী শ্যামাঙ্গের

উজ্জ্বল ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্থিতা হইলেন। * * * দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময়ী শ্যামা প্রতিমা অনন্ত নীলাকাশে স্বরূপ মিলাইয়া ধীরে ধীরে বিলীন হইলেন।"

যদি সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা এই স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা দেখি যে, একটি উদ্দাম প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই প্রবৃত্তি একজন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাঁহার অহংএর একস্থলে এমন একটি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, যাহাতে সেই উদ্দাম প্রবৃত্তি সাধারণতঃ যেভাবে অহংএর উপর ক্রিয়া করে সেরূপ ভাবে ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইতেছে না। তখন, এই প্রবৃত্তির গতি যেন যে পথে চলিতেছিল, সে পথে বাধা পাইয়া আর এক নূতন পথে ধাবিত হইতেছে। এই যে ক্রিয়াটি মনের ভিতর হইতেছে, ইহা নির্জ্ঞান মনের মধ্যে হইতেছে, স্বপ্নের ভিতর দিয়া তাহা এইরূপ আকারে পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিলে আরও আমরা দেখিতে পাই, যেন তিনটি বিষয়ের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিক্রিয়া হইতেছে। তাহার প্রথম বিষয়টি এক শ্রেণীর প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির ভিতর বিভিন্ন শ্রেণী আছে, যেমন, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি। ডাক্তার ফ্রয়েড এই প্রবৃত্তিগুলির যে মূল কারণ অথবা উৎস তাহার একটি নামকরণ করিয়াছেন, কথাটি সংস্কৃত শব্দের 'ইদম'। বৈজ্ঞানিক ভাষায় সংক্ষেপে ইহাকে (Id) ইদ্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়টি ব্যক্তিত্ব বা অহং, যাহার উপর এই Id ক্রিয়া করিতেছে। এই ব্যক্তিত্ব বা অহং-এর বৈজ্ঞানিক আখ্যা Ego। তৃতীয় অহং বা Ego-র উপর 'ইদ্'-এর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে Ego-র কতকটা পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেখা যায় অনেক স্থলে "ইদ্" যখন, Ego-র উপর ক্রিয়া করে, তখন Ego অনেক সময় বাস্তব জগতের অস্তিত্বের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। কিন্তু বাস্তব জগতের নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে চলিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। সেই জন্য Ego বা অহং এইরূপ বিরুদ্ধাচরণের জন্য অনেক সময় কষ্ট সহ্য করে। এইরূপ ভুল ভ্রান্তির জন্য দুঃখ কষ্ট পাইয়া Ego ক্রমশঃ একটা অভিজ্ঞতা লাভ করে যাহার ফলে সে বুঝিতে পারে যে প্রবৃত্তি উপভোগ করিলে সুখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতের নিয়ম কানুন লক্ষ্য করিয়া তাহা করিতে হয়, নতুবা পরিণামে মুস্কিলে পড়িতে হয়। এই সব কারণে Ego-র এক অংশ এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, যাহাতে Egoর উপরে Id-এর ক্রিয়া

যে পথে গতিলাভ করিয়াছিল, এখন সে পথে না গিয়া এক নূতন পথে ধাবিত হয়। এই পরিবর্ত্তিত Egoর অংশের নাম Super-Ego বা শ্রেষ্ঠ অহং। এইরূপে আমরা তিনটি বিষয় বা বস্তু পাইলাম। Id (ইদ্), Ego (এগো বা অহং) এবং Super-Ego (শ্রেষ্ঠ অহং)। নব্য মনস্তত্ত্বের গবেষণা প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় লইয়া।

উপরের বর্ণনাটি স্বপ্নের ঘটনা হইতে দেওয়া হইয়াছে, এখানে আমরা জাগ্রত অবস্থায় মনের গভীরতম ক্রিয়ায় Super-Ego বিকাশের একটি অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমার একজন রোগী মনঃসমীক্ষণের সময় এই ঘটনাটি আমার নিকট বিবৃত করিয়াছিল। কিছুদিন আগে সে পিতার মৃত্যুর পর পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কলিকাতায় ইহার কতকগুলি ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় কোনও ভাড়াটিয়া বাড়ীর ভাড়া আদায় করিয়া মোটর করিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল। হঠাৎ সে একটা বাড়ীর সম্মুখে ড্রাইভারকে মোটর থামাইতে বলিল। সে আমার কাছে বলিয়াছিল যে ঐ বাড়ী যে কাহার বাড়ী তাহা সে জানিত না, এবং কেন যে হঠাৎ সেখানে গাড়ী থামাইয়া সেই অচেনা বাড়ীতে তাহার প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল, তাহাও সে জানে না। যাহা হউক সে গাড়ী থামাইয়া যে অপরিচিত বাড়ীতে প্রবেশ করিল তাহা একটি গণিকালয়। সুতরাং এই যুবক যে ইতিপূর্ব্বে এ পথ দিয়া যাতায়াতের সময় এই বাড়ী ও বাড়ীর বাসিন্দাকে লক্ষ্য করিয়াছিল এবং বর্ত্তমানে তাহা স্মরণ নাই এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর অধিবাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্য তাহার মনে গূঢ় ইচ্ছা হইয়াছিল এবং বিবেক-জনিত বা লোকলজ্জা-জনিত বাধাবোধও সেই সঙ্গে তাহার মনে জাগিয়াছিল, ভুলিয়া যাইবার ইহা একটি কারণ হইতে পারে।

যাহা হউক যুবক বাড়ীতে প্রবেশ করিলে বাড়ীওয়ালী ঐ যুবককে দরজা হইতে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল এবং যে ঘরে সেই গণিকা ছিল, সেই ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসাইল। পতিতা মেয়েটি তখন খাটের উপর বসিয়াছিল, যুবক চেয়ারে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখ দেখিতে দেখিতে তাহার ছেলে বেলার একটি দৃশ্য মনের

ভিতর উদিত হইল। তাঁহার মা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে বসিয়া জপ ও আহ্নিক করিতেন, সেও সেই সময় ঠাকুর ঘরের দরজায় বসিয়া থাকিত, এবং ঠাকুর ঘরের ভিতর সম্মুখের দেওয়ালে যে দেবীমূর্ত্তির চিত্রপট ছিল এক মনে তাহাই দেখিত। আজ সেই পতিতার মুখ দেখিয়া সেই দেবীমূর্ত্তির ছবিখানি সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহার মনে হইল যেন ঐ পতিতার মুখখানি সেই চিত্রাঙ্কিত দেবীর মুখের সহিত এক হইয়া গেল। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, বাড়ীওয়ালী তখন তাহাকে ধরিয়া তাহার পকেটে বাড়ীভাড়ার যত টাকা ছিল, সমস্তই কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে দিল।

উপরোক্ত স্বপ্নের ঘটনা ও জাগ্রত অবস্থার ঘটনা এই উভয় ঘটনাতেই দেখা যাইতেছে, মনের গভীরতম প্রদেশে কাম প্রবৃত্তির এক উদ্দাম আবেগ; কিন্তু যাহার মনে এই প্রবৃত্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার অহং-এর নির্জ্ঞান মনে এক দেবীরূপিণী মাতৃমূর্ত্তির পবিত্র চিত্র উদয় হইল এবং ইহার ফলে সেই প্রবৃত্তির স্রোত তাহার গতিপথ হইতে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া অপর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

১৭ বৎসর বয়স্ক একটি কলেজের ছাত্র অনিদ্রা রোগে ভুগিতেছিল, নিদ্রা-কারক ঔষধ না খাইলে তাহার নিদ্রা হইত না। আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিলে আমি কোন মানসিক কারণ হইতে তাহার এই ব্যাধি হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য মনঃসমীক্ষণ প্রণালী মত তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করি। কিছুদিন চিকিৎসার পর বুঝিলাম তাহার মনের মধ্যে Birth Symbol ক্রিয়া করিতেছে। এই Birth Symbol জিনিসটি কি তাহা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। এখানে ইহার মোটামুটি কিছু আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি।

মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণ থাকে তখন সে মাতৃগর্ভস্থ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে বা ভাসিতে থাকে। যদি কেহ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে জলের মধ্যে ভ্রূণের মত কিছু ভাসিতেছে, অথবা জল হইতে বাহির হইতেছে বা জলের মধ্যে ডুবিতেছে এইরূপ দেখে, অথবা দিবাস্বপ্নে এই ভাব তাহার মনের মধ্যে উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার নির্জ্ঞান মনের ভিতর Birth Symbol বা জন্ম-প্রতীকের ক্রিয়া

হইতেছে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রলয়-সলিলে বট পত্রের উপর নারায়ণ শিশুরূপে ভাসিতেছেন বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা Birth Symbol-এর বর্ণনা। বাইবেলেও জলপ্লাবনে মগ্ন পৃথিবীতে নোয়ার জাহাজখানি ভাসিতেছে বলিয়া বর্ণনা আছে, সেই জাহাজে যেসব প্রাণী আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আছে, এই যে বর্ণনা, ইহাও সেই Birth Symbol-এর বর্ণনা। "চতুরঙ্গ" পুস্তকে শচীশের ডায়ারিতে একটি গুহার কথা আছে ঃ—"সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মত—তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু। তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে। সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী,—তার মন নাই, সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে—সে নিঃশব্দে কাঁদে।" এই চিত্রটিও Birth Symbol-এর চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবার যোগ্য।

এই Birth Symbol গভীর মনের মধ্যে কি করিয়া উদয় হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে। শিশু মায়ের গর্ভে থাকে, প্রসব বেদনার সময় জরায়ুর সঙ্কোচ প্রভৃতিতে প্রপীড়িত হইয়া কষ্ট পায়, তাহার পর প্রসূত হইয়া গর্ভমুক্ত শিশু, মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আরাম পায়; এই সকল অবস্থার অভিজ্ঞতা তাহার নির্জ্জান মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। 'জঠর যন্ত্রণা' বলিয়া সেই জন্য একটি কথার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মাতৃগর্ভ যে কেবল যন্ত্রণাময় কারাগার তাহাও নহে। শিশু যখন বড় হইয়া জীবন সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে হাবুডুবু খাইতে থাকে তখন হয়তো তাহার মাতৃগর্ভের শান্তিময় জীবনের কথা মনে পড়ে এবং সেইরূপ শান্তিময় জীবনে আবার ফিরিয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা হয়। ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগের মধ্যে সমাধি-লাভের ইচ্ছা কতকটা সেই মাতৃগর্ভে আবার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছারই প্রকাশ স্বরূপ।

যে যুবকটি আমার চিকিৎসাধীন ছিল, সে একদিন মনঃ-সমীক্ষণের সময় আমার কাছে প্রকাশ করিল যে সে মাঝে মাঝে কবিতা লেখে। যখন রাত্রে তাহার মাথার বেদনা অসহ্য হয়, কিছুতেই ঘুম আসে না তখন কবিতা লিখিয়া

সে আরাম পায়। অনেক বলা কহার পর কবিতার খাতাখানি আমাকে দেখিতে দিয়াছিল, তাহা হইতে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

শ্রাবণের অশ্রুধারায়
　　কদম ফোটেরে,
ব্যথা তার মধুর হয়ে
　　রঙিয়ে ওঠে রে।
নদী তারে আপন বুকে
ভরে নিল নিবিড় সুখে
বেদনা তার কোন পুলকে
　　কোথায় ছোটেরে।

দ্বিতীয় কবিতাটি এই ঃ—

মম বেদনার সরোবর নীরে
　　কমল উঠিল ফুটি,
মম বিষাদের বন বীথিকায়
　　পবন পশিল ছুটি।
নব কিশলয় নব ফুল দলে
　　শোভিল রিক্ত শাখী—
শোভন ছন্দে গাহিয়া উঠিল
　　যতেক সুপ্ত পাখী।

এই দুইটি কবিতায় প্রথমটিতে কদম্ব ও দ্বিতীয়টিতে কমল ফুটিবার কথা বলা হইয়াছে। দুটি ফুলই গোলাকার ও লাল রং-এর। কদম্ব সম্পূর্ণ লাল না হইলেও রক্তিমাভ হরিদ্রা বর্ণের। ভ্রূণের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। ঐ দুই ফুলের সহিতই জলের সংযোগের কথা কবিতায় বলা হইয়াছে। কদম্ব বর্ষা ধারায় প্লাবিত হইতেছে ও নদীর জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। কমল সরোবরের সলিলে ভাসিয়া আছে। উভয় ফুলের কথা উল্লেখের সহিত 'ব্যথা' ও 'বেদনা'রও উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে আবার এই ব্যথা ও বেদনা পুলকে পরিণত হইল। এই বর্ণনা নির্জ্জান মনের Birth Symbol-এর ছবি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য কেবল কবিতা হইতেই যে Birth

Symbol ধরা হইয়াছিল তাহা নয়, মনঃসমীক্ষণ হইতে সংগৃহীত উপাদান-গুলিও এই রোগনির্ণয় কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল। সে পিতামাতার একমাত্র পুত্র; মায়ের নিকট অজস্র আদর পাইয়াছে, কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই পিতার নিকট কঠিন শাসন সহ্য করিতে হইয়াছে। এইসব পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিও Birth Symbol-এর পরিপোষক।

কবিতার মধ্য দিয়া symbol-এর প্রকাশ শ্রেষ্ঠ কবিগণের কবিতায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় symbolism-এর কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নব্য মনস্তত্ত্বের দ্বারা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার পুস্তক ইউরোপে ইংরাজী ভাষায় এবং বহু বিভিন্ন ভাষায় আছে। ডাক্তার ফ্রয়েড Gradiva নামক একখানি উপন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া নব্য মনোবিজ্ঞান কি ভাবে সাহিত্যে প্রয়োগ করা যায় তাহার পথ দেখান। ডাঃ আর্নেষ্ট জোন্স (Dr. Ernest Jones) শেক্সপিয়ারের কোন কোন পুস্তক এই প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন। Charles Bandouin নামক একজন ফরাসী লেখক ফরাসী কবি Emile Verhairen-এর পুস্তকাদি এই মনঃসমীক্ষণ প্রণালীতে আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, সেই পুস্তকখানি ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের নাম "Psycho-Analysis and Æsthetics"। বাঙ্গালা ভাষাতেও যদি এই শ্রেণীর গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা সমৃদ্ধ হইবে।

নব্য মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে ইহা কেবল মনের অসামাজিক নীচ প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধীয় আলোচনা। কিন্তু নির্জ্ঞান মনের একটা উচ্চতর দিক অবশ্যই আছে। যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

"শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা সরিৎ।
পৌরুষেন প্রযত্নেন লস্তনীয়া শুভে পথি।

অর্থাৎ বাসনা সরিৎ শুভ এবং অশুভ এই দুই পথ দিয়াই প্রবাহিত হয়। পৌরুষ সম্পন্ন ব্যক্তিদের যত্ন করিয়া শুভ পথে লইয়া যাওয়াই উচিত।

যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে ঐরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

চিত্ত নদী উভয়তঃ বাহিনী
বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায়।

অর্থাৎ চিত্ত নদী দুই দিক দিয়াই বহিয়া যাইতে পারে। কল্যাণের পথ দিয়া বহিয়া যাইতে পারে, আবার পাপের পথ দিয়া বহিয়া যাইতে পারে।

মনঃসমীক্ষণ বা Psycho-Analysis-এ যাহা বলা হইয়াছে যোগ-বাশিষ্ঠের সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই। মনঃসমীক্ষণের মতে "ইদ্" মানুষের অন্তরের আদিম শক্তি ও অতি প্রবল শক্তি—যোগবাশিষ্ঠ যাহাকে 'বাসনা সরিৎ' বলিয়াছেন। সেই শক্তির যখন উচ্চ পথে গতি হয় তখন Psycho-Analysis-এর ভাষায় তাহার sublimation হইয়াছে বলা হয়।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত যখন ইউরোপ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন ভিয়েনায় ডাঃ ফ্রয়েডের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ডাঃ ফ্রয়েড তাঁহাকে চা'এর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ডাঃ ফ্রয়েড অধ্যাপক দাসগুপ্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে "ভারতবর্ষে যোগসাধনের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিতে পাওয়া যায়। যোগসাধনে মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়, মনের পরিবর্ত্তন হয়, এইরূপ কথা শুনা যায়। এ সম্বন্ধে Psycho-Analysis দ্বারা পরীক্ষা করার কোনও উপায় আছে কি?" অধ্যাপক দাসগুপ্ত কিছু রাগতঃ হইয়া উত্তর দেন যে "যোগদর্শনের ন্যায় উচ্চস্তরের দর্শনের সাইকো-অ্যানালিসিসের ন্যায় জড় মনোবিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা সম্ভব নহে বলিয়া তিনি মনে করেন।"

কিন্তু বাস্তবিকই কি ইহা অসম্ভব? যোগদর্শনের দ্বারা সাইকো-অ্যানালিসিস্ হইতে কি নূতন তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে না?*

শ্রীসরসীলাল সরকার

* সাহিত্য পরিষদে পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ।

মানুষের মন

শুধু পশুপক্ষীরই নহে, মানুষেরও চিড়িয়াখানা···পৃথিবী।

* * *

আত্মীয়স্বজনহীন নিঃসন্তান প্রৌঢ় দম্পতি। রমানাথ ও ভবানী।

রমানাথ লোক মন্দ নহেন, কাহারো সাতে পাঁচে থাকিতে ভালবাসেন না; মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে। দোষের মধ্যে একটু বেশী কৃপণ-স্বভাব। বংশরক্ষা করিবার জন্য কেহ নাই, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র দুঃখ।

রমানাথ-গৃহিণী পূর্ব্বে বহু মাদুলী ও কবচ ধারণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, কোন ফল হয় নাই। সন্তান কামনায় সন্ন্যাসীদের পিছনেও তিনি কম পয়সা নষ্ট করেন নাই। মন্দিরে মন্দিরে হত্যা দিয়াও এবং অনেক মানত করিয়াও কোন ফল হইল না দেখিয়া ভবানী ইদানীং ওসব করা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মাত্র দুইজন প্রাণী, খরচ প্রায় নাই বলিলেই হয়, কাজে কাজেই হাতে বেশ দুপয়সা জমিয়াছে এবং পয়সা যতই জমিতেছে, রমানাথও ততই আরো কৃপণ হইয়া উঠিতেছেন।

লোকে বলে,—"দাদা পয়সা যে জমিয়েই চলেছো, এত পয়সা করবে কি?"

উত্তরে রমানাথ কিছু না বলিয়া শুধু হাসেন।

রমানাথের বাড়ীর চারিপার্শ্বে দশ বারো কাঠা জমি। তাহাতে রমানাথ তরিতরকারীর বাগান করিয়াছেন। এই একটি মাত্র সখ তাঁহাদের, এবং ইহাতে কর্ত্তা ও গৃহিণী দুইজনেরই একটু বেশী ঝোঁক আছে। ইহা হইতেও কিছু অর্থাগম হয়।

পাড়ার ছেলেরা আসিয়া বলে,—"খুড়ো, আমাদের ক্লাব যে উঠতে চল্‌লো, আপনার ত এত পয়সা, একটু কৃপা করুন, নইলে দাঁড়াই কোথায়?"

রমানাথ বলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোদেরও যেমন, ক্লাব করেছিস, বেশ করেছিস! বসে বসে ত' খালি আড্ডা দিবি তার জন্যে পয়সা কিসের? পয়সা টয়সা পাবি না, যা ভাগ্।"

ছেলেরা কিন্তু উঠিবার নাম করে না।

রমানাথ হঠাৎ চেঁচাইয়া ওঠেন,—"আরে আরে, হেই হেই হেই, সব গাছগুলো গরুতে খেয়ে গেল। বাড়ীর পিছনে খস্ খস্ আওয়াজ কিসের? তোদের জ্বালায় গেলুম রে বাবা!"

রমানাথ কাল্পনিক গরু তাড়াইতে উঠিয়া যান্। আর ফিরিয়া আসেন না।

ছেলেরা হাঁকে "খুড়ো একটা গতি করে দিন।" কোন উত্তর না পাইয়া উহাদের মধ্য হইতেই একজন চেঁচাইয়া বলে,– "খুড়ো এত পয়সা করবে কি? শেষে তোমার সব পয়সাও ওই গরুতেই খাবে।"

রমানাথ বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর দেন,—"তোরা থাকতে আর অন্য গরুতে খেতে পারবে না রে; আমি ম'লে সব নিস্ রে বাবা সব নিস্। তোদের ক্লাবকেই না হয় সব দিয়ে যাবো। আর জ্বালাস্নি বাপু।"

ছেলেরা হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়।

ভবানী বলেন,—"ও আবার কি অলক্ষুণে কথা, দিয়েই দিতে না হয় কিছু, তোমার কাছে বড় মুখ করে চাইতে এসেছিল যখন।"

রমানাথ অন্যমনস্কভাবে বলেন,—"দিতুম ত, দিতুম ত, হ্যাঁ ওই ত দোব বল্লুম।"

ভবানী স্বামীকে ভাল করিয়াই চিনেন, আর কোন কথা বলেন না।

*　　*　　*

রমানাথ আহারে বসিয়াছিলেন, ভবানী পাখা দিয়া বাতাস করিতেছিলেন। ভবানী বলিলেন,—"হ্যাঁগা একটা কথা ছিল।"

রমানাথ মাথা না তুলিয়াই বলিলেন,—"কি কথা, কিছু পয়সা খসাবার মতলবে আছ ত?"

—"কথার ছিরি দেখ, আমি কেবল তোমার পয়সা খসাবার মতলবেই কথা বলি, না? আর এদিকে দুনিয়াসুদ্ধ লোক আমারই বদনাম করে বেড়ায়, আমিই নাকি তোমায় হাড়-কেপ্পণ করে তুলেছি।"

রমানাথ বাধা দিয়া বলিলেন,—"থামো থামো, দুনিয়াসুদ্ধ লোক এসে আমার সম্বন্ধে তোমার কানে কানে কি বলে গেছে, তা আর এখন নাই বা শোনালে। আর লোকগুলোও কি রে বাবা! আমি পয়সা খরচ না করি ত

তোদের কি রে বাপু! দুহাতে সব দানছত্তর করে সব ফুঁকে দিলেই তোদের প্রাণে খুব আহ্লাদ হয় না?”

ভবানী বলিলেন,—“বকতে সুরু করলে ত, আমি আর তোমার বকানি শুনতে পারি না। কোন একটা কথা যদি তোমাকে বলবার যো আছে, আমি চল্লুম”। বলিয়া ভবানী উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই রমানাথ বলিলেন,—“আচ্ছা আচ্ছা এই ক্ষান্ত দিলুম। কি বলবে বলছিলে বলো। বোসো বোসে, আমারই কপাল খারাপ, আমার কথা আর কেউ শুনতে চায় না, সবাই আমাকেই শোনাতে জানে।”

ভবানী নরম হইলেন,—“বলব আর কি, এই বলছিলুম যে, আমার পিসীমাকে জানতে ত?”

“তোমার আবার পিসীমা কোত্থেকে এলেন। তোমার যে আবার কোন পিসীমা আছেন একথা ত আমাকে কোনদিন বলোনি। আর হঠাৎ এ সময় তোমার পিসীমাকে জেনেই বা আমার লাভ?”

—“ও, আমারই ভুল হয়েছিল, আমার দূর সম্পর্কের পিসীমা হ’ন, তুমি তাঁকে জানো না। আমাদের বিয়ের কিছুদিন আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।”

—“ও।”

—“সেই পিসীমার সইয়ের মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, তার স্বামী বছর দশেক আগে মারা গেছে। আজ খবর পেলুম যে সেও প্রায় মাস তিনেক হ’ল মারা গেছে।” ভবানী চক্ষে একবার অঞ্চল দিলেন। “তার দেওর আমায় চিঠি লিখেছে যে তার বড় ছেলেকে ইচ্ছে করলে আমার কাছে রাখতে পারি।”

—“হুঁ তোমার সইয়ের দেওরটি যে খুব ধুরন্ধর লোক তা বুঝতে পারছি। তা, সে ছোঁড়াটার বয়স কত?”

রমানাথ নিজের মনেই বলিলেন,—“তিনি নিজে ছেলেটাকে নিজের কাছে না রেখে, তোমার ইচ্ছে হ’লে আনিয়ে রাখতে পার এরকম ধরণের কথা লেখেন কেন? এ সবের মানে কি?”

—“তার আর দোষ কি, সে ছাপোষা গরীব মানুষ।”

—আর আমার দুয়োরে হাতী বাঁধা আছে, না ?”

—“থামো থামো, আমরা ছেলেটাকে এনে রাখলে একটা ছেলেকে মানুষ করার হাত থেকে সে বেচারী নিষ্কৃতি পায়। ছেলেটার বয়স ? তা কতই বা হবে, বড় জোর চোদ্দ কি পনেরো, তার বেশি নয়।”

রমানাথ চুপ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া ভবানী বলিলেন,—“হ্যাঁগা, তাহলে ছেলেটাকে এখানে পাঠিয়ে দিতেই লিখব ?”

—“না না, পরের ছেলেকে এনে শুধু হাঙ্গামা বাড়ানো। এই সব পাড়ার বদ ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে মিশে উচ্ছন্নে যাবে। তাছাড়া অনর্থক খরচ বাড়ানো। না না গিন্নী ওসবে কাজ নেই।”

ভবানী চটিয়া উঠিলেন,—“পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে বকে যাবে না আরো কিছু! আসল কথা বলো যে খরচ বাড়বে। কিই বা এমন বাড়বে ? তোমার এমন কৃপণ স্বভাব! আমি কোন কথা শুনব না, আমি লিখে দিচ্ছি ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিতে। বলি এত যে টাকা জমাচ্ছো, আমরা ম’লে কি টাকাগুলো সঙ্গে গিয়ে বাতি দেবে ?”

রমানাথ রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—“না গিন্নী ওসব হবে না। তোমার চিঠির জবাব দেবার দরকার নেই।” সমস্ত ব্যাপারটি ঝাড়িয়া ফেলিতেছেন এইরূপ ভাব দেখাইয়া রমানাথ বলিলেন,—“গিন্নী, আর কদিনই বা বাকি আছে, কাজ কি নিজেদের পরের ছেলের মায়ায় জড়িয়ে ?”

ভবানী স্বামীকে ভাল করিয়াই চিনিতেন, কোন কথা না বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। রমানাথও কথা বলিবার চেষ্টা না করিয়া নিঃশব্দে আহার সমাধা করিলেন।

কয়েকদিন ধরিয়া রমানাথ এবং ভবানীর বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কোন বাক্যালাপ হইল না। ভবানী বিষণ্ণ বদনে মুখ অন্ধকার করিয়া গৃহস্থালীর কার্য্যে মনোনিবেশের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। রমানাথ গৃহিণীর বিষণ্ণতা দূর করিবার কোন চেষ্টা করিলেন না। হঠাৎ তাঁহার বাগানটির প্রতি মমতা অত্যধিক বাড়িয়া গেল এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত তিনি বাগানের সেবায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

বাগানে বেড়ার গা দিয়া একটি লাউগাছ লতাইয়া লতাইয়া বাড়িতেছিল, রমানাথ তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

একদিন সকালে রমানাথ একটা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহাদের পাড়ার নবীন ডাক্তার দামোদর পূর্ব্বদিকে হন্ হন্ করিয়া কোথায় চলিয়াছে।

দামোদরকে দেখিয়া হঠাৎ রমানাথের মেজাজ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি ডাক দিলেন,—"বলি ও দামোদর, কোথায় যাও হে? আজকাল যে আর তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। একটু গরীবের বাড়ীতে এসোই না···ডুমুরের ফুল হয়ে থাকলে কি আর চলে, হাঃ হাঃ হাঃ।"

দামোদর হাসিয়া পথ হইতে উত্তর দিল,—"একটা কাজে যাচ্ছি? পরে আসব। আমাদের দেখা পাওয়ার কথা বলে আর লজ্জা কেন দেন দাদা, আপনারই বরং আজকাল দেখা পাওয়া ভার! বুড়ো বয়েসেও বউদির আঁচল ধরে বসে থাকেন না কি?"

রমানাথও হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"না রে ভাই না, আর তোমার বউদির আঁচল ধরে বসে আছি কি না একবার দেখেই যাও। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেই ফেলো। এসো এসো, গরীবের বাড়ীতে একটু বসলে তোমার কাজ আর পালিয়ে যাবে না ভায়া।"

দামোদর হাসিতে হাসিতে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিল। দামোদর বাগান দেখিয়া বলিল,—বাঃ বেড়ে বাগান করেছেন দেখছি। খুব সিম্ হয়েছে তো··· যদি এর অর্দ্ধেকও টিঁকে যায় তাহলেও অনেক কুমড়ো হবেই বলে মনে হয়.. আরে এত বড় বড় বেগুন হ'ল কি করে।"

রমানাথ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"অমনি তে কি আর হয়েছে ভায়া, অনেক কষ্টে ওর বীজ যোগাড় করতে হয়েছে।"

হঠাৎ দামোদরের বেড়ার গায়ের লাউগাছটির উপর নজর পড়িল, দামোদর দেখিল যে একটি গোলগাল ছোট নধর লাউ পাতার আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে। কোমল সবুজ তাহার রং, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। দামোদরের মুখ হইতে তাহার অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া আসিল,—"বাঃ চমৎকার দেখতে ত!"

দামোদরের কাজের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল, সে বলিল,—"আচ্ছা দাদা, আজ চলি তাহলে, ভয়ানক জরুরী একটা কাজ আছে। আবার আসব আপনার বাগান দেখতে।"

দামোদর চলিয়া গেল। রমানাথ শিশু লাউটির দিকে কিছুক্ষণ ধরিয়া অপলকনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে রমানাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। হঠাৎ রমানাথ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং মাথা নাড়িয়া দুই হস্তে লাউটিকে থাবড়াইতে থাবড়াইতে বলিলেন,—"বাহরে বেটা বাচ্চু, বাহরে বেটা বাঃ।"

লাউটিও যেন তাঁহার আকস্মিক উচ্ছ্বাসে খুসি হইয়া দুলিয়া দুলিয়া জানাইয়া দিল যে, সেও তাঁহার ব্যবহারে খুব প্রীত হইয়াছে।

রমানাথ ভুলিয়া গেলেন যে গৃহিণীর সহিত তাঁহার আর বনিবনা নাই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওগো, দেখে যাও, দেখে যাও কে এসেছে।"

ভবানী হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। রমানাথ কোন কথা না বলিয়া প্রথমে লাউটিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"দেখরে বেটা বাচ্চু, চেয়ে দেখ কে এসেছে।" বাচ্চু দুলিয়া দুলিয়া জানাইয়া দিল যে কে আসিয়াছে সে দেখিতে পাইয়াছে।

ভবানী বলিলেন,—"মরণ আর কি! বলি বুড়ো বয়সে তোমার দিন দিন হচ্ছে কি? যেমন চেঁচালে…"

রমানাথের হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল, লজ্জিত হইয়া তিনি বলিলেন,—"আহা হা, দেখো না কি সুন্দর দেখ্‌তে", বলিয়াই তিনি চট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

ভবানীর সমস্ত বিষণ্নতা দূর হইয়া গেল, তিনি পলায়মান স্বামীর দিকে চাহিয়া আর হাসি চাপিতে পারিলেন না। তিনিও আবার লাউটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে তিনিও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মৃদুস্বরে আদর করিয়া তিনি ডাকিলেন,—"বাচ্চু"। হাঁ বাচ্চুই ঠিক্ নাম বটে। মনে মনে ভবানী স্বামীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আবার তিনি মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—"বাচ্চু।" বাচ্চু কোন সাড়া দিল না; বেড়ার গায়ে হেলান দিয়া সে স্থির অচঞ্চল হইয়া রহিল।

ভবানী হঠাৎ কি ভাবিয়া আঙ্গুলে সিঁথির সিঁদূর লইয়া বাচ্চুর অঙ্গে লেপন করিয়া দিলেন।

রমানাথ পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া গৃহিণীর পিছনে

দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি গৃহিণীকে হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিতে পারার জন্য ভীষণ খুসী হইয়া উঠিলেন এবং হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এ্যাঁ গিন্নী, আমারই মাথা খারাপ হয়েছে না ?"

ভবানী অপ্রস্তুত হইয়া হাসিতে লাগিলেন। অতি মধুর সে হাসি। কর্ত্তা গৃহিণীতে আবার মিল হইয়া গেল। রমানাথ এবং ভবানী পরামর্শ করিতে লাগিলেন, তাইত দ্বিপ্রহরে বাচ্চুর যে ভীষণ রৌদ্র লাগিবে, কি করা যায় ?

সেইদিন পর্য্যন্ত কিন্তু বাচ্চু রৌদ্র জলকে অগ্রাহ্য করিয়াই বাড়িয়াছে।

রমানাথ তৎক্ষণাৎ ঠকাঠক্ বাঁশ চিরিয়া কঞ্চি কাটিতে বসিয়া গেলেন। অনেক বেলা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া কঞ্চি কাটিয়া চট দিয়া বাচ্চুর জন্য একটি ছোটখাট সূর্য্যাতপ তৈয়ার করিয়া তবে রমানাথের স্নানাহারের ফুরসৎ হইল।

বৈকালে রমানাথ উত্তমরূপে লাউগাছটির গোড়া খুঁড়িয়া জল দিলেন এবং ভবানী সমস্ত পাতায় ভাল করিয়া ছাই ছিটাইয়া দিলেন। গাছে পোকা লাগিলেই সর্ব্বনাশ !

পরদিন সকালে সমস্ত গাছগুলির তদারক করিয়া আসিয়া রমানাথ দাওয়ায় লাঠি হাতে করিয়া বসিয়া রহিলেন। ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তবু আর একটু বেশী সাবধান থাকা ভাল বলিয়াই বোধ হয়। কে জানে কখন আবার গরুবাছুর আসিয়া গাছগুলি খাইয়া যাইবে।

রামগতি ও সীতানাথ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। রমানাথ তাঁহাদের ডাকিয়া বলিলেন,—"বলি ও সীতানাথ, ও রামগতি, যাও কোথায়, শোন শোন।"

তাঁহারা আসিলেন। রামগতি বলিলেন,—"আরে যাব আর কোথায়, এমনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।"

—"দেখ দেখি এবার বাগানটা কেমন হয়েছে, এসো এসো," বলিয়া রমানাথ তাঁহাদের বাগান দেখাইতে সুরু করিলেন। প্রথমেই লাউ গাছটির কাছে যাইয়া লাউটিকে দেখাইয়া বলিলেন,—"কেমন চমৎকার লাউ হয়েছে দেখেছ ! গিন্নীর আবার মাথায় কি ঢুকেছে আদর করে ওর নাম রেখেছেন বাচ্চু।"

রামগতি বলিলেন,—"হ্যাঁ বেশ, তা লাউয়ের গায়ে সিঁদূর মাখানো কেন

হে? আর লাউয়ের নামকরণ করাই বা তোমার গিন্নী শিখলেন কোত্থেকে, মাথার কোন গোলমাল টোলমাল হয়নি ত?"

রমানাথ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন,—"আর বল কেন, আর বল কেন, গিন্নীর মাথা খারাপ।"

সীতানাথ বলিলেন,—"লাউয়ের নীচে একটা জলের হাঁড়ি ঝুলিয়ে দাও হে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বাড়বে। আরো অনেক ত হবে হে, খুব ফুল হয়েছে দেখছি, আমাদেরও একটা দিও টিও।"

জলের হাঁড়ি ঝুলাইয়া শীঘ্র শীঘ্র লাউ বড় করিবার পদ্ধতি রমানাথও জানিতেন। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাহা করেন নাই। বাচ্চু যে বড় হইলে কুৎসিত হইয়া যাইবে। তাই সেই কথাই আবার সীতানাথের নিকট শুনিয়া রমানাথ অকস্মাৎ ভীষণ চটিয়া উঠিলেন,—"লাউ খাওয়াবে না কচু করবে, আমার লাউ আমি বড় করবো না, কাউকে দেবো না আমার খুসী! খবর্দ্দার ফের ওকথা কেউ আমার কাছে বোলো না।"

রামগতি ও সীতানাথ তাঁহার এই হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইবার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—"খামোখা চটে উঠে চোখ রাঙাও কেন হে, তোমাকে খারাপ কথা কি এমন বল্‌লুম বাপু। নিজেই রাস্তা থেকে ডেকে এনে শুধু শুধু রাগ দেখাচ্ছ, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে রমানাথ, চিকিৎসা করাও, চিকিৎসা করাও।"

তাঁহারা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রমানাথ লাফাইয়া উঠিয়া বাচ্চুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"শুন্‌লি বাচ্চু ছোটলোকগুলোর কথা শুন্‌লি, বলে কি না…" ক্রোধে রমানাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি আর কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরেই ভবানী কয়েকজন প্রতিবেশিনীকে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতে দেখিয়া তাঁহাদের আহ্বান করিলেন। তাঁহারা আসিলে ভবানীও বাগান দেখাইবার অছিলায় তাঁহাদের বাচ্চুকেই দেখাইয়া বলিলেন,—"কি সুন্দর লাউ দেখছ, উনি আবার আদর করে নাম রেখেছেন বাচ্চু।" ভবানী সস্নেহে একবার বাচ্চুর গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন।

মেয়েরা এইসকল ব্যাপার চট্ করিয়া বুঝিতে পারে। ভবানীর কথা

শুনিয়া এবং কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একজন বলিলেন,—"তোমার সেই সইয়ের ছেলে না কার কথা বলছিলে না, তাকে আনিয়ে নাও, আর পাগলামি করে লোক হাসিও না।"

ভবানী কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"আমার আর কি অসাধ, তবে ওঁর এক অদ্ভুত গোঁ, কিছুতেই ছেলেটাকে আনতে দেবেন না।" বলিয়াই কিন্তু ভবানী একবার আড়নেত্রে বাচ্চুর দিকে তাকাইয়া লইলেন।

তাঁহারা তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া হাসাহাসি করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

•

রমানাথ এবং ভবানীর চেষ্টার ফলেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, বাচ্চু আর সত্য সত্যই বাড়িল না।

কিন্তু রমানাথ একদিন সকালে উঠিয়া বাচ্চুকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। গৃহিণীকে ডাকিলেন,—"ওগো শুনছ।"

ভবানী আসিয়া বলিলেন,—"কি হল আবার।" রমানাথ কোন কথা না বলিয়া বাচ্চুকে দেখাইয়া দিলেন। ভবানী দেখিলেন যে বাচ্চুর গাত্রে একটি ছোট ধূসর বৃত্তাকার দাগ দেখা যাইতেছে, বলিলেন,—"ও আবার কি ?" রমানাথ উত্তর দিলেন, "তাইত ভাবছি।"

রমানাথ ও ভবানীকে ভাবাইয়া তুলিয়া বাচ্চু দিনে দিনে শুকাইতে সুরু করিল এবং সেই ধূসর বৃত্তটি তাহার পরিধি বাড়াইয়া চলিল।

কি যে করিবেন রমানাথ কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে একদিন তিনি একজন প্রবীণ চাষাকে ডাকিয়া বাচ্চুর জন্য কি করা যায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তাঁহার উৎকণ্ঠার হেতু দেখিয়া হাসিতে লাগিল এবং বলিল,—"এর জন্যে আপনার এত ভাবনা! একটা গাছে কত লাউ যে এভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তার কি কিছু ঠিক্ ঠিকানা আছে। আমি কর্ত্তা আপনার রকম দেখে ভাবলুম না জানি আপনার বাগানে কি এমন মহামারী লেগে গিয়েছে।"

তাহাকে হাসিতে দেখিয়া রমানাথ ভীষণ চটিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলিলেন,—"কিছু করতে পারা যাবে কি না বলো, দাঁত বার করে হাসবার জন্যে আমি তোমায় ডাকিনি।"

—"কি আর করবেন, একটু হিংএর জল ছিটিয়ে দেখতে পারেন, যদি কিছু হবার থাকে ত ওতেই হবে," বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে রমানাথের প্রবৃত্তি হইল না। তথাপি কি মনে করিয়া তিনি বাচ্চুর সর্ব্বাঙ্গে হিংএর জলই লেপন করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রত্যুষেই উঠিয়া রমানাথ বাচ্চুকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন যে ঔষধে কোনই ফল হয় নাই, বরং বাচ্চুকে যেন আরো কাহিল দেখাইতেছে। উৎকণ্ঠার আতিশয্যবশতঃ রমানাথ বিস্মৃত হইলেন যে একদিনেই ঔষধে সুফল হইবে এরূপ আশা করাও তাঁহার অনুচিত।

রমানাথ নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। বাচ্চু তাঁহারই সম্মুখে তিলে তিলে শুকাইয়া মারা যাইবে আর তিনি কিছু করিতে পারিবেন না এই চিন্তা তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল।

কি ভাবিয়া রমানাথ গাছটির গোড়া কোপাইয়া জলের পর জল ঢালিতে সুরু করিলেন। সমস্ত স্থানটি কাদায় কাদাময় হইয়া গেল, তাঁহার কাপড়ও জলে একাকার হইয়া গেল, কিন্তু সেদিকে রমানাথের ভ্রূক্ষেপই নাই। তিনি জল ঢালিতেছেন ত জল ঢালিতেছেনই।

দামোদর পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া বলিল,—"কাপড়টা যে জলে কাদায় ভেসে যাচ্ছে দাদা, একটু দেখে জল ঢালুন।

তাহার কথা শুনিয়া এবং নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া রমানাথ জল ঢালা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি সুস্থির হইতে পারিলেন না। করুণস্বরে তিনি দামোদরকে আহ্বান করিলেন,—"ও দামোদর, একটু শুনে যাও না ভাই।"

দামোদর আসিতেই কাতরকণ্ঠে রমানাথ বাচ্চুকে দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখো না দামোদর, বাচ্চুটা যে মরে গেল, তুমি ত ডাক্তার, ওটাকে বাঁচাবার একটা উপায় বলো না ভাই।"

দামোদর হাসিল,—"কি যে বলেন দাদা, সামান্য একটা লাউ শুকিয়ে যাচ্ছে বলে আমায় ওষুধ prescribe করতে হবে না কি! এর জন্যে আপনি এত কাতর কেন হয়ে পড়েছেন বলুন দেখি? আপনার নিশ্চয়ই কোন অসুখ টসুখ হয়েছে, বলেন ত আপনারই চিকিৎসা করতে সুরু করি।"

রমানাথ কি জানি কেন দামোদরের কথায় রাগ করিতে পারিলেন না। তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"তুমিও শেষে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে সুরু করলে দামোদর।"

দামোদরের স্মরণ হইল যে, সে রমানাথ ও ভবানীর অত্যধিক লাউপ্রীতি লইয়া কাহাকে তামাসা করিতে শুনিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ জিভ্ কাটিয়া বলিল,—"ছি ছি আমি তাই করতে পারি দাদা। ভাল ও নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, সব ফলেই ওরকম দাগ টাগ হয়ে থাকে। ওই নিয়ে আপনি বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন বলে চোখে ভুল দেখতে সুরু করেছেন, আর তাই ভাবছেন যে বাচ্চু শুকিয়ে যাচ্ছে; ও নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামাবেন না দাদা, আর মিছে মাথা ঘামাবেন না।" দামোদর আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

রমানাথ ভাবিলেন তাই ত, সত্য সত্যই কি তিনি এই কয়দিন ধরিয়া ভুল দেখিয়াছেন এবং ভুল বুঝিয়াছেন। একবার বাচ্চুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই রমানাথ বুঝিতে পারিলেন যে দামোদরই ভ্রান্ত এবং তিনি নিজে দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই সত্য। বাচ্চুর সেই নিটোল নধর চেহারা আর নাই, তাহার বর্ণও স্থানে স্থানে পাণ্ডুর হইয়া কুষ্ঠের ক্ষতের ন্যায় দেখাইতেছে। এক জায়গায় চুপসাইয়াও গিয়াছে যেন। তাহার সেই স্নিগ্ধ লাবণ্যই বা কোথায় অন্তর্হিত হইল?

ভবানী আসিয়া রমানাথের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বাচ্চুকে দেখিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ বদন আরো বিষণ্ণ হইয়া গেল।

রাত্রে রমানাথ ও ভবানী কাহারও চোখে ঘুম নাই। থাকিয়া থাকিয়া রমানাথ শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পদচারণা করিতেছিলেন। অন্ধকারে হঠাৎ রমানাথ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। ভবানী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হল?" রমানাথ উত্তর দিলেন,—"কিচ্ছু না।"

রমানাথ বালিশের তলা হইতে টর্চ বাহির করিয়া তাহার আলোকে তাক হইতে আইডিনের শিশি পাড়িয়া যেখানে ছড়িয়া গিয়াছিল সেইখানে লাগাইয়া দিলেন। শিশিটি তাকে রাখিতে যাইয়াই হঠাৎ রমানাথের মনে হইল যে, সত্য সত্যই তিনি ভীষণ মূর্খ! নহিলে এই সামান্য উপায়টিও তাঁহার মনে ইহার পূর্ব্বে আসে নাই। মানুষের ক্ষতে আইড়িন লাগাইয়া দিলে তাহা

যখন ভাল হইয়া যায়, তখন কোন ফলের বা বৃক্ষের দেহেও কোন ক্ষত হইলে আইডিন লাগাইলে তাহাই বা সারিবে না কেন? মানুষেরও প্রাণ আছে উহাদেরও প্রাণ আছে, ইহা ত বৈজ্ঞানিক সত্য।

রমানাথ মনের আনন্দে সেই মধ্য রাত্রিতেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"গিন্নী, হয়েছে হয়েছে।"

ভবানী ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িতেই রমানাথ তাঁহাকে কোন অনুযোগ করিবার অবকাশ না দিয়া তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। ভবানী তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইলেন। রমানাথের যুক্তির অযৌক্তিকতা তিনিও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

মোহাচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধিহীন রমানাথ ও ভবানী!

রমানাথ টর্চের আলো বাগানে ফেলিয়া দেখিলেন বাচ্চু আছে কি না। দেখিলেন বাচ্চু ঠিকই নিজের স্থানে শান্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। বোধ হয় মৃত্যুরই অপেক্ষা করিতেছে।

রমানাথ এবং ভবানী বাগানে চলিয়া আসিলেন। রমানাথ আইডিন দিয়া তুলা ভিজাইয়া বাচ্চুর দেহের সে দাগটির স্থানে সস্নেহে লেপন করিয়া দিলেন। হাতে নাড়া লাগিয়া বাচ্চু দুলিতে লাগিল। রমানাথ ভাবিলেন, বুঝি জ্বালা করিতেছে বলিয়া বাচ্চু আপত্তি জানাইতেছে। তাই রমানাথ হাসিয়া বলিলেন,—"আর কিচ্ছু ভাবনা নেই রে বেটা, এইবার খুব শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠবি।" বাচ্চু দুলিতে লাগিল। ভবানীর বিষণ্ণতা বিদূরিত হইয়া গেল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হৃদয় হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে তাঁহারা যাইয়া শয়ন করিলেন।

বাচ্চু কিন্তু বাঁচিয়া উঠিল না। ধীরে ধীরে শুকাইয়া মরিয়া গেল।

*　　*　　*

রমানাথ শুষ্ক বদনে বাচ্চুর নিকটে যাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমাদের ছেড়ে গেলি বাচ্চু।"

হঠাৎ তাঁহার বাচ্চুর পশ্চাতে নজর পড়িল, তাঁহার মনে হইল যেন সেখানে পাতার আড়াল হইতে একটি ক্ষুদ্র লাউ উঁকি মারিতেছে। রমানাথ এক

ঝটকায় সেই লাউয়ের ডগাটি টানিয়া আনিলেন। দেখিলেন যে তিন চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাউ সেই শাখাটিতে ঝুলিয়া রহিয়াছে। তাহারা যেন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছিল।

রমানাথ তাহাদের দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তোদের কে আসতে বলেছিল হারামজাদারা, দূর হ' দূর হ'!" রমানাথ একটিকে ছিঁড়িয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। ভবানী তাঁহার চীৎকার শুনিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা দিলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া ভবানী বাধা দিয়া বলিলেন,—"এগুলোও বেশ ত দেখতে, করছো কি, এগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে তোমার কি লাভ হবে, পাগল হলে না কি!"

রমানাথ হাত ছাড়াইতে ছাড়াইতে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"চোপরাও তুমিও আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।" ভবানী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

রমানাথ আবার সেটিকে টানিয়া ছিঁড়িবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে বৃন্তচ্যুত হইতে ভীষণ আপত্তি জানাইতে লাগিল। রমানাথ অকৃতকার্য্য হইয়া আরো উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধের আতিশয্যে তিনি ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে দা লইয়া আসিয়া বৃক্ষটির গোড়ায় এক কোপ দিয়া লাউ গাছটির শাখা ধরিয়া এক টান দিলেন। লাউয়ের অনেকগুলি ডগা মাটিতে আসিয়া পড়িল। বাচ্চুও মাটিতে একখণ্ড ইষ্টকের উপর আসিয়া পড়িল। শুধু ঠক্ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং বাচ্চুর শরীরের কিয়দংশ ফাটিয়া গেল।

রমানাথ তাহা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল তিনি যেন এইমাত্র নরহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার বাগানের সমস্ত বৃক্ষ, পুষ্প, লতা যেন তাঁহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে,—"তুমি হত্যাকারী, তুমি হত্যাকারী!"

সমস্ত পৃথিবী রমানাথের পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে। এক একবার তাঁহার মনে হইল যে, তিনি ছুটিয়া পলাইয়া যান। কোথায় পলাইবেন? আশে পাশে কেহ নাই দেখিয়া রমানাথ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে অতি সন্তর্পণে রমানাথ বাচ্চুকে মাটি হইতে তুলিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"বড় লেগেছে না?"

শুষ্ক, শীর্ণ বাচ্চু কোন উত্তর দিল না। একটা দমকা বাতাস আসিয়া রমানাথকে কাঁপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হঠাৎ দরদর ধারায় রমানাথের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুটস্বরে বাহির হইল,—"আমি ত তোকে ইচ্ছে করে মারিনি বাচ্চু, আমি ত তোকে ইচ্ছে করে মারিনি।"

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষণ

(৫)

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা অন্ন-সমস্যা ও দারিদ্র্য-সমস্যার আলোচনা করিতেছিলাম। এ সমস্যা অতি বিকট সমস্যা এবং ক্রমশই ঘনীভূত হইতেছে। এ সমস্যার যথোচিত সমাধান করিতে না পারিলে মানবীয় সভ্যতা ছারেখারে যাইবে। আমরা দেখিয়াছিলাম এ যুগের সাংঘাতিক সামাজিক ব্যাধি 'Poverty amidst Plenty'—জগৎ নিঃস্ব নয়, তথাপি নিরন্ন। আমরা দেখিয়াছি বিজ্ঞানের 'কলে কৌশলে' খাদ্য-উৎপাদন ও বস্ত্র-সংবয়ন পঞ্চাশ'গুণ বর্ধিত হইয়াছে কিন্তু পরিবেশন ও বণ্টনের কোন সুব্যবস্থা আবিষ্কৃত না হওয়ায় দরিদ্রজন—'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে' রহিয়াছে। বরং বেকার সমস্যা দিন দিন উৎকটতর হইতেছে এবং ধনিক ও শ্রমিকের বিবাদ ক্রমশঃ অন্তর্দ্রোহের মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে এবং Red Revolution (রক্তাক্ত বিপ্লব) সমীপবর্তী হইতেছে। ডাঃ ভগবান্‌দাসের কথায়—Humanity is in imminent danger of dying from mutual hatred. ইহার প্রতিবিধান জন্য কেহ কেহ Scientific Socialism বা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন—কেহ বা আর একগ্রাম উর্দ্ধে উঠিয়া রুশীয় Bolshevism প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন। বল্‌সেভিজিম্ অংশতঃ কল্যাণকর হইলেও যখন সার্বভৌম নহে এবং দ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন উহা দ্বারা সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব আমরা চাই—'Socialism of Love'—not the Socialism of Hate. সেই জন্য ডাঃ ভগবান্‌দাস জগতের বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—তোমরা একটা বিশুদ্ধ প্রণালী—একটা correct technique আবিষ্কার কর 'for the organisation of world-prosperity'—একটা নবতর কল্যাণতর 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' প্রতিষ্ঠিত কর—for the ushering in of a true Millennium, of a world-wide International Alliance and Co-operation—তবেই সাম্যমৈত্রীর সুবর্ণ যুগের জন্ম হইবে—তোমরা ধন্য হইবে,

জগৎ সু-স্থ হইবে—এক কথায়—Create and guide the great Joint-Family of All Humanity। বস্তুতঃ বিশ্বমানবের ঐরূপ মহা যৌথ পরিবার-প্রতিষ্ঠাই সামাজিক আধি-ব্যাধির অমোঘ ও অ-দ্বিতীয় প্রতিকার। এই বিশ্ব-মানবের মহা যৌথ-পরিবার সম্পর্কে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি* —

In this country when we speak of brothers, we inevitably think of the joint family—the ideal commune of ancient India, where there is no drab equality but a soulful fraternity of elder and younger. And only when we have succeeded in establishing on our earth a gigantic joint family, composed of brothers-in-the-spirit, where each gives freely according to his capacity and each is given ungrudgingly according to his needs (as is the case in every true joint family), it will only be then and not until then that the social problem will have reached a solution.

যৌথ পরিবার প্রথার প্রাণ কি? *To* every one according to his needs and *from* every one according to his capacity.

যার যত উচ্চ শক্তি, কার্য উচ্চতর
তার পক্ষে—দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর

—নবীনচন্দ্র

আমি বলিতে চাই—যৌথ পরিবার প্রথার ঐ প্রাণ ভবিষ্যতে নবতর কল্যাণতর মূর্তি পরিগ্রহ করিবে এবং 'the whole world will become a gigantic joint family'। ইহাকেই আমি Socialism of Love বলিলাম; ইহাই যথার্থ Communism—এই প্রণালীতেই অন্নসমস্যা বেকার-সমস্যা দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হইবে।†

* The Future of the Theosophical Society (Convention Lectures—1930) Theosophic Gleanings p. 116.

† এদেশে প্রচলিত যৌথ পরিবার প্রথার অবনত অবস্থা সত্ত্বেও Sir James Stephen-এর মত ব্যক্তি তৎসম্পর্কে এইরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—I think it will be impossible for any candid person to deny that Hindu institutions favoured the growth of many virtues, have practically solved many problems—the problem for instance of pauperism—which we English are far enough from solving.

আমরা দেখিয়াছি—ডাঃ ভগবান্‌দাস জগতের যাবতীয় বৈজ্ঞানিকদিগকে সনির্বন্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

Scientists of the world! Unite and shew us the Right Way—the Right Way to establish World Peace and Appeasement and create and guide the great joint family of All Mankind.

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—ঐরূপ বিশ্বমানবের বিরাট্ সংসদ্ ও মহা যৌথ পরিবারের প্রতিষ্ঠাপত্তনের সুপথ-প্রদর্শন কি. যো বা স্মো বা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু অনেকেই ত' Pedants—বিজ্ঞানের কড়াক্রান্তি লইয়া বেসাত করেন—তাঁহাদের 'পণ্ডা' কতটুকু? ভগবান্‌দাস বৈজ্ঞানিকের স্কন্ধে যে গুরুভার চাপাইতে চান—কাহারা তাহা বহন করিবার যোগ্য? যাঁহারা ধুরন্ধর—যাঁহাদের বিজ্ঞান প্রজ্ঞান দ্বারা উদ্‌ভাসিত, যাঁহাদের বুদ্ধি বোধির দ্বারা উজ্জ্বলিত – 'who combine Philosophy with Science'—এক কথায়—who are *truly* wise—যাঁহারা একাধারে বৈজ্ঞানিক ও প্রাজ্ঞানিক। ঐরূপ ব্যক্তি পৃথিবীতে সুলভ না হইলেও একেবারে সুদুর্লভ নন। তাঁহারা যদি এই ব্রত গ্রহণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ঐকান্তিক ভাবে অগ্রসর হন, তবেই সুরাহা হইতে পারে—নতুবা নয়।

যেদিন প্রজ্ঞান বিজ্ঞানের সহচর হইবে, যেদিন বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যার সহিত অধ্যাত্ম-বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, কেবল ভূতের সন্ধানে প্রাণপাত না করিয়া —যিনি ভূতে ভূতে অবস্থিত, সেই ভূতাত্মার পরিচয় পাইবেন—

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে হ্যবস্থিতঃ

—শুধু ভূতজ্ঞ না হইয়া আত্মজ্ঞ হইবেন, সেইদিন জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হইবে—

'A new orientation will be given to human thought and endeavour'—so that (ডাঃ ভগবান্‌দাসের ভাষায়) the new discoveries of Science will be used righteously and the world will be taught the best way to peace, by means of the best form of Social Organisation, in accordance with the Law of

Alliance, the law of what Kropotkin used to call 'Mutual Aid for existence', instead of the Law of the struggle for existence.

অর্থাৎ, তখন বিগ্রহ নয় সন্ধি, বিবাদ নয় সম্বাদ, Competition নয় Co-operation, সংগ্রাম নয় সমবায়—মানবের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের লক্ষ্য হইবে। কথাটা এত জরুরি, যে ইহার একটু সম্প্রসারণ করিতে চাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদ (Law of Evolution) সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বলিতে লাগিলেন—সংগ্রাম (Struggle for Existence)-ই উন্নতির ধারা, অভ্যুদয়ের অনন্য পন্থা—জীবনযুদ্ধে যে যোগ্যতম তাহারই উদ্বর্তন হয়—অতএব 'survival of the fittest'-এর জয়গান কর। এই জয়ধ্বনি এমন উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল যে ইহার 'বেজায় আওয়াজে' আর সব বাণী স্তম্ভিত হইয়া গেল। অথচ এই 'জীবনযুদ্ধে'র কথাটা অর্দ্ধ সত্য মাত্র—পূর্ণ সত্য নয়—

It is a half truth and therefore not quite true for even the vegetable and animal kingdoms—it is very untrue for the human kingdom.

এই সত্যের যে অপরার্ধ—the greater half of the truth—'Mutual aid for existence'—সহযোগ ও সম্বাদ—তৎপ্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিলেন না—যদিও মনস্বী ক্রোপট্কিন তারস্বরে তাহার ঘোষণা করিলেন।

Kropotkin endeavoured to turn the attention of Scientists to the greater half of the truth, namely Mutual Aid for Existence but in vain.

ইহার ফল কিরূপ বিষময় হইল, ডাঃ ভগবান্‌দাস তাহা জ্বলদ্ অক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন—

The result of accepting it as the whole truth, and obeying it, consciously and unconsciously, has been the competitive hatred that we feel all around us, among us, everywhere, pervading the whole atmosphere of human life. This half-truth of the "struggle for existence", emphasised and approved by Science, as if it were the whole truth ; accepted by all as

the only true philosophy of life; and followed in all human affairs diligently from the smallest to the largest scale, individual and national—is ever intensifying that hatred and discord in family, farm, factory, school, college, court, office, transport, all professions whatsover, and international relations, which necessarily explodes from time to time in vast wars.

সেই জন্যই ডাঃ ভগবান্‌দাস বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—বিজ্ঞান অনেকদিন বিগ্রহের কথা বলিয়াছে, এবার প্রজ্ঞানের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সন্ধি ও সংযোগের কথা বলুক—

They should teach to the world the Law of Alliance of Existence (governing and regulating the working of the inferior law of struggle, and utilising it as a subordinate and servant)—the way which would satisfy all the appetites, needs, requirements of all temperaments, sexes, ages, within the limits of reason and mutual justness.

আর এক কথা। যিশুখৃষ্ট বলিতেন Man lives not by bread alone—কেবল ভৌমিক খাদ্যে মানবের পূর্তি হয় না—সে জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্য চাই—যাহাকে Religion বা ধর্ম বলে। ইহাই মানুষের Spiritual Bread.

So long as human beings fear death and pain, so long will they inevitably need the consolation of Religion. Bolshevistরা কিন্তু নিপট নাস্তিক—তাঁহাদের নিয়ম এই—

No one can be a member of the party or even a probationary—no one can be candidate for membership—who does not whole-heartedly and outspokenly declare himself an atheist, and a complete denier of the existence of every form or kind of the supernatural.

—Soviet Communism, p. 1012;

ইহাই বল্‌সেভিজিমের দুর্বলতা—অতি বিষম weak point.

সত্য বটে অপ-ধর্ম—false Religion—is 'opiate for the people'—সম্মোহন অহিফেন—কিন্তু সত্য ধর্ম—true Religion ? উহা জীবের পক্ষে

অমৃতরস—'মৃতসঞ্জীবনী'—True Religion is the very Elixir of life। বৈজ্ঞানিক! এ যুগে তোমরাই ত' শিক্ষাগুরু—You constitute the 'Spiritual Power' today। প্রাচীন Prophet ও পৈগম্বরের শূন্যাসনে সমাসীন হইয়া, বিজ্ঞানকে প্রজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া you become the greatest world-Church.

Let the custodians of Science make themselves fully regenerate by adding Spiritual Science to Material Science and constitute themselves the new and greatest world-Church, the Guardians of Humanity. Let true Religion be re-discovered and taught by selfless Scientists now, since the professional priests have lost it.

এই সত্য ধর্ম—True Religion কি? সত্যধর্মের সার কথা এই যে, এই বিশ্বের অন্তরালে এক অচিন্ত্য অব্যক্ত অজ্ঞেয় অমেয় অজর অমর অক্ষর মহাশক্তি লীলায়িত রহিয়াছে এবং ঐ মহাশক্তি অন্ধ জড় শক্তি নহে—উহা প্রজ্ঞাময়ী ঈক্ষাময়ী, চিন্ময়ী—'It sweetly and mightly ordereth all things'। ডাঃ ভগবান্দাসের ভাষায় বলি—

The essential fact, at the heart of true religion, is the spiritual Intelligence which reigns and rules over the world of matter—the All-pervading Spirit, the Anima Mundi, the Collective Intelligence, the Supra-Conscious, the Universal Mind, "in which all things live and move and have their being, and which lives and moves and has Its Being in all things", the Mystery which has created and runs this Universe, from inconceivably small atoms to unimaginably large star-systems.

অর্থাৎ এই চরাচরাত্মক বিবিধ বিচিত্র বিশ্ব একটা যদৃচ্ছা মাত্র নয়, একটা খামখেয়াল—'a mighty maze without a plan' নয়—একটা 'fortuitous concourse of atoms' নয়—একটা 'জগদান্ধ্যাৎ প্রসজ্যেত' নয়। ইহার পশ্চাতে অভিসন্ধি ঈক্ষা Purpose নিহিত আছে—একটা নিগূঢ় নিয়তি প্রচ্ছন্ন আছে—

মনে হয় কোন্ এক নিগূঢ় নিয়তি
যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি

—যে নিয়তি বিধাতার প্রেরণায় এই বিশ্বকে ঋতমার্গে পরিচালন করিতেছে। * এ মত এখন কোনও কোনও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের সম্মতি লাভ করিয়াছে বটে—যথা Sir Oliver Lodge, Sir James Jeans এবং Bergson—কিন্তু আমরা ইহাকে সর্ববাদিসম্মত দেখিতে চাই।

There is evidence of mind at work, benificient and contriving mind, actuated by purpose—a purpose inspired by a far-seeing insight, a deep understanding and adaptation to conditions.

—'Making of Man' by Sir Oliver Lodge.

The Universe begins to look more like a great thought than a great machine. * * The Universe shows evidence of a designing and controling power that has something in common with our individual mind. * * The Universe can be best pictured as consisting of pure thought of a mathematical thinker.—Sir James Jeans.

এ সম্পর্কে বার্গসোঁর উক্তিও স্মরণীয়। তিনি যাহাকে Elan Vital বলেন, ঐ Elan Vital 'has carried life by more and more complex forms to higher and higher *destinies*'.

আমরা ত' এই রকম বিজ্ঞানই চাই—যাহা প্রজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত—যাহাতে বিশ্বেশ্বরকে বাদ দেওয়া হয় না।

ভাগবত-পুরাণে গজেন্দ্র-মোক্ষণের কাহিনী রক্ষিত আছে। ত্রিকূটপর্বত-নিবাসী বলদৃপ্ত এক মহাগজ একদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া জলপানের জন্য এক বৃহৎ সরোবরে অবতরণ করিলে এক প্রকাণ্ড কুম্ভীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। গজ নিজ বলবিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া কুম্ভীরের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু মহাবল কুম্ভীরকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে নক্রের

* যাঁহাদের এ বিষয়ে কৌতূহল আছে, তাঁহারা যেন Duckworth কর্তৃক প্রকাশিত 'The Great Design' গ্রন্থ সযত্নে পাঠ করেন। It is a symposium by fifteen leading scientists of internationa fame belonging to different branches of science.

আক্রমণে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া নিরুপায় হইয়া পড়িল। তখন গজেন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া বিপদ্‌ভঞ্জন অধমতারণ অপার-করুণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইল--

মাদৃক্ প্রপন্ন পশুপাশবিমোক্ষণায়

'হে প্রভু! এই শরণাগত অজ্ঞানের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন করুন—অবিদ্যাপাশ উন্মোচন করুন। আমার মোক্ষণ সাধন করুন।'

করোতু মেহদভ্র-দয়ো বিমোক্ষণং

তখন ভগবান্ কৃপা করিয়া সেই মহাগজের মোক্ষণ বিধান করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ঐরূপে নাস্তিক্যগন্ধি বিজ্ঞান যদি কোনদিন আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয়—তবেই তাহার ব্যর্থতা মোক্ষণ হইবে, নতুবা নয়। আশার কথা—রজনীর ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া নবীনা উষার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিতেছে—তমঃ ধীরে ধীরে তিরস্কৃত হইতেছে—অনতিচিরে প্রাচীমূলে তরুণ তপন উদিত হইবেন—আসুন আমরা ঋষির সহিত সুর মিলাইয়া বলি—

জবা-কুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্বঃপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্॥

"The darkness is lifting; the light of spiritual truth is breaking in on our world; the dawn is here. The sun begins to rise and already its rays illumine our world,—for the new day is breaking!"

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সিখ সম্রাট ও সতীর শাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুঁয়রের ইচ্ছাশক্তি কেহ রোধ করিতে পরিত না। বলিয়াছি যে সে ভুলাইবার যাদু মন্ত্র জানিত। অবশেষে সকলে তাহার কথামত কার্য্য করিতে বাধ্য হইল। একাগ্র মন ও শুদ্ধ সংকল্প যেখানে, সেখানে জয় নিশ্চয়। কুঁয়র বলিত যে এতো বড় গুরুপ্রসাদ পাইবার অধিকারী সে নিজেকে কখনও মনে করে নাই, এজন্য সে কায়মনোবাক্যে দিবারাত্র ওয়াহ গুরুকে ডাকিত। কমলা কী শ্রেণীর মেয়ে ইহা বেশ বুঝিয়াছ। দলসিংহও লোভে পড়িবার বান্দা ছিল না। অতএব কুঁয়রের কমলা লাভ কেবল গুরু কৃপা বই কিছু নহে। শুভকর্ম্মের পূর্ব্বের দিন কুঁয়র ধর্ম্মশালায় গিয়া রহিল। গ্রামে যে তাহার বন্ধুর দল হইয়াছিল, তাহারা বরযাত্রী হইয়া তাহার সহিত কন্যাবাড়িতে প্রথম প্রহর রাত্রে আসিল। তাহারা সবাই কুঁয়রকে একজন দারোগা বলিয়াই জানিত। "দারোগা" অপেক্ষা গৌরবের পদ আজ পর্য্যন্ত অত্যজ পাড়াগেঁয়েরা পঞ্জাবে কল্পনা করিতে পারে না, অতএব এই অমায়িক, ভাল মানুষ, খরচে দারোগাটিকে তাহার নূতন বন্ধুরা যেমন ভাল বাসিত তেমনি মান্য করিত। তাহারা হৃদয়ের সহিত উৎসবে যোগ দিল। আলগোজা বাজাইয়া, নৃত্য করিয়া, তলওয়ার খেলিয়া, মশাল ঘুরাইয়া কোনরূপ ত্রুটি হইতে দিল না। কুঁয়র দলসিংহকে অর্থসাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, সে কিছুতে রাজী হইল না। গ্রামের মেয়ে পুরুষকে সে পরিতোষপূর্ব্বক কড়াহ প্রসাদ ও "মিঠাভাত" খাওয়াইল।

তুমি খাঁটি সিখ বিবাহ দেখ নাই। ইহা অতি সুন্দর আড়ম্বরহীন, মহান্। কুঁয়রের বিবাহ এই রীতিতেই হইল। আসরের মধ্যস্থলে উচ্চ তখতের উপর কিংখাবমণ্ডিত গ্রন্থসাহেব। ইহার সম্মুখে গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর বৃদ্ধ "পঞ্চ" হইয়া সস্মিত মুখে,* শুভ্রবস্ত্র পরিয়া বসিল। এ "পঞ্চ" গুরুর প্রতিনিধি নহে, সাক্ষাৎ গুরু—কারণ "পাঁচ মে পরমেশ্বর"। মেয়েদের মধ্যে যুবতীরা "জঞ্জের", অর্থাৎ বরযাত্রীদলের, অপেক্ষা করিতে লাগিল দ্বারে দাঁড়াইয়া, বাকি মেয়েরা সভার-

---

* চুড়িদার পায়জামা আংরাখা, চাদর, ডবল পাগড়ি। আজকাল আংরাখার জায়গায় লম্বা কোট হইয়াছে।

তিন দিক ঘেরিয়া বসিল। এ দেশের মেয়েরা পর্দ্দার অপমান জানে না। বর ও তাহার সঙ্গীরা প্রবেশপথ-রক্ষিকাদের বলপূর্ব্বক হটাইয়া তবে কন্যাবাড়ি ঢুকিতে পাইল। দরজার এ যুদ্ধে পুরুষদের গায়ের চাদরের মধ্য হইতে হস্ত বাহির করিবার নিয়ম নাই। মেয়েদের সে নিষেধ নাই। সভায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে গুরুগ্রন্থকে, তারপর "পঞ্চ"কে সকলে প্রণাম করিল। মেয়েরা সময় উপযোগী শবদ্ গান আরম্ভ করিল।* ভাইজী গ্রন্থসাহেব খুলিয়া সুর করিয়া পাঠ করিতে লাগিল। দলসিংহ কন্যা লইয়া আসিল, ও কন্যার মাতা বর কন্যার গাঁঠছড়া বাঁধিয়া দিল। আচার্য্য ভাইজী বর কন্যাকে গ্রন্থসাহেবের সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার আদেশ দিল। প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হইলে পঞ্চ, অকাল পুরুষের স্তব পাঠ করিয়া, নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিল। অমনি সকলে সমস্বরে "সত-শ্রী-অকাল" রবে আকাশ কাঁপাইয়া দিল। পাঁধাজী (ব্রাহ্মণ পুরোহিত) এক কোণে একটুখানি চতুষ্কোণস্থানে গোবর লেপিয়া, তাহার মধ্যে ছোট একটি গর্ত্তে অগ্নি জ্বালিয়া, কিছু ফুল, তুলসীপত্র, একটি জলপূর্ণ পিতলের পঞ্চপাত্র লইয়া বসিয়াছিল। নবদম্পতিকে বধূর মাতা ও জন কয়েক বৃদ্ধারা সেখানে লইয়া গেল ও অগ্নির সাতবার প্রদক্ষিণ করাইল।

পান্ধাজী ভাঙ্গা সংস্কৃত ও পাঞ্জাবী হিন্দী মিশ্রিত মন্ত্র পড়িয়া দম্পতির কাপড়ের উপর কেশর গোলা জল ও হলুদ মাখা চাউল ছিটাইয়া দিল।

পুরুষরা সমস্ত রাত ঢোলক করতাল বাজাইয়া শবদ কীর্ত্তন করিল। একঘড়া ঘরে চোয়ানো দারু, আট দশ জালা সরদাই, এবং 'শক্করের' সরবৎ একরাত্রে ফুরাইয়া গেল। মেয়েরা অন্দরে ঢোলক ও কাঠি বাজাইয়া দুইদল হইয়া ছড়ায় লড়াই করিল, গাহিল, নাচিল, কুঁয়রকে লইয়া কত আমোদ করিল। কুঁয়র অবাক হইয়া দেখিল গ্রাম্য মেয়েদের হাস্যপরিহাসে, গানে, নৃত্যে, ছড়া কাটাকাটিতে এমন একটি কথা নাই যে বাপ ভাইয়ের সামনে উচ্চারণ না করা যায়। সহর অঞ্চলে ইহার বিপরীত। কুঁয়র অবশ্য বাক্যের অতীত সুখী ও আনন্দিত হইয়াছিল। আমাকে কতবার সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিল যে, যদি কমলাকে পাইবার পর একদিন মাত্র সে জীবিত থাকিত, তা হইলেও নিজেকে ধন্য ও

* "সিঠনী" অর্থাৎ অশ্লীল ছড়া গাওয়া, অ-সিখ হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত। সিখ মেয়েরা স্তবগান করে। ইদানীং সিঠনীর কুপ্রথা পঞ্জাবে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

তাহার জীবন সফল হইল মনে করিত। ইহার অর্থ না বুঝিয়া, আমি হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম আর সে হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিত। কমলার গম্ভীর ভাব কিন্তু কিছুতেই ঘুচিল না। সিখ মেয়েরা সকলেই একটু আধটু পড়িতে শিখে, "জপ-জী-সাহেব" পাঠ করিবার জন্য—এই স্তবের পুস্তিকা পাঠ হইল সিখদের উপাসনা, নিত্যকর্ম্ম। বিবাহের পরদিন হইতেই সে কুঁয়রের কাছে গুরুমুখি ও ফারসীর রীতিমত পাঠ হইতে লাগিল। তখন হাতের লেখা বহিই হইত। কুঁয়র বেচারাকে "কাতিব" * লইতে হইল। যথাসাধ্য খোশখতে, "করীমা" ও গুলিস্তার" যে সকল অংশ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল, লিখিয়া দিতে হইল। কুঁয়র কমলার মেধা ও অধ্যবসায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। দিন পনেরোর মধ্যে চলনসই গুরুমুখি ও ফার্সী লিখিতে শিখিল। রাজবাড়ির ধরণধারণ, আদবকায়দা, আত্মীয় কুটুম্ব এবং প্রধান দরবারীদের নাম, তাহাদের কাজ ও স্বভাব খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া টুকিয়া লইত। কুঁয়র আমাকে বলিত যে কমলাকে এতদূর "কেজো" স্বভাবের ও গম্ভীর প্রকৃতির দেখিয়া সে মনে মনে তাহাকে নীরস ঠাহরাইয়াছিল, কিন্তু সে ভুল দূর হইতে দেরি হইল না। বাহিরে, কমলা যাহাই হউক, পতির নিকটস্থ হইবা মাত্র তাহার সরল সরস উজ্জ্বল স্নেহপূর্ণ পীযূষ-ভ্রান্ত হৃদয়খানি একেবারে গলিয়া গিয়া প্রেমামৃতে প্রিয়তমের মনপ্রাণ নিষিক্ত করিয়া দিত। কুঁয়রের এ সহস্রবার আবৃত্তি-করা কথা কয়টি আমার এখনও মুখস্থ আছে—একটু আধটু হয়ত ভুল হইয়াছে, মোটের উপর কিন্তু ঠিক।

দেড় কিম্বা দুই মাসের অধিক এ অনির্ব্বচনীয় সুখ-শান্তির জীবন—তাহার কবি-প্রাণের উপযুক্ত—কুঁয়রের ভাগ্যে ঘটে নাই। সে দলসিংহকে ও কমলাকে পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিল, এ বিবাহ এক্ষণে গোপন রাখা কেন অতি আবশ্যক। কমলা কুঁয়রকে প্রেমের দিব্যদৃষ্টির শক্তি সাহায্যে ঠিক চিনিয়া লইয়াছিল। ক্ষুদ্রতা, ছলনা, গোপনচারিতা যে যুবরাজের স্বভাব বিরুদ্ধ ইহাতে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। ইতিমধ্যে দুইবার সরকারী "মুখ্‌বির" (চর) যুবরাজ কোথায় লুকাইয়া আছেন জানিবার জন্য গোপনে অনুসন্ধান করিতে করিতে এ গ্রামেও আসে। দলসিংহ এ ক্ষুদ্র গ্রামের সরপঞ্চ, প্রধান। দুইবার তাহাকে

* কেতাবের লিপিকর।

ডাকাইয়া সাবধানে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া যায়; আর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া এত বড় যে গোপনীয় কথা জানানো হইয়াছে সে যদি ইহা প্রকাশ করিয়া ফেলে তো তাহার সর্ব্বনাশ হইবে, এই প্রকার শাসাইয়াও যায়। একবার মহারাণী জীন্দাঁর কয়েকজন যুবা জাসুস এদিকে আসে। মাতাল অবস্থায় তাহাদের মুখ হইতে, মহারাণী জীন্দাঁর জিঘাংসা-বৃত্তির কথা বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা বলে চারিদিকে মহারাণী খোঁজ করাইতেছেন, টিক্কা গোপনে কোনস্থানে প্রেম অভিনয় করিতেছেন বা বিবাহ করিয়াছেন, এ জনপ্রবাদ এবং খোদ সিংহজীর এ ধারণা, সত্য কি না। মাতাল গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল যে সত্য যদি টিক্কাসাহেব বিবাহ করিয়া থাকেন, তো মহারাণী নিশ্চয় তাঁহার এ নূতন কুটুম্বিদের নখের উপর উকুনের মত মারাইয়া ফেলিবেন, এমন তাঁহার ক্রোধ। এত বড় স্পর্দ্ধা? মহারাণীর পালিতা আত্মীয়াকে কুঁয়র সাহেব বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার অপমান করিয়াছেন, সমস্ত জগত জানে; ইহা জানিয়াও কে এমন আছে যে এ ক্ষেত্রে কুঁয়রকে কন্যা দিবার দুঃসাহস করে?

গ্রামে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না, যে ওই দারোগা, যুবরাজ। ইহা এমন অসম্ভব ব্যাপার। এজন্য কুঁয়র নির্ব্বিঘ্নে অজ্ঞাতবাস করিতে পারিল।

বিদায়ের কয়দিন পূর্ব্ব হইতে কমলা দিবারাত্র ছায়ার মত কুঁয়রের সঙ্গে সঙ্গে থাকিল। এক নিমেষ চক্ষের আড়াল করিল না। কমলা সামান্য শাক্ রাঁধিলেও অমৃতবৎ হইত—ইহা গ্রামশুদ্ধ জানিত। সে স্বামীকে নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইত, মাতার নিষেধ শুনিত না। আসন্ন বিদায়ের মেঘ-আচ্ছন্ন কয়দিন সে বারান্দায় তোলা উনানে এমন স্থানে বসিয়া পাককার্য্য সম্পাদন করিত যেখান হইতে কুঁয়রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত। বাড়ির রুটি সেঁকিবার পোঁতা তন্দুর দূরে ছিল। কমলার বারান্দাতেই একটা তন্দুর লাগাইবার ইচ্ছা দেখিয়া, কুঁয়র আধঘণ্টার মধ্যে এক কোমর গর্ত্ত খুঁড়িয়া, কুমোর-বাড়ি হইতে তন্দুর আনাইয়া, সেখানে স্বহস্তে বসাইয়া দিলেন। যে জিনিষটা দুজন বলবান লোক কষ্টে বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহা অবলীলাক্রমে কুঁয়র বামহস্তে তুলিয়া ধরিয়া গহ্বর মধ্যে সযত্নে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে সব ঠিকঠাক করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া পাড়ার মেয়ে-পুরুষ, যাহারা শহুরে আনাড়ির হাতের এ অনভ্যস্ত কাজ দেখিয়া হাসিবার জন্য জড়ো হইয়াছিল, তাহারা সমস্বরে

'ওয়াহ'! 'ওয়াহ'!* 'ধন্য সচ্চে বাদশাহ!' 'ব্যল্লে! ব্যল্লে!'† বলিয়া উঠিল। কমলা করযোড়ে, ঊর্দ্ধমুখে সত্য-গুরুকে প্রণাম করিল। এ মাণিক-যোড়ের স্বভাব দেখাইবার জন্য এই তুচ্ছ ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। কমলা কুঁয়রকে কেবল চক্ষে চক্ষেই রাখিল না, গল্পে, আবদারে, হাস্যকৌতুকে, তাহাকে নিজের বক্ষের রক্ত দিয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল।

পূর্ণিমার দিন ভোররাত্রে, গ্রন্থসাহেবকে প্রণাম করিয়া, কুঁয়র, কমলা ও ইহার পিতামাতা চারজনে নিঃশব্দে গ্রাম ছাড়িয়া খেয়াঘাটে গেল। সেখানে কুঁয়রের অশ্বিনী পত্তনিদারের প্রাঙ্গণে বাঁধা ছিল। কুঁয়রের শিস শুনিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া, পাচিল টপকাইয়া ঘোড়ী পার্শ্বে আসিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। দড়বড়িতে পত্তনিদারের ঘুম ভাঙ্গিল ও সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। তাহাকে বখ্‌শিশ দিয়া চারজনে কিছুদূরে সেই চরের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। কুঁয়রকে বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া জলের দিকে নামিয়া গেল। কমলা শান্ত স্থির কণ্ঠে কহিল, "সত্যগুরুপ্রসাদে তোমার কাছ থেকে সাতজন্ম ফুরাবে না এমন মনের আনন্দের পুঁজি পেয়েছি। তুমি আমার দূরে হতেও আর পার না, অদৃশ্য হতেও আর পার না। তাই বলি, আমার জন্য ভেবো না।" কুঁয়র কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কমলা আজ্ঞার স্বরে কহিল, "ওঠো ঘোড়ায়; আমাকে দেখাও কেমন বীর তুমি কিছুতে টলো না।" কুঁয়র সওয়ার হইলে হুকুম দিল, "ওয়াহ গুরুর নাম করে ঘোড়ী ছোটাও! খবরদার, আমার দিব্য, পেছু ফিরে দেখো না। সত্য শ্রী অকাল্! ছুড্ডো ঘোড়ী!" আজ্ঞাকারী বালকের মত কুঁয়র, "ওয়াহ গুরু" নাম লইয়া, যেন উড়িয়া চলিয়া গেল। ধড়াস্ করিয়া কমলার সংজ্ঞাহীন দেহ বালুর উপর পড়িয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া দুজনে ফিরিয়া আসিয়া দেখে কমলার চেতনা নাই, তাহার মুখ দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। মাথায়, মুখে ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া জল দিতে দিতে জ্ঞান হইল। তিনজনে যখন বাড়ি ফিরিয়া গেল, তখনও ফর্সা হয় নাই। সকাল হইলে দেখা গেল, রক্ত ঠোঁট হইতে পড়িয়াছে। কুঁয়র যখন যান, তখন তাঁহার সাক্ষাতে নিজের দুর্ব্বলতা দমন করিবার জন্য এতো

* সত্য সম্রাট—অর্থাৎ গুরু।

† উচ্চারণ Valle—মানে, চমৎকার।

জোরে দাঁত দিয়া বার্‌বার্ ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে কাটিয়া প্রায় এ ফোঁড় ও ফোঁড় হইয়া গিয়াছে!

ইহার পর কমলা ধীরভাবে, অবিচলিতচিত্তে গৃহকর্ম্ম করিয়া, প্রতিবাসীদের হর্ষে বিষাদে যোগ দিয়া, আড়াই বৎসর কাটাইয়াছে। সে গ্রন্থসাহেবের তখ্‌তের নীচে, একটি চৌকির উপর রেশমী রুমাল পাতিয়া স্বামীর হাতের লেখা বইগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কুঁয়র নিজের গলার হীরার কণ্ঠা, জেবঘড়ি, আর অমূল্য পেশকব্জ যাহা কমলাকে দিয়াছিল তাহাও সেই সঙ্গে রাখা থাকিত। প্রাতে ও সন্ধ্যায়, গুরুগৃহের পূজা অর্চ্চনার পর, কমলা এ সমস্ত এক একটি করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিত। রাত্রে তাহার এ বুকের ধনসকল, বুকের উপর রাখিয়া নিদ্রা যাইত। কতবার তাহার মাতা রাত্রে ঘুমন্ত দুহিতার ঘরে প্রবেশ করিয়া, ইহা দেখিয়া, সমস্ত রাত অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাটাইতেন। সে এমন রাসভারি যে তাহার দারোগা স্বামী এতোকাল তাহার খোঁজ লইল না, ইহার উল্লেখ তাহার সাক্ষাতে করিতে কেহ সাহস করিত না। দলসিংহ মধ্যে মধ্যে দরবারের ও কুঁয়রের সংবাদ আনিয়া বাড়িতে শুনাইত। কন্যার প্রচ্ছন্ন মনঃকষ্টের জন্য সে বড় দুঃখিত থাকিত। কুঁয়রের এ দীর্ঘ সময়টা কী ভাবে কাটিয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত আগেই বলিয়াছি।

একদিন দলসিংহ খবর দিলেন যে দরবার আবার দীনানগরে আসিয়াছে ও সম্রাটের সঙ্গে টিক্কাসাহেবও আসিয়াছেন। টিক্কা যে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকেন, ক্রমশঃ রোগা হইয়া যাইতেছেন, কিছুতে আর তাঁহার উৎসাহ, স্পৃহা নাই, কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদে যোগ দেন না, এবং হাকিম বৈদ্যেরা তিনি উন্মাদগ্রস্ত না হইয়া যান, এরূপ ভয় করিতেছে, এ সমস্ত জনশ্রুতিও বৃদ্ধ বর্ণনা করিল। কমলা ইহা শুনিয়া দু'তিন দিন খুব ভাবিল, তাহার পর তাহার কী করা উচিত ঠিক করিয়া পিতার সাহায্য ভিক্ষা করিল। কমলার বিশ্বাস যে একবার তাহাকে দেখিলে ও বীরোচিৎ দৃঢ়তা রক্ষা করিবার জন্য তাহার কাতর প্রার্থনা একবার শুনিলে, কুঁয়রের মন ভালো হইবে।

কমলা কুঁয়রের সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশ্যে যে উপায় স্থির করিল তাহা এই। পিতাপুত্রীতে অতি দীনবেশে দীনানগরে যাইবে। সেখানে কুঁয়রের উদ্যানে শত শত স্ত্রী-পুরুষ রোজ কাজ করে। দলসিং প্রত্যূষে কন্যাসহ বাগানের ফটকে

হাজির হইয়া, অন্নাভাবে মারা যাইতেছে ভান করিয়া, মেয়ে মজুরদের মধ্যে কমলাকে ভর্ত্তি করাইয়া দিবে। প্রাতে কুঁয়র বাগানে একাকী বায়ুসেবন করিয়া বেড়ান সকলেই জানিত। এই অবসরে, যদি কপালজোর থাকে, স্বামীসন্দর্শন হইতে পারে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া কমলা পিতার সহিত গুরুচরণারবিন্দ স্মরণ করিয়া যাত্রা করিল। সরলপ্রকৃতি কন্যাবৎসল পিতাকে বুঝাইয়া কহিল, "মজুরাণী সাজা ত সামান্য কথা, বাবা ; পতির ক্ষণিক উপকার হবার যদি এক সেরে এক রতিও আশা থাকে, তা'হলেও পতির জন্য ঐ একরত্তি আশা সফল করবার চেষ্টায় হাসতে হাসতে প্রাণ দেওয়া সতীর ধর্ম্ম। আর তুমি ত রাজভক্ত ; নিজের রাজার জন্য প্রাণ দেওয়া যখন তোমার কাছে তুচ্ছ, তখন এটুকু তোমার পক্ষে কিছুই নয়।"

তিনদিনে ইহারা দীনানগরে পৌঁছিল। দু' ক্রোশ পথ থাকিতে তাম্বুর সমুদ্র, আর লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়ার ভীড় আরম্ভ হইল। টিক্কার প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী এক ধর্ম্মশালায় রাত্র যাপন করিল। শেষরাত্রে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল ; ভিজিতে ভিজিতে পিতাপুত্রী বাগানের দেউড়িতে উপস্থিত হইল। পাহারা-ওয়ালারা দলসিংহের ক্লিষ্ট অথচ প্রশান্ত মুখ, তাহার পশ্চাতে স্থির সৌদামিনীর মত মেয়েটিকে দেখিয়া, ইহাদের যত্ন করিয়া বসাইল। কুঁয়রের দৃষ্টান্তে ও শাসন-শিক্ষাগুণে তাহার নিম্নতম ভৃত্যরাও দরিদ্রের প্রতি ভদ্রব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। ক্রমে বাগানের দারোগা সাহেব আসিলে, কমলা মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিল। দলসিংহ কন্যার নিকট মুখস্থকরা পাঠ তাহাকে শুনাইল। দারোগা তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা মঞ্জুর করিল। কমলাকে কহিল, "আহা! দেখতে পাচ্ছি তোমরা ভদ্রলোক ; বড় বিপদে পড়ে তুমি বুড়া বাপের অন্নের জন্য কুলির কাজ কর্ত্তে এসেছ। যাও, বাছা, ফটকের ভিতর যাও, লোকের ভীড় হবার আগে। যদি তোমার বরাৎ ভাল হয় তো দয়ার অবতার আমাদের টিক্কাসাহেবের সামনে পড়তে পারো। তিনি তোমাদের দুঃখের কথা শুনলে সব দুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়ে দিবেন। জানি তোমরা জাট, ভিক্ষা লও না। তা বাছা রাজার দান ভিক্ষা নয়, ওয়াহ গুরুর দানের মত। ঐ দূরে যে বৃক্ষকুঞ্জ দেখছ ওইখানে তালাওয়ের ধারে তিনি বেড়াচ্ছেন।" দলসিংহকে দারোগা নিজের কাছে বসাইল, আর মধ্যাহ্নে ভোজন করিয়া, কন্যা ততক্ষণ কাজ হইতে ফিরিলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে যাইতে কহিল।

কমলা সোজা সেই কুঞ্জের দিকে ছুটিল। তাহার তখন বাহ্য জ্ঞান নাই। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন, তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস, তাহার মনপ্রাণ সব এক সুরে বাঁধা হইয়া 'ওয়াহ গুরু' ডাকিতেছিল। অবশেষে এক জায়গায় পৌঁছিল, যেখানে মাথার উপর লম্বা দোসার সোনালি ফুলে ভরা গাছ, নিচে রঙ্ বেরঙের পুষ্পে ছাওয়া ঝোপ ঝাড়, সম্মুখে অদূরে প্রশস্ত দীঘি, তার ওধারে উচ্চ সৌধমালা। হঠাৎ দেখিল এক বাঁকের মোড় হইতে কুঁয়র, অতি ধীরপদে, ম্লানমুখে বাহির হইল; জল পড়িতেছে, তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই; এক ঘনপল্লব মৌলশ্রী তলে দাঁড়াইল; পাগড়ির মধ্যে হইতে কমলার উপহার একটি ফুলকারি রুমাল বাহির করিল, একদৃষ্টে তাহা দেখিতে লাগিল, চক্ষু মুছিতে লাগিল। কমলা সেই গোলাপী বস্ত্র-খণ্ড চিনিল। কমলার অদ্ভুত অবস্থা হইল। উড়িয়া গিয়া পতির পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে প্রাণ চাহিতেছে। পা কিন্তু উঠিতেছে না। আবার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে। সমস্ত বল একত্র করিয়া সে আবৃত্তি করিতে লাগিল, "হে সত্যগুরু আমাকে সামলাও! হে সত্যগুরু আমাকে সামলাও।" এক পা এক পা করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলে আবার দাঁড়ায়। আবার চলে আবার দাঁড়ায়। কুঁয়র দেখিতে পাইল। প্রথমে সহজ পদক্ষেপ, তারপর দৌড়াইয়া কমলার সম্মুখে আসিল। "কোন্ কৌলাঁ? মেরী কৌলাঁ?" বলিয়া কমলার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া টলমল করিতে লাগিল। প্রথম সামলাইল কমলা। সে বর্ষা-বাঁচাইবার নিজের উপরকার কম্বলখানা ভিজা ঘাসের উপর ফেলিয়া দিল। স্বামীকে ধরিয়া তাহার উপর বসাইয়া, তাহার মুখে, কপালে, গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। সে কমলার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দুজনের চক্ষে কিছুক্ষণ পরে জল দেখা দিল। কুঁয়র তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলার হাত ধরিয়া কহিল, "এসো আমার সঙ্গে!" একেবারে যেখানে সিংহজী বসিয়া জপ করিতেছেন ও ভজন শুনিতেছেন, সেখানে কমলাকে লইয়া গেল ও তাহার সহিত পিতৃচরণে প্রণাম করিল। সে সমস্ত তোমাকে বলিয়াছি। সিংহজী ও তাঁহার খাস অন্তরঙ্গদের এ কাহিনী কুঁয়রের মুখে শুনিতে শুনিতে অনেক রাত্র হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নির্ব্বাণ

হাতে হাত রাখো,
কথা কোয়োনাকো
হে শাশ্বতী—
চিরপরিচয়ে হে চির-অজানা চিরন্তনী !
দেখো নাকি হায়,
বেলা চলে যায়,
গোধূলি মিলালো দিগন্তরে,
ঘনায় সন্ধ্যা,
তোমার অশ্রু-চোখের ছায়ায়,
বিদায় ঘনালো,
হে শাশ্বতী !
দিনের মরণে স্মৃতির মরণ
কেমনে মানিব চিরন্তনী !

তন্নুতটরেখা এখনো ঢাকেনি
তিমির-চেলাঞ্চলে,
তারাদীপাবলি জ্বলেনিক অম্বরে,
মন্থর ঐ কুহেলি জড়ায়ে প্রান্তরে,
শর্ব্বরী দূরে থাকি' প্রতীক্ষিছে।
সময় ফুরায়,
ফুরালো সময়, হে শাশ্বতী !
হানো নয়নের অন্তিম বিদ্যুৎ,
ঝলকি উঠুক্
পলাতক পাখী বিস্মৃতি-বলাকার
নামহারা কোন্ তুষার-মরুর পারে।

নামুক্ এখন বিনিদ্র বিভাবরী,
কাল-সাগরের অবিরাম কলরোল
আছাড়ি পড়ুক অস্ত-অচল-মূলে।
আমিহীন তুমি, তুমি-হারা আমি,
তুমি নাই, আমি নাই—
কিছু নাই, কেহ নাই—
জ্বালাময়ী এই নেতির ধূয়ায়
কাঁপিছে তারকা, কাঁপে অম্বর,
নবসৃজনের কি এ শিহরণ,
হে শাশ্বতী!

গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

সনেট

নিস্তরঙ্গ অন্ধকার, পৈশুন্যের অভিচারে ভরা ;
দুরন্ত শ্বাপদ সম স্বপনের ক্রূর যাওয়া আসা;
স্বখাত ব্যামোহ গর্তে ব্যর্থ ক্ষোভে শ্রান্ত হয়ে মরা;
এও কি তোমারই শাপে, হে মানবী, এও কি দুরাশা!
মরীচিকা ছায়া যদি এতটুকু করুণায় নামে
নিষ্পলক এ মৃত্যুরে ক্ষমা করি গাহি জয়গান।
মানি আমি বহু মনে খুঁজেছি সে বহু প্রাণারামে,
তোমার একান্ত ভিক্ষা হীন বলি হেনেছি কৃপাণ।
দুর্ম্মর এ পরকীয়া; পঙ্গু আমি ক্রীড়নক সম;
স্রোতস্বিনী রক্তধারা নাচায় যে মোর দেহতরী।
পরিক্রমা অন্তে জানি তোমারেই চেয়েছি নির্ম্মম,
বাঙ্ময় তর্জনী হেলে নিষেধের সীমা দিলে গড়ি।
স্বর্ণপক্ষ বিধূনিত অতীতের মহাকাশ হতে
তোমার শানিত চক্ষু শান্তি আনে, অয়ি শুচিব্রতে॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এতরাত্রে বিপিন একা মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়ী যাইবে। মহেশ চৌধুরীর বাড়ী কাছে নয়, আশ্রম হইতে প্রায় চার মাইল পথ। বিপথে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া গেলে পথ কিছু সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এখন বর্ষাকালে দিনের বেলাও সে পথে যাতায়াত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রম হইতে বাগবাদা যাইতে হইলে সাতুনার গা ঘেঁষিয়া যাইতে হইবে, সাতুনা বেশী দূরে নয়। সাতুনা পর্য্যন্ত যাওয়ার আগেই পথের ধারে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজন গৃহস্থের খানকয়েক বাড়ী আর ক্ষেতখামার পাওয়া যায়, তাদের কারও কারও গরুর গাড়ী আছে। বিপিন কি লোক পাঠাইয়া গরুর গাড়ী আনাইয়া লইবে? অথবা মাধবীকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে, পথে ওই ছোট পাড়াটিতে হোক, সাতুনায় হোক, কারও কাছে সংগ্রহ করিয়া লইবে গরুর গাড়ী? গরুর গাড়ী না পাওয়া গেলে হাঁটিয়াই হাজির হইবে বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে? এই সব ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেয়,—আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী ক্ষান্তবর্ষার রাত্রি রত্নাবলীকে ঘিরিয়া আছে, নির্জ্জন পথ বাহিয়া দুজন হাঁটিয়া চলিয়াছে ঘুমন্ত গ্রামের গা ঘেঁষিয়া, পথের খানিক খানিক ভিজা চাঁদের আলোয় ঢাকা আর খানিক খানিক বড় বড় গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার, কোথাও ঝোপ-ঝাড় পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দুদিকেই জলভরা ক্ষেত : হাঁটিয়া চলিতে চলিতে দু'জনে কখন উঠিয়া বসিয়াছে গরুর গাড়ীতে ছাউনির মধ্যে, গাড়ীর দোলনে এদিক ওদিক টলিতে কখন তারা জড়াইয়া ধরিয়াছে পরস্পরকে, কখন শশধরের দুটি হাত অন্ধের দু'টি হাতের মত রত্নাবলীর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে রত্নাবলীর সর্ব্বাঙ্গের পরিচয়—একা বিপিনের সঙ্গে একাকিনী মাধবীর এত রাত্রে মহেশ চৌধুরীর বাড়ী যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ও অসঙ্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর গায়ে সত্যই

কাঁটা দিয়া ওঠে। বিপিনের কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? কাল মাধবীকে নিয়া গেলে চলিবে না মহেশ চৌধুরীর বাড়ী?

'কি ভাবছেন? খাওয়া হয়ে থাকলে মাধবীকে পাঠিয়ে দিন বাইরে।'

'আমিও যাই না আপনাদের সঙ্গে?'

বিপিন মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া বলিল, 'না না, আপনাকে যেতে হবে না।'

'আমি সঙ্গে না গেলে মাধু আপনার সঙ্গে যাবে না।'

'মাধু যাবে কি যাবে না সেটা আপনার কাছে না শুনে মাধুর কাছেই না হয় শুনতাম?'

রত্নাবলী অধীর হইয়া বলিল, 'বুঝেও কি বুঝতে পারেন না আপনি? এত রাত্রে আপনার সঙ্গে মাধুকে আমি যেতে দেব না। যদি চেষ্টা করেন নিয়ে যাবার, হৈ-চৈ গণ্ডগোল বাধিয়ে দেব।'

বিপিনের যে প্রতিভা ক'দিন হইতে মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, রত্নাবলীর মুখে একথা শুনিবামাত্র সোণার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গার মত চোখের পলকে জাগিয়া উঠিল। সত্যই চোখের পলকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল বিপিনের চোখেই। রত্নাবলী স্পষ্ট দেখিতে পাইল একবার কি দু'বার পলক পড়ার মধ্যে বিপিনের চোখ যেন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল অন্ধকারে হিংস্র পশুর চোখের মত, তারপর হইয়া গেল জ্ঞানের ছানি পড়া বৃদ্ধের চোখের মত স্তিমিত।

'আপনাকে নিলে আর গোলমাল করবেন না?'

'না। আমি সঙ্গে গেলে—'

'ডাকব নাকি সবাইকে?'

রত্নাবলী ভয় পাইয়া বলিল, 'সবাইকে ডাকবেন? সবাইকে ডাকবেন মানে? কেন ডাকবেন সবাইকে?'

বিপিন গম্ভীর মুখে বলিল, 'পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়া কি ভাল নয়? আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন, আপনি প্রথম নন, আপনার মত দু'একজন এ ভাবে আশ্রম ছেড়ে গিয়েছে।'

'আশ্রম ছেড়ে যাব?' এতক্ষণ রত্নাবলী দাঁড়াইয়াছিল, এবার দাওয়ায়

উঠিবার ধাপটিতে বসিয়া পড়িল। আগে বসিয়া বলিল, 'একটু বসি, পা ধরে গেছে। কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছি না।'

কথাটা সত্য নয়। রত্নাবলী বেশ বুঝিতে পারিতেছিল সব। অনেকদিন আগে, দেড়বছর দু'বছরের কম হইবে না, সে তখন অল্পদিন হয় আশ্রমে বাস করিতে আসিয়াছে, বিপিন একদিন এমনিভাবে অসময়ে হঠাৎ সকলকে ডাকিয়াছিল। সীতা নামে একটি শিষ্যার আশ্রমে মন টিঁকিতেছে না, সে চলিয়া যাইবে, সকলের কাছে বিদায় চাহিতেছে। সে দৃশ্য রত্নাবলীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। কুটিরের সামনে মাটিতে বসানো দু'টি লণ্ঠনের আলো সকলের মুখে পড়িয়াছে, কারও মুখে বেশী, কারও কম। সকলে নির্ব্বাক—পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক। এখনকার চেয়ে শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা তখন কম ছিল আশ্রমে।

সীতা কাঁদিতেছিল। দাওয়ায় বসিয়া মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। কয়েকদিন আগে সীতার স্বামীকে বিপিন আশ্রমেরই কি একটা কাজে দূরদেশে পাঠাইয়াছে, তিন চার দিন পরে সে ফিরিয়া আসিবে। কল্যাণী নামে আশ্রমের একটি মেয়েকে বিপিন সেই ক'টা দিন সীতার সঙ্গে তার কুটিরে থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল। বছর বার বয়স ছিল কল্যাণীর আর ছিল কাঠির মত সরু চেহারা। একটু তফাতে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে ভয়ার্ত্ত চোখে চাহিয়াছিল। সীতার মুখের চেয়ে কল্যাণীর সেই দৃষ্টিই রত্নাবলীর বেশী স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সকলেই জানিত, একঘণ্টা আগে কল্যাণীর বাবাকে অবিলম্বে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি গরুর গাড়ী আনিতে গিয়াছেন। কল্যাণীর বাবার মত রূপবান পুরুষ রত্নাবলী কখনো ছাখে নাই। শান্তির খোঁজে ভদ্রলোক সদানন্দের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, কিন্তু একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় বিপিনের সঙ্গে ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিয়া অশান্তির সৃষ্টি হইতেছিল। মানুষটাকে সকলেই পছন্দ করিত, মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আবার তিনি সংসারে ফিরিয়া যাইতেছেন জানিয়া সকলের দুঃখও হইয়াছিল, আনন্দও হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনার সীতা-সংক্রান্ত আকস্মিক পরিণতিতে সকলে থতমত খাইয়াছিল।

তারপর বিপিন সীতাকে বলিয়াছিল, 'আপনি তবে তৈরী হয়ে নিন।' তখন সীতা বলিয়াছিল, 'আমি যাব না।—উনি না ফিরে এলে এক পা নড়ব না আমি এখান থেকে।'

বিপিন যেন স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিল, 'সে কি!'

সীতা প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়াছিল, 'উনি নেই, এভাবে আপনারা আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন না।'

বিপিন গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, 'আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কে?'

কল্যাণীর বাবা গরুর গাড়ী আনিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিদায় হইয়া গিয়াছিলেন, সীতা কয়েকটা দিন আশ্রমে ছিল। সীতার স্বামী কিন্তু আর আশ্রমে ফিরিয়া আসে নাই। বিপিন কি তাকে আশ্রমের কাজে বাহিরে পাঠাইয়াছিল? বাহিরে থাকিতে আশ্রমের কোন কথা কানে যাওয়ায় আর সে ফিরিয়া আসে নাই? অথবা নিজেই সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল? এইসব ছিল তখন সকলের জিজ্ঞাস্য। এখনও এসব জিজ্ঞাস্যই রহিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া সীতাও যেন আশ্রম হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

বিপিন রত্নাবলীকে লক্ষ্য করিতেছিল। আশ্রমের নিয়ম তো আছেই, তাছাড়া রত্নাবলী নিজেও অত্যন্ত সাবধান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রত্নাবলীর দেহটাই বড় বেহায়া। দেখিতে দেখিতে বিপিনের মনে হয় কি, এর কাছে কোথায় লাগে মাধবীলতা, গদির কাছে কাঁথার মত? তবু মাধবীলতার আকর্ষণ কত বেশী। রত্নাবলীকে এতকাল সে কি দেখিয়াও কোনদিন চাহিয়া দেখিয়াছে? কুটীরে হোক নদীর ঘাটে হোক, রত্নাবলী দৃষ্টিপথে পড়িলে তাকে না দেখিয়া অবশ্য থাকা কঠিন, অন্ততঃ তাড়াতাড়ি সরিয়া যাওয়ার আগে,—মেয়েদের দিকে তাকানো উচিত নয় মনের এই ছুতাতেও অন্ততঃ—একটিবার রত্নাবলীকে দেখিতেই হয়, কিন্তু সে দেখা ওই দেখা পর্য্যন্তই। রত্নাবলী যেন আকর্ষণ করে না, কেবল মনটা বিচলিত করিয়া দেয় কিছুক্ষণের জন্য। মাধবীলতা ও রত্নাবলীর তুলনামূলক সমালোচনাটা বিপিন আগেও যে কোনদিন করিতে পারিত, কিন্তু এই মুহূর্ত্তের আগে কথাটা যেন তার খেয়ালই হয় নাই। কথাটা মনে পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সে জানে, এখন তাকে এই দাওয়ায় বসাইয়া

কুটীরের সামনে খোলা যায়গায় জ্যোৎস্নালোকে মাধবী আর রত্নাবলী যদি পরস্পরের কিছু তফাতে দাঁড়ায়, যাতে এক একটি চোখের কোণে সে এক এক জনকে আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্নার আবরণ অঙ্গে চাপানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃতা দেখিতে পায়, দুটি চোখই তার অপলক হইয়া থাকিবে রত্নাবলীর দিকে কিন্তু মন তার পড়িয়া থাকিবে মাধবীলতার কাছে। অভদ্র কল্পনাটি বিপিনের রোমাঞ্চকর মনে হয়। বিপিনের নিজেরই একটা ধারণা ছিল যে মোটামুটি হিসাবে বছর ত্রিশেক বয়স হইবার পর মানুষের আর এ ধরণের কল্পনা ভাল লাগে না, ছেলেমানুষী মনে হয়, হাসি পায়—রাজা সাহেবের বাড়ীতে দেয়ালে টাঙ্গানো কয়েকটি নগ্না নারীর প্রকাণ্ড চিত্র দেখিয়া বিপিন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল যে এই ছবিগুলির দিকে কেউ তাকাইয়াও ছাখে না, দেখিয়া দেখিয়া আর কারও কিছুমাত্র কৌতূহল নাই,—রক্তমাংসের স্ত্রীলোকের বেলাও মানুষের তাই হয়, প্রথম বয়সটা কাটিয়া যাওয়ার পর নারীদেহ সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত কৌতূহল মিটিয়া যায়। প্রথম বয়স বিপিনের বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বয়সটাও প্রায় কাটিতে চলিল, তবু রত্নাবলী ও মাধবীলতা সম্বন্ধে ছেলেমানুষী কল্পনা করিতে তার ভাল লাগিতেছে কেন এটা অবশ্য বিপিন ভাবিয়া দেখিল না। রত্নাবলীর পাশে বসিয়া সে হঠাৎ একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ফেলিল—এত জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল বলিবার নয়। রত্নাবলী আরও ভয় পাইয়া গেল। পাশে বসে কেন বিপিন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেন বিপিন? অমন করিয়া তাকায় কেন বিপিন জ্ঞানী বুদ্ধের মত?

'আপনি বড় ছেলেমানুষ রতন দেবী।'

গা ঘেঁষিয়া বিপিন বসিয়াছে। বিপিন যদি এবার গায়ে হাত দেয়? যদি জড়াইয়া ধরে? পুরুষ মানুষকে রত্নাবলী বিশ্বাস করে না। মেয়েমানুষ সব সময়েই সংযত থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষ মানুষের সংযম শুধু অন্যমনস্কতা, হয় তো পাঁচ সাত বছর কোন মেয়ের কথা মনেও পড়িল না, কিন্তু তার পাশে গা ঘেঁষিয়া বসিবার পর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে হয়তো এমন পাগলামী করিয়া বসিল যার তুলনা হয় না। বিপিনের কিছু হইবে না, বিপদে পড়িবে সে। সে যদি গোলমাল করে, সকলে যদি বুঝিতেও পারে যে দোষ আগাগোড়া বিপিনের, তবু বিপিনের এতটুকু আসিয়া যাইবে না, মারা পড়িবে সে-ই।

'উমা-মাসী আসছে বোধ হয়।'

সহজভাবে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও কোন লাভ হইল না, রত্নাবলীর নিজের কানেই কথাগুলি শুনাইল যেন সে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রণয়ীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

বিপিন একটু হাসিল। - 'আসুন না, সকলেই তো আসবেন।'

'সকলে আসবেন কেন। ও-কথা বলছেন কেন আপনি!'

কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে কি না মনে মনে রত্নাবলী তাই ভাবিতেছিল, গলাটা তাই কাঁদ' কাঁদ' শোনাইল। মেয়েদের প্রকৃতিই এই রকম —একটা কিছু করিবে কি করিবে না ভাবিতে ভাবিতে কাজটা অর্দ্ধেক করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আজ পর্য্যন্ত কোন মেয়ে নিজেকে দান করার আগে ঠিক করিয়া ফেলিতে পারে নাই আত্মদান করিবে কি না।

[লেখকের মন্তব্য: কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে কথাটা মনে রাখা দরকার। কোন বিষয়ে আগে হইতে মন স্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ হিসাবে প্রায় সকলেই গণ্য করিয়া থাকে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটা কিন্তু গোঁয়ারতুমিরই রকমফের। ধরা বাঁধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না, ধরা বাঁধা নিয়ম কি জীবনে বেশী আছে? যে গুলিকে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ মাত্র, উল্টাটাও অনায়াসে খাটিতে পারিত। মানুষ কি চায়, মানুষ কি করে এবং মানুষের কি চাওয়া উচিত আর মানুষের কি করা উচিত, এর কি কোন নির্দ্দিষ্ট ফরমূলা আছে? অন্যের প্রস্তুত করা ফরমূলা চোখ কান বুজিয়া অনুকরণ করা হয় বোকামি নয় গোঁয়ারতুমি। মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী, তারা বোকাও নয় গোঁয়ারও নয়। এই জন্য তারা আগে হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, দরকার মত কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মন সিদ্ধান্তের বাঁধনে বাঁধা পড়িতে চায় না। শশধরের বাহুর বাঁধন রত্নাবলী মানিয়া লইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও সে কি স্বীকার করিবে নারীজন্ম তার সফল হইল অথবা মস্ত একটা ভুল সে করিয়া বসিয়াছে ঝোঁকের মাথায়? দেহ অবশ্য তার অবশ

হইয়া যাইবে, চোখ মেলিয়া চাহিবার ক্ষমতাও হয়তো থাকিবে না, মনে প্রায় এই ধরণেই একটা চরম সিদ্ধান্ত সমস্ত চিন্তাকে দখল করিতে চাহিবে যে জীবনের তার অতীতও ছিল না ভবিষ্যতও থাকিবে না, তবু সে তখনও ভাবিতে থাকিবে যে, শশধর যদি তাকে কামনা করে, নিজেকে সে কি তখন দান করিবে ? নিজেকে দান করা কি উচিৎ হইবে তার ?

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রত্নাবলীর এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিটা একটু অসাধারণ। সে যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে ধাঁধাঁয় ফেলিয়া দেয়। সে যেন সব সময় সচেতন হইয়া থাকে যে, কি করিবে না করিবে ঠিক সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং তাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।]

বিপিন আবার মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, 'আপনি বড় ছেলেমানুষ।' বলিয়া নিছক বাহাদুরী করার জন্যই গম্ভীর মুখে হাত বাড়াইয়া রত্নাবলীর গালটা টিপিয়া দিল। রত্নাবলী মাথায় ঝাঁকি দিল, আধহাত সরিয়া বসিল এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—আর কিছুই করিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া রত্নাবলীর নিশ্চেষ্ট শান্তভাবে খুসী হইয়া বিপিন বলিল, 'মাধুকে নিয়ে যাচ্ছি, মহেশবাবুর বাড়ীতে রেখে আসবো বলে। এখন কয়েকদিন ওইখানেই থাকবে, তারপর যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাবে। ওর পক্ষে আশ্রমে থাকাও চলবে না, আমাদেরও ওকে রাখা চলবে না। আপনি বলছেন, আপনি সঙ্গে না গেলে ওকে আপনি যেতেই দেবেন না, আমি তাই ভাবলাম আপনিও বুঝি চিরদিনের মত ওর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে চাইছেন। তাই সকলকে ডাকার কথা বলছিলাম। আপনি তো মাধবীর মত চুপি চুপি আশ্রমে আসেন নি, আপনি কেন চুপি চুপি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন—যেতে হলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই যাবেন।'

বলিয়া বিপিন হাসিতে লাগিল।

গাল টিপিয়া দেওয়ায় রত্নাবলী আধ হাত তফাতে সরিয়া গিয়াছিল, এবার প্রায় হাতখানেক কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'মাধু চলে যাচ্ছে আশ্রম থেকে?'

সায় দিবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে যাওয়ায় বিপিনের মুখ প্রায় রত্নাবলীর

মুখের সঙ্গে ঠেকিয়া গেল। তা হোক, তাতে দোষ নাই, গোপন কথার আদান-প্রদানের সময় মানুষের-মুখ কাছাকাছিই আসে। ভিতরের কৌতূহল রত্নাবলীর চোখ দুটিকে যেন সত্যসত্যই খানিকটা বাহিরের দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। তেমনি চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করেছে মাধু? কার সঙ্গে করেছে?'

'কি করবে? কার সঙ্গে করবে? ও তো আশ্রমে চিরকাল থাকবার জন্য আসে নি—ক'দিন বেড়িয়ে গেল, এই মাত্র।'

'আমার কছে লুকোন কেন? বলুন না? পায়ে পড়ি, বলুন।'

'কি বলব?'

রত্নাবলী হতাশ হইয়া গেল। অভিমানে সরিয়া বসিল। কি করিয়াছে মাধবী? আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে এমন কি অপরাধ মেয়েটা করিয়াছে! এতকাল সঙ্গে থাকিয়াও জানিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তো মাধবীকে, মাধবী চলিয়া যাওয়ার আগে!

'বসুন, ডেকে দিচ্ছি মাধবীকে।'

'আপনি বসুন, আমিই ডেকে আনছি।'

•

ডাক শুনিয়া মাধবীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে!

'এখুনি যেতে হবে আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে।'

'চলুন তবে, যাই।'

যাওয়ার সময় দাওয়ায় বসিয়া রত্নাবলী ক্ষীণস্বরে একবার মাধবীলতাকে ডাকিল। মাধবী সাড়া দিল না। ছুটিয়া গিয়া উন্মাদিনীর মত সদানন্দের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে খুন করিয়া ফেলিবার জন্য তার ধৈর্য্য ধরিতেছিল না। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠায়! সে এত সস্তা, মানুষের কাছে তার মর্য্যাদা এত কম যে প্রকাশ্যভাবে বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে অভিসারে যাওয়ার হুকুম পাঠাইয়া দিতে পারে এমন অনায়াসে!

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'ওদিকে কোথায় চলেছ ?'

মাধবীলতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'ফপরদালালি করবেন না—আমি পথ চিনি।'

'শোনো, শোনো। দাঁড়াও।'

পিছনে পিছনে খানিকটা প্রায় ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতার হাত ধরিয়া বিপিন তাকে দাঁড় করায়। মাধবী বলে, 'ও! আপনি বুঝি পাওনা মিটিয়ে নেবেন আগে? শীগগির নিন, একটু তো ঘুমোতে হবে রাত্রে?'

বিপিন কোমলকণ্ঠে বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাধু? কি বকছ পাগলের মত ?'

মাধবীলতাও কোমল কণ্ঠে বলে, 'মাথা খারাপ হবে না? যা আরম্ভ করে দিয়েছেন আপনারা, এতে মাথা ঠিক থাকে মানুষের? এর চেয়ে কুমারসায়েবের মিস্ট্রেস্ হওয়াই আমার ভাল ছিল, কিছুদিন তো মজা করে নিতাম।'

এখানটা ফাঁকা, কাছাকাছি দু'একটি মোটে গাছ আছে। এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো আশ্রমের কুটীরগুলির কয়েকটি মাত্র চোখে পড়ে আর এদিকে চোখে পড়ে সদানন্দের কুটীর। জ্যোৎস্নালোকে কুটীর ও আবেষ্টনীর মধ্যে ফাঁকা মাঠে মাধবীলতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিপিনের মনে হয়, আঙ্গুলগুলি যদি তার পাখীর পালকের মত কোমল হইয়া না যায় আর সে যদি মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে সস্নেহে আঙ্গুল বুলাইয়া না দেয় পৃথিবীটাই রসাতলে চলিয়া যাইবে! অকারণে নিজেকে এই মেয়েটার জন্য মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার কোনও একটা কারণ কি আবিষ্কার করা যায় না? অসহ্য কোন যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না এই মেয়েটার জন্য? অসম্ভব কোন কার্য্য সম্ভব করা চলে না? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীলতার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপিন মৃদুস্বরে বলে, 'মাধু, কে তোমার ওপর অত্যাচার করছে বল, কাল তাকে আশ্রম থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। এ আশ্রম আমার, দলিল-পত্রে আমার নাম আছে, আমার কথার ওপর কারও কথা কইবার অধিকার নেই। কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, একবার তার নামটি শুধু তুমি বল।'

কি উগ্র উদারতা বিপিনের! এদিকে চাপিয়া ধরিয়াছে মাধবীর মাথাটা নিজের বুকে, মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কে অত্যাচার করিয়াছে তার উপর, কে কষ্ট দিয়াছে তার মনে? একটু কাঁদে মাধবীলতা, একটু ফোঁস ফোঁস করে।

বিপিন ব্যাকুল হইয়া বলে, 'কেন কাঁদছ মাধু? কেঁদো না। বল না তুমি কি চাও? অন্য কোথাও চলে যাবে?'

'কোথায় যাব? কার কাছে যাব?'

'যেখানে যেতে চাও পাঠিয়ে দেব। নিজে আমি তোমার নামে বাড়ী কিনে দেব, ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা জমা রেখে দেব,—'

'আপনার মিষ্ট্রেস্ হয়ে থাকতে হবে তো?'

বিপিন একটু ভাবিল। হাতের আঙ্গুল পাখীর পালক নয় বলিয়া আপশোষ করার সময় সদানন্দ যেমন ভুলিতে পারিতেছিল না যে মাধবীলতার ঠোঁটের নীচে দাঁত আছে আর আঙ্গুলের ডগায় নখ আছে আর রক্তমাংসের তলায় হাড় আছে, বিপিনও তেমনি এখন কেবলি ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল যে মাধবী-লতা যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপিন তারপর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি বল?'

মাধবীলতা চুপ। বিপিন সত্যই মানুষ নয়।

'যাকগে, ওসব কথা পরে হবে। এখন চলো তোমাকে মহেশবাবুর ওখানে রেখে আসি।'

'মহেশবাবুর ওখানে?'

'হ্যাঁ। এখানে তোমার থাকা চলবে না।'

মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিনের সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া নৌকাটিতে উঠিয়া বসিল। ছোট ডিঙ্গি নৌকা, ছাউনি নাই, হাল নাই, বসিবার ভাল ব্যবস্থাও নাই। তবু পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার চেয়ে নৌকায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ী যাওয়া অনেক সুবিধা। বিপিন নৌকা বাহিতে জানে।

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রেণে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈদিক ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণত্ব

ভারতবর্ষীয় ধর্মের অনুষ্ঠানবহুল ধারা ব্রাহ্মণ প্রতিপত্তির মূল কারণ। এই ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ বা বেদসমূহ, কেবলমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশক মন্ত্রের সংকলন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঋগ্বেদ হোতা নামক একজন পুরোহিতের যজ্ঞকালে উচ্চারিত স্তবসংগ্রহ; সামবেদ ঋগ্বেদ থেকে উদ্ধৃত কতকগুলি প্রত্যুত্তরস্বরূপ; যজুর্বেদে স্তবের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞসম্বন্ধীয় উপদেশ গদ্যে পাওয়া যায়। চতুর্থ সংগ্রহ বা অথর্ববেদ অপর তিনটির তুলনায় অর্বাচীন ব'লে গণ্য, এবং অলৌকিক বিধিবিধান বা অভিচার মন্ত্র-তন্ত্রের আকর। এই শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত এবং "গাথা"-পুস্তকের জেন্দ ভাষাই ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, এগুলি ভারতীয়-য়ুরোপীয় উপভাষার মধ্যে প্রবীণতম হতেই হবে, যেমন প্রথমে মনে করা গিয়েছিল; এই সংস্কৃতেই, য়ুরোপের অন্যান্য ভাষার তুলনায়, ইন্দো-য়ুরোপীয় মূলভাষার চেহারা বেশি বদলে গিয়েছে ব'লে বোধ হয়।

ম্যাক্ডনেল প্রমুখ অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত মনে করেন যে, এই চারটি বেদ সংগ্রহের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান থাকা সম্ভব। ভৌগোলিক নামের ব্যবহার অনুসারে তাঁরা অনুমান করেন যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে আর্য্যজাতি পঞ্জাবের সীমানা মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। সেই একই পণ্ডিতগণের মতে সামবেদ ও যজুর্বেদ রচনাকালে আর্যগণ যমুনা ও মধ্য গাঙ্গেয় প্রদেশে, কুরুক্ষেত্র, মধ্য দেশ এবং কোশলে অবস্থান করছিলেন। পরিশেষে অথর্ববেদের কালে মগধ এবং অঙ্গের উল্লেখ থেকে প্রমাণ হয় যে তাঁরা নিম্ন গাঙ্গেয় প্রদেশে পৌঁছেছিলেন। এই মতাবলম্বীরা ঋগ্বেদকে ২০০০ বা ১৮০০ থেকে ১৫০০-র মধ্যে, সামবেদ ও যজুর্বেদকে ১৫০০ থেকে ১০০০ এক মধ্যে, এবং অথর্ববেদকে অনুমান ১০০০ পূর্বাব্দে ফেলেন। মোক্ষমূলর আর একটি হ্রস্বতর কালনির্ণয়

সমর্থন করেছেন এবং র‍্যাপ্‌সন্ সাহেবও তাঁর কেম্‌ব্রিজ্ হিষ্টরি অফ্ ইণ্ডিয়াতে অনুমোদন করেছেন—তাঁরা বলেন ঋগ্বেদের প্রাচীনতম স্তব বা ছন্দের কাল ১২০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে ; অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ঋক্-স্তব এবং ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চার সংগ্রহের বা "মন্ত্রের" কাল ১০০০ থেকে ৮০০-র মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ নামক আনুষ্ঠানিক টীকার কাল ৮০০ থেকে ৬০০-র মধ্যে।

বস্তুতঃ, ভৌগোলিক তথা কালনির্দেশক হিসেব থেকে দেখতে গেলে বেদকে আর্যদের অভিযানের ক্রমবিকাশের বা ভারতীয়দের পূর্ব-ইতিহাসের সাক্ষী মানতে যাওয়া নিতান্ত আনুমানিক ও স্বকপোলকল্পিত বলতে হয়। সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয়ের মতানুসারে, এইরূপ সীমা নির্দেশ করা এই কারণে আরো অস্বাভাবিক যে, প্রত্যেক সংগ্রহ, এমন কি ঋগ্বেদও বহু শতাব্দী যাবৎ "খোলা" থাকত। ফলে দাঁড়ায় এই যে, যদিও বৈদিক ভিত্তি ভারতীয়-আর্যজাতির মূলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (একাধিক পণ্ডিত ঋগ্বেদের কোন কোন উপাদানকে আর্যদের ভারত প্রবেশের পূর্বে ফেলতে কুণ্ঠিত হন না) ; এবং যদিও ঋগ্বেদের অবশিষ্ঠ অংশে পঞ্জাব-অবস্থানের ভৌগোলিক ও ভাষাগত প্রমাণের ছাপ থাকতে পারে ; তবুও বেদের বর্তমান রূপের রচনা এ স্থলে বৌদ্ধযুগের বিশেষ আগে ফেলা চলে না। যে অবস্থায় আমরা বেদ পেয়েছি, সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় বলেন সে বেদ খৃষ্টপূর্ব ১০০০ সহস্রাব্দ পর্য্যন্তও পৌছায় না। জোরাথুস্ত্রের আবেস্তার ভাষারই প্রায় অনুরূপ তার ভাষা এবং উভয়ের মিলিত সাক্ষে সর্ববাদীসম্মতে তার সনতারিখ আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দ।

নৈতিক হিসেব থেকে দেখতে গেলে, বৈদিক সংগ্রহের অনুষ্ঠানপ্রধান ধারার থেকেই ভারতীয় মনীষার ভবিষ্যৎ গতির দিক নির্ণয় করিতে পারা যায়। বেদের ধর্ম কতকগুলি আচারের সমষ্টি—মত ও বিশ্বাসের নয় ; এবং কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ অনুষ্ঠানপদ্ধতির উপরেই তা' সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। তার ফল হল এই যে বৈদিক মন্ত্রের প্রতি আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠা রক্ষা ক'রে, ভারতীয় মন চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথমাবধি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগে সমর্থ হয়েছিল।

বৈদিক দেবতাগণ—যাঁদের আর্যেরা ইরাণ থেকে সঙ্গে এনেছিলেন, যাঁরা

দেব, বা "দীপ্তিমান" বা "স্বর্গীয়"—তাঁরা অধিকাংশ আকাশমার্গের দেবতা। তাঁদের নামেই প্রকাশ যে তাঁরা দীপ্তিমান আকাশের পূজার সঙ্গে জড়িত; তিনি আকাশ-পিতা নামে অভিহিত ও পূজিত হতেন—"দ্যৌ পিতা" (Zeus Pater, বা Jupiter তুলনীয়)। এ পূজাবিধি সম্ভবত আদিম ইন্দো-য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই দেবগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরুণ, তারাময় আকাশের বা পরে বিশ্ব-সমুদ্রের দেবতা, যিনি তাঁর জুড়ি, ইরাণী আহুবা-মাজ্‌দার মত বিশ্বব্যাপারের ঋতির তত্বাবধান করেন; ইন্দ্র, স্বর্গের শক্তি, বজ্র যাঁর প্রতীক; সূর্য, মিত্র এবং বিষ্ণু, যাঁরা তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন নামে সূর্যের দেবতা; উষা বা ভোররাত্রি; রুদ্র বা ঝটিকা, ইত্যাদি। এই দেবতাদের পূজাবিধি ছিল প্রধানত, যজ্ বা যজ্ঞমূলক। পরন্তু এই দেবগণ ছিলেন, এতই অশরীরী এবং তাঁদের যজ্ঞবিধির গৌরব এতই অধিক যে, কালক্রমে দেবতা ও যজ্ঞ তুল্য-মূল্য হ'ল; এবং যজ্ঞের উপকরণকেও দিব্য ব'লে প্রচার করা হ'ল।—যথা, অগ্নি বা আগুন, এবং সোম বা পূজাপানীয়। আবার ব্রহ্মণ্ (অথবা ক্লীব লিঙ্গে ব্রহ্ম) বা যজ্ঞের অলৌকিক অনুষ্ঠান-মন্ত্র, তাঁর কপালে আরো আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল। তাঁরই মধ্যস্থতায় দেবতা ও মানুষের ভিতর সেই সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল, যার দ্বারা উভয়েই আবদ্ধ হলেন। ব্রহ্মণের তাহলে ক্ষমতা আছে দেবতাদের বাধ্য করবার, তাঁদের বেঁধে আনবার। কিন্তু তবে ত তিনি দেবতাদের চেয়েও মহৎ। এইরূপে তাঁকে সর্বপ্রধান দেবতা ব'লে ঘোষণা করা হ'ল। পূজাবিধিই হয়ে দাঁড়াল পূজার পাত্র; পৌরোহিত্যের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা দৈবীকৃত হয়ে তৎসৎ-এ পর্যবসিত হ'ল।

এই যে মনোরাজ্যের যুক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে মূল বৈদিক ধর্ম থেকে ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উদ্ভব হ'ল, তা'কে সন তারিখের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধতে পারা যায় না, কিন্তু "ব্রাহ্মণের" কালে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে ব'লে বোধ হয়। বেদের সঙ্গে যুক্ত গদ্য অনুষ্ঠান পদ্ধতিকে বলে "ব্রাহ্মণ", যা'তে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যাঁরা দীর্ঘ কালপঞ্জীর পক্ষপাতী, তাঁরা "ব্রাহ্মণের" কাল ফেলেন আমাদের পূর্ব শতাব্দী ৮০০০ থেকে ৬০০০ মধ্যে; কিন্তু সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত কাল নির্ণয়ানুসারে সে কাল প্রথমোক্ত

তারিখেরও অনেক পরে। সামাজিক হিসেবে দেখতে গেলে "ব্রাহ্মণ"-এ আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণশ্রেণী বিধিবদ্ধ জাতে পরিণত হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস হিসেবে দেখতে গেলে, হয়ত আমরা তা'তে দেখতে পাব পুনর্মৃত্যুর নীতির সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত হয়েছে জন্মান্তরবাদের। পরিশেষে, দার্শনিক হিসেবে দেখতে গেলে, কোনো কোনো ব্রাহ্মণে, যেমন শতপথ ব্রাহ্মণে, "আত্মন্", "ব্রহ্মণ" ও "ব্রহ্মণ-আত্মন্"-এর ধারণা পরিষ্কার রূপে দেখতে পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী গ্রন্থে যার পরিণতি লাভ ঘটেছে।

উপনিষদ

"ব্রাহ্মণ"-এ যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার আভাস দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি পরিণতি লাভ করে "আরণ্যকে" (অরণ্য-গ্রন্থ) এবং উপনিষদে (গুহ্য তত্ত্বোপদেশ)। এগুলি একপ্রকার উন্নত তত্ত্বকথা, যার গঠন অত্যন্ত স্বাধীন ও সম্পূর্ণ কাব্যাত্মক, এবং যার কাব্যরস সময় সময় অতি চমৎকার, "ব্রাহ্মণের" মত বেদের সঙ্গে আল্‌গাভাবে গ্রথিত, এবং বেদের পুণ্যধর্মের অংশীদার। এখন পর্য্যন্ত সমগ্রভাবে উপনিষদগুলির তারিখ আমাদের পূর্ব শতাব্দীর অনুমান ৬০০ সনে ফেলা হয়; যদিও তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনগুলি, যথা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক সংক্ষিপ্ত কালনির্ণয় অন্তত শেষোক্ত তারিখের সঙ্গে মেলানো যায় না। ফলত সর্ব-প্রাচীন উপনিষদ ও আদিম বৌদ্ধধর্মকে অনায়াসে সমসাময়িক বলতে পারা যায়।

উপনিষদের শিক্ষাকে বিধিবদ্ধ বলা যায় না। তবুও তার থেকে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত উদ্ধার করতে পারা যায়, বিশ্বাসের হিসাবেও বটে এবং দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবেও বটে। বিশ্বাসের দিক থেকে ধরলে, উপনিষদেই আমরা সর্বপ্রথম একটি নতুন তত্ত্ব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, যেটি পরবর্ত্তী ভারতীয় চিন্তার উপর বরাবর তার ছাপ রেখে গেছে; সেটি হচ্ছে জন্মান্তর পরিগ্রহ, যা নির্ণীত হয় আমাদের পূর্বজন্মের হিসাবনিকাশ বা পাপপুণ্য বা "কর্ম" দ্বারা। অবশ্য শতপথ ব্রাহ্মণের কতকগুলি শ্লোকে ইতিপূর্ব্বেই জন্মান্তর এবং "কর্ম্ম" সম্বন্ধে পরিষ্কার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

তথাপি ভালে পুস্যাঁ প্রমুখ অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনে করেন যে জন্মান্তরবাদ একটি সাধারণ জনমত বা বিশ্বাস, যা প্রথমত ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তাঁরা বলেন, আমাদের মনে হয় জন্মান্তরবাদ প্রাচীন আর্য বা হিন্দুর জড় আত্মা-দর্শনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং "ব্রাহ্মণে" আমরা যে পৌরোহিত্যের সংস্কার দেখতে পাই, তার থেকে পৃথক সংসর্গে এই সাধারণ মতবাদ ক্রমশ গড়ে উঠেছিল। দার্শনিক ক্ষেত্রে, "ব্রাহ্মণ"-এ ইতিপূর্ব্বেই যে নির্বিকার সত্তা বা সর্বব্যাপী পদার্থ, বা ব্রাহ্মণের সূচনা করা হয়েছিল, উপনিষদে সর্বপ্রথম সেই ধারণারও গভীরতা সম্পাদন করা হয়। এই যে পরম সত্য, উপনিষৎ তাঁকে বাহ্য জগতে পায়নি, যেখানে কেবল অসংলগ্ন ঘটনা প্রবহমান; পেয়েছিল মনস্তত্ত্বের জ্ঞানরাজ্যে, চিন্তাশীল চেতনায়, সেই মানব অন্তরাত্মায়, যাকে ভারতবর্ষীয়েরা বলে আত্মন্। ঋগ্বেদের মন্ত্রে এই শব্দের অর্থ প্রাণবায়ু; এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে তার আক্ষরিক অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তির ও পদার্থের "স্ব"। "ব্রহ্মণ হৃদয়ে বাস করেন। তিনি সেখানেই আছেন, আর কোথায়ও নয়। যে ধীরেরা তাঁকে নিজ আত্মায় দর্শন করেন, তাঁরাই চির অমরতা লাভ করেন, অন্যেরা করেন না।" যদিও ব্রহ্মণ মানবাত্মায় বাস করেন, যদিও তিনি অন্তরস্থ এমন কি আত্মনের সঙ্গে অভিন্ন, তবুও স্মরণ রাখা চাই যে, "আত্মন" এবং য়ুরোপীয় "অহং" এক জিনিষ নয়, যে অহং ব্যবহারিক, এবং বাহ্যিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরূপী। এখনই দেখা গেল যে, সেটি হচ্ছে ভারতীয়গণ যাকে বলে "স্ব", ব্যক্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিক মূলাধার, চেতনালব্ধ জ্ঞানের সব চেতন ভিত্তি। ফলে দাঁড়ায় এই যে "ব্রহ্মণ" নিজেও অবচেতন, "যিনি আত্মাকে মনন করেন, কিন্তু যাকে কোন আত্মাই মনন করতে পারে না ('কেন' উপনিষৎ)। এই অবচেতন সত্তা, চিরকালজ্ঞাতা, কিন্তু কোনকালেই জ্ঞেয় নন; তিনি একাধারে আধ্যাত্মিক ও অজ্ঞেয়, "নেতি" "নেতি" ছাড়া তাঁকে কোনরূপে বর্ণনা করা যায় না। এবং যে-আত্মার তিনি পরমাত্মা, সে তাঁকে সহজজ্ঞান (intuition) ব্যতীত ধারণা করতে পারে না। এই সংশয়রহিত সহজজ্ঞান দ্বারা অন্তরাত্মায় তাঁর যেটুকু আভাস পাই, তা'তে দেখি তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জীবনের, প্রত্যেক সত্তার মূলে বর্ত্তমান। ফলত উপনিষদের উপদেশকে যতদূর বিধিবদ্ধ করা সম্ভব তা' বৃহদারণ্যক উপনিষদে

যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রাণস্পর্শী সূত্রে সংহত করা যায়; "সে ব্রহ্মণ্ কি তুমি জানতে চাও? তিনি তোমার নিজের আত্মা, যা' সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট।"

এইখানে আমরা সেই রহস্যপূর্ণ পাতালপুরীতে প্রবেশ করি, যেখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ঈশ্বরের গতিবিধি। যে জ্ঞানী ব্যক্তি সে পর্য্যন্ত পৌঁচেছেন এবং নিজের অন্তরে এই অবচেতন আদিসত্বার উপলব্ধি করেছেন, তিনি তাঁর প্রতি গমন করেন এবং প্রকৃতপক্ষে বন্ধনমুক্তি লাভ করেন। এখন থেকে তাঁর কাছে "অন্তরও নেই, বাহ্যও নেই, ভিতরও নেই, বাহিরও নেই।" অন্য কথায় বলতে গেলে, এই দর্শকের ব্যক্তি বা বাহ্যজগত, কোনটাই অবশিষ্ট থাকে না। তিনি বিশ্বের অবচেতনায় গিয়ে পৌঁচেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর মোক্ষলাভও হয়ে গিয়েছে, কারণ "আত্মন্" বা "ব্রহ্মণের" সঙ্গে এক হয়ে, তিনি ব্যক্তিত্বের কারাগৃহ থেকে, কর্মের বন্ধন থেকে, জন্মান্তরের ঘূর্ণীচক্র থেকে অব্যাহতি লাভ করেছেন।

হিন্দু যোগশাস্ত্র, অন্তত তার ঐতিহাসিক রূপে, এইপ্রকার মূলসূত্রের উপরেই স্থাপিত। বাণপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে, যোগীগণ তাঁদের দেহ মনকে নানাপ্রকার কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করেন, যার দ্বারায় ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটে, বুদ্ধি নির্বিকার হয়, যাতে ক'রে চিত্ত সেই পরমাত্মায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, যিনি দিব্য অবচেতন স্বরূপ, যিনি আত্মার অন্তরাত্মা, যিনি মননের কর্তা কর্ম এমন কি ক্রিয়ার ও পূর্বতন শুদ্ধ চিদ্‌বস্তু।

এর থেকে বোঝা যায় যে, এই প্রকার ধারণাসমষ্টির মূলে রয়েছে এক মানসিক অবস্থা যাকে ভুল ক'রে বলা হয়েছে হিন্দুদের দুঃখবাদ; কিন্তু বস্তুত সেটি কেবলমাত্র বাস্তব ব্যক্তিত্বের এবং বাহ্য জগতের বিরোধী মনোভাব। ব্যক্তির পক্ষে, জন্মান্তরগ্রহণ,—জন্ম, দুঃখভোগ, মৃত্যু, পুনর্জন্ম,—এই পাঠ কল্পনায় বাস্তবজীবনের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা না এসে যায় না। জন্মান্তরের প্রবাহ থেকে মুক্তিলাভ—সকল ভারতবর্ষীয় ধর্মতন্ত্রই এই মোক্ষবাদ প্রার্থী। এবং এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে উপনিষদ জন্মান্তরগ্রহী আত্মার অন্তরে "ব্রহ্মণ্ আত্মন" কে আবিষ্কার করে, যিনি একাধারে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। অব্রাহ্মণ্য ধর্ম, যথা, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম, যে উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তা' ক্রমশ প্রকাশ্য।

এই সকলই অবশেষে এইরূপে এক পরমানন্দের অবস্থায় উত্তীর্ণ হ'ন, যার স্তুতি-গান কবি এবং তত্ত্বদর্শী উভয়েই করেছেন। ফলত ভারতবর্ষীয় ধর্মতত্ত্ব আসলে দুঃখবাদী নয়, কেবল পাশ্চাত্য চক্ষে সেইরূপ প্রতীয়মান হয় মাত্র ; ভারতীয়গণ জগত সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক ধারণা পোষণ করেন, তার সঙ্গে দুঃখবাদের কোনো যোগ নেই।

জৈনধর্ম

ব্রাহ্মণ্য যোগশাস্ত্রের ন্যায়, জৈনধর্মও একপ্রকার তপশ্চর্য্যা, যার স্থূল লক্ষ্য বাস্তবিক আবরণ থেকে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সত্তায় আত্মাকে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু যোগী যেস্থানে ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণায় মনোনিবেশ করেন, জৈনগণ সেস্থলে একটি সম্প্রদায় বা ধর্মসঙ্ঘ সংগঠন করেছেন (যে সম্প্রদায় প্রথমত গঙ্গার পূর্ব উপকূলে এবং পরে গুজরাট, মহীশূর ও তামিল দেশে বিশেষ ভাবে সম্প্র-সারিত)। তা' ছাড়া, যোগশাস্ত্র সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মে নিষ্ঠা অবিচলিত রেখেছে, অপর পক্ষে জৈনধর্ম প্রচলিত ধর্মদ্বেষী। জৈনগণ "ব্রহ্মণ", এমন কি কোন দেবতারই, অস্তিত্ব মানেন না। বৌদ্ধধর্মের মতই, জৈনধর্ম একটি নাস্তিক ধর্ম ; ইহার মতে বিশ্ব-জগৎ অনন্ত এবং কর্তাবিহীন, একমাত্র নিজ অঙ্গসমূহের শক্তির উপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে।

এই ধর্মমত অতি প্রাচীন। তার আদি মতাবলম্বী বা নির্গ্রন্থগণ, এবং তাদের ধর্মপ্রবর্তক পার্শ্ব, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর প্রান্তে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছান। এই সম্প্রদায় বিধিবদ্ধ ভাবে গঠিত বা সংস্কৃত হয় বর্দ্ধমান নামক একজন ক্ষত্রিয়-দ্বারা, যাঁর উপাধি ছিল মহাবীর এবং "জিন" অর্থাৎ জয়যুক্ত (যার থেকে "জৈন" নামের উৎপত্তি)। তিনি জন্মেছিলেন সম্ভবত বৈশালীতে, এবং বাস করেছিলেন মগধে (বিহার)। ৭২ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় ; জৈন ঐতিহ্য অনুসারে ৫২৮-৫২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে ; এবং আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ৪৭৮-৪৭৭ বা ৪৬৮-৪৬৭-এর দিকে। যে দিকেই ধরা যাক্, তিনি ছিলেন শাক্য মুনির সমসাময়িক। জৈনধর্ম যদিও বৌদ্ধধর্মের সহোদর, এবং নীতি ও নিয়মাদির ক্ষেত্রে যদিও তার সঙ্গে সম্পর্ক অতি নিকট, তবুও দৈনন্দিন জীবনে উভয়ের মধ্যে রেষারেষি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক।

দার্শনিক হিসেবে দেখতে গেলে, উপনিষদের সঙ্গেই জৈনধর্মের বিরোধ বেশি ব'লে বোধ হয়। উপনিষদের ঝোঁক একের প্রতি। জৈনধর্ম বহুর ভক্ত। সে ধর্ম দুই প্রকার স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে। এক, জড়পদার্থ, যথা শূন্য বা সূক্ষ্ম আকাশের প্রসার, কাল এবং আদিম ধাতু (পুদ্গল) যার অন্তরে আছে গুণবিশিষ্ট পরমাণু সকল, ক্রমান্বয়ে স্বাদ, রঙ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দগুণসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, স্বতন্ত্র আত্মা বা জীব, জড়পদার্থের মতই যারা অসৃষ্ট এবং অসীম। উপনিষদের ধর্মের আত্মার সঙ্গে জৈনধর্মের আত্মার পার্থক্য এই যে তাহা একটি অবিনাশী monad বা মনাণু, যার পক্ষে বিশ্বাত্মা বা দেবাত্মায় লীন হওয়া অসম্ভব, যেহেতু আত্মাও নেই দেবতাও নেই। এই আত্মা অন্তিমকালে পঞ্চভূতে মিশে যায়। জড়ের স্পর্শে আত্মা কর্ম্ম এবং জন্মান্তরের অধীন হয়ে পড়ে। জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষ্য হচ্ছে এই বন্ধন ছিন্ন করা,—তপস্যা দ্বারা, কৃচ্ছ্র সাধন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা; ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ, জীব মাত্রকেই শ্রদ্ধা, এবং অহিংসার দ্বারা। এই সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ ক'রে, আত্মা জড় জগত হতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে এবং পুনরায় অক্ষত মনাড বা মনাণু রূপ ধারণ ক'রে চিদাকাশে প্রত্যাবর্তন করবে; এ স্থলেও সে চিন্ময়, নিত্যনির্ব্বিকার ও সদানন্দ।

জৈনদের স্বর্গ ছিল শূন্য; সে শূন্য স্বর্গ মহাবীর সম্যক পূর্ণ করলেন। প্রকৃত পক্ষে দেবত্বে উন্নীত না হলেও, এই নাস্তিক তাপস দেবতারই তুল্যমূল্য বা ততোধিক ছিলেন। এবং তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁরই প্রতিরূপে বংশপরম্পরাগত জিন বা তীর্থঙ্কর কল্পনা ক'রে নিলেন, যাঁরা অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের এক এক ভাগের অধিপতি। বৌদ্ধধর্মেও পরে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটে।

আমাদের অব্দের প্রথম শতাব্দীর দিকে জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন; এক শ্বেতাম্বর, যাঁরা বিশ্বাস করেন না যে একটি মাত্র কাপড় পরলেই অপরিগ্রহ ব্রত ভঙ্গ করা হয়; আর এক দিগম্বর, যাঁরা বেশি কঠোরপন্থী ও নগ্নতার পক্ষপাতী। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ৪৬৭ ও ৫২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুজরাটের বলভী মহাসভায় বিধিবদ্ধ করা হয়।

অধিকন্তু বক্তব্য এই যে, জৈনধর্মের মনাড বা মনাণুবাদ, বাস্তববাদ ও দ্বৈতবাদ হেতু ইহাকে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সন তারিখ হিসাবে সর্ব্বপ্রথম

দর্শন মনে করা যেতে পারে। তদ্ভিন্ন মধ্যযুগে জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পণ্ডিতের অভ্যুদয় হয়েছিল, যথা, শ্বেতাম্বর হরিভদ্র (অনুমান ৮৫০-৯০০), এবং হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৬৮ বা ১১৭২)।

বৌদ্ধধর্ম

বুদ্ধ শাক্যমুনির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যত তর্কবিতর্ক হয়েছে, এমন প্রায় কোনো প্রশ্ন সম্বন্ধে হয়নি। কার্ণ প্রমুখ বহু ভারতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মতে, বুদ্ধদেব কৃষ্ণেরই মত একজন পৌরাণিক ব্যক্তি। অপর পক্ষে সেনার্ প্রমুখ আর এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শাক্যমুনির ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু মনে করেন যে এতরকম তথ্যে জড়িত করা হয়েছে যে তার থেকে সে ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে নেওয়া বড়ই মুস্কিল। অবশেষে, ওলডেনবার্গ-এর সম্প্রদায়, যাঁরা প্রধানত সিংহলী পুঁথি বা পালিশাস্ত্রের উপর নির্ভর করেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে তার থেকে বুদ্ধের জীবনী গড়ে তোলা যায়।

শেষোক্ত দলের মতে প্রামাণ্য তথ্য মানতে হ'লে সিদ্ধার্থ, বা ভবিষ্যৎ বুদ্ধ, জন্মেছিলেন সিংহলী পুরাণ অনুসারে খৃঃ পূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে এবং অধুনা গ্রাহ্য সংশোধিত কলিপঞ্জী অনুসারে ৫৬৩ অব্দে। অযোধ্যা ও নেপালরাজ্যের সীমানাস্থিত কপিলবস্তু নগরে তাঁর জন্ম হয় শাক্যবংশের একটি ক্ষত্রিয় পরিবারে, যার থেকে তাঁর উপাধি শাক্যমুনির উৎপত্তি। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন ও গৌতম নাম ধারণ ক'রে দক্ষিণ বিহার বা মগধস্থিত রাজগৃহের নিকটে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন যোগী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে উপদেশ গ্রহণ করেন, কিন্তু কোন শিক্ষাই তাঁর মনঃপূত হয় না। পাঁচ ছয় বৎসর কাল জ্ঞান সন্ধানের পর অবশেষে তিনি বুদ্ধগয়ায় 'বোধি' বা সত্যের দর্শন লাভে সমর্থ হন। সেইদিন থেকেই তিনি হলেন 'বুদ্ধ', অর্থাৎ যিনি জেগেছেন, যিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন। বারাণসী ধামে তাঁর প্রথম উপদেশ দানের পরে তিনি তাঁর ধর্মপ্রচার এবং তাঁর সম্প্রদায় বা সঙ্ঘ স্থাপনের কার্যে ব্রতী হলেন। এইরূপে তিনি মুক্তির বার্তা প্রচার করত বারম্বার পূর্বগাঙ্গেয় প্রদেশ পরিভ্রমণ করলেন, এবং সর্ব্বত্র মঠ বা বিহার স্থাপন করলেন। উক্ত প্রদেশের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী তুই নৃপতি—মগধরাজ বিম্বিসার (বিহার, রাজধানী

রাজগৃহ), এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ (অযোধ্যা, রাজধানী শ্রাবস্তী) তাঁকে আশ্রয় দিলেন। ৮০ বৎসর বয়সে তিনি কুশিনগরে দেহত্যাগ করেন, সিংহলী পুরাণ মতে ৫৪৩ পূর্ব্বাব্দে, ব্যুলার-এর মতে ৪৭৭ অব্দে, এবং অধুনাগ্রাহ্য কালপদ্ধতি মতে ৪৮৩ পূর্ব্বাব্দের দিকে।

প্রথম পরিচয়ে আদিম বৌদ্ধধর্মকে দর্শন বা ধর্ম, কোন পর্যায়েই ফেলা যায় না; অন্তত কথাগুলির য়ুরোপীয় অর্থে। সে ধর্ম প্রথম থেকেই দার্শনিক জিজ্ঞাসাকে বৃথা ব'লে নির্দেশ করেছে; এবং কোনো দেবতা বা পূজাবিধির বিধান দেয়নি। তথাপি তার একটি দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি ছিল ঃ সে দর্শন অনুভূতিসাপেক্ষ এবং দুঃখের সমস্যায় সীমাবদ্ধ। ধর্মমতও তার ছিল, কিন্তু সে ধর্ম কেবলমাত্র মানবীয়। মানবজাতির পক্ষে যা কল্যাণকর তা ভিন্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসা থেকে আর কিছু জানবার ইচ্ছে তার ছিল না; তাই বৌদ্ধধর্ম দার্শনিক তত্ত্বকে অজ্ঞেয়ের কোঠায় ফেলে রেখে দিয়েছিল। সংযুক্ত-নিকায়ের উপদেশ, "হে শিষ্যগণ! বিধর্মীদের ন্যায় জগত অনাদি অনন্ত কিনা এ চিন্তা কোরো না। যদি চিন্তা করো তো এই কথা বল যে, এইখানে দুঃখ এবং এইখানেই তার প্রতিকার।"

একদিন বুদ্ধের কাছে তাঁর শিষ্য মালুঙ্ক্যপুত্ত এসে আশ্চর্য্য প্রকাশ করেন যে, তাঁর ধর্মশাস্ত্রে, বিশ্বের উৎপত্তি এবং মনুষ্যের অমরতারূপ গুরুতর কোন মীমাংসা নেই। বুদ্ধ তাঁকে যে উত্তর দিলেন, তার সারমর্ম এই যে, "এ সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভে শান্তির পথে বা শুদ্ধির পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হওয়া যায় না। যার দ্বারা শান্তিলাভের সাহায্য হয়, তাই আমি তোমাদের শেখাতে এসেছি: দুঃখ সম্বন্ধে সত্য, দুঃখের মূল, এবং তার মূলোচ্ছেদ।" সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখলে অতএব আদিম বৌদ্ধধর্মকে একপ্রকার নিরীশ্বরবাদী মানবধর্ম ব'লে মনে করা যেতে পারে।

উপনিষদ সাধারণত এই উপদেশ দিয়ে থাকে যে, মানুষের সামাজিক ব্যক্তিত্ব (যাকে ভারতীয়রা বলেন জীব বা মনস্) এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী বা স্বভাব (যাকে তাঁরা বলেন প্রকৃতি), এসব কেবল মায়াজালমাত্র, এবং ব্রহ্মণ্ বা জীবাত্মারূপী আত্মনই একমাত্র সত্যপদার্থ। বৌদ্ধধর্ম এর প্রথম বাক্যটি গ্রাহ্য করে। বুদ্ধের মতেও পৃথিবী এবং মানুষের অহং অসম্বদ্ধ ঘটনাস্রোতমাত্র,

এবং ক্ষণিক বিকার মাত্র (সংস্কার)। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন, অর্থাৎ "অহং" বা আত্মার অস্তিত্ব, সৎবস্তুরূপেই হোক বা আধ্যাত্মিক সত্তা হিসাবেই হোক, মানেন না। "হে শিষ্যগণ! সূক্ষ্ম আত্মা অপেক্ষা স্থূল শরীরকে অহং মনে করা বরং ভাল ; কারণ শরীর ক্ষণেকের তরেও বেঁচে থাকে, কিন্তু যাকে বলে আত্মা, তার ক্রমান্বয় উৎপত্তি, লয় ও পরিবর্তন হ'তে থাকে। হে শিষ্যসকল! বনের বানর যেমন খেলাচ্ছলে একটি গাছের ডাল ধরে, পরে সেটি ছেড়ে আর একটি ধরে, তারপর আর একটি, তেমনি হে শিষ্যবর্গ! যাকে বলে আত্মা, বা চিন্তা বা জ্ঞান, সে বস্তু দিনে রাতে অবিরাম উৎপত্তি লয় ও পরিবর্তনশীল।" সমস্ত মিলিন্দগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ই এই যে "অহং" বা স্ব'য়ের সৎবস্তু হিসাবে কোন অস্তিত্ব নেই, এবং তা' কেবল চেতনাবস্থার পরম্পরামাত্র (বিজ্ঞান-সংতান)। ঔপনিষদিক আত্মনের এইরূপে বিনাশ সাধিত হ'লে, বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র ঘটনাপরম্পরা এবং তার বিশ্ব অনিত্যতার সিদ্ধুমাত্রেই পর্যবসিত হয়।

পরন্তু এই সিন্ধু দুঃখসিন্ধু। জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু, বাসনা ও বাসনার পরিতৃপ্তি সকলই দুঃখাত্মক। উপরন্তু, যেহেতু বৌদ্ধধর্ম জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে সনাতন ও প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাস পোষণ করে ; এবং কর্মেও (অর্থাৎ সেই কর্ম যার ফলাফল মৃত্যুর পরে ফলে) বিশ্বাস স্থাপন করে ; সেহেতু এই বিশ্বব্যাপী দুঃখ অতীত এবং ভবিষ্যৎকালে অনন্ত গুণ বেড়ে চলতে থাকে। এই সত্যটিকে কর্মবন্ধরূপ সূত্রদ্বারা প্রকাশ করা হয়, আর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এইরূপে করা যেতে পারে :—অস্তিত্বের তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি ; ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রতি এবং জ্ঞানের লীলায় প্রতি আসক্তি থেকে অস্তিত্বের তৃষ্ণার উৎপত্তি ; আমাদের পূর্বজন্মের উত্তরাধিকারসূত্র বা কর্ম থেকে এই আসক্তির উৎপত্তি ; এ স্থলে কর্ম কতকটা বংশানুক্রমিক ধারা বা উত্তর-স্বভাবের কাজ করে। এই উত্তরাধিকার আবার তার শক্তিলাভ করে অজ্ঞতা বা অবিদ্যার কাছ থেকে, যার প্রভাবে আমরা এই অগণিত অতীত জীবনের সঞ্চিত স্তর-পরম্পরায় গঠিত মিথ্যা "অহং"কে সত্য সত্যই আমার আমিত্ব ব'লে ভুল বিশ্বাস করি। এই অজ্ঞানকে দূর করো, জীবনের প্রতি আসক্তিও কেটে যাবে ; যে-কর্মের বোঝা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত আছে তা' ক্ষয় হ'য়ে যাবে, এবং আমরা জন্মজন্মান্তরের চক্র থেকে

তুরন্ত মুক্তিলাভ করব। সংসারের ঘানির কর্মচাপ থেকে মুক্ত হয়ে, বৌদ্ধগণ অবশেষে নির্বাণ লাভ করেন, অর্থাৎ ঘটনাবহুল জীবনের হয় সুখসমাধি।

বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদ—সেই অনির্বচনীয় মধুর বিষাদ—এই নির্বাণের আশার স্পর্শে রূপান্তরিত হ'য়ে, একটি বিশ্বব্যাপী সান্ত্বনার ভঙ্গী, একটি প্রসন্ন সৌম্যভাব, একটি আন্তরিক স্ফূর্তির আকার ধারণ করে। ধম্মপদ বলেন, "আমরা এই শত্রুময় জগতে শত্রুহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ আনন্দে জীবন যাপন করি, আমাদের কোন সম্পত্তি নেই, তাই দীপ্যমান দেবতাদের ন্যায় আনন্দই আমাদের একমাত্র আহার্য।" এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধের ভিক্ষুচর্যা এবং যোগীদের ব্রহ্মচর্যের মধ্যে ব্যবধান কতখানি। বৌদ্ধশাস্ত্রে বহু উল্লিখিত একটি উপদেশে তপস্যার নিন্দাবাদ আছে, যথা হে শিষ্যগণ! দুটি জিনিষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। একটি হচ্ছে আমোদ আহ্লাদময় জীবন; সেটি হীন ব্যর্থ। আর একটি, তপঃক্লিষ্ট জীবন; সেটি বৃথা ও ব্যর্থ। যে মুক্তি যোগীগণ ভীষণ কায়ক্লেশে লাভ করবারচেষ্টা করতেন, আদিম বৌদ্ধধর্ম সেটি লাভ করতেন প্রসন্ন শ্লেষ ও উদার এবং অবহিত তর্কের দ্বারা, বুদ্ধিসঙ্গত সুবিবেচিত জীবনযাত্রার দ্বারা এবং পরিমিত জ্ঞান দ্বারা। তাঁদের মূলমন্ত্র এবং লক্ষ্য উভয়ই ছিল সম্পূর্ণরূপে নেতিবাচক, তবুও তাতে সর্বভূতে বিপুল দয়া অত্যন্ত সুনিশ্চিত ও মনুষ্যোচিত ভাবে প্রকাশ পেত। এই মনোভাবের বাহ্য বিকাশ ছিল সেই অনুপম বৌদ্ধ মাধুর্য, যা মানব উত্তরাধিকারের মহার্ঘতম সম্পদের অন্যতমরূপে চিরদিনই বর্তমান থাকবে।

এস্থলে বলা ভাল যে, কেবলমাত্র শাস্ত্রবচনের আলোচনায় নিজেদের আবদ্ধ রাখলে বৌদ্ধধর্মের অতি অসম্পূর্ণ ধারণা করা হবে। বৌদ্ধধর্মের সার হচ্ছে সেই বৌদ্ধ বেদনাবোধ সেই গভীর কারুণ্য যা' শাস্ত্রের শত নেতিবাচক মতবাদ সত্ত্বেও নিজের চারিপাশে এমন একটি উৎসাহ, একটি ধর্মভাব, একটি সক্রিয় দয়ার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পেরেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হ'লে কেবলমাত্র তার দর্শন চর্চা করলে হবে না: অশ্বঘোষের সূত্রালঙ্কার, অজন্তার প্রাচীরচিত্র এবং বোরোবুদুরের উৎকীর্ণ মূর্তিরও সন্ধান নিতে হবে।

এই সকল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যে নীতি পদ্ধতি, তা অনবদ্যরূপে পরিশুদ্ধ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি নিষ্প্রয়োজন। পশুবলি দেওয়া তো দূরের কথা, ভক্ত উপাসকের কর্ত্তব্য জীবমাত্রকেই সম্মান করা, তা' সে যতই

নগণ্য হোক, এবং বলিদান ও সকল প্রকার অনুষ্ঠান অপেক্ষা পুণ্যচিত্ত বিশুদ্ধ জীবন এবং বারম্বার ভিক্ষাদানকে শ্রেয় জ্ঞান করা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, শ্রমণ ও ভিক্ষুণীদের উপরন্ত সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্যপালন এবং স্বেচ্ছাদারিদ্র বরণ করতে হবে। শত্রুকে সকলেই ক্ষমা করবে এবং উদারভাবে দেখবে, যদিও তার দ্বারা হত বা আহত হও; এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে, পরের জন্য প্রাণও দিতে হবে, যেমন বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে দিয়েছিলেন (জাতক)। এস্থলে লক্ষ রাখবার বিষয় এই যে উল্লিখিত দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে এই নীতিপদ্ধতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; আমরা দেখেছি যে, বৌদ্ধদের মতে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আসক্তিই প্রত্যেক জীবের অন্তরে তার ভবিষ্যৎ জন্ম জন্মান্তরকে, সেই যত দুঃখের আঁধারকে, স্তূপীকৃত করতে থাকে। জন্মান্তরের বীজাণুকে মারতে হলে অস্তিত্বের তৃষ্ণাকে, ব্যক্তিত্বের লোভকে, অহঙ্কারকে বিনাশ করতে হবে। এই মূলমন্ত্রের বশবর্ত্তী হয়েই বুদ্ধ বাসনার লয়সাধনের উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ বাসনামাত্রই অহংকে বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ করে; তাই বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন অহঙ্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ত্যাগস্বীকার, বিশ্বমৈত্রী, অর্থাৎ কি না আমিত্বের বলিদান, পরকে আত্মাদান।

একদিকে যেমন ব্রাহ্মণদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, অপর পক্ষে বৌদ্ধ সঙ্ঘ সকল প্রকার শিষ্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করত। একটি প্রাচীন শ্লোকে বুদ্ধের মুখে এই বাণী দেওয়া হয়েছে: "মুক্তির পথ সকলের জন্যই খোলা রয়েছে।" বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলনের আর একটি প্রধান অন্তরায় ছিল বলির প্রথা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠানের মূলকেন্দ্র ছিল বলিদান। সে বিষয়ে নিরুৎসাহ হওয়ার দরুণ বৌদ্ধগণ সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হলেন। তাঁদের প্রচলিত ধর্মদ্বেষী বলে গণ্য হবার কারণ নিরীশ্বরবাদ বা আত্মন অস্বীকরণ ততটা নয়, যত না বলিদান সম্বন্ধে উদাসীনতা। এ প্রসঙ্গে লক্ষ করবার বিষয়ে এই যে, বৌদ্ধধর্ম তথা জৈনধর্মের উদ্ভব এবং দুই শতাব্দীব্যাপী প্রভাব বিস্তার হয়েছিল বেশির ভাগ গঙ্গামাতৃক পূর্বাঞ্চলে বা এক প্রকার "নব্যভারতে"—যেখানে অপর প্রদেশের তুলনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মতন্ত্র অপেক্ষাকৃত কম বিধিবদ্ধ হয়েছিল। অপর পক্ষে পুরাতন আর্যপ্রদেশ, যথা ব্রাহ্মণদের পুণ্যভূমি দোয়াব বা পঞ্জাব, অনেকদিন পরে

প্রভাবিত হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে মৌর্য নামক মগধের একটি রাজবংশ দ্বারা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অধিকৃত হ'লে পর তবে এই প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের যে বৎসর মৃত্যু হয় প্রচলিত লোকমতানুসারে সেই বৎসরেই রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা আহূত হয়। সেইখানেই সম্ভবত তাঁর তিন প্রধান শিষ্য, আনন্দ, উপালি ও কাশ্যপ, যে শ্লোকরাজি সঙ্কলন ও সমর্থন করেন, সেইগুলি পরে ত্রিপিটকে সন্নিবেশিত হয়। আনন্দ ভার নেন বুদ্ধের উপদেশবাণীর (সূত্রপিটক), উপালী ভার নেন সঙ্ঘনিয়মাবলীর (বিনয় পিটক), এবং কাশ্যপ ভার নেন ধর্মশাস্ত্র রচনের (মাতৃকা), যেটি বোধহয় পরবর্ত্তী অভিধর্ম পিটকের বীজস্বরূপ। অনুমান শতবর্ষ পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। পরে অশোকের আমলে বৌদ্ধসঙ্ঘকে যে দুই দলে বিভক্ত দেখতে পাওয়া যায় এই সভাতেই তার প্রথম প্রকাশ হয়; অর্থাৎ স্থবিরের দল, যাঁরা নিষ্ঠাবান ও সনাতনপন্থী, এবং মহাসাঙ্ঘিকের দল, যাঁরা গরিষ্ঠসংখ্যক ও বিরোধপন্থী। বস্তুত, এই দুই সভা সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তিগুলি কাল্পনিক পুরাণকথা ব'লেই বোধ হয়।

ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশ : দরিয়ুস ও সেকন্দর

পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক সম্পর্ক সুরু হয় আকেমেনীয় পারস্যদের আমলে। ৫১৭-৫০৯ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে পারস্যরাজ প্রথম দরিয়ুস পশ্চিম পঞ্জাব জয় করেন, এবং কারিয়াণ্ডা প্রদেশের স্কিলাক্স নামক গ্রীক্‌কে সিন্ধুনদের গতি অনুধাবন করতে আদেশ করেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী থেকে আমাদের কালের চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত গান্ধারে, কাপিশে ও পঞ্জাবে খরোষ্ঠী বা খরোষ্ট্রী নামে যে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, দুটি আদিম ভারত-বর্ষীয় বর্ণমালার যেটি অন্যতম, সেটি নাকি আকেমেনীয় রাজত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারা যায় এবং সেটি নাকি পারস্য মুন্সীদের আরমীয় বর্ণমালার ধারাবাহিক বংশধর। ব্রাহ্মী নামক ভারতবর্ষের অপর বর্ণমালা, যেটি গঙ্গামাতৃক প্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ছিল, এবং যার থেকে বর্ত্তমান ভারতীয় বর্ণমালা সকল প্রসূত, সেটিও সেমেটিক্ বর্ণমালার সঙ্গে সম্পর্কিত; কিন্তু সেটি সমুদ্র

পথেও প্রবেশ লাভ ক'রে থাকতে পারে। প্রবলপ্রতাপ সেকন্দর শা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিবার পর ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সিন্ধুনদ পার হয়ে পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। স্থানীয় রাজাদের রেষারেষির দরুণ তাঁর প্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। তক্ষশীলার রাজা আম্ভি, যাঁকে গ্রীকগণ বলতে তক্ষীল, বিজেতাকে বন্ধুরূপে বরণ ক'রে নিলেন, এবং তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেন। কিন্তু "পোরস" বা পৌরব বংশের যে রাজা ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যদেশে রাজত্ব করতেন, তিনি তাঁর রাজ্যের প্রবেশ পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। ৩২৬ অব্দের জুলাই মাসে সেকন্দর সার নিকট পুরুরাজ ঝিলমের যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। সেকন্দর বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হলেন, এবং মুহূর্তেকের জন্য গঙ্গার উপত্যকায় প্রবেশ করবারও কল্পনা করেছিলেন, যেখানে সর্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত ভারতীয় রাজ্য —মগধ—প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সৈন্যগণ বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁকে নিরস্ত হ'তে হ'ল। নেয়ার্কসের নায়কত্বে তাঁর নৌবাহিনী সিন্ধুনদ বেয়ে ফিরে গেল, তিনি সিন্ধুর তীরে তীরে কুচ ক'রে চল্‌লেন এবং ৩২৫ অব্দের অক্টোবর মাসে বেলুচিস্থান দিয়ে পারস্যদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।*

(ক্রমশঃ)

* শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত রেনে গ্রুসে-র "ভারতবর্ষ" সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।

চারিটি বিচ্ছেদের কবিতা

(১)

মসৃণ ধুলোর ওপর পাৎলা বৃষ্টি।
উঠোনের ধারের উইলো গাছগুলি এবার
মঞ্জুরিত হতে থাকবে
সবুজ পরিপুষ্টতায়।
কিন্তু, পথিক, তুমি বরং যাবার আগে
এক পাত্র সুরা পান ক'রে নাও ;—
তোমার বন্ধুদের কাউকে তুমি পাবে না
তোমার পাশে
যখন তুমি থামবে এসে
শেষ বিদায়ের তোরণ দ্বারে।

(২)

কো-কাকু-রো থেকে
কো-জিন চল্‌লো পশ্চিমে,—
ধোঁয়া ফুলের পরাগে আব্‌ছা নদী।
দূর আকাশের গায়ে
মসীবিন্দুর মতো জেগে আছে
তার নিঃসঙ্গ নৌকার পাল।

এখন আমার সাম্‌নে শুধু নদীর
কুঞ্চিত বিস্তৃতি।
আমার সাম্‌নে শুধু দীর্ঘ কিয়াঙ্‌—
এঁকে-বেঁকে যে স্বর্গের দিকে চলে গেল।

(৩)

লোকে বলে,
সান্‌সো-র পথ-ঘাট বড় দুর্গম—
নাকি পাহাড়ের মতো খাড়া।
সেখানে গ্র্যানিটের প্রাচীর
পথিকের মুখের সামনে সোজা উঠে যায়,—
তার অশ্ববল্‌গা হঠাৎ ঢাকা পড়ে
পাহাড়ী মেঘে।

শিন্‌-এর শান-বাঁধানো পথের ধারে
আছে গাছের মনোহর সারি
তাদের গুঁড়ি পাষাণ ফুঁড়ে বেরিয়েছে।
আর তুহিনের বাঁধন ভেঙ্গে
নদীর ঢল নামে
সোকু-র মায়াবী সহরে।

মানুষের ভবিষ্যৎ
নিয়তির ছকে অভ্রান্ত করে আঁকা;
জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হওয়া বৃথা!

(৪)

প্রাচীরের উত্তরে নীল পাহাড়
তার পায়ের কাছে ঘুরে গেল
রূপালি নদী।
এখানে আমরা বিদায় নেব
তারপর পার হয়ে যাব সহস্র যোজন
মরা ঘাসের ওপর দিয়ে।...

(রিহাকুর তর্জ্জমা)

সৌরীন্দ্র মিত্র

সোনার সিঁড়ি

আজকের এই রাত শান্ত সুরভিত
কীট্‌স-এর বাঞ্ছিত মৃত্যুর মতো।
তবু মাঝে মাঝে আঙুরের মতো জড়িয়ে-যাওয়া
অন্ধকারের ফুল্‌কি আগুন-লতা
ছেয়ে আসে সারা অঙ্গে।

দেহ পুড়ে যায়—ভস্মাবসানে পড়ে থাকে
নির্ব্বাণ-আহুতির ক্ষীণ বহ্নিজ্বালা,
মানসিক অপরাগ।

ঐশী অতৃপ্তি? কাব্যে বলে তাই।
জীবনেও কি তা' সত্যি নয়?

যদি সিদ্ধ হয়ে যেতো সর্ব্বাঙ্গীণ উপলব্ধি
থাক্‌তো না অনির্ব্বচনীয়তার আকৃতি।
যদি ফুরিয়ে যেতে তুমি—
কি নিয়ে গড়ে উঠ্‌ত
আমার অতৃপ্ত স্বর্গকামনা?

সোনার সিঁড়ির শেষ নাই।
মাটি থেকে লতিয়ে উঠে
দিগ্‌বলয় ভেদ ক'রে
ধূমায়িত নীল নীহারিকার পুঞ্জে পৌঁছয়

সকলেরি লালায়িত চোখ সেই দিকে।
বৈশ্য-রাবণের অন্ধ লোলুপতা
মধ্যবিত্ত পুরূরবার স্বপ্ন-বিলাস
বিদ্রোহী ত্বাষ্ট্রের সাম্য-লিপ্সা
সকল কবির অক্ষয় অক্ষমতা—
আর আমার পরিতৃপ্ত উর্দ্ধরতি
শুধু তোমায় ঘিরে'।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

Testament of India—by Ela Sen, (George Allen & Unwin).

বর্ত্তমানে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সঙ্কট উৎকট রূপ ধারণ করেছে। অপেক্ষাকৃত দ্বন্দ্ব-বিরত যুগে মোহ স্বাভাবিক্। কিন্তু আন্তর্জাতিক সঙ্কট ও দুর্যোগ জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। তাই এ যুগে প্রাচীন নিশ্চিন্ত ধর্ম্মসমাধি বিচলিত, অর্ব্বাচীন দ্বন্দ্বে যোগনিদ্রা অপাংক্তেয়। অনেকেই দেখি তাই হয় হাহাকারে নতুবা জয়গানে পঞ্চমুখ। জড়বাদের মন্ত্রোচ্চারণে সন্তোশালোদ্ধৃতা অহল্যার মত এই নবচেতনা। বর্ত্তমান ভারতীয় তথা জাগতিক পরিস্থিতি নানা শ্রেণী-স্বার্থের সংঘর্ষে আবর্ত্তিত; ফলে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয় না হলেও দুর্জ্ঞেয়। গভীর বাস্তব সম্পৃক্তি ও বৈদগ্ধ্য না থাকলে এ দুর্দ্দৈবে দিক নির্ণয় সম্ভব নয়। মার্কস-তুল্য সম্যক-দৃষ্টিতে এ সম্ভব। শ্রীমতী এলা সেনের Testament of India-য় তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই সহজ নয়। শ্রীমতী সেনের বা এই জাতীয় দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা আশাপ্রদ বলে মনে হয়। এই প্রচেষ্টায় অবশ্য সাফল্যের চেয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চেতনার মূল্য বেশী, এবং সে মূল্য শ্রীমতী সেনের প্রাপ্য। এই গ্রন্থে মাহাত্মা গান্ধী জওহরলাল প্রমুখ রাষ্ট্রনেতা ও দিক্‌পালগণের সাক্ষাৎ পাই। এঁদের প্রত্যেককে কেন্দ্র করে এক একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি সহজ, সরল ও অগভীর। বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধগুলি গ্রথিত হয়েছে। ফলে মালব্যজী, জিন্না, সুভাষচন্দ্র, রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকলেই গ্রন্থভুক্ত। এই দলে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে দেখে আশ্চর্য্য লাগে। Younger Socialists-রাও শ্রীমতী সেনের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। বাংলায় সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধেও একটা প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে। তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে এঁর প্রতিপাদ্য অকাট্য না হলেও উপভোগ্য হতে পেরেছে। তবে এটা প্রায় স্পষ্ট যে শ্রীমতী সেনের দৃষ্টি বর্ত্তমান ভারতীয় সমস্যার মর্ম্মভেদে অক্ষম। বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে রাষ্ট্রনায়কদের সঠিক সংস্থান তাই এ বইএ পেলাম না। জওহরলাল কংগ্রেসে সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলনের প্রবর্তক হ'য়েও সোসিয়ালিষ্ট

ন'ন তা আজকের দিনে প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহু জায়গায় "United Front"-এর উল্লেখ থাকলেও 'United Front' সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট উক্তি কোথাও পেলাম না। হয়ত সুস্পষ্ট ধারণার অভাবই এর কারণ। গান্ধীবাদ-কর্ষিত ক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হতে চলেছে তা বিচিত্র ঘটনা সংঘাতে পরবর্ত্তী যুগে শ্রেণীসংগ্রাম রূপে দেখা দেবে। আপাততঃ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র দলনির্ব্বিশেষে সকলেরই শত্রু এই ভিত্তিতে সর্ব্ব পন্থার মিলনক্ষেত্র এই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা। এই গান্ধীচালিত কংগ্রেসের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অধুনা অলঙ্ঘ্যনীয়। প্রত্যেক দল ও দলপতির উৎপত্তি ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। এবং এক এক দলের আয়ুষ্কালও প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়।

যাই হোক লেখিকার শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার লক্ষণ পরিস্ফুট। মুস্কিল এই যে মানুষ হিসাবে এবং রাষ্ট্রনেতা হিসাবে, গান্ধী, জহরলাল, বা সুভাষচন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা সম্ভব নয়। কারণ সাধারণ পারিবারিক জীব হিসাবে এঁদের জীবনে অন্তঃপুর প্রায় নেই বল্লেই চলে। এবং বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিনেতৃত্বের প্রয়োজন ন্যূন না হলেও ব্যক্তিপূজার প্রয়োজন ও মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। সেই জন্যেই বোধহয় আত্মজীবনীর প্রাদুর্ভাব এ যুগে এত বেশী।

অনেকেরই এ বই পাঠ্য, বিশেষতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

•

Germany's Revolution of Destruction—by Herman Ranschning (Heinemann).

ড্যানজিগ্ আজকালকার প্রধান খবর। ছোট্ট জায়গা হলে কি হয়, বারুদ-ঠাসা। অবশ্য আজকাল কোন গণ্ডগ্রাম যে বারুদখানা আর কোনটা নয় কেউ বল্‌তে পারে না। মহামানবদের কৃপায় ঐতিহাসিক কারণ ইতিহাস থেকে লোপ পেয়েছে, দাঁড়িয়েছে সব ছুতোয়। তবু বল্টিক সাগরে যেতে কে না চায়? পোলাণ্ডের অর্গল বন্ধ, জার্ম্মানীর হাত পা ছড়াবার স্থান নেই, মাথায় ইংরেজ, পায়ে ইটালী, মাত্র দুটি দিক আছে, এক ব্ল্যাক সী না হয় বল্টিক্।

প্রথমটার সুবিধা হয়েছে, দ্বিতীয়টির বাধা সোভিয়েট। একবার 'করিডর' ও ড্যানজিগ্ এলেই হল, তখন ইংলণ্ডের জাহাজ আর ফ্রান্সের সৈন্য জার্ম্মানীর বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। তাই ড্যানজিগকে নাৎসী করার দরকার হয়। লেখক এই ড্যানজিগের নাৎসী দলের সর্দ্দার ছিলেন, যে-পদ ফষ্টার সাহেব অলঙ্কৃত করছেন। পরে সেনেটের সভাপতি পর্য্যন্ত হন। এখন ভদ্রলোক বুঝেছেন যে নাৎসীরা পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করছে। বোঝবার বর্ণনা বইখানির বিষয়। অনেকে হয়ত তত্ত্বটি ইতিপূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এই রক্ষা, নচেৎ ভদ্রলোকের ভাষা ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে ব্যাপারটা প্রথম পাঠেই সরল হত মনে হয় না। তবু অভিজ্ঞতার মূল্য যথেষ্ট।

বইখানি পড়লেই মনে হয় লেখক বড় ঘরের ছেলে, হ্বাইমার কনষ্টিটিউশনে হতভম্ব হয়ে পড়েন, ক্রুনিং-এর কাণ্ডকারখানায় স্বার্থে আঘাত পড়ে, তাই ভাবলেন, যেমন পাপেন, ইয়ং এবং হেরেনক্লাবের দল ভেবেছিল, নাৎসীদের দ্বারা জমিদার-অফিসার শ্রেণী দেশে পাকা হবে। কিন্তু ঠিক জমতে না জমতে কেঁচে গেল। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ন্যায়, স্বাধীনতা প্রভৃতির নামে লেখক বলছেন এই পৃথিবীর নাৎসীরই প্রধান শত্রু। আমার বক্তব্য এই যে হয়ত তারা শত্রু, কিন্তু উক্ত কারণে নয়, অতএব উষ্মা প্রকাশে বিশেষ কিছু লাভ হয় না।

কিন্তু একটা খাঁটি কথা বইখানিতে আছে, যেটা আমাদের জানা উচিত। আমরা বরাবরই শুনে আসছি যে হিট্লার একজন ভীষণ মতলব-বাজ, বহুপূর্ব্ব থেকে তিনি কি করবেন সব ঠিকঠাক আছে, বিশ্বাস না হয়, তাঁর বই পড়ে ছ্যাখ, ছত্রে ছত্রে মিলে যাবে। ভবিষ্যতটা তাঁর কাছে দাবার ছক্, এক একটি দানে তিনি এগিয়ে চলেছেন জয়ের পথে। গোয়েবেলস্ সেই অনুসারে প্রপাগাণ্ডা করে যাচ্ছেন, সৈন্যরা সেই আদেশ মেনে যাচ্ছে, এবং গেডি, রীড প্রভৃতি সাংবাদিকরা সেই দুর্নিবার অগ্রসরের ওপর আলোকসম্পাত করছেন। বইখানি পড়ে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে হিটলার বিপ্লবের আবর্ত্তে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এমন ভাবে হাত পা ছুঁড়ছেন যে আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে আবর্ত্ত কেন স্রোতটাও তাঁর সৃষ্টি। রাউশনিং-এর কৃতিত্ব এই জচ্চুরীটা ধরিয়ে দেওয়াতে। তাঁর বই পড়ে কারুর সন্দেহ থাকবে না যে আজকের জার্ম্মানীতে প্রোগ্রাম আছে, প্ল্যান নেই, এবং সে-প্রোগ্রাম কেবলমাত্র ধ্বংসেরই।

এটা কেবল কথার মার-প্যাঁচ নয়। অনেকে আজকাল ফাঁপরে পড়েছেন ফ্যাশিজম্-নাৎসীজমের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায়। বস্তুটা কি সোভিয়েট কম্যুনিজমের anti-thesis, মাত্র প্রতিক্রিয়া, না ক্যাপিট্যালিজমের পরিণতি, মৃত্যুকালের শ্বাসটানা! এই ফাঁপর থেকে মার্ক্সিষ্ট্দেরও উদ্ধার নেই। বস্তুটার স্বরূপ বোঝা চাই, বিশেষত বাঙলাদেশে যেখানে national planning-এর জন্ম হয়েছে বল্লে অত্যুক্তি হয় না, এবং যেখানে ফ্যাশিজমের যত প্রকার সহকারী কারণ থাকতে পারে তা বর্ত্তমান। ব্যাপারটা এই ঃ

নাৎসীরা জার্ম্মানীকে ওলট-পালট করে দিয়েছে, ফ্যাশিষ্টরা যেমন ইটালীকে। অতএব ঘটনাকে ক্রান্তি, কালান্তর, বিপ্লব বলতেই হবে। এখন সব বিপ্লবই কি এক ধাতুর ? রেভোলিউশনকে বড় অক্ষরে বানান করলে সব গোল মিটে যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নানা প্রকারের বিপ্লব আছে। তার মধ্যে দুটি শ্রেষ্ঠ। একটা নিহিলিষ্ট বিপ্লব, য়্যানার্কিষ্ট, অর্থাৎ নেতিমূলক, আরেকটা মার্ক্সিষ্ট। এতদিন যে-সব বিপ্লব ঘটেছে, যাদের বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতবর্গ নানা প্রকারের ক্ষতি দেখিয়েছেন, তাদের অনেকগুলিই প্রথম শ্রেণীর। দ্বিতীয় প্রকারের বিপ্লবের সংখ্যা কম, কারণ প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত চাষী মজুরের সক্রিয় যোগের দৃষ্টান্ত কটাই বা! কোনো ক্ষেত্রে প্রথমে, কখনও বা মধ্যে, কিন্তু শেষরক্ষা কোথায় বা হয়েছে, এক রুশিয়া ছাড়া, অন্য সব ছুটকো-ছাটকা। সাহিত্যের ভাষায়, প্রথম প্রকার বিপ্লবে পূর্ব্বতন সৃষ্টির ধ্বংসের আদেশই বর্ত্তমান, দ্বিতীয়টিতে রক্ষা ও সৃষ্টির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। প্রথমটি অনৈতিহাসিক, দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক। তার অর্থ নয় যে নিহিলিষ্ট বিপ্লব ঘটনাই নয়, অর্থ এই যে তার দ্বারা সভ্যতার অবস্থান্তর ঘটলেই রূপান্তর ঘটে না, সভ্যতা অন্যস্তরে ওঠে না, একই স্তরে থাকে, না হয় পিছিয়ে পড়ে। অর্থ নয় যে এই সব ঘটনায় প্রোগ্রাম নেই, নিশ্চয়ই আছে ; অর্থ এই, প্রোগ্রাম থাকলেও, এতে প্ল্যান নেই। প্ল্যানের মর্ম্ম হল ইতিহাসের নিয়মকে, আজকালকার বুলি অনুসারে ডায়েলেকটিকের ধর্ম্ম বুঝে কাজ হাসিল করা। নাৎসী-বিপ্লব ধ্বংস করতেই সমর্থ, অতএব যাঁরা সভ্যতা এগিয়ে চলুক আশা করেন তাঁদের কর্ত্তব্য ··· ।

কি কর্ত্তব্য বইখানিতে স্পষ্ট করে লেখা নেই। অনেকের মতে কর্ত্তব্য

সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি। সেটা রাউসনিং-এর পছন্দ নয় সন্দেহ হয়। তবে বাধা দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয়। উপায় বলেননি। বাধা দেওয়া উচিত কেন বলেছেন। উচিত এই জন্য যে নচেৎ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাবে না। আমিও বলি স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হোক—কিন্তু জমিদার-অফিসার শ্রেণীর হাতে সভ্যতা কেন আমার ছোট আমিকেও সমর্পণ করতে ভয় পাই। কে করবে তাহলে?

সমালোচনা লিখে ছুটি অবান্তর কথা মনে জাগছে—(১) ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির প্ল্যান আছে, না কেবল প্রোগ্রাম? (২) ভাল বই লেখবার মূলে জ্ঞান থাকলেই চলে না; ধর্ম্মজ্ঞান থাকা চাই। সে-ধর্ম্ম যদি আমাদের শ্রেণী-ধর্ম্ম হয় তবে সোনায় সোহাগা। রাউসনিং-এর বইটা সত্যই ভাল। পরিচয়-পাঠক যেন নিশ্চয়ই পড়েন।*

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* এ-সমালোচনা যুদ্ধঘোষণার এক মাস আগে লিখিত।

পাতালকন্যা—অজিত দত্ত। কবিতা-ভবন, দাম দেড়টাকা।

বছর আষ্টেক আগে 'কুসুমের মাস' নামে অজিতবাবুর প্রথম কবিতার বই বেরোয়। অনেকগুলি নিখুঁত, অপূর্ব্ব সনেটের জন্য বইখানি নিশ্চয়ই কাব্যোৎসাহীরা ভুলে যাননি। কিন্তু ভুলে না-গেলেও, এ-আশঙ্কা অনেকেরই হয়েছিল হয়তো,—এবং হওয়াটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়,—বুঝি প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবিস্মরণীয় 'প্রথমার' মতো অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস'ও কবির শিল্প-চাতুর্য্যের নিঃসংশয় দলিল ও ভবিষ্যতের পরিণততর কাব্যের আশ্বাসমাত্র হয়েই রইল। কেন না, 'কুসুমের মাসে'র পরবর্ত্তী এই সুদীর্ঘ আট বছরে কবি যা লিখেছেন, তা এতই কম, এতই পরিমিত, যে সব একত্র করেও 'পাতালকন্যা'র পাতা সাতচল্লিশের বেশী হ'ল না এবং কবিতার সংখ্যাও পঁচিশের ও-দিকে গেল না। কিন্তু তবু, পরিমাণের স্বল্পতার জন্য কবির বিরুদ্ধে যাঁদের অভিযোগ থাকবে, তাঁরাও আশা করি স্বীকার করবেন যে, বইটি যথেষ্ট হৃষ্ট-পুষ্ট না-হওয়ায় যেটুকু অসন্তুষ্টির কারণ ঘ'টেছে, 'পাতালকন্যা'র কোন-কোন কবিতার আশ্চর্য্য উৎকর্ষের

দরুণ সেটুকু নিঃসন্দেহে পুষিয়ে গেছে। কেবল তাদেরই খাতিরে কবির বাক্‌কুণ্ঠার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ নীরব হয়ে যায়,—যেহেতু মন আমাদের ইতিমধ্যেই বন্দী হয়ে গেছে 'পাতালকন্যা'র স্বপ্ন-মন্দির, কুহেলি-রাজ্যে ;—মন সানন্দে, সাগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছে, 'এ-কবিতা আমার ভালো লাগলো !' আর যে জিনিস্ ভালো লাগে, এক হিসেবে তা যতো কম হয়, যতো দুষ্প্রাপ্য হয়, ততোই ভালো।

আগেই বলে রাখা দরকার, অজিত দত্ত আধুনিক হয়েও রোমান্টিক। 'কুসুমের মাসের' কোমল, শান্ত ও সংযত কবিতাগুলিতে যে রোমান্টিক আবেশ ও স্বপ্নালুতা ছিল তারা অক্ষুণ্ণ : 'পাতালকন্যার' সঙ্গে 'কুসুমের মাসে'র আন্তরিক সম্বন্ধ সুপরিস্ফুট। আঙ্গিক ও পদ্ধতির দিক দিয়ে কবির পরিণতি এ-বইয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হলেও, কবিতার মূল সুর, এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু প্রবল রকমের রোমান্টিক। আজকের দিনে, যখন তরুণ কবিরা নাকি সমষ্টির চিন্তা ছেড়ে প্রেমের কবিতা লিখতেও লজ্জা বোধ করেন, বোধ করি অজিত দত্তই একমাত্র কবি যিনি সোজাসুজি রূপকথার কল্পলোকের বর্ণনা করতে সাহস পান,—যিনি উগ্র-পন্থী কবিকুলের সমসাময়িক হয়েও সে-দেশের কথা লিখ্‌তে ইতস্তত করেন না,

> "যে-দেশে পাষাণ-পুরী, মানুষের চোখের পাতাও
> অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে…"

তিনি একথা বলতে দ্বিধা করেন না, শৈশব কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে যে-দেশের মায়াবী প্রভাব আমাদের বিমুগ্ধ কল্পনাকে মুক্তি দেয়, সে-দেশের মায়াঞ্জন এখনও তাঁর চোখে, সে-দেশের অরণ্য-সঙ্গীতে এখনও তাঁর হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত। তাঁর প্রাণ সে দেশের মায়াবিনী পাশাবতীর কাছে এখনও বিক্রীত ;—

> হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,
> কখনও আমার পরে তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও ঃ
> তাহলে তোমারে কহি, সে-দেশে যে পাশাবতী আছে
> মায়ার পাশাতে যেই জিনি লয় মানুষের প্রাণ

মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান ;
সাবধানে যেও সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তার মৃদুকণ্ঠে শোন তুমি অরণ্যের গান।

এ-ধরণের কবিতাকে এস্‌কেপিষ্ট বলে উড়িয়ে দেবার লোভ অনেকেই হয়তো সম্বরণ করতে পারবেন না। হয়তো এ-কবিতা সত্যিই এস্‌কেপিষ্ট, অস্বীকার করবো না। কেন না বইয়ের প্রথম দিককার কবিতা কটির সাহায্যে কবি এমনই একটি রূপকথার সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করেছেন যেটা আমাদের জীবন থেকে হয়তো সত্যিই কিছু দূরে। কিন্তু কল্পনার এই স্বপ্ন-স্বর্গ-রাজ্যের সত্যতা ও আকর্ষণ সম্বন্ধে মনে কোনরকম প্রশ্নেরই উদয় হয় না ; ঐশ্বর্য্য ও মায়া এতই সমৃদ্ধ। ধরুন,

দূরে,—বহুদূরে,—শাল, তাল
তমাল, হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়াম্লান দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোন দিন এসে—
আঁখি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটি রয় চিরকাল,
বসন্ত সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাতপদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

এ-কবিতা পড়তে গিয়ে, ঐ রূপকথার দেশ সত্যই আছে কি-না, সে-সন্দেহ মনে আসে না। লাইনকটির অপূর্ব্ব ধ্বনিবিন্যাসে যে রসঘন সৌন্দর্য্য জমে উঠেছে, তার মোহে আমরা আচ্ছন্ন। এস্‌কেপিজিমের সুর এতে থাকলেও, এ-যে কবিতাই, এবং উঁচু দরেরই কবিতা সে-বিষয়ে দ্বিধা থাকতে পারে না। পাঠক যদি তীব্রতম, উগ্রতম বাস্তবপন্থীও হন, তবু তাঁকে মানতে হবে যে, পুরোপুরি কল্পনার সাহায্যেও কখনো কখনো কবি সৌন্দর্য্য-সত্যের মুখোমুখি পরিচয়ে নিজেকে এবং পাঠককে জাগিয়ে দিতে পারেন। অজিত দত্তের কবিতা পড়লে বিশ্বাস হয়, কবিতা সত্যই কোন বাঁধাধরা 'থিওরির' শাসন মেনে

চলে না। বহুকাল পূর্ব্বে লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির শিল্প-প্রতিভা বিশ্লেষণচ্ছলে পেটার যে দুটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছিলেন,—কল্পনা ও সৌন্দর্য্য-কামনা, আমার মনে হয় সমগ্র কবিজাতির বেলাতেও তা সমভাবে প্রযোজ্য, এবং বাংলাদেশে প্রগতির অজস্র পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন সত্ত্বেও যে তা মিথ্যা হয়ে যায়নি আজও, তার প্রমাণ অজিত দত্তের কবিতা।

অজিতবাবুর লেখনীতে যে সত্যিই জাদু আছে, 'মাছেরা' ও 'রাঙা সন্ধ্যা' কবিতাদুটি তার প্রমাণ দেবে। একদিকে কল্পনার উদ্দামতায় আর তারই সঙ্গে প্রকাশের সংযমে কবিতা দুটি, অন্তত আমার কাছে, অপূর্ব্ব। আঙ্গিকের দিক দিয়ে এমন নিখুঁত কবিতা অজিত বাবুও খুব বেশী লেখেন নি ঃ

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে প্যাখার ঘায়
ডানা মেলে দিয়ে উড়ে চলে যায় দুটি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দুটি কথা উড়ে যায়।
(রাঙা সন্ধ্যা)

কেঁপে-কেঁপে ওঠে জল, কে তারে কাঁপায় ?
উপরে বাতাস, আর নিচে তার রূপালি মাছেরা ;

* * *

ছোট মাছ, বড় মাছ—পাশাপাশি ছুটে চলে যায়
নীলাভ ঢেউয়ের পরে, পাতালের নিথর শীতলে
তাদের ডানার নিচে সপ্ত সমুদ্রের নীল জল,
তাদের নিঃশ্বাসে কাঁপে আকাশের নক্ষত্রের ছায়া।
(মাছেরা)

ছন্দের ব্যাপারেও অজিতবাবু ঐতিহ্যকে যথাসম্ভব মেনে চলেন, নিয়মিত মাত্রার অমিত্রাক্ষর কবিতা 'অহল্যা' নিঃসন্দেহে একটি প্রথমশ্রেণীর রচনা। তবে ছন্দ নিয়ে মধ্যে মধ্যে নতুন পরীক্ষা যে কবি না করেছেন এমন নয়,— যেমন 'বড়বাজার', যার মিলহীন অসম-ছন্দ পাঠকের ভালোই লাগবে। বিশেষ করে অসম মাত্রায় লেখা 'একটি কবিতার টুক্‌রো' ভাবে ও ভাষায়, ধ্বনিতে ও অনুষঙ্গে একটি শিশিরকণার মতো নিটোল, নিখুঁত রচনা। শব্দ-চয়ন ও

বর্ণবিন্যাসের সূক্ষ্ম কৌশল অজিতবাবুর আয়ত্ত, ছন্দের ও রচনাপদ্ধতির নানা-জাতীয় কারিকুরিও তাঁর জানা এবং এ-সব তিনি জায়গায় জায়গায় অলৌকিক চিত্র আঁকতে প্রয়োগ করেছেন। সামান্য একটু গা-ছম্‌ছমানি, কিন্তু 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভয়ঙ্কর বিভীষিকা নয়,—আর তারই ভেতর অনিবার্য্যভাবে ফুটে উঠেছে একটি সৌন্দর্য্যপ্রাণ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনুভূতি। যেমন 'পরী' কবিতায়,—

যদি তুমি কোনদিন পাহাড়ের কিনারে-কিনারে
গভীর বনের পাশে, বিশাল মাঠের মাঝখানে,

* * *

যদি তুমি সেথা গিয়ে বলে থাকো,—'কে আছো এখানে ?'
'কে আছো এখানে' বলে' তারা সব হেসেছে তখন,
তাদের হাসির শব্দে কেঁপেছে পাহাড়, মাঠ, বন।

'পাহাড়, মাঠ, বন'! মাত্র তিনটি কথা! কিন্তু এই সবল তিনটি বাহনের সাহায্যে যে অলৌকিক সম্ভাবনার রহস্যক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তা থেকে সমজাতীয় De la Mare-এর 'The Listeners' ও 'Motley'-র কোন কোন কবিতার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গত মনে পড়ে।

এ-ছাড়া হাসির ও ব্যঙ্গ কবিতাও যে অজিতবাবুর হাতে খোলে তার নমুনাও এই বইয়েই আছে, যেমন অকবির কাব্যপ্রয়াস নিয়ে লেখা 'পদ' অথবা 'আত্মীয়' নামক হাল্কা বিদ্রূপের কবিতাটি। রূপকথার মোহ জাগাতেও কবি যেমন ওস্তাদ, নিছক ফুর্ত্তির কবিতা লিখতেও কম নন। কিন্তু 'অনধিকারী' কি 'পুলিশ' জাতীয় কবিতায় তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন, তার ফলে ঠাট্টা ও স্বপ্ন জাতীয় দুই বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে একটা Pseudo-serious গোছের খাপ্‌ছাড়া জিনিস দাঁড়িয়েছে। শেষ কথা, অজিতবাবু, যিনি রূপকথার কবিতা লেখেন, ইয়েট্‌সের ভাষায় যিনি 'Dreamer of dreams', তিনিও যে সমাজ থেকে দূরে নন, 'মিস—' কবিতার গম্ভীর ও রূঢ় বিদ্রূপ সেকথা প্রতিপন্ন করেছে।

শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র

A Journey Round my Skull—By Frigyes Karinthy
(Faber & Faber).

গ্রন্থকার হচ্ছেন জনপ্রিয় কথাশিল্পী। হাঙ্গেরীর সর্ব্বত্র ইতরভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের কাছে তাঁর রচনা সমাদৃত। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠকের মনোরঞ্জন কল্পে প্রণীত হয় নি। এখানি একটি উৎকট ও মারাত্মক ব্যাধির বিবৃতি। মস্তিষ্কের অন্তর্ভাগে টিউমার উদ্ভব হয়ে গ্রন্থকারের সর্ব্বাঙ্গের পরিচালনা-কেন্দ্র বিকল করে তোলবার উপক্রম করেছিল—সেই সময়কার দিনপঞ্জিকার মধ্যে বিধৃত মানসিক বিকার ও শারীরিক গ্লানির চুম্বক তুলে দেওয়া হয়েছে এতে। চিত্তাকর্ষক না হয়েও গ্রন্থখানি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেছে লিখন-ভঙ্গীর অদ্ভুত নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততার জন্য।

প্রথম উপসর্গ হতে অস্ত্রোপ্রচার ও রোগমুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত দশ মাসের অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্যের অভাব অবশ্য নাই কিন্তু অসুস্থ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত জগৎ হতে স্বপ্ন ও বাস্তবের পার্থক্য ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে অপসৃত হয়ে গেছে বলে সে বৈচিত্র্যে কৌতূহল সৃষ্টি করবার শক্তি নাই।

সেই জন্য সাধারণ পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ ক্লান্তিকর ও কষ্টদায়ক হবে। প্রকৃত সাহিত্যরসিক বুঝবেন যে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা রহস্যের সৃষ্টি করা বা কোন বিশেষ মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নয়। আলেখ্যটির মৌলিকত্ব হচ্ছে এই যে এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য বিবর্জ্জিত।

রোগটি ধরা পড়তে বিলম্ব হয়েছিল। গ্রন্থকার তাঁর অবসর সময় অতিবাহিত করতেন শব্দ প্রতিযোগিতায়। একদিন সন্ধ্যার সময় একাগ্রচিত্তে অক্ষরবিন্যাস করছেন। শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ। সহসা মনে হলো পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথের উপর রেলগাড়ী প্রধাবিত। ধ্বনিটি এত স্পষ্ট যে বাতায়নের কাছে উঠে এলেন। উপর্য্যুপরি কয়েকবার হবার পর বুঝলেন ব্যাপারটি ভ্রম। চিকিৎসকের কাছে যেতে প্রকাশ পেলো যে নাসিকা ও কর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত কোন শিরা ফুলে উঠেছে। পরের উপসর্গটি হলো রীতিমত আতঙ্কের। একদিন অকস্মাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উত্থানশক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেলো; গৃহজাত দ্রব্য সামগ্রী মনে হলো হিল্লোলিত —ভাবলেন সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং অন্তিম সময় আগত। মুহূর্ত্তের

অনুভূতিটি মানসরাজ্য বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেলো। জনৈক মনঃসমীক্ষণ বিশাবদ অভয় দিলেন ব্যাধিটি মানসিক। আর একজন বিশেষজ্ঞ বল্লেন অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবনের কুফল।

এদিকে অন্তরের প্রতীতি ইঙ্গিত করতে লাগলো যে ব্যাধির উপসংহার ভয়াবহ। নিছক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা সে অনুভূতি খণ্ডন করে চলা দায় হয়ে উঠলো। তারপর মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে অসহ্য যন্ত্রণা ও বমির উদ্রেক ; চলার সময়ে বামভাগে গতি ; দৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাদ উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রোগটির প্রকৃতি-নির্ণয় হলো।

গ্রন্থকারের মর্ম্মগত বিসংবাদ শান্ত হতে বাহ্যিক আচরণে এল প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন। অতিমাত্রায় মুখর হয়ে পড়লেন ; ভাবভঙ্গী ও কথার ধারা হয়ে উঠলো প্রখর ও নাটকীয়। যেন কতই জীবন বহনের দায়িত্বভার হতে অব্যাহতি পেয়ে স্ফূর্ত্তির উৎসে অবগাহন করে নিচ্ছেন। উৎকণ্ঠিত শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আস্ফালন করে জানাতে লাগলেন যে ব্যাধিটির আভিজাত্যে তিনি যথার্থই গৌরবান্বিত।

এদিকে চিত্তের আর একটি অংশ এই নবলব্ধ প্রগল্‌ভতা দেখছিল পরম কৌতুকে। গ্রন্থখানির সদ্‌বস্তু হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গীটি।

শারীরিক যন্ত্রণা, মানসিক বিচার, স্বপ্ন ও প্রলাপ বিবৃত হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। কোথাও দার্শনিক তত্ত্বকথা বা আধ্যাত্মিক ভাবালুতার লেশ মাত্র নাই। আত্মীয়বর্গের উদ্বেগ ও দুঃখে সমবেদনা বা আত্মপ্রসাদের নাম গন্ধ নাই। আছে নিবিড় কৌতুকবোধ।

দৃষ্টিলোপ, পক্ষাঘাত, বুদ্ধিবিকৃতি ও মৃত্যু এই চারটি ধাপ ছিল ব্যাধির অনিবার্য্য পরিণতি—অন্ততঃ গ্রন্থকার সে বিষয় নিঃসন্দেহ ছিলেন—কিন্তু কী অদ্ভুত অহঙ্কার। শেষ পর্য্যন্ত, অহিফেনসেবীর মতো স্বপ্নাবিষ্ট হয়েও নিজের স্বতন্ত্র সত্তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকারের পর্য্যাপ্তির মধ্যেও দেখা যায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত মহাপ্রভু মজা দেখার প্রলোভন সংবরণ করতে নারাজ।

ব্যাধি অবশ্য পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত সুইডিস বিশেষজ্ঞ অলিভ ক্রোনা অর্ব্বুদটিকে অপসারণ

করেছিলেন সুদূর নরওয়ের কোন হাসপাতালে। চারঘন্টা ব্যাপী মহাযজ্ঞের অধিকাংশ সময় রোগীর কেটেছিল সজ্ঞানে। এই অভিজ্ঞতাটি যে অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে সেটি অতিক্রম করে যেতে আমাকে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। অধৈর্য্য হয়ে বার বার গ্রন্থখানি মুড়ে রেখেছি অথচ লঙ্ঘন করে যেতে পারিনি। প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি অনুভূতি বিন্যাস করে গেছেন আত্মহারা শিল্পীর মত—দাঁড়িয়েছে দুঃসহ বিভীষিকা। সে উলঙ্গ নিষ্ঠুর বর্ণনা পাঠকের চিত্তে দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে।

গ্রন্থকারের নির্ম্মম স্টৌয়িক অবধারণায় সুন্দর ও অসুন্দরের বিলয়ন হয়েছে অচ্ছেদ্যভাবে তথাপি হৃদয়ের কমনীয়তা প্রকাশ পেয়েছে ফাঁকে ফাঁকে। উন্মাদাগারের প্রাচীনতম অধিবাসী 'মণী'র কাহিনীটি হচ্ছে প্রধান দ্রষ্টব্য। এত অল্প কথায় এতখানি অনুকম্পার বিকাশ কদাচিৎ দেখা যায়। দেশ হতে দেশান্তরে যাবার সময় বহু বিচিত্র বর্ণের ভাবধারা বিচ্ছুরিত হয়েছে চিত্তাকাশে।

শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্ন জাগে গ্রন্থকারটি কে? কি প্রকৃতির লোক? আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণিধান করে সে কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। অন্তরঙ্গ পারিবারিক জীবনের কোন কথা প্রকাশিত হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে জানা যায় যে সহধর্ম্মিণী ছিলেন বিদেশে কোন উন্মাদাগারেব চিকিৎসক ও একমাত্র পুত্র 'সিনি' থাকতো বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ এবং তাঁর নিজের সময় অতিবাহিত হতো কাফের বৈঠকে। হয়ত' কাল্পনিক রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় হলে হৃদয়ের সন্ধান মিলবে। দুঃখের বিষয় তাঁর উপন্যাস বা নাটকের কোনটাই ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়নি। বর্ত্তমান গ্রন্থের সুদক্ষ অনুবাদক বার্কার শুনেছি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আশা করি তিনি এ কার্য্যের ভার নিয়ে পরদেশী পাঠক সম্প্রদায়কে অনুগৃহীত করবেন।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ—সুশোভনচন্দ্র সরকার প্রণীত
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৯১৮ থেকে ১৯৩৮—এই বিশ বছরের ইতিহাস সহজ, স্পষ্ট বাংলায় অধ্যাপক সরকার আলোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে

আমাদের দেশের লোক আজকাল অনেকটা সজাগ। কয়েকটি সংবাদপত্রের কল্যাণে বিশ্ব রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণাও অনেকের হয়েছে। অধ্যাপক সরকার ১৭টি পরিচ্ছেদে গত মহাযুদ্ধের অবসান থেকে ১৯৩৮-এর শেষে আবার সমরোন্মুখ ইয়োরোপের যে চিত্র দিয়েছেন, তা বিশেষ মূল্যবান্। বাংলা বইয়ের বিক্রী সম্বন্ধে কিছু ভরসা করে বলা শক্ত, কিন্তু অন্তত আশা করা যায় যে এ ধরণের বই প্রকাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বাচার ছেড়ে যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, সেই রকম সুবুদ্ধি পাঠকদেরও হবে। এ বইয়ের বহু সংস্করণ হোক্।

লেখক যথার্থই বলেছেন যে সমাজ সম্পর্কীয় সকল আলোচনা, তা সমসাময়িক বিবৃতি বা পুরাবৃত্ত কথাই হোক্, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। "বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেই কোন বিবরণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, এ কথা একটা সংস্কার মাত্র।" তাই পক্ষপাত দোষের অসার অভিযোগকে অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন। সে দৃষ্টিভঙ্গীতে আছে মার্ক্স্‌বাদের অসংশয় পরিচয়। ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি পেতে হলে মার্ক্স্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলন করতে যে হয়, এ কথা আমাদের দেশে ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের কাছে জান্‌তে পাওয়া বড় কম কথা নয়।

অধ্যাপক সরকার কিন্তু কোথাওই একদেশদর্শিতা দেখান্‌নি। তাঁর লেখার ধরণ হচ্ছে সংযমের প্রতিরূপ; এমন কি, এক এক সময় অভিযোগ করতে ইচ্ছা হয় যে সংযমের যেন আতিশয্য ঘট্‌ছে। ফ্যাশিজ্‌মের বর্ণনা করতে গিয়ে একটু অনবধান উষ্মা পর্য্যন্ত তিনি দেখান্‌নি। সাল্‌ভেমিনির মত একনিষ্ঠ লিবারল মুসোলিনির কর্ম্মকাণ্ডকে "বিরাট ধাপ্পাবাজী" নাম দিয়েছিলেন। সুশোভনবাবুর মত যে ভিন্ন, তা নয়; কিন্তু ফ্যাশিজ্‌মের আবির্ভাব আর প্রকৃতি সম্বন্ধে অবিচলিত ধৈর্য্য নিয়ে আলোচনা করার মত বুদ্ধিবৈভব তাঁর আছে।

ফ্যাশিষ্ট পঙ্গপাল মধ্য ইয়োরোপকে যে ছেয়ে ফেল্‌তে পেরেছে, তার কারণ জান্‌তে হলে ভের্সাই সন্ধিব্যবস্থা, বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের পত্তন ও কার্য্যাবলী, উত্তর সামরিক জার্ম্মানীর লাঞ্ছনা, সোশ্যাল ডেমক্রাটদের অবিমৃষ্যকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য। অধ্যাপক সরকার অল্প পরিসরে অনবদ্যভাবে

সে আলোচনা করেছেন। আজকের পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের গুরুত্ব বুঝ্‌তে হলে রুষ বিপ্লবের সময় থেকে ট্রট্স্কির সঙ্গে কম্যুনিষ্ট দলের মতভেদ আর মস্কোয় বহু প্রাক্তন সাম্যবাদীর বিচার সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে। অধ্যাপক সরকার পাঠকদের সে সুযোগ দিয়েছেন। যে আর্থিক সঙ্কট ১৯২৯ সালে দেখা দিয়ে ধনিকবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহুলোকের মনে সন্দেহ জাগায়, আর সোশ্যালিজ্‌ম্‌কে প্রায় একটি ফ্যাশানে পরিণত করে তোলে, তার বিশদ বিবরণ এ বইয়ে পাওয়া যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বইয়ে হয়তো অতি-সংযম প্রয়োজন। অবশ্য অধ্যাপক সরকারের লেখায় সর্ব্বত্র তা নেই, কিন্তু যেখানে আছে, সেখানে তাকে মোচন করতে পারলে লেখার সৌষ্ঠব বৃদ্ধিই হত। বিদেশী কথার উচ্চারণগত বানান করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল ঘটেছে। এ কথার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে বিদেশী নামের উচ্চারণ সম্বন্ধে এ বইকে অনেকেই প্রামাণ্য বলে মান্‌বে। যে মানচিত্রটি দেওয়া হয়েছে, সেটি নির্ভুল নয়।

অধ্যাপক সরকার সাম্প্রতিক রাষ্ট্রনীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে আরও বই লিখে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন আশা করছি।

Inside Asia—by John Gunther (Hamish Hamilton), 12/6.

"ইন্‌সাইড্‌ ইয়োরোপ" লিখে জন্‌ গান্থারের যে খ্যাতি হয়েছিল, এই বইয়ে তা অটুট থাক্‌বে। ক্ষিপ্রবুদ্ধি সাংবাদিক হিসাবে লেখকের যে ক্ষমতার পরিচয় এই দুটি বইয়ে পাওয়া যায়, তা অসাধারণ। দু বছরের মধ্যে এশিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর গাড়ীতে ঘুরে, নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, নানা অজানা দেশের প্রাচীন ও সাম্প্রতিক ইতিহাস অনেকটা আয়ত্ত করে, ৬২৬ পাতার বই লেখা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। এ বইয়ের যে আদর হয়েছে ও হবে, বিশেষত এশিয়ার বাইরে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু "ইন্‌সাইড্‌ এশিয়া" পড়ে সন্তুষ্ট হওয়া শক্ত। সাংবাদিকরা বোধ হয় প্রগল্‌ভতাকে দোষের মধ্যে ধরেন না; ঐ গুণটির পরিচয় এ বইয়ের

প্রায় পাতায় পাতায় মেলে। তিন পাতায় চীন দেশের ইতিহাস বর্ণনা লেখক করেছেন, দু মিনিটেই যে ও ব্যাপারটা আয়ত্ত করা চলে পাঠককে সেই আশ্বাস দিয়ে। গান্থারের লেখার ধরণ হাল্‌কা, মজ্‌লিসী, আর বিশেষ করে মার্কিন মার্কা। বইখানা সুপাঠ্য বলা চলে না, কিন্তু সহজপাঠ্য খুবই।

এ বইয়ে কি কি পাওয়া যাবে, তা পাঠককে বেশী করে বলার দরকার হবে না। জাপান, চীন, ফিলিপাইন্‌স্‌, ইন্দোচীন, শ্যাম, ভারতবর্ষ, ইরাণ, আরব প্রভৃতি নানা দেশের বিবরণ এতে মিল্‌বে, আর জাপানের মিকাডো, চিয়াং কাই শেক, সুং পরিবার, গান্ধিজী, জওয়াহরলাল নেহেরু, ইরাণের শাহ্‌, ইহুদী নেতা ডক্টর ভাইৎস্‌মান্‌ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাবে। নানা দেশের নানা আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য লেখক যে চেষ্টা করেছেন আর যে সাফল্যলাভ করেছেন, তা বিশেষ প্রশংসার বিষয়। জাপানের উপর যে আটটি পরিচ্ছেদ আছে, বইয়ের মধ্যে সেগুলিই সব চেয়ে উত্‌রেছে। কিন্তু এ দেশের বাইরে অনেকে আবার বলেন যে ভারতবর্ষ আর গান্ধী, নেহেরু প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিচ্ছেদগুলিও খুব ভাল।

লেখক বলেছেন যে প্রত্যেক নাম, তারিখ, ঘটনার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি বার বার তাঁর লেখা নিজে শুধ্‌রে নিয়েছেন, আর এক এক যায়গা বিশেষজ্ঞদের দেখিয়েছেন। অবশ্য নানা দেশ সম্বন্ধে এত বড় বই নির্ভুল প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। তাই অনেকগুলো তাজ্জব খবর এতে রয়ে গেছে ; তার একটা ছোটখাটো ফিরিস্তি দেওয়া গেল।

(১) ১৯৩৩ সালে পুণা প্যাক্টের সময় গান্ধিজী যখন অনশন ভঙ্গ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন বন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর এক কুষ্ঠরোগী। (পৃঃ ৪৪০)

(২) কোন ভারতীয় বড় চাকরী পেলে তার আত্মীয় স্বজন চাকরীর আশায় তাকে উত্যক্ত করে। শোনা যায় যে লর্ড সিংহ বিহারের লাটগিরি ছাড়েন আত্মীয়দের চাকরী চাওয়ার চাপে। (পৃঃ ৪৪২)

(৩) অধিকাংশ ভারতীয়ের তুলনায় জওয়াহরলাল খুব লম্বা। দৈর্ঘ্যে তিনি হচ্ছেন পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। (পৃঃ ৪৫৯)

(৪) রাজনৈতিক কারণে সুভাষ বসু যত নির্যাতন সহ্য করেছেন,

ভারতবর্ষে বোধ হয়, জওয়াহরলাল নেহেরু ছাড়া আর কেউ তত সহ্য করে ন। বসু হচ্ছেন নেহেরুর বিশেষ অনুরাগী শিষ্য। (পৃঃ ৪৭৫)

(৫) কংগ্রেসের বামপন্থীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। (পৃঃ ৪৭৬)

এশিয়ার সর্ব্বত্র যে গণ আন্দোলন নানারূপে দেখা দিয়েছে, লেখকের তার প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতি আছে। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে গোটাকয়েক কড়া কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু তীরবেগে কলম চালাতে গিয়ে মাঝে মাঝে খুব দামী কথাও বলেছেন। "The poverty of Asia is unspeakably greater than any poverty known in the western world. A cause of this is the shockingly high birth-rate." (পৃঃ ৬২৫)। বিষয়টির অবতারণা শেষ ঐ আড়াই লাইনে।

বইয়ের জ্যাকেটে এশিয়ার যে একটা ম্যাপ আছে, সেটা দেখ্‌লে বার কয়েক চোখ রগ্‌ড়াতে হবে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

The Collected Poems of Hart Crane (Boriswood)

The Still Centre—by Stephen Spender (Faber & Faber)

১৯৩২ এর ২৭শে এপ্রিল হাভানা থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে হার্টক্রেন একটি জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। রোমান্টিক আত্মহত্যা বোধহয় আমেরিকায় তাঁর প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ। অনেক বিখ্যাত সমালোচক তাঁর কাব্যশক্তির উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং করেন, কিন্তু সে শক্তির নিদর্শন এ কাব্যসংগ্রহে অনুপস্থিত। ভূমিকায় ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক "The Bridge" শীর্ষক কবিতাটিকে এলিয়টের Waste Land-এর সমকক্ষ বলে ঘোষণা করেছেন। সেতুর রূপকের সাহায্যে হার্ট ক্রেন নাকি একটি অতিকথা নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু এই অনাবশ্যক দীর্ঘ (৫৪ পৃষ্ঠা) কবিতার পাতায়

পাতায় অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও চিত্রের ভারে সে প্রয়াস বারবার চাপা পড়েছে, ছত্রে ছত্রে সংযমের চেয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাই পাঠকের চোখে বেশী পড়ে। অসংযমের জন্য সম্ভবত দায়ী ১৯২০-২৮-এর আমেরিকান স্বচ্ছলতা এবং কবির অতিরিক্ত পানদোষ।

অন্যান্য অনেক কবিতার মধ্যে For the Marriage of Faustus and Helen সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য; হার্টক্রেনের বৈশিষ্ট্য এতে প্রত্যক্ষ।

> Carped arbiter of beauty in this street
> That narrows darkly into motor dawn—
> You, here beside me, delicate ambassador
> Of intricate slain numbers that arise
> In whispers, naked of steel ;
>   religious gunman !
> Who faithfully, yourself, will fall too soon,
> And in other ways than as the wind settles
> On the sixteen thrifty bridges of the city ;
> Let us unbind our throats of fear and pity.

'দি ষ্টিল সেণ্টার' স্পেণ্ডরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। স্পেণ্ডর তাঁর কবিতাগুলিকে চার অংশে ভাগ করেছেন ; প্রথম অংশের গুলি মোটামুটি বর্ণনামূলক, কয়েকটির শেষে ভবিষ্যদ্‌বিলাসী উচ্ছ্বাস আছে। ইতিহাসের কুটিল গতি, চারিদিকে কর্কশ পাহাড় ইত্যাদি ; কিন্তু পরে কবি আশা করেন যে সূর্য্যোদয় গোছের কিছু একটা আসবে, যন্ত্রণার শেষ হবে। দ্বিতীয় অংশের কবিতাগুলি আমার অনেক ভালো লাগল, এর কয়েকটির ভাষায় ইয়েট্‌সের প্রভাব প্রত্যক্ষ, যেমন ;

> In the sunset above these towns
> Often I watch you lean upon the clouds
> Momently drawn back like a curtain
> Revealing a serene, waiting eye
> Above a tragic, ignorant age.

স্পেনসংক্রান্ত কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য, কারণ এরা স্পেণ্ডরের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর কবিতা পড়লে এ ধারণা হয় যে কোন শান্তিবাদী আচম্‌কা খেয়ালে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়েছেন, সেখানে তাঁর প্রতিক্রিয়াটা স্যালভেশন আর্মি সুলভ। স্পেণ্ডর আসলে লিবেরল ক্রীশ্চান ঃ

> My love and pity shall not cease
> For a lifetime at least.

এ সব কবিতায় তিনি বীররসের বক্তা স্বেচ্ছায় হননি, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বীররসের স্থান নেই; তাঁর মতে ভবিষ্যতে কোনো কবি হয়ত সহজভাবে বর্ত্তমানের heroics সম্বন্ধে লিখতে পারবেন, এখন লিখলে সেটা "utilitarian heroics" হবে। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য মালরোর 'ডেস্ অব্ হোপ্' কিম্বা অডেনের 'স্পেন' কি শুধু utilitarian heroics ?

স্পেন গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর স্পেণ্ডরের উৎসাহ পড়ে এসেছে, কারণ তিনি বরাবর বিপ্লবীর চেয়ে বিলাসী বেশী ছিলেন; ব্যক্তিগত সমাধানের সন্ধানে তিনি এখন ব্যস্ত; তাঁর মধ্যে যে একটা কিছু জন্মগত দুর্বলতা আছে সেটার আবিষ্কার যদি তিনি করে থাকেন তাহলে তাঁর আত্মজ্ঞান আশা করি ভবিষ্যতে পাঠক ও লেখক উভয়ের পক্ষেই শুভ হবে। আপাতত তাঁকে আমরা তাঁর প্রেমস্বর্গে অবিচলিত অবস্থায় রেখে বিদায় গ্রহণ করতে পারি :

> Shuttered by dark at the still centre
> Of the word's circular terror,
> O tender birth of life and mirror
> Of lips, where love at last finds peace
> Released from the will's error.

সমর সেন

আঁকা-বাঁকা (উপন্যাস)—প্রবোধকুমার সান্যাল। (ডি, এম, লাইব্রেরী)।

'ইংরেজিতে এম-এ পাস করা আধুনিক ছেলে' কঙ্করকুমার পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু মীনাক্ষীকে লিখল : 'হে মীনাক্ষী দেবী, আমি তোমার শ্রীচরণে

আবেদন জানাই, তুমি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হও। পতিতাগণের দুঃখ ঘোচাও এবং আধুনিক মেয়েদের গর্ব্ব খর্ব্ব করো। তুমি এসে দুই নৌকায় পা দিয়ে দাঁড়াও এবং আমি স্খলিত-আদর্শ তরুণ, আমি তোমার পূর্ণিমা ও অমাবস্থার রূপ দেখে গদ্য কবিতা রচনা করি।' তার উত্তরে ছাব্বিশ বছরের মীনাক্ষী (তার চেয়ে এক বছরের ছোট) স্নেহের কাঁকরকে জানাল: 'তুমি একজন উদ্‌ভ্রান্ত তরুণ, এবং আমি কূলনাশিনী তরুণী। মানে, আমি এতই খরস্রোতা যে, অবিশ্রান্ত কূলক্ষয় ক'রে না চললে আমার প্রাণের সত্য পরিচয় দেওয়া যায় না। বিপ্লবের সঙ্গে যেমন ধ্বংস জড়ানো, তেমনি তোমার সঙ্গে আমি। কিছু একটা গড়ে তোলবার মতন প্রতিভা নেই কিন্তু ভাঙাভাঙি করবার কেমন একটা উল্লাসকর প্রবৃত্তি বেশ উৎসাহিত ক'রে তুলছে। * * তোমাকে ব'লে রাখি আমি বরং রঙ্গমঞ্চের উপর ওরিয়েণ্টাল কায়দায় নাচ দেখিয়ে জনসাধারণের মনে রং ছড়াতে পারবো কিন্তু বিয়ে ক'রে স্বামীর সঙ্গে পতিতাবৃত্তি করতে পারব না'। নায়ক-নায়িকার চরিত্রের আভাস এই থেকেই কতকটা পাওয়া যায়। কিন্তু এতেই যাঁদের রুচি আহত হবে, তাঁরা বই শেষ করবার আগেই নিহত হবেন। কারণ তিন শ' আটাশ পৃষ্ঠার মধ্যে সবে বারো পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এসেছি। এখনও কাঁকর-মীনাক্ষী সাক্ষাৎকার বাকি, তাদের দীর্ঘ ভ্রমণ-তালিকা না-হয় বাদই দেওয়া গেল। তার ওপর পাঠক একথাও এখনো জানেন নি যে, মীনাক্ষীর যেমন ছিল রূপ, কাঁকরের তেমনি ছিল রূপো। অধ্যাপনা ছেড়ে দেওয়ার পর উপযুক্ত নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করার পক্ষে মীনাক্ষীর কোন বাধাই থাকল না। আর কাঁকর বা কঙ্কর প্রথম থেকেই ছিল সাহিত্যিক, অর্থাৎ অখণ্ড অবসরের অভাব তার কোন দিনই ছিল না। ধনী পিতার মৃত্যুর পর টাকার অভাবও তার ঘুচল। সাধারণ জীবনে এ-রকম যোগাযোগ বড় একটা ঘটে ওঠে না। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে, এটা গল্প। এই দুটি তরুণ-তরুণীকে কেন্দ্র ক'রে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, যুগের সঙ্গে সমানভাবে পা ফেলে আমাদের সমাজ এগোয়নি এবং তার ফলে মানুষের অগ্রগতির পথে সমাজ এক বিশাল অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজ মানুষ তাই কিছুতেই পূর্ণতা লাভ করতে পারছে না; তার চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিটছে না। কাঁকর-মীনাক্ষী বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে; ডায়ালেকটিক্‌-কে

মেনে না নিয়ে ওদের উপায় নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের একান্ত অভাব। তাদের নিরুদ্দেশ ভ্রমণের মধ্যে প্রথমে ছিল 'রোমান্সের মোহ' এবং পরে বাস্তবের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এই রঙীন কল্পনার মেঘ কেটে গিয়ে দাঁড়াল 'একটা প্রবল আত্মতাড়না।' লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ওরা বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি, ওরা কেবল জানিয়েছে একটা অসংলগ্ন প্রতিবাদ।' ওদের সাহস ছিল, সাধ্য ছিল না। ওদের এই দুর্ব্বলতা হয়তো সর্ব্বজনীন।

'নবীন যুবক', 'আলো আর আগুন', 'ঘুম ভাঙার রাত' প্রভৃতি উপন্যাসে লেখকের আসল বক্তব্য কতকটা অনুচ্চারিত থেকে গিয়েছিল। এই গল্পে অচল সমাজের অবিচল অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অথচ গল্পের সাবলীল গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। সম্ভব অসম্ভব নানা ঘটনাই সন্নিবিষ্ট হয়েছে; কাঁকর-মীনাক্ষীর আচরণও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শোভনতার মাত্রা অতিক্রম করেছে; নির্ঝরের স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতের মতো ভাষাও আপন বেগে ব'য়ে গেছে, লেখকের আধিপত্য মানেনি। কিন্তু সমস্ত মিলে যে বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে, তা পরম উপভোগ্য।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্তৃক আলেক্জান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীবৃন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪৬

পরিচয়

উপনিষদে জীবতত্ত্ব

মুখবন্ধ

আমরা যাহাকে বিদ্যা বলি, প্রাচীন কালে তাহার নাম ছিল 'বেদ'। বেদের যাহা চরম পরম, তাহাই বেদান্ত। বেদান্তই পরা বিদ্যা—বেদান্তেই হিন্দু চিন্তা তুঙ্গতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল। এই বেদান্তের 'প্রস্থান' বা 'পিটক'—উপনিষদ্—বেদান্তো নাম উপনিষদ্।

বৈদিক সাহিত্য চারি বিভাগে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতায় মুখ্যতঃ যজ্ঞে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহের সঙ্কলন; ব্রাহ্মণে যজ্ঞের প্রণালী ও পদ্ধতির বিবৃতি; আরণ্যকে যজ্ঞাঙ্গ সমূহের রূপক ভাবনা ও প্রতীক উপাসনা এবং উপনিষদ্ বা বেদান্তে বেদের চরম পরম উপদেশ।

প্রাচীন আর্যসমাজে মানবজীবন চারি আশ্রমে সুবিন্যস্ত ছিল—প্রথম ব্রহ্মচর্য, তারপর গার্হস্থ, পরে বানপ্রস্থ এবং সর্বশেষে সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ—জাবাল, ৪

ব্রহ্মচারী অবস্থায় আর্য বালক সংহিতায় রক্ষিত মন্ত্রসমূহের 'স্বাধ্যায়' করিতেন। স্বাধ্যায় অর্থে সু-আবৃত্তি। অধ্যয়ন সমাপনান্তে আর্য-যুবক গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংসারী হইতেন এবং পত্নীর সহিত ব্রাহ্মণোক্ত বিধানে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। গৃহস্থ কিন্তু চিরদিন সংসারে থাকিতেন না। নিজ শরীরে বলিপলিত লক্ষ্য করিলে পুত্রের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি অরণ্যে গমন করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত আরণ্যক; উহাই ছিল

বানপ্রস্থ আশ্রম। অরণ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভব হইত না—সেজন্য তিনি আরণ্যক গ্রন্থে উপদিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যজ্ঞাঙ্গ সমূহের রূপক ভাবনা ও প্রতীক উপাসনা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করিতেন। বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। ইহাই ছিল চতুর্থ আশ্রম। বানপ্রস্থী বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া 'অধিকারী' হইলে তবে ঐ চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত ভিক্ষু। তাঁহারই আলোচ্য গ্রন্থ ছিল উপনিষদ্। চতুর্থাশ্রমী ঐ উপনিষদ্ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করতঃ মুক্তি পথের পথিক হইয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতেন।

এই উপনিষদের প্রতি আমার সবিশেষ পক্ষপাত। দার্শনিক-প্রবর সোপেন্‌হাওয়ারের সহিত সুর মিলাইয়া আমিও বলিতে পারি—এই উপনিষদ্‌ই আমার জীবনের শান্তি এবং মরণের স্বস্তি। বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া আমি যথাসাধ্য উপনিষদের আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনার আংশিক ফল স্বরূপ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'উপনিষদ্—ব্রহ্মতত্ত্ব' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করি। আর্য ঋষিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল তত্ত্বরত্ন উপনিষদের খনিতে নিহিত রাখিয়া গিয়াছেন, ঐ গ্রন্থে প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে, উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত জড়তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিষয়েও নানা উপদেশ নিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আলোচনা না করিলে উপনিষদের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। তজ্জন্য উপনিষদ্-উক্ত জড় ও জীবতত্ত্ব বিবৃত করিয়া গ্রন্থান্তর রচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। সে আজ ২৮ বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে জড়তত্ত্ব বিবৃত করিয়া 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি এবং 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ উপলক্ষ্য করিয়া 'পরিচয়ে'র প্রথম বর্ষে জীবতত্ত্বের আংশিক আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ ছিল। এক্ষণে উপনিষদের জড়তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত আছি। আশা করিতেছি ৫।৬ মাসের মধ্যে ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে পারিব। তৎপূর্বে মদ্-রচিত জীবতত্ত্বের কয়েকটি অধ্যায় 'পরিচয়ে'র পাঠকবর্গকে উপহার দিতে চাই। আশা করি যাঁহারা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু, এ সম্পর্কে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা অংশতঃ তৃপ্ত হইবে।

(১)

মৃত্যু ও উৎক্রান্তি

জীব যখন দেহী, অর্থাৎ কোন না কোন শরীরের সহিত সংযুক্ত—তখন তাহার পক্ষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। শরীর অর্থে যাহা শীর্ণ হয়, জীর্ণ হয়। শরীর জীর্ণ হইলে, জীব জীর্ণ বাসের ন্যায় জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—গীতা

ইহাই মৃত্যু। গীতা আরও বলিয়াছেন—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ; ভাগবতেরও ঐ কথা—মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ। তবেই "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে ?" অর্থাৎ, "যাবৎ জননং তাবৎ মরণং" (শঙ্কর)।

স্বীকার করি, কোনও কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা (উহার পারিভাষিক নাম 'কল্প') বা শরীরের মধ্যে যোগাগ্নি প্রজ্বলন দ্বারা মানুষ সুদীর্ঘজীবী হইতে পারে। এ সম্পর্কে গীতার প্রসিদ্ধ মরাটি ভাষ্যে যোগী ধ্যানেশ্বর যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম এবং পাদটীকায় তাহার ইংরেজি অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

যোগসিদ্ধ পুরুষের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া সুষুম্নার দ্বারে সহস্রার স্পর্শ করিলে সহস্রদল হইতে একরূপ অমৃতক্ষরণ হয়। সেই অমৃত ধারা সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া প্রাণকে আপ্লুত করে। তখন সেই ধারার দ্যুতি যেন ঘনীভূত হইয়া শরীরের এক নবীন ত্বক্ রচনা করে। তখন যোগীর দেহচর্ম ধান্যতুষের ন্যায় খসিয়া পড়ে এবং দেহে অপূর্ব লাবণ্যের বিকাশ হয়—দেহ যেন রত্নখচিত বলিয়া মনে হয়। মৃত্যু তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে, জরা কোথায় অন্তর্হিত হয়; এমন কি যৌবনও পুনঃ মুকুলিত হইয়া শৈশবের দিকে ফিরিয়া যায়। যেমন বসন্তাগমে তরুবর নব পুষ্পকিশলয়ে ভূষিত হয়, ঐরূপ দেহও নবীন নখদন্তে শোভিত হয়, যেন হীরকশ্রেণী দীপ্তি পাইতে থাকে, এবং যোগীর পদতল করতল রক্তপদ্মের সমতুল্য হয়; এবং চক্ষুতে অপূর্ব জ্যোতিঃ খেলিতে থাকে; যোগীর শরীর বায়ুতুল্য লঘু হয় এবং আপ্রনখ সুবর্ণময় বোধ হয়।*

---

* When this path is beheld, then thirst and hunger are forgotten, night and day are undistinguished in this road.

Then with a discharge from above, the reservoir of moon-fluid of immortality (contained in the brain), leaning over on one side, communicates into the mouth of the *Power*.

যোগাগ্নি-প্রজ্বলন সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের উক্তি এইরূপ—

পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে,
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ,
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥—শ্বেত, ২।১২

অর্থাৎ, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক শরীরে যোগ-গুণ (দিব্য, গন্ধ-সংবিৎ প্রভৃতি) প্রবৃত্ত হইলে—যে যোগী যোগাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারেন, তাঁহার রোগ জরা মৃত্যু বারিত হয়!

শ্বেতাশ্বতর বলিলেন ঐরূপ যোগীর শরীরের 'ন মৃত্যুঃ'—বলা বাহুল্য, ইহা আপেক্ষিক মৃত্যুঞ্জয়তা মাত্র। কারণ, উহা যখন শরীর, তখন একদিন না একদিন সে শরীরের বিনাশ হইবেই হইবে।

এই মৃত্যু সম্পর্কে বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

স যত্রায়ম্ অণিমানং ন্যেতি জরয়া বা উপতপতা বা অণিমানং নিগচ্ছতি, তদ্ যথা আম্রং বা উডুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে, এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৬

Thereby the tubes (nerves) are filled with the fluid, it penetrates into all the members, and in every direction the vital breath dissolves thereinto.

As from the heated crucible all the wax flows out and then it remains thoroughly filled with the molten metal poured in :

Even so that lustre (of the immortal moon-fluid) has become actually moulded into the shape of the body. On the outside it is wrapped up in the folds of the skin.

Even so, above is this dry shell of the skin, which like the husk of grain, of itself falls off.

Afterwards such is the splendour of the limbs, that one is perplexed whether it is a self-existing shaft of cashmere porphyry, or shoots that have sprouted up from jewel seed.

Such becomes the body, what time the serpentine (or annular) Power drinks the moon-fluid (of immortality descending from the brain), then oh friend, Death dreads the shape of the body.

Then disappears old age, the knots of youth are cut to pieces, and *the lost state of childhood re-appears.*

As the golden tree at the freshly sprouting extremities of its branches puts forth jewel buds daily new, even so, *new and beautiful* nails sprout forth (from his fingers and toes).

He gets other teeth also ; but these shine beyond all measure, as rows of diamonds set on either side.

The palms of the hands and soles of the feet become like red lotus flowers ; the eyes grow inexpressively clear.

The body becomes of gold in lustre, but it has the lightness of the wind, for of water and of earth no portion is left.—Quoted in 'Dream of Ravana' pp. 189—92.

'এই শরীর যখন জরা বশতঃ শীর্ণ হয় বা ব্যাধি জন্য জীর্ণ হয়, তখন (পক্ক) আম্র বা ডুমুর বা অশ্বত্থফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি এই পুরুষ (জীব) এই সমুদয় অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হয়, এবং ভারাক্রান্ত শকট যেমন সশব্দে গমন করে, তেমনি 'শারীর আত্মা' উর্ধ্বশ্বাসী হইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করে।'

তদ্ যথা অনঃ সুসমাহিতম্ উৎসর্জৎ যায়াৎ, এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি, যত্রৈতদ্ উর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩৫

জীব দেহ ছাড়িয়া গেলে জীবাপেত শরীর স্ফীত হইয়া আধ্মাত (inflated) হইয়া সাপের খোলসের মত পড়িয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়, স উচ্ছ্বয়তি আধ্মায়তি আধ্মাতো মৃতঃ শেতে—বৃহ, ৩।২।১১

তদ্ যথা অহি-নির্ল্বয়নী (সর্প-নির্মোক) বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবমেব ইদং শরীরং শেতে—বৃহ, ৪।৪।৭

জীবের মৃত্যুদশা বর্ণনা করিয়া, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

পুরুষং সোম্য! উতোপতাপিনং* জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি, তস্য যাবন্ন বাঙ্ মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি। অথ যদাঽস্য বাঙ্ মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাংদেবতায়াম্ অথ ন জানাতি॥—ছা ৬।১৫।১-২

ছান্দোগ্যের অন্যত্রও এই কথা আছে—

অস্য সোম্য! পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্ মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণঃ তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্—ছা, ৬।৮।৬

অর্থাৎ, মৃত্যুকালে জীবের বাক্য মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজঃ পর দেবতায় সংভৃত হয়। সেই জন্য ঐ দশায় তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়।

জীবিতকালে ইন্দ্রিয়-শক্তি-সকল বহির্মুখ ছিল, এখন মৃত্যুদশায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহারা অন্তর্মুখ হয়।

স যত্রায়ম্ আত্মা অবল্যংন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেতি, অথ এনম্ ইমে প্রাণা অভিসমায়ন্তি। স এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেব অন্ববক্রামতি—বৃহ, ৪।৪।১

(এতে প্রাণাঃ=বাগাদয়ঃ; তেজোমাত্রাঃ=চক্ষুরাদীনি করণানি—শঙ্করভাষ্য)

---

* উপতাপিনং জরাদ্যুপতাপবন্তম্—শঙ্কর

'যখন জীব যেন নির্বল হইয়া সংমোহ প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়-শক্তি) আত্মাতে সংভৃত হয়। সে সেই সকল তেজোমাত্রা (চক্ষুঃ প্রভৃতি করণ) আদান করিয়া হৃদয়ে সংপিণ্ডিত করে।'

সুতরাং তখন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই স্তম্ভিত হয়।

একীভবতি ন পশ্যতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন জিঘ্রতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন রসয়তে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বদতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন শৃণোতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন মনুতে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন স্পৃশতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বিজানাতি ইত্যাহুঃ—বৃহ, ৪।৪।২

(একীভবতি করণজাতং স্বেন লিঙ্গাত্মনা * * তথা ঘ্রাণদেবতানিবৃত্তৌ ঘ্রাণম্ একীভবতি লিঙ্গাত্মনা, তদা ন জিঘ্রতি ইত্যাহুঃ। সমানম্ অন্যৎ—শঙ্করভাষ্য)

অর্থাৎ মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহ আত্মার সহিত একীভূত হওয়ায়, দর্শন শ্রবণ বচন স্পর্শন স্বাদন ঘ্রাণন মনন বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপারই স্থগিত হইয়া যায়। কৌষীতকী-উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

যত্রৈতৎ পুরুষ আর্তো মারিষ্যন্ অবল্যং ন্যেত্য মোহং ন্যেতি, তদাহুঃ উদক্রমীৎ চিত্তং। ন পশ্যতি, ন শৃণোতি, ন বাচা বদতি। তথাস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি; তদা এনং বাক্ সর্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি, মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহ অপ্যেতি + + স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহৈব এতৈঃ সবৈঃ উৎক্রামতি—কৌষীতকী, ১।৪।৩-৪

অর্থাৎ, পুরুষ যখন আর্ত ও নির্বল হইয়া ম্রিয়মাণ হয়—তখন লোকে বলে ইহার চিত্ত উৎক্রান্ত হইয়াছে—তখন সে দেখে না, শুনে না, বাক্য বলে না, চিন্তা করে না। তখন সমস্তই প্রাণে একীভূত হয়—বাক্ সমস্ত বাক্যের সহিত, চক্ষু সমস্ত রূপের সহিত, শ্রোত্র সমস্ত শব্দের সহিত, মনঃ সমস্ত ধ্যানের সহিত। সে যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন এই সমস্তের সহিতই উৎক্রান্ত হয়।

প্রশ্ন-উপনিষদ্‌ও এই মর্মে বলিতেছেন—

তস্মাৎ উপশান্ত-তেজাঃ পুনর্ভবম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ মনসি সম্পদ্যমানৈঃ। যচ্চিত্তঃ তেনৈষ প্রাণম্ আয়াতি প্রাণঃ তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথা-সঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি—প্রশ্ন, ৩।৯-১০

এই যে ইন্দ্রিয়-শক্তির আত্মার সহিত একীভাবের জন্য দর্শন শ্রবণাদি

ব্যাপার স্থগিত হওয়া—এ ঘটনা আমাদের সুপরিচিত; কারণ, প্রতি রাত্রে নিদ্রাকালে এইরূপ ঘটনা ঘটে। তখনও সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্মায় উপসংহৃত হয়।

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তঃ অভূৎ, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় + + তানি যদা গৃহ্ণাতি অথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম। তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি, গৃহীতা বাক্, গৃহীতং চক্ষুঃ, গৃহীতং শ্রোত্রং, গৃহীতং মনঃ—বৃহ, ২।১।১৭

[প্রাণানাং = বাগাদীনাম্; বিজ্ঞানম্ = বাগাদীনাং স্বস্ব-বিষয়গত-সামর্থ্যম্—শঙ্করভাষ্য]

অর্থাৎ নিদ্রার সময় বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞান দ্বারা প্রাণ-সমূহের বিজ্ঞান গ্রহণ করেন। তখন ঘ্রাণ গৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত হয়, চক্ষুঃ গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, মনঃ গৃহীত হয়। ছান্দোগ্য ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

স যদা স্বপিতি, প্রাণমেব বাক্ অপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ; প্রাণো হ্যেব এতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে—৪।৩।৩

ইহা সুপ্তির বর্ণনা। জাগ্রত হইলে কি হয়?

স যদা প্রতিবুধ্যতে অস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিতিষ্ঠন্তে—কৌষী, ৩।৩

—'তখন ইন্দ্রিয়-শক্তি-সকল স্ব স্ব আয়তনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।' বৃহদারণ্যক (২।১।২০) ও এই কথাই বলিয়াছেন—অস্মাৎ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ ব্যুচ্চরন্তি।

বৃহদারণ্যক বলেন, রাজার প্রত্যাগমনের কালে সূত, গ্রামাধ্যক্ষ প্রভৃতি যেমন তাঁহার চৌদিকে সমবেত হয়, তেমনি অন্তকালে ইন্দ্রিয়-শক্তি (প্রাণ-সমূহ) আত্মাতে সম্ভৃত হয়।

তদ্ যথা রাজানং প্রযিযাসন্তম্ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ অভিসমায়ন্তি, এবমেব ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩৮

তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত হয় এবং সেই দীপ্তিতে আত্মা শরীর হইতে চক্ষুঃদ্বারে, মূর্দ্ধাদ্বারে বা অন্যদ্বারে উৎক্রমণ করেন। ইহাকেই বলে উৎক্রান্তি।

তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি, চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীর-দেশেভ্যঃ—বৃহ, ৪।৪।২

আমরা জানি দার্শনিক দৃষ্টি দ্বিবিধ—এক জড়বাদীর দৃষ্টি যাহাকে material-

ism বলে, এবং অন্য জীব-বাদীর দৃষ্টি যাহাকে spiritualism বলে। জড়বাদী বলেন "Life and mind are merely by-products of the world process"—প্রাণ ও চিত্ত এই বিশ্বব্যাপারের অবান্তর ঘটনা মাত্র। প্রতিবাদে জীব-বাদী বলেন—সে কি কথা! "Mind is behind matter"—জড় হইতে জীব নয়, জীব হইতেই জড়।

অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩

'তিনিই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের প্রভেদ করিলেন।' আর প্রাণ?

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং, প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—কঠ, ৬।২

'এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ইহা প্রাণের প্রেরণায় নিঃসৃত হইয়াছে' এবং প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্—প্রশ্ন, ২।৬

এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই প্রাণতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, "The origin of forms is Life", which, as Elan Vital, "has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies"। অধিকন্তু ঐ প্রাণ = প্রজ্ঞাত্মা—উহা অজর, অমর, আনন্দস্বরূপ—

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ—কৌষী, ১।৮

জড়বাদী অবশ্য দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে চৈতন্য 'মদ-শক্তিবৎ'—জড় অণুপরমাণুর chemical reaction মাত্র। তাঁহার ধারণা 'Survival of Man' বাজে কথা—'the grave is but his goal' কারণ, দেহের নাশের সহিত জীবের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জড়বাদীর মতে চিন্তা যখন মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—vibrations of the brain cells—যেমন যকৃৎ পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমনি মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়—এবং যখন দেহের নাশেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়, তখন ঐ মতে মৃত্যুর পর উৎক্রান্তির কথাই উঠিতে পারে না।

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চান্যে—কঠ, ১।২০

—'জীব মৃত হইলে মানুষের মধ্যে সংশয় উপস্থিত হয়, কেহ বলে থাকে, কেহ বলে থাকে না'—জড়বাদী এ সন্দেহের অতি সহজে সমাধান করেন। তিনি বলেন থাকে না, থাকে না, থাকে না,—নাস্তি নাস্তি নাস্তি। উপনিষদের ঋষিরা কিন্তু, নিপট জীব-বাদী। তাঁহারা বলেন দেহই মরে, দেহী (জীব) মরে না—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—'all of me does not die'। তাঁহারা প্রখ্যাত দার্শনিক সোপেনহাওয়রের পূর্বধ্বনি করিয়া বলেন 'the supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us'—'অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখানের মত বিরাট্ বিয়াকুবি দ্বিতীয় নাই'—আত্মার কি জন্ম মৃত্যু আছে ?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮

আত্মা যে, অজর অমর অক্ষর বস্তু—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—কঠ ২।১৮

দেহের নাশে জীবের বিনাশ হইবে কিরূপে ? শরীর নশ্বর, বিনাশী বটে ; কিন্তু জীব অবিনাশী অবিনশ্বর। শরীরের নাশে শরীরীর নাশ হয় না—

মর্ত্যং বা ইদং শরীরম্ আত্তং মৃত্যুনা। তদস্য অশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্।—ছা, ৮।১২।১

'এই শরীর মর্ত্য, মৃত্যুগ্রস্ত ; ইহা অশরীর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান।'

সেই জন্যই জীব-বাদী উপনিষদের ঋষি জীবের উৎক্রান্তির কথা তুলিলেন—'এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি'—এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—উৎক্রান্ত জীবের সঙ্গে কি গমন করে ?

তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনু-উৎক্রামতি, প্রাণম্ উৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণাঃ* অনু-উৎক্রামন্তি * * তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ—বৃহ, ৪।৪।২

'উৎক্রান্ত জীবের অনুগমন করে তাহার প্রাণশক্তি এবং ঐ শক্তি যে ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশিত ছিল, সেই সকল ইন্দ্রিয়। আর অনুগমন করে তাহার অর্জিত বিদ্যা ও কর্ম এবং পূর্বপ্রজ্ঞা।'

পূর্বপ্রজ্ঞা অর্থে ইহ জন্মে সঞ্চিত সংস্কার বা 'বাসনা' (traces, vesti-

* সর্বে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ পরিবারস্থানীয়া অনূৎক্রামন্তি—নিত্যানন্দ

gates) ।* (পূর্বপ্রজ্ঞা=অতীত কর্মফলানুভববাসনা—শঙ্কর)। সংস্কার ছাড়া আর কি সঙ্গে যায়? বিদ্যা-কর্মণী। বিদ্যা অর্থে ইহ জন্মে উপার্জিত জ্ঞান এবং কর্ম-অর্থে ইহ জন্মে অনুষ্ঠিত ব্যাপার। বলা বাহুল্য ঐ কর্ম কেবল চেষ্টনা (Action) মাত্র নহে—ভাবনা (Thoughts), কামনা (Desires) ও চেষ্টনা (Actions)—সমস্তই। আমরা জানি—চিত্তে প্রথমতঃ কামনার উদয় হয়, তাহারই অনুরূপ ভাবনা এবং ভাবনার অনুযায়ী চেষ্টনা হয়।

অথো খলু আহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে, যৎ কর্ম কুরুতে তদ্ অভিসংপদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

—'পুরুষকে 'কামময়' বলে। সে যেমন কামনাযুক্ত হয়, সেই মত তাহার ভাবনা (ক্রতু) হয়। সে যেমন ভাবনাযুক্ত হয়, সেই মত কর্ম করে। সে যেমন কর্ম করে, তাহার অনুরূপ ফল পায়।'†

উৎক্রান্তিতে জীবের সঙ্গে কি যায়? এ প্রসঙ্গে গীতার উক্তি অভিজ্ঞ পাঠকের স্মরণ হইবে।

শরীরং যদ্ অবাপ্নোতি যৎচাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধান্ ইবাশয়াৎ ॥—গীতা, ১৫।৮

'বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ জীব ইন্দ্রিয় সমূহ (ও তাহাদের সংস্কার) সঙ্গে লইয়া উৎক্রান্ত হয়।'

নাস্তিত্ববাদীর জড়বাদ যদি প্রত্যাখান করা যায়, তবে জীব-বাদীর কাছে প্রশ্ন উঠে—'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি'—মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলাম—কিন্তু তাহার কি গতি হয়? উপনিষদ্ এই প্রশ্নই তুলিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি উপনিষদের মতে জীব ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ—সেই রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু। দেহ নাশে ঐ বিন্দু কি সিন্ধুতে মিশাইয়া যায়?—জলবিম্ব যথা জলে—'the dew drop slips into the shoreless sea'? ঘটের নাশে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন

---

* ইহাকে বুদ্ধদেব 'সঙ্খার' বলিতেন—'অনেকজাতি-সঙ্খারং' (জন্মে জন্মে সঞ্চিত সংস্কার)। ঐ অশেষ সংস্কারের আধার বলিয়াই জীবের চিত্ত Tabula Rasa নহে; উহা অসংখ্যেয় বাসনাভিঃ চিত্রম্ (যোগসূত্র, ৪।২৩)—যেহেতু উহা 'অশেষ সংস্কারাধারত্বাৎ' (সাংখ্য-সূত্র, ২।৪২)

† So Emerson regards an action as threefold—the desire which prompts, the thought which decides the mode of activity, and the act.

হয়, তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, দেহের নাশে কি জীব-চৈতন্য সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে একাকার হইয়া যায়? যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে। বৌদ্ধেরা ইহাকেই নির্বাণ বলেন—ইহাই বেদান্তের বিদেহ-মুক্তি। আমরা যথাস্থানে দেখিব ঐ নির্বাণ মুক্তি অতি উচ্চ অধিকারীর প্রভূত সাধনার চরম ফল—উহা সাধারণ জীবের পক্ষে সুদূর-পরাহত। তাহাই যদি হয় তবে দেহের নাশে সাধারণ জীবের কি গতি হয়? ইহার উত্তর দ্বিবিধ। প্রথম উত্তর অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক-লাভ—দ্বিতীয় উত্তর জন্মান্তর-প্রাপ্তি।*

জন্মান্তরের আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। এক্ষণে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম উত্তর প্রচলিত ইসলাম্ ও খৃষ্ট মতাবলম্বীর উত্তর—যাঁহারা মানুষের ইহলোকে কৃত কর্মের ফল স্বরূপ অনন্ত স্বর্গ-নরকে (eternal retribution in heaven or hell-এ) বিশ্বাসবান্। কিন্তু এ বিশ্বাস কি বিচার-সহ? মানুষের আয়ুঃ শত বর্ষের অধিক নয়—শতায়ুর্বৈঃ পুরুষঃ—বাইবেলের মতে আরও কম—Three score years and ten—মাত্র সপ্ততি বর্ষ। এই স্বল্প কয়েক বৎসরে মানুষ কি এমন সুবৃহৎ পুণ্য-পাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে, যাহার ফলে তাহার অন্তহীন স্বর্গ-নরকের ব্যবস্থা হইবে? কার্য ও কারণের ত অন্ততঃ কতকটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। এত ছোট কারণে এত বড় কার্যের উৎপত্তি হইবে কিরূপে? সেই জন্য অধুনা অনেক খৃষ্টান, seeing 'the unparalleled disproportion in which cause and effect here stand to one another'—কার্য-কারণের ঐ বিরাট্ অসামঞ্জস্য দেখিয়া eternal reward or punishment (অনন্ত পুরস্কার বা তিরস্কার)-রূপ অযৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন ন্যায়পর বিধাতা, তখন তিনি লঘু পাপে এত গুরুদণ্ড, অল্প পুণ্যে এত বিপুল ঋদ্ধির বিধান করিবেন কেন? সেই জন্য উপনিষদের ঋষিরা

---

* If the fact of death not being our end is established for a man, then the second question for him is: of what kind is his continued existence after death? Here two chief doctrines are opposed to each other,—first, the immortality of the individual in an *eternal* heaven or in an *eternal* hell and secondly, the doctrine of palingenesis (জন্মান্তর).—George Grimm's The Doctrine of the Buddha.

জীবের পরলোক-গতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ-নরক স্বীকার করেন না। তাঁহাদের কথা এই—যথা-কর্ম যথা-শ্রুতং—কর্মানুসারে ফলের তারতম্য—As you sow so shall you verily reap—যেমন কর্ষণ তেমনি ফলন—আর ঐ ফলন কোন মতেই অন্তহীন হয়। তবে জীবের পরলোক-গতির প্রকার ও প্রণালী কিরূপ? আগামী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শিখ সম্রাট ও সতীর শাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সিংহজী নূতন বধূকে সোনার চোখে দেখিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার হস্তে, অন্দরে নিজের সেবার প্রায় সম্পূর্ণ ভার দিলেন। তাহার হাতের দু'একটি তরকারি না হইলে তাঁহার ভাল খাওয়া হইত না। সে বসিয়া গল্প না করিলে, তাঁহার ঘুম আসিত না। বৈকালের পোষাক বাহিরে আর পরিতেন না; কমলা চুল আঁচড়াইয়া "জুণ্ডা" বাঁধিয়া নিপুণ হস্তে শ্বশুরকে অন্দরেই সাজাইয়া দিত। ক্রমে, সে লিখিতে পড়িতে জানে জানিতে পারিয়া, তাহাকে দিয়া অনেক জরুরি হুকুম লিখাইতেন, কোন কোন মিসল পড়াইয়া শুনিতেন। দু একবার কৌতুকছলে, বড় পেঁচালো ও কূট বিষয়ে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে এমন ভাল মত দিল যে সিংহজী 'ধন্যগুরু' বলিয়া উঠিলেন। তখন হইতে তাহার মহলে প্রায়ই আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "বহুজী, আপনার হুকুম নিতে এসেছি। তোমারি বুড়া খোকার উপর বেজার হও না, তো।" আমাকে সিংহজী যখন বলিতেন, "চলো, ব্রহ্মদেও, গুরুপরসাদ নিয়ে আসি," আমি ইহার অর্থ বুঝিতাম "চলো, ছোট কুঁয়রাণীজীর কাছে যাই।"

ইচ্ছা করিলে কমলা বাপকে লক্ষপতি ও প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার করাইতে পারিত ও ভাইদের অতি উচ্চপদ দেওয়াইতে পারিত। কিন্তু সে কখনও এ প্রকার কোন আরজ করিত না। স্বার্থ কাহাকে বলে জানিত না। সিংহজী এমন কখনও দেখেন নাই, কখনও শুনেন নাই। কমলাকে তিনি উত্তরোত্তর আরও স্নেহ এবং শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। তাহাকে প্রায়ই পোযাক ও জহরত উপহার দিতেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া জীন্দাঁ ও বড় কুঁয়ারাণী জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেন। কুঁয়রকে সিংহজী বলিতেন, "ওরে তুই বড় ভাগ্যবান!" সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইত। আমাকে দিনের মধ্যে যে কতবার সে বলিত, "তায়া জী, মেরে বড়ে কর্ম্মাঁ দে ভাগসী, গুরুমহারাজ দে কিরপা নাল

এ দেবী ময়নু মিলি"—'জেঠামহাশয়, আমার বড়ই পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি যে গুরুমহারাজের কৃপায় এ দেবী আমি পেয়েছি।'

দীনানগরে কিছুদিন পরম সুখে থাকিয়া, কমলার সৌভাগ্য স্বচক্ষে দেখিয়া, দলসিংহ গ্রামে ফিরিয়া গেল। সিংহজী তাহাকে, তাঁহার বৈবাহিক হইবার মর্য্যাদামতো ধূমধামের সহিত, বাড়ি যাইতে কহিলেন। সে কিন্তু শুনিল না। খেলাৎ ও সিরোপা ছাড়া কোন উপহার লইল না। বলিল, "শ্রীগুরু আমাকে সকল ধনের উপর যে ধন—মনের সন্তোষ দান করিয়াছেন। আমি হঠাৎ বড় মানুষ হইতে চাহি না। তাহার স্বগ্রামের চতুর্দ্দিকে দশ পনেরো খানা গ্রামে, পূর্ব্বেই তাহাকে সকলে সম্মান করিত ও ভালবাসিত। এখন তাহার দেশময় সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। মধ্যে মধ্যে সিংহজী, বেহাই ও বেহানকে আনাইতেন। কেবল যে কমলাকে খুসি করিবার জন্য, তাহাদের "এ অধমের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন" বলিয়া, পালকি, রথ পাঠাইয়া সাদরে ডাকাইতেন, তাহা নহে। সিংহজী এ ধর্ম্মভীরু, নিস্পৃহ বৃদ্ধবৃদ্ধার সহিত, কাজ কর্ম্মের পর, দুদণ্ড আলাপ করিয়া বড় আরাম বোধ করিতেন।

ধরিতে গেলে মানুষের, বিশেষ স্ত্রীলোকের, সুখ শান্তির যা কিছু উপকরণ আবশ্যক, কমলা এখন সে সমস্ত অপর্য্যাপ্ত পাইয়াছে। কুঁয়রের প্রকৃতিতে যাহা যাহা দুর্ব্বলতা ছিল, কমলার গুণে সে সমস্ত দূর হইতে চলিয়াছে। কোনো বন্ধু এক পিয়ালী দারু পান করিতে অনুরোধ করিলে সে এখন বলে, "আরে ভাই, মনের সুর একটু উঁচু করে বাঁধ্‌বার জন্যে, আর সংসারে শুকনো দৃষ্টিটা একটু রসীলা (রস-যুক্ত) করবার জন্যে তো আগে 'তীরথ পরসাদ' নিতুম ? এখন গুরুমহারাজ অন্তরেই এমন অমৃতের ফোয়ারা খুলে দিয়েছেন যে আমি যা কিছু দেখি, বা শুনি বা করি সবই সুধাময়, মহান্।" কমলা স্বামীকে এমনভাবে চালাইত যে সে যে চালিত হইতেছে তাহা বুঝিতেই পারিত না। সে এখন মন দিয়া রাজকার্য্যে পিতার সাহায্য করে। নিয়মিতরূপে, কমলার সানুনয় প্রেরণায়, সে মহারাণী জীন্দাঁকে রোজ প্রণাম করিতে যায় ও বড় কুঁয়রাণীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করে। কমলা প্রাতে ও সন্ধ্যায় আরাধনার শেষে একটি প্রার্থনা করিতে কখনো ভুলিত না। তাহা এই : "হে সৎগুরু! ম্যয় কদি কিসে দে ধরম দা দেয়ন্ তোঁ না চুকাঁ।" 'হে ভগবান্! আমি যেন কখনও

যাহার প্রতি যা ধর্ম্মের দেয় : তাহা দিতে না চুক করি।' একদিন কুঁয়র আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবন্তিজী, তুসী এ কী মহারাজ দে চরনাঁ বিচ্ অরজ করদে ও ময়নু দস্সো ?" "তুমি এ কি প্রার্থনা করো আমাকে বুঝাও।" কমলা হাসিয়া করজোড়ে কহিল, "এর মানে আমি বলি ? গোস্তাখি মাপ করবে ? যেমন, কুঁয়রাণীজীর কাছে যেতে তোমার ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি তোমার বড় স্ত্রী। তাঁর প্রতি তোমার যা কর্ত্তব্য তা তিক্ত হলেও পালন করা, প্রসন্ন চিত্তে পালন করা, তোমার ধর্ম্ম। আমি তোমার হয়ে জগদীশ্বরের চরণে দুবেলা প্রার্থনা করি যে, এ ধর্ম্ম হতে আমি যেন কখনো পরাঙ্মুখ না হই।" আমি উপস্থিত ছিলাম। কমলার উচ্চ মন ও নিঃস্বার্থতা এবং স্বামীকে ধর্ম্মপথে সোজা রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলাম। কমলা স্বামীকে হুকুম করিল, "তায়াজীর মুখ বন্ধ করো!" তৎক্ষণাৎ কমলার হাতের তৈয়ার করা অমৃতসমান কড়াই প্রসাদ এক থাবা আমার মুখে কুঁয়র পুরিয়া দিল।

বড় কুঁয়রাণী, কমলার রাজমহলে আবির্ভাব হওয়া অবধি, কুঁয়রের সহিত দু একটি মতলবের কথা ছাড়া, অন্য কথা কহা বন্ধ করিয়াছিলেন। জীন্দাঁর প্রসাদে, অন্দরে বাহিরে তাঁহার ইদানীং অখণ্ড প্রতাপ। তাঁহার খাজানার ধন সমাগমও পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক অধিক হইতেছে। তিনি জীন্দাঁর নিকট সর্ব্বক্ষণ পরম সুখে কাটান। দীর্ঘ নিশ্বাস ও চক্ষের জল, কুঁয়রের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন। কুঁয়রের প্রতি আদব কায়দায় কিন্তু তাঁহার কখনও কোনো প্রকার ত্রুটি লক্ষিত হয় না। দু একবাই, কুঁয়র যাহাতে শুনিতে পায় এমন-ভাবে, পাশের কামরায়, নিজের খাস বাঁদীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, "কি করিব ? আমরা ভদ্রঘরের মেয়ে, পুরুষদের ভুলাবার হাবভাব, ন্যাকরা ট্যাকরা আমরা জানি না।" ইহার ইঙ্গিত কুঁয়রকে কি প্রকার দগ্ধ করিয়াছিল বুঝিতেই পারো। বেচারা শুনিবামাত্র, পাছে তাহার মুখ হইতে কোন দুর্ব্বাক্য বাহির হইয়া যায়, এই ভয়ে চুপচাপ উঠিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিয়াছিল। আমি কত বুঝাইলাম। আমি যখন বলিলাম, স্ত্রীলোক আবার মানুষ, ওদের কথা গ্রাহ্য করলে জাত্ থাকে না।" তখন আমার মুখপানে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কমলার কাছে আমার এই উক্তিটি লাগাইতে ছাড়িল না। সে কিন্তু আমারই দিক লইল ; কহিল, "সত্যই তো। কলিযুগে হিন্দুর ঘরের

মেয়ে আবার মানুষ! সে হয় খেলনামাত্র, নয় ঘর সাজাবার জীবন্ত সরঞ্জাম, নয় কেনা বাঁদী।" কমলা আমার কথায় সম্পূর্ণ সায় দেওয়াতে, হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কুঁয়রের দিকে আমি সগর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখি সে হাতজোড় করিয়া কমলাকে যেন অমন কথা মুখে না আনিতে কাতরে প্রার্থনা জানাইতেছে; আর তাহার চক্ষে জল! কমলার অমনি মুখের হাসি নিবিয়া চক্ষে জল আসিল। সে একেবারে বসিয়া পড়িয়া, স্বামীর হাঁটু ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে ক্ষমা করো; তোমার মতো সত্যিকার পুরুষের সামনে একথা বলা আমার অন্যায় হয়েছে।" কুঁয়র উত্তর দিল, "ঠিক বলেছ, দেবী।" কমলা, "না, না—তোমার সামনে আমার মনেও এমন কথা আনতে নাই।" আমি এই অদ্ভুত দম্পতীর এ রাস-ধারীর* পালা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

মহারাণী জীন্দাঁ যখন তখন কুঁয়রকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দাও, কী করে ঐ নূতন "আমদানিটি"-কে (অর্থাৎ কমলা) খুসি করিতে পারি। ঐ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আগে তো মিশিনি।" কুঁয়র উত্তর দিতেন, "সরকার, সত্য কথা; হজুর ঐ জাতীয় মানুষের সঙ্গে কখনো মেশেন নাই। তা, কমলা আর কিছু চায় না, হজুরের একটু কৃপা পেলেই ও নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে।"

সিংহজীর মুখে জীন্দাঁর নিকট, নূতন বধূর সুখ্যাতি আর ধরিত না। জীন্দাঁর কুহকজাল, ভোলা মহেশ সিংহজী, ভেদ করিতে অসমর্থ। তাঁহার বিশ্বাস, যাহাতে তাঁহার আনন্দ, তাহাতেই জীন্দাঁর। প্রত্যহ জীন্দাঁর নিকট কমলার গুণগান করিতেন। জীন্দাঁ 'সত্ বচন্' 'সত্ বচন্'† মাত্র বলিত। জীন্দাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে কমলার বিনাশ সাধন না করিলে আর নিস্তার নাই।

বাহির হইতে দেখিলে কমলার সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু জীন্দাঁ ও বড় কুঁয়রাণী, এই দুই কুটিল ও কঠোর প্রকৃতি নারীর ষড়যন্ত্রে, অন্দরে তাহাকে নানাপ্রকার ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছিল। অবশ্য তাহার স্বতন্ত্র মহল

---

* যাত্রা।

† সত্ বচন্=যো হুকুম, আজ্ঞা হাঁ। পঞ্জাবে রাজা বা অন্য বড় লোকের মুখ হইতে কিছু বাহির হইবামাত্র, মোসাহেব এবং অন্যান্য অনুচরবর্গ সমস্বরে 'সৎ বচন মহারাজ' 'সৎ বচন মহারাজ' বলিতে থাকে।

ও নিজ দাসদাসী, আমলা, কর্ম্মচারী, সেপাই সান্ত্রী সবই ছিল। খোদ সিংহজী তাহার শুভানুধ্যায়ী, স্নেহাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু জীন্দাঁ অন্দর মহলের বিধাত্রী। তাঁহার ন্যায় চতুরা ও দয়ামায়ালেশহীন রমণী বোধ হয় আর জন্মায় নাই। তিনি সিংহজীর মত অসাধারণ বিজ্ঞ, বহুজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সমস্ত জীবন ফাঁকি দিতে পারিয়াছিলেন, এমন গভীর তাঁহার শঠতা। বলা বাহুল্য যে জীন্দাঁর প্রতি অপার অনুরাগ থাকায়, সিংহজীর দৃষ্টিশক্তি তাঁহার এই প্রিয়তমা মহিষীর দিকে কার্য্য করিতে পারিত না। সিংহজীর স্থির বিশ্বাস যে জীন্দাঁর মত উদার হৃদয়া এবং দয়াবতী স্ত্রী সংসারে বিরল। আর আগেই বলিয়াছি, আমরা সবাই সিংহজীকে এতো ভালবাসিতাম, যে তাঁহাকে জীন্দাঁর নৃশংসতার, রক্তলোলুপতার ও অন্যান্য পৈশাচিক প্রবৃত্তির কথা কিছু জানিতে দিতাম না। বরং ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দোষ ঢাকিতাম।

সিংহজীর আজ্ঞায়, জীন্দাঁর অনুমতি ছাড়া অন্দরে, মহারাণীদের, বধূরাণীদের, অন্য কুটুম্বিনীদের বা আশ্রিতাদের পৃথক পৃথক মহলে, কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, বা ফটকের বাহির হইতে পারে না। অন্দরে ১১টি দেউড়ি অর্থাৎ পৃথক বাড়ী, প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যদিও, আলাদা আলাদা প্রাসাদের অংশের কর্ত্রীঠাকুরাণীদের, নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা নিয়ম ছিল, তবুও জীন্দাঁর চক্ষু বা হস্ত কিছুই এড়াইতে পারিত না। তাঁহার ভয়ে সকলে থরহরিকম্প। সামান্য কিছু কিনিতে হইলে বা তত্ত্ব পাঠাইতে হইলে, বা কোন কর্ম্মচারীকে ছুটি দিতে হইলে বা বরখাস্ত করিতে হইলে, তাঁহার মঞ্জুরী লইতে হইত। তাঁহাকে নিয়মিত ভেট না দিলে কেহ চাকরী পাইত না। যথেষ্ট নজর দিতে পারিলে সাত খুন মাফ্। জীন্দাঁ কাহারো সহিত মিশিতেন না, এক বড় কুঁয়রাণী ও নিজের পালিতা কন্যা ছাড়া। বেশি কথা কহিতেন না, যা দু একটি কথা বলিতেন তাহা অতি বিনীত ও নম্রভাবে। মুখে সর্ব্বদা গুরুর নাম। ধর্ম্মের বাহ্যিক কর্ম্ম একটিও বাদ যাইত না। দেখিতে মূর্ত্তিমতী সংযম ও শীলতা! আমাকে দেখিলে স্বহস্তে পাখার বাতাস দিতে আসিতেন। তাঁহার মতো অযোগ্যার প্রতি তাঁহার পতিদেবতার কৃপাদৃষ্টি বজায় রাখিবার জন্য আন্তরিক সহায়তা করিতে বলিতেন। তাঁহার ভীষণ ডালকুত্তাদের পাশে, তাঁহার গদির

সামনে, মানুষরূপী কুকুর, তাঁহার পোষ্য জোয়াহির সিং, জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পুচ্ছ বিহনে, তা-দেওয়া গুম্ফ নাড়িত। যতবার সিংহজীর উল্লেখ হইত, জীন্দাঁ ও জোয়াহির, অন্নদাতার উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইত। যতক্ষণ উপস্থিত থাকিতাম, আমার হৃৎকম্প থামিত না।

সকল সুখসত্ত্বেও, এই দেবীরূপিণী রাক্ষসীর হস্তে কমলা দেবীকে যে কী লাঞ্ছনা, কী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত তাহা বর্ণনাতীত। এই এক কথা বার বার বলিতেছি। ইহাতেই বুঝ যে এখন পর্য্যন্ত, যখন সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, যখন পুরাকালের কোশল ও মথুরাপুরীর ন্যায়, সে ৩০।৪০ বৎসর মাত্র আগেকার লাহোর ও দীনানগর কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এখনও কমলার দুঃখ পাওয়াটা আমার প্রাণে তাজা ক্ষতের মত জ্বলিতেছে।

কমলার বাড়ীর সমস্ত আমলা ও দাসদাসী জীন্দাঁর মুখাপেক্ষী। অনেকগুলি তাহার চরবিশেষ। প্রথমটা জীন্দাঁ বিস্তর চেষ্টা করিলেন যে কমলার চরিত্রদোষের প্রমাণ কোন প্রকারে তৈয়ার করেন। কিন্তু জীন্দাঁর পক্ষেও এ কার্য্য অসাধ্য হইল। একটু মাত্র ছিদ্র, সহস্র আয়াসেও খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এ বিষয়ে আমার অধিক বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই আর ইচ্ছাও নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যখন দেখা যায় যে সামান্য গৃহস্থ বাটীতেও, বৌ-কাঁটকি শ্বাশুড়িরা, পতি পুত্রের অগোচরে শান্ত ও সহৃশীলা বধূকে অশেষ কষ্ট দিতে পারে, তখন বুঝো, বিপুল রাজ-অন্তঃপুরে, সিংহজী ও কুঁয়রের কমলার প্রতি অসীম স্নেহসত্ত্বেও, জীন্দাঁর মত কর্ত্রী, কমলাকে কতো যন্ত্রণা দিতে পারিতেন ও দিতেন। কমলার প্রথমটা এমন দিন যাইত না যে দু একবার বুক ফাটিয়া কান্না না বাহির হইত।

কমলার প্রতি জীন্দাঁর ব্যবহারের দুই তিনটি দৃষ্টান্ত দি। সিংহজী কমলাকে কোন অপূর্ব্ব গহনা বা বস্ত্র উপহার দিলেন। জীন্দাঁর চর, বাড়ীরই কোন চাকরাণী, তাঁহার আদেশ মত রাতারাতি তাহা সরাইয়া ফেলিল। পরদিন সিংহজী যখন কমলার ওখানে বসিয়া আছেন, জীন্দাঁ সেখানে গিয়া সস্নেহে কমলার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "শ্রীসরকার-দত্ত সিরোপা আমাকে

দেখাইলে না ?" কমলা আনিতে গিয়া দেখেন, নাই। মূল্যবান জিনিষ না পাওয়াতে সিংহজীও একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন হাসিতে হাসিতে জীন্দাঁ কহিলেন, "তা অন্নদাতা, প্রথমটা সব বধূরই এই রকম দামী বস্তুগুলি বাপের বাড়ী পাঠাইতে ইচ্ছা করে—আমিও পাঠাইতাম।" কমলা প্রতিবাদ করাতে, "লজ্জা কি, বৌরাণীজী! আমাদের অন্নদাতা সর্ব্বজ্ঞ ও দয়ার অবতার। তিনি তোমার উপর রাগ করবেন না।" এই রকম, অবশ্য বিভিন্ন অবস্থায় ৪।৫ বার হইল। সিংহজী কিন্তু ভুলিলেন না। তাঁহার কমলার সত্যবাদীতার উপর বিশ্বাস কিছুতে টলিল না। ইহার মধ্যে যে কোন দুষ্ট লোকের বদমায়েসী বা কারসাজী আছে তিনি বেশ বুঝিলেন। তবে জীন্দাঁর প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইল না।

রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীদের আপোষের মধ্যে সম্মান প্রদর্শনের যে সব বাঁধা নিয়ম ছিল, কমলার প্রতি জীন্দাঁ সে সব কখনও পালন করিতেন না। অতি নিম্নশ্রেণীর আশ্রিতার মত তাহার প্রতি ব্যবহার করিতেন।

গ্রন্থ সাহেবের "অখণ্ড পাঠ," সত্য নারায়ণের কথা, বা অন্য কোন উপলক্ষে, একজন সামান্য দাসীকে দিয়া কমলাকে নিজ দেউড়িতে জীন্দাঁ ডাকাইতেন। রাজ-অন্দরের কায়দামত ইহা মারাত্মক অপমান। সুশীলা কমলা কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে আসিত। এমন সময় তাহাকে ডাক পড়িত যখন তাহার আহারের সময় নিকট। জীন্দাঁ তাহাকে পাকে প্রকারে-সমস্ত দিনটা ভয়ানক খাটাইতেন, একবার মাত্র খাইতে বলিতেন না। একদিন সিংহজীর সেবায় রাত্র দেড় প্রহরের সময় কমলার ভবনে যাই। কমলা সেইমাত্র জীন্দাঁর মহলের উৎসব হইতে আসিয়া ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে মূর্চ্ছা গেল। সিংহজী রাজবাটীর সমস্ত হাকিম, বৈদ্য ডাকিলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে কমলা বলিল, তাহার মধ্যে মধ্যে ঐরূপ হয়; কারণ বলিল না। সিংহজীকে জীন্দাঁ বলিত— "ছোট বউজী না হলে আমার ও কাজই হত না, একা একশর মত খাটলেন!"

কোনো দেউড়ীতে বা কোন বড় সরদারের বাটীতে ভোজের নিমন্ত্রণে গেলে, জীন্দাঁ কমলার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে গৃহকর্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিত,—"আহা! বাছা আমার ডাহা গণ্ডগ্রামের মেয়ে; মেহনত

মজুরী করা, খোলা চলা ফেরা, "মিস্‌সিরোটী" লস্‌সী* খাওয়া উহার অভ্যাস—কুঁয়রাণী হয়ে পর কত কষ্টই হচ্ছে।

জীন্দাঁর প্ররোচনায়, তাঁহার দাসী বাঁদীরা, কমলাকে কোনো সম্মান দেখাইত না। কমলার নিজ চাকরাণীরাও প্রথমে তাহার আজ্ঞা পালন করিত না। কমলা তাহাদের অর্থদণ্ড দিলে বা বরখাস্ত করিলে, জীন্দাঁ মাফ্ করিয়া দিতেন। কমলার সাক্ষাতে তাহাদের বলিতেন, ও গ্রাম্য গরীবঘরের মেয়ে, উহার দোষ লইয়ো না!

কমলার পিতা জীন্দাঁর সহিত কখনো সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, মহারাণী তাঁহাকে চাকর বাকরদের মধ্যে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাইতেন। সরল দলসিংহ এ অপমান বুঝিতেই পারিত না, কমলাকে কিন্তু বড় বাজিত।

কমলা যে দিন সিংহজীর বা স্বামীর অনুরোধে তাঁহাদের নিকটে বসিয়া প্রসাদ পাইত, সেদিন তাহার খাওয়া হইত। অন্য সময়, লাংরীরা, জীন্দাঁর আজ্ঞায়, এমন কদর্য্য আহার্য্য আনিয়া দিত যে প্রায় তাহার খাওয়া হইত না। যে-পাচককে কমলা সাজা দিত, জীন্দাঁ তাহাকে পুরস্কার দিতেন!

জীন্দাঁর বাটীতে প্রাসাদের প্রধানা মহিলাদের ভোজ হইলে, কমলাকে পংক্তিতে বসিতে না দিয়া আশ্রিতাদের মধ্যে স্থান দেওয়া হইত।

বড় কুঁয়রাণী স্বপত্নীর সহিত কথা কহিতেন না। অভিবাদনও ফিরাইয়া দিতেন না। জীন্দাঁ ও বড় কুঁয়রাণী নিজেদের সহিত কমলাকে বসিতে দিতেন না; অবশ্য সিংহজী বা কুঁয়র উপস্থিত থাকিলে অন্য কথা।

কুঁয়রাণী মুখ বুজিয়া সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত। সে জানিত, সিংহজীর জীন্দাঁর প্রতি যতই কেন অনুরাগ হউক না, তাহাকে তিনি সন্তানের অধিক স্নেহ করিতেন। সে বুঝিয়াছিল, সিংহজীর জীন্দাঁর প্রতি অন্ধ মোহ, আর তাহার নিজের প্রতি জ্ঞান ও বিচার শক্তির সহিত ন্যস্ত মমতা; একটা দৈহিক আকর্ষণ, অন্যটি আত্মিক বন্ধন। এই দুই প্রকার মায়াতে টক্কর লাগিলে, অন্ধ মায়া নিশ্চয় চুরমার হইবে। কমলা ভাবিয়া দেখিল, সে যদি সমস্ত খুলিয়া, পরম সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, সূক্ষ্মদর্শী ও দয়ালু শ্বশুরের চরণে অনুযোগ করে,

* গমের আটা ও বেসন্ মিশ্রিত রুটি এবং ঘোল, পঞ্জাবে দরিদ্রদের এখনও এই দৈনিক খাদ্য।

তাহা হইলে জীন্দাঁর পতন নিশ্চয়। কিন্তু ঐ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই, সিংহজীর প্রাণের এক একটি শিকড় ছিঁড়িয়া যাইবে।

আবার কুঁয়র যেমন আশুতোষ তেমনি আশুরোষ। সামান্য অন্যায় দেখিলে জ্বলিয়া যান; তাহার হৃদকমল-আসীনা কমলার এ হেন দুরবস্থা শুনিলে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া এমন কার্য্য নাই যা করিতে না পারেন। হয়তো জীন্দাঁর মহলের উপর চড়াও করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইতে পারেন।

ধরো যদি সিংহজী সমস্ত জানিতে পারিয়াও ঘরের নিন্দনীয় কাণ্ড বাহিরের লোকের নিকট অপ্রকাশ রাখিবার হেতু, অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক কারণে, জীন্দাঁর বাহ্যিক সম্মান বজায় রাখেন, তাহা হইলে সম্রাট ও যুবরাজে যুদ্ধ বাধিতে পারে। যুবরাজের দশ হাজার খাস্ সৈন্য; আবার তিনি প্রধান সেনাপতি।

স্বার্থহীনা ও ঈশ্বরপরায়ণা কমলা, নিজের জন্য এত বড় বিপ্লব বাধাইতে একেবারে অনিচ্ছুক।

জীন্দাঁ, সিংহজীর উপর কমলার সদ্‌গুণের ও সদ্‌বুদ্ধির প্রভাব, ও টিক্কার তেজিয়ান প্রকৃতি, খুব বুঝিতেন। সে জন্য অতি সতর্কতার সহিত কমলার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেন।

কিন্তু তামসিক বৃত্তির চালনা করিতে করিতে মানুষ পরিণাম-দৃষ্টি হারাইয়া বসে। পাশব প্রবৃত্তির চরিতার্থতার দিকে মন দিলে, অতি বুদ্ধিমানও ক্রমে পশুর মতই রিপুর ক্ষণিক উদ্দামের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া যায়। জীন্দাঁরও তাহাই হইতেছিল। যতই মনের আক্রোশ ও প্রতিহিংসা বৃত্তি পোষণ করিতেছিলেন ততই তাঁহার ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবার শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল।

কমলা কেবল যে ধীরভাবে এ অবিশ্রান্ত নির্যাতন সহ্য করিত তাহা নহে; সে যা যা সৌভাগ্য পাইয়াছিল তাহার জন্য জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ছিল। তাহার হৃদয়সমুদ্রের অন্তঃস্তরে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত। আর ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া, ইটটি খাইয়া পাটকেলটি না ফিরাইয়া দিবার যে-একটা মহাশিক্ষা ও সুখ আছে, তাহা সে উপলব্ধি করিয়া, দিন দিন আধ্যাত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হইতেছিল। কমলার অবিচলিত শান্ত-সন্তুষ্টভাব, ও

আকৃতি-প্রকৃতিতে ধর্ম্মানন্দের, এবং আত্মপ্রসাদের সুস্পষ্ট লক্ষণসকল দেখিয়া জীন্দাঁর শুষ্ক প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ-প্রাণে যেন ঘৃতাহুতি পড়িত।

এইভাবে সুখেদুঃখে তিনবার দীনানগরে বাস ও তিনবার রাজধানীতে বাস হইল—তিন বৎসরের কিছু অধিক কাটিল। ইতিমধ্যে কমলা পঞ্জাবের মধ্যে সমস্ত বড় বড় তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছে। দীনানগরের উত্তরে হিমাচলের ক্রোড়ে কাংড়া এবং জ্বালামুখী (সিংহজী এই দুই দেবীমন্দির পুনঃসংস্কার করাইয়া, সোনার পাতে মুড়িয়া দিয়াছিলেন), ঐ প্রদেশেই ভাগসূনাথ ও বৈদ্যনাথ ; লাহোরের উত্তরে জম্মুরাজ্যের অন্তর্গত ত্রিকুটা পর্ব্বতশিখরে বৈষ্ণব দেবী ; জগতে প্রসিদ্ধ সৈন্ধব লবণের খনির নিকট, ঝিলাম নগর হইতে ২০ ক্রোশ দূরে কটাক্ষ দেবী। এসকল পার্ব্বত্য পুণ্যভূমির দৃশ্য বড়ই সুন্দর। সাম্রাজ্যের দক্ষিণে, মরুস্থল-মধ্যস্থ অতি প্রাচীন মুলতান নগরে প্রহ্লাদপুরী। সিন্ধুনদপার ডেরাগাজী খাঁ নগরের অদূরে সখিসরওয়র দরগাহ। সখি সরওয়র একজন মুসলমান মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু ইঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক মানে, ও বৈশাখে তাঁহার দরগাহে মাসব্যাপী প্রকাণ্ড মেলা বসে। এরকম বিচিত্র জনসংঘ ভারতে বোধহয় কোথাও দেখা যায় না। বালাখ-বোখারা, সমরকন্দ, কাবুল, বিলোচস্থান সীইস্থান ইত্যাদি প্রবাসি হিন্দুরা রেশমী বস্ত্র, গালিচা, 'তিল্লা' নামক সুবর্ণমুদ্রা এবং সালম মিছরি,* দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত চিনির চাক্তি, ইত্যাদি নানাবিধ হাকিমী ঔষধ বিক্রয় করিতে আইসে। এইসব লম্বাচুল, আফ্‌গানী পরিচ্ছদ-পরা হিন্দুদের মধ্যে, দূর ঢাকা-বাংলা হইতে সমাগত, খালি পা, খালি গা, হিঙ্গলাজ তীর্থযাত্রী বাঙ্গালি স্ত্রী-পুরুষও দেখিতে পাইবে। পঞ্জাবী ও মাড়োয়ারী তো বেশীর ভাগ। সিখেদের বিশেষ তীর্থসকল কমলা দু-তিন বার ভ্রমণ করিয়াছিল, যেমন দীনা নগরের অদূরে আনন্দপুর সাহেব,† (যেখানে গুরু গোবিন্দ সিংহ মহাদেবির আরাধনা করিয়াছিলেন ও তাঁহার "পাঁচ পেয়ারা" ভক্ত শিষ্যগণ ধর্ম্মের জয়ের জন্য দেবীর চরণে নিজ নিজ মুণ্ড বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন) ; গুরুদাসপুরে "কন্ধসাহেব", অর্থাৎ প্রাচীর, যাহার ছায়ায় সিখ শহীদরা ‡ বিশ্রাম করিয়াছিল ;

* Milk Sugar—শীর্‌খিস্ত।

† সিখেরা 'সাহেব' শব্দ, গুরুগ্রন্থ ও তীর্থের সহিত ব্যবহার করে—যথা গ্রন্থসাহেব, সুখমনিজী সাহেব, ননকাণা সাহেব, ইত্যাদি।

‡ শহীদ—Martyrs, আসল অর্থ 'সাক্ষী'।

সিয়ালকোটে "বেরসাহেব", কুলগাছ যাহার নীচে কোনো গুরু বসিয়াছিলেন ; অমৃতসরে "টালীসাহেব", সিসুগাছ গুরুহস্ত রোপিত ; লাহোর হইতে ২০ ক্রোশ "নন্‌কনা সাহেব", মরুস্থলের মধ্যে গুরু নানকের জন্মস্থান ; জলন্ধরের সন্নিকট গুরুধাম "করতারপুর ; গুজরানওয়ালার নিকট এমানাবাদে 'রোড়ি সাহেব, অর্থাৎ কাঁকরবেদী, যাহার উপর বসিয়া গুরু নানক তপস্যা করিয়াছিলেন ; লুধিয়ানা জেলায় তলওয়ন্দি ও সুলতানপুর গ্রামদ্বয়, আদিগুরুর বাল্যকালের লীলাভূমি, ইত্যাদি। এবং দুই সর্ব্বপ্রধান তীর্থ—অমৃতসরে দর্ব্বার সাহেব সংলগ্ন পবিত্র পুষ্কর এবং অমৃতসর হইতে সাত ক্রোশ "তরণতারণ" (তারণতারিণী) দীর্ঘিকা, এই দুই সরোবরে কমলা বৎসরে ৫।৬ বার স্নান করিতে যাইত। আমাকে, কমলার সকল তীর্থযাত্রায় সিংহজী অভিভাবক করিয়া সঙ্গে পাঠাইতেন। কমলার সহিত শতাধিক পুরস্ত্রী, সহচরী, দাসী ও বহুসংখ্যক গরীব ভদ্রবিধবা থাকিত। সে শেষোল্লিখিতদের তীর্থ করাইতে ও নানাপ্রকার সাহায্য করিতে ভালবাসিত। আর সওয়ার, পেয়াদা, চোবদার ইত্যাদি ৪০০।৫০০জন থাকিত। সওয়ারীর জন্য ঘোড়া, হাতী, রথ, বহেলী, পালকি ও ভারবরদারী উট, খচ্চড়, টাটু, বলদ। কমলার ইচ্ছামত আমরা নির্জ্জন আমবাগানে, নদী বা সরোবর তীরে, বিস্তীর্ণ বস্ত্রাবাস রচনা করিতাম। কমলা তাহার ডেরায় প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর সংবাদ লইত। কাহারও অসুখ করিলে, সরকারী এবং কমলার খাস হাকিম বৈদ্যেরা একদণ্ড বসিতে পাইত না। ইদানিং রাজপ্রাসাদে, রাজধানীতে, সমস্ত দেশে কমলার যশোগান সকলের মুখে। জীন্দাঁর নিজ দল ছাড়া সবাই তাহাকে বড় ভক্তি করিত। তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া, আমি প্রায়ই দেখিয়া পুলকিত হইতাম যে অনেক পথ বহিয়া শত শত লোক এই দেবীর দর্শন লাভের আশায় আসিত। আর ইহা অবগত হইয়া আশ্চর্য্য হইতাম যে, জীন্দাঁর কমলার প্রতি অন্তঃপুরে গুপ্তভাবে হৃদয়হীন আচরণ লইয়া ভদ্রলোকেরা দূর গ্রামে ও নগরে কানাকানি করিত, ও জীন্দাঁকে অভিসম্পাত দিত।

আমার কমলা মাইর শেষযাত্রা হরিদ্বারে। আমার আন্তরিক সুখ শান্তিও সেই যাত্রার সহিতই এক রকম শেষ হইল। তাই কমলা দেবীর সেবায়, ঐ স্বাধীন বিচরণের আনন্দের দ্রুতগামী মাস দুই তিন, আমার প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে। হরিদ্বার হইতে ফিরিবার কালে এক সন্ধ্যার স্মৃতি আমার মনে

এমন জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে যেন আজই সকালের কথা। হরিদ্বারে স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন আদি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, রোজ একক্রোশ মাত্র পথ অতিবাহিত করিয়া আমরা ৩।৪ দিন হইতে লাহোর অভিমুখে চলিয়াছি। গভীর ঘনবিন্যস্ত শাল ও অন্যান্য বড় বড় বৃক্ষের অফুরন্ত বন। মধ্যে মধ্যে বাঁশ, বেত, শর ও কলার জঙ্গল। এক আধ ক্রোশ অন্তর বড় বড় নদী ও নালা। বনের ভিতর দিয়া উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা "পাখডাণ্ডী" রাস্তা। গাছে গাছে, ঝাড়ে ঝাড়ে, বন মোরগের ও সোনা-রূপা-ধূপ-ছায়া রংয়ের সুবিশাল পাখীর ঝাঁক। আজ যেখানে আমরা ডেরা করিয়াছি এখানটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। কমলা, তাহার উত্তরদ্বারী পট্টপ্রাসাদের চিক ফেলা দেউড়িতে, উঁচু মসনদের উপর বসিয়া একদৃষ্টে পর্ব্বতমালার দিকে চাহিয়া আছে। আমি গালিচার উপর তাহার সম্মুখে বসিয়া আছি। ছাউনির দুই তিনশত তাঁবু সারে সারে কমলার লাল বস্ত্র-নির্ম্মিত মহলের পশ্চাদ্‌ভাগে, একশত হাত জমি ছাড়িয়া, পড়িয়াছে। দেউড়ির ৮।১০ হাত তফাতেই একটি গগনস্পর্শী শিমুল বৃক্ষ, ফুলে লালে লাল। ঠিক এই মহাদ্রুমের নিচেই নালার খাড়া পাড় নামিয়া গিয়াছে। নালার এক পোয়ার অধিক শুষ্ক গর্ভে শাদা নোড়ানুড়ি বিছানো। ওপারে উচ্চ তীরের নীচে ক্ষীণ রক্তাভ জলধারা। পাড়ের একেবারে ধার হইতে অভেদ্য প্রাচীরের মতো গায়ে গায়ে বৃক্ষশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর সংখ্যাতীত গাছের মাথার উপর ঢেউ-খেলানো অনন্ত গাঢ় সবুজ নীল ছাদ্, দূরে গিয়া ঢালু পর্ব্বতের গায়ে উঠিয়া আকাশে ঠেকিয়াছে। শেষে, তাহারও উপর, শিবমন্দিরের সারির ন্যায়, এক কাতার বরফ ঢাকা পর্ব্বতশৃঙ্গ শাদা, গোলাপি ও সিন্দুরে। ওপারের বন হইতে একপাল হনুমান ও মর্কট বানর সাবধানে নামিয়া, জল খাইয়া, চকিতে ভীতি-বিহ্বলভাবে অদৃশ্য হইল। আমরা চাহিয়া আছি—দেখি লতাগুল্ম সরাইয়া একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া জলে পড়িল। আমার শিকারী প্রাণ চমকাইয়া উঠিল। দৌড়াইয়া গিয়া আমার দূরবীন ও বন্দুকটা আনিবার জন্য উঠিবামাত্র—কমলা হাসিয়া আমাকে স্থির হইতে আজ্ঞা করিল। আমি আবার বসিলে, সে বলিল, "আমার সুমুখে জীবহত্যা করতে নেই, আমাকে এসব দেখতে নেই।" আমি অবাক হইলাম; যোদ্ধার স্ত্রী, যোদ্ধার পুত্রবধূ, যোদ্ধার ভগ্নী ও যোদ্ধাজাতীয় মেয়ের

এ কী রকম কথা? আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। কমলা সহাস্য আরক্তিম মুখ নীচু করিয়া হাতের আর্সি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম,—জোড় হাত উপরে তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম, "পিতামহের মত পুত্র হউক।" শার্দ্দুল মহাশয়ের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমার সেই প্রসিদ্ধ থলে আনাইয়া, টাকায় মোহরে ও সোনারূপার বাদামে দশ বারো সহস্র টাকা মূল্যের বখশিশ ছোট বড় সকলকে বণ্টন করিয়া দিলাম। সুতর সওয়ারের ডাক কমলার ডেরা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত বসান ছিলই। আমি সিংহজীকে, উজীর সাহেবের সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিয়া, শুভসংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। একছত্র মাত্র লিখিলাম -"ওয়াহগুরু কৃপার প্রাসাদে পৌত্ররূপী পূর্ণচন্দ্র ৬।৭ মাস মধ্যে উদয় হইবেন।"

ইংরাজের তরফ হইতে বৌরাণী সাহেবাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য, মিরাঠ কাম্পুর একজন কর্ণেল ও সাহারানপুরের কালেক্টর সস্ত্রীক, আমাদের সঙ্গে ছিল। ফিরিঙ্গী সরকারের অগোচর ছিল না যে খালসা সম্রাট তাহার কনিষ্ঠ বধূটিকে আন্তরিক স্নেহ করেন ও সমস্ত বড় বড় বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লয়েন। ঐ বুদ্ধিমতী যুবতীকে ইংরাজদের প্রতি সদয় ও তাহাদের সহিত সখ্যতা অটুট রাখিবার পক্ষপাতিনী করিতে পারিলে, মস্ত লাভ। এই বুঝিয়া দুজন বিচক্ষণ প্রতিনিধি কোম্পানী বাহাদুরের তরফ হইতে আমাদের ডেরায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার জন্য মোতায়েন হইয়াছে। কর্ণেল সাহেব অতি সজ্জন বৃদ্ধলোক। তাঁহার মেম চমৎকার হিন্দি বলিতে পারেন। কলেকটারের মেম নূতন বিলাতের আমদানি। কটা রং, কটা চুল, বিড়ালচক্ষু সুন্দরীরা বাহির হইতে কত বিভিন্ন। দুদিনের আলাপেই কিন্তু কমলা তাহাদের ভিতরটা জানিতে পারিল, দেখিল আসলে কোন প্রভেদ নাই, ঠিক আমাদের মেয়েদের মতই। সে যা হউক, পারিতোষিক বাঁটার সোরগোল দেখিয়া, কারণ অনুসন্ধান করিয়া, সুখবর জানিতে পারিয়া, কর্ণেল ও দুজন মেম, কমলাকে সেলাম করিতে আসিল। কমলা বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট পর্দ্দা করিত না। তিনজনে জানু পাতিয়া কুর্নিশ করিল। কমলা প্রকোষ্ঠ হইতে বহুমূল্য চুড়ি খুলিয়া এক এক জোড়া দুই মেমকে পরাইয়া দিল। হাসি গল্প চলিতে লাগিল। ডান দিকে নালার উপর পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল। মেমেরা ইংরাজি কবিতা

আওড়াইয়া চন্দ্রমার শোভা বর্ণনা করিতে লাগিল। “কবে আমাদের মেয়েরা তোমাদের মত শিক্ষিতা হইবে!” কমলা ইহা বার বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল। এমন সময় ডেরায় এক ভয়ঙ্কর গোল উঠিল। ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কর্ণেল ও আমি ছুটিয়া গিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! ২০।২৫টা বন্য হস্তী জমাট দল বাঁধিয়া, আমাদের ডেরার দিকে আসিতেছে। তাহাদের আগে আগে এক পর্ব্বতাকার হস্তী শুঁড় তুলিয়া বিকট চিৎকারে বনস্থল কম্পিত করিতে করিতে বেগে আগু হইতেছে। আমাদের লোকলস্কর, চলন্ত পাহাড়গুলির আক্রমণের অপেক্ষা করিল না। তাহারা এ আসন্ন মহাবিপদ দূর হইতে দেখিয়াই, বিপরীত দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইল। কর্ণেল সাহেবের অধীনে যে একশত পুরবীয়া পল্টনের সিপাহি ছিল, তাহারা চক্ষের পলকে প্রস্তুত হইয়া, ঠিক যে দিক দিয়া গজযূথ আসিতেছিল, সেই দিক আগলাইয়া সার দিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মত অচলভাবে দাঁড়াইল। আমার হাঁক ডাক গালি গালাজে আমাদের সওয়াররাও আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু তাহাদের ঘোড়াগুলি ভয়ে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছিল, তাহাদের কিছুতে স্থির থাকিতে দিল না। লাগাম না মানিয়া কতক অশ্ব সওয়ারকে লইয়া পলাইল, কতক সওয়ারকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিল, কতক নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। পায়দল্ সিপাইরা বিশৃঙ্খল-ভাবে যত্রতত্র দাঁড়াইয়া তলোয়ার ঘুরাইয়া আস্ফালন করিতেছিল ‘আয় “শালা হাতীরা, এক কোপে সুঁড় উড়িয়ে দিব!” আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলাম। আমি আর কিছু না করিতে পারিয়া, একজন মশালচিকে দেখিতে পাইয়া হুকুম দিলাম, “দে ৫।৭ খানা তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে।” আমাদের হাতীশালের দারোগা, আমাদের সঙ্গে ২৫।৩০টি হাতীর মধ্যে যে ৫।৬টি ‘নর’ ছিল, তাহাদের লইয়া নির্ভীকভাবে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ঐ দারোগাই বুদ্ধি করিয়া আমাদের সহিত যে বিস্তর উট ছিল, তাহাদের বল্লমের খোঁচা মারিয়া আগত-প্রায় শত্রুদলের দিকে দৌড় করাইয়া দিল। আগুন দেখিয়াই হউক, উটের ভয়েই হউক, বা আমাদের হস্তীসকল দেখিয়াই হউক, ডেরার সীমানার খাত্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, বন্য চারণদল থমকাইয়া একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইল, ও পরে যে দিক দিয়া আসিয়াছিল সে দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা সমস্ত রাত বড় বড় ঘাস ও কাষ্ঠের গাদা ডেরার চতুর্দ্দিকে জ্বালাইলাম। এই ভয়াবহ

ঘটনার সময় কমলা নিষ্কর্ম্মা ছিল না। সে সমস্ত মেয়েদের নিজের দরবার খেমাতে একত্র করিয়াছিল। তাহাদের অভয় দিয়া, তাহাদের সাহায্যে কতকগুলি দড়ির সিঁড়ি তৈয়ার করাইয়া, দেউড়ির সম্মুখে নালার উচ্চ খাড়া পাড়ে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। যদি মত্তমাতঙ্গগণ সমস্ত ছাউনি ভেদ করিয়া তাহার তাঁবুর দিকে আসিত, তাহা হইলে সেই রজ্জু ধরিয়া স্ত্রীলোকগণ নামিয়া গিয়া রক্ষা পাইত।

হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে, পলাতক বীর পুরুষেরা ফিরিয়া আসিল। কমলা কর্ণেল সাহেব, তাঁহার পূরবীয়া সিপাহি, নিজের লোকজন সকলকে দরবারে এক প্রহর রাত্রে সান্ধ্য আরতির পর তলব করিল। আমার দ্বারায় কর্ণেল সাহেবকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল; পূরবীরা প্রত্যেকে খুব বখশীষ পাইল। হাতীর দারোগা শিরোপা পাইল। নিজের যোদ্ধাগণকে হুকুম হইল, "এখন হইতে খাস দেউড়ি রক্ষা মেয়েরা করিবে; তোমরা তাহাদের জন্য রন্ধন করিয়া দিবে।" শেষ আজ্ঞা প্রচার হইল, এখানে আমাদের ডেরা ৪।৫ দিন থাকিবে। দরবার সাঙ্গ হইবার পর, কমলা আমাকে বলিল, "আমি ইংরাজদের দেখাতে চাই যে আমরা ভয় পাইনি, সে জন্য ৪।৫ দিন ছাউনি ভাঙ্গা হইবে না। আসল কথা স্থানটি বড় সুন্দর।"

পরদিন খবর পাইলাম, বন্য হস্তীর দঙ্গল দূরের প্রসিদ্ধ কজলি বনের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। কূচ আবার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বরাত্রে কমলা গম্ভীরভাবে আমাকে কহিল, "তায়াজী, বাড়ী ফিরিতে আর ইচ্ছা হয় না।" "কেন, বৌরাণীজী?" "বাড়ীতে সিংহজীর দয়ার অন্ত নাই; কুঁয়র সাহেবের কৃপা দৃষ্টি দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু জীন্দাঁ মাই সাহেবার ও বড় কুঁয়রাণীজীর আমি চক্ষুশূল। তাঁহারাই অন্দরের কর্ত্রী। আমি তাঁহাদের কত বুঝিয়েছি। বলেছি, আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা শান্তিপূর্ব্বক জীবন কাটান। পতি ও শ্বশুরের সেবা, গ্রন্থ সাহেব পাঠ, তীর্থদর্শন ছাড়া আমার আর কোনো অভিলাষ নাই। কিন্তু মহারাণীজী ও কুঁয়রাণীজীর মন কিছুতে পাইলাম না।" এই আমি, অন্তপুরে কমলার কষ্টের প্রথম আভাস পাইলাম। পরে, তাহার স্বর্গারোহনের পর, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলাম। কমলার কথায় তখন কি উত্তর দিব ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কমলা আবার বলিতে লাগিল, "প্রথম যেদিন হরিদ্বারে আসবার পথে, নিশ্চয় জানলুম ওয়াহগুরু আমাকে সন্তানবতী করবেন, থেকে থেকে

আমার নেত্র হতে জল পড়তে লাগল, সে জল আমার প্রাণটা নিংড়ে বেরিয়েছিল। সমস্ত রাত সুখমনি সাহেব পাঠ করে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লুম। অনেক বেলায়, একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখে, ধড়ফড় করে উঠে বসলুম। দেখলুম, সিংহজী আমাকে জগন্নাথজী দর্শন করতে নিয়ে গেছেন। তিনি কতবার আমাকে বলছেন, মহাযাত্রার পূর্ব্বে তিনি একবার জগন্নাথ* যাত্রা করবেন। আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে অনুভব কল্লুম, আমি রক্তের ঢেউয়ের মধ্যে একহাতে সাঁতার কাটছি, আর একহাতে আমার ছোট্ট টুকটুকে শিশু সন্তানটিকে ধরে রয়েছি। আচম্বিতে একটা কী প্রলয়কাণ্ড হ'য়ে হাত থেকে খোকাটি ছিটকে গিয়ে তলিয়ে গেল। সিংহজী নিকটেই কিনারার উপর তাঁহার সদানন্দভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি 'সরকার এ কী হল' বলে চিৎকার করবামাত্র একটা রক্তের তুফান উঠে আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চমকে ঘুম ভেঙ্গে দেখি এক প্রহর বেলা—ডেরার সমস্ত পরিচিত দৃশ্য ও কোলাহল। তখন থেকে আমার মন কেমন উদাস অবসন্ন হয়ে আছে। তাই তোমাকে বন্দুক চালিয়ে রক্তপাত করতে মানা করেছিলুম। আমার মনে হচ্ছে যেন কী একটা মহাবিপদ ঘনিয়ে আসচে।" কমলার কথা শুনে আমার গাত্রে কাঁটা দিল; হৃদয়টা কেমন দুলিয়া উঠিল, কিন্তু হাস্য করিয়া, প্রফুল্লতার ভান করিয়া কহিলাম, "বাছা, তোমাদের অবস্থায় সব মেয়েদের মন ও শরীর বিকল হয়ে যায়। তুমি ওয়াহগুরু চরণ ধ্যান করো। সর্ব্বদা খুসি থাকবার চেষ্টা করো।" আমার প্রেরিত সুসংবাদ সিংহজীর নিকট ৩।৪ প্রহরের মধ্যেই পৌঁছিয়াছিল। দুই দিন না যাইতে তাঁহার পরম আনন্দের নিদর্শন কমলা পাইল। রকম রকম মুখ-রোচক চাটনি, আচার ও মোরব্বা, নানাবিধ অম্লমধুকুলফি (দু মুখ গলিয়ে বন্ধ করা সোনার চোংয়ের মধ্যে), এবং কাবুল ও কাশ্মীরের, কার্পাসে সুরক্ষিত, তাজা ফল, কমলার জন্য সুতরী ডাকে তিনি পাঠাইলেন। প্রতি প্রভাতে, সিংহজী প্রেরিত নিত্য নূতন স্নেহের তত্ত্ব কমলা পাইতে লাগিল।—(ক্রমশঃ)

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

---

* মহারাজা রনজীত সিংহ পুরীধামে গিয়া কোহেনূর রত্ন দেবতাকে নিবেদন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। হঠাৎ কাল আসিয়া তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হইতে দিল না। মৃত্যু শয্যায় তিনি, বাকরোধ অবস্থায়, ধ্যান সিংহকে ইঙ্গিতে তাহার ঐ ইচ্ছা পূরণ করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু ঐ অতুল হীরকখণ্ড দারুব্রহ্মের মুকুটে স্থান না পাইয়া, অবশেষে ইংরাজ রাজের খাস সম্পত্তি হইল।

জৈন ও বাৎসীপুত্রীয় মতে আত্মবাদ*

জৈন দর্শনের প্রধান কথা হইল অনেকান্তবাদ। নৈয়ায়িকগণ কোন সিদ্ধান্ত একান্ত (unambiguous) না হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু জৈনগণের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে কোন কিছু সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহে কোন কথা বলিতে পারা যায় না। সবই তাঁহাদের মতে অনেকান্ত (admitting of various conclusions)। কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বলিতে পারা যায় না বলিয়াই যে বস্তুও মায়িক ও মিথ্যা—এ-কথা জৈনগণ স্বীকার করিতেন না, এবং ইহাই হইল জৈন দর্শনের বৈশিষ্ট্য। মাধ্যমিকাচার্য নাগার্জুনের মতের সহিত জৈনাচার্যগণের মতের পার্থক্য ও সাদৃশ্য উভয়ই সুস্পষ্ট। নাগার্জুন বলিতেন বস্তু সৎ-ও নহে অসৎ-ও নহে; জৈনাচার্যগণ কিন্তু বস্তুর সত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান হওয়ায় এক অর্থে সেই কথাই অন্যভাবে ঘুরাইয়া বলিতেন, বস্তু সৎ-ও হইতে পারে অসৎ-ও হইতে পারে; বস্তু প্রকৃত পক্ষে অবক্তব্য। "অস্তি," "নাস্তি" এবং "অবক্তব্য"—এই তিন পক্ষের আবার বিবিধ সঙ্করের ফলে জৈন দর্শনের সেই বিখ্যাত "সপ্তভঙ্গী"র উদ্ভব। ইহাই স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ। যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৈয়ায়িকগণ কোন যুক্তির মধ্যে কিছুমাত্র অনৈকান্তিকতা থাকিলেই তাহা পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে জৈনাচার্যগণ অকুতোভয়ে এই মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে জগতে সবই সন্দিগ্ধ ও অনেকান্ত, সুতরাং কোন মতকেই সম্পূর্ণরূপে সত্য বা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা মনে করা যাইতে পারে না। জৈনদিগের পরমতসহিষ্ণুতা জগতে অতুলনীয়; তাহার কারণ জৈনদিগের মজ্জাগত এই অনেকান্তবাদ।—দর্শনের দিক্ হইতেও আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা জৈন মতই সমর্থিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। Matter-এর ক্ষুদ্রতমাংশ electron বহুদিন পর্যন্ত atom রূপেই পরিগণিত হইত; কিন্তু Prince de Broglie যখন ১৯২৬ সালে Wave-

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture No. 15.—'তত্ত্বসংগ্রহে' বেদান্তের আত্মবাদেরও আলোচনা আছে; কিন্তু বেদান্তমত সাধারণ্যে সুপরিচিত। সুতরাং তৎপরিবর্তে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাই বোধ হয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে।

mechanics আবিষ্কার করিলেন তখন বৈজ্ঞানিক জগৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে electron একই সঙ্গে একই সময়ে particle-ও বটে wave-ও বটে ; অর্থাৎ, আধুনিক বিজ্ঞানের মতে matter হইল অনেকান্ত ও অবক্তব্য। Matter-এর স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা এখন বৈজ্ঞানিকগণ ছাড়িয়াই দিয়াছেন ; Matter-এর বিবিধ গুণ (property) নির্ণয় করিতেই এখন তাঁহারা ব্যস্ত, এবং এই সকল গুণ সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী হইলেও আর তাঁহারা ভয় পান না।

প্রথমে একটি মাত্র কারিকাতেই জৈন মত উত্থাপন করা হইয়াছে ঃ—

জৈমিনীয়া ইব প্রাহুর্জৈনাশ্চিল্লক্ষণং নরম্।
দ্রব্যপর্যায়রূপেণ ব্যাবৃত্ত্যনুগমাত্মকম্॥ ৩১১ ॥

কমলশীল "পঞ্জিকায়" বলিয়াছেন যে এখানে "জৈন" বলিতে দিগম্বর জৈন বুঝাইতেছে। ইহারা মীমাংসকদের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে আত্মা চিন্ময় (চিল্লক্ষণং নরম্) ; এবং মীমাংসকদের মতই জৈনগণ আরও বিশ্বাস করেন যে দ্রব্যরূপে এই আত্মা সর্বাবস্থায় অনুবৃত্ত হইলেও পর্যায়ানুযায়ী প্রতি অবস্থাতে এই আত্মার ভেদও দেখা যায় (ব্যাবৃত্তি)। আত্মার এই দ্বৈরূপ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; সুতরাং তদর্থে প্রমাণান্তরের প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ, জৈনদিগের মত ঃ—পর্যায়ানুযায়ী সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও যে স্থিরসত্তা চৈতন্যরূপে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে তাহাই হইল আত্মা।—এই মত যে বাস্তবিকই মীমাংসোক্ত আত্মবাদের অনুরূপ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এবং মীমাংসকদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানবাদী যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন শান্তরক্ষিত এখানেও সেই আপত্তিই করিয়াছেন ঃ—

তত্রাপ্যবিকৃতং দ্রব্যং পর্যায়ৈর্যদি সঙ্গতম্।
ন বিশেষোঽস্তি তস্যেতি পরিণামি ন তদ্ভবেৎ ॥ ৩১২ ॥

অর্থাৎ, দ্রব্য অবিকৃত থাকিয়াই যদি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অবস্থা পরিগ্রহণ করে তবে কোন বৈশিষ্ট্যই উৎপন্ন হইবে না ; এবং সে-ক্ষেত্রে দ্রব্যের যে পরিণামিত্ব পূর্বপক্ষী প্রমাণ করিতে উৎসুক তাহাও প্রমাণিত হইবে না।—এখানে দ্রব্য বলিতে যে আত্মাই বুঝাইতেছে তাহা কমলশীল স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু

গতানুগতিক যুক্তিদ্বারা মীমাংসক বা জৈন কাহারও মতই যে সম্যকরূপে খণ্ডন করা যায় না তাহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় শান্তরক্ষিত পরবর্তী কারিকাত্রয়ে জৈন মত আরও বিস্তারিতরূপে উপস্থিত করিয়াছেন ঃ—

দেশকালস্বভাবানামভেদাদেকতোচ্যতে।
সংখ্যালক্ষণসংজ্ঞার্থভেদাদ্ভেদস্তু বর্ণ্যতে॥ ৩১৩॥

রূপাদয়ো ঘটশ্চেতি সংখ্যাসংজ্ঞাবিভেদিতা।
কার্যানুবৃত্তিব্যাবৃত্তী লক্ষণার্থবিভেদিতা॥ ৩১৪॥

দ্রব্যপর্যায়য়োরেবং নৈকান্তেনাবিশেষবৎ।
দ্রব্যং পর্যায়রূপেণ বিশেষং যাতি চেৎ স্বয়ম্॥ ৩১৫॥

এই কারিকা তিনটির ভাষা ভাল না হইলেও জৈন দর্শনের গূঢ়তম তথ্য এখানে বেশ সরল ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। জৈন এখানে বলিতেছেন, বস্তুর তথাকথিত একত্ব বলিতে বুঝায় দেশ, কাল ও স্বভাবের অভেদ; এবং বস্তুর ভেদও সেইরূপ সংখ্যা, লক্ষণ, সংজ্ঞা ও অর্থের ভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। "একটি" মাত্র ঘট সম্বন্ধেও যখন বহুবচনান্ত "রূপাদয়ঃ" শব্দ প্রয়োগ করা চলে তখন সংজ্ঞা ও অর্থের বৈরুদ্ধ্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; বস্তুর স্বভাবের মধ্যেও যে এইরূপ বৈরুদ্ধ্য বর্তমান তাহার প্রমাণ, একই বস্তুর কতকগুলি কার্য (যথা, দ্রব্যত্ব) সর্বাবস্থায় অনুবৃত্ত হয় এবং আর কতকগুলি কার্য (যথা, রূপ) অবস্থানুযায়ী পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্রব্য যখন বাস্তবিকই পর্যায়ক্রমে বিবিধ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন কিরূপে বলা যাইতে পারে যে দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বৈশিষ্ট্যবিহীন (নৈকান্তেনাবিশেষবৎ)?—বাহ্য অভিব্যক্তির দিক্ হইতে দ্রব্য কতকগুলি ধর্মের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে; জৈন এখানে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে এই সকল ধর্ম হইল পরস্পরবিরুদ্ধ; সুতরাং বস্তুর (এখানে আত্মার) প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছুই বলিবার উপায় নাই। একই ঘটের রূপাদি হইল বহু, সুতরাং সখংযাগত বৈষম্য সুস্পষ্ট। ঘটকে রূপাদির পার্থক্য অনুযায়ী নীল, পীত প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে সুতরাং সংজ্ঞাভেদও স্বীকার্য। ঘটের দ্রব্যত্বাদি অনুবৃত্ত এবং রূপাদি পর্যায়ক্রমে ব্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং লক্ষণেও ভেদ

রহিয়াছে। ঘটের দ্বারা উদকাহরণ করা যায়, কিন্তু ঘটস্থ নীলাদি রূপের কার্য হইল বস্ত্রাদির বিবিধ রাগ উৎপাদন; কাজেই কার্যেরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতেও প্রত্যেক বিষয়ে অনুরূপ ভেদ বর্তমান; অনুবৃত্তিধর্ম চৈতন্যদ্বারা অর্থানুভব ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ব্যাবৃত্তিধর্ম সুখাদিদ্বারা পীড়া, অনুগ্রহ প্রভৃতিরই গ্রহণ হয়। সুতরাং ঘটের ন্যায় আত্মাও সন্দিগ্ধ ও অনেকান্ত।

জৈন মত এইরূপে উপস্থিত করিয়া শান্তরক্ষিত এইবার প্রতিবিধানকল্পে বলিতেছেন ঃ—

স্বভাবাভেদ একত্বং তস্মিন্ সতি চ ভিন্নতা।
কথংচিদপি দুঃসাধ্যা পর্যায়াত্মস্বরূপবৎ ॥ ৩১৬॥

অর্থাৎ, স্বভাবের অভেদই হইল একত্ব; সেই অভেদ যদি বর্ত্তমান থাকে তবে ভিন্নতা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য; পর্যায়ানুযায়ী বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য।—দ্রব্য এবং পর্যায়ের মধ্যে যদি অভেদ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সেই অভেদ সম্পূর্ণ হউক! একই সঙ্গে তদ্বিপরীত ভেদও কিরূপে সম্ভব? একই বস্তুর একই সঙ্গে বিধি ও প্রতিষেধ সম্ভব হইতে পারে না (ন হ্যেকস্যৈকাা বিধিপ্রতিষেধৌ পরস্পরবিরুদ্ধৌ যুক্তৌ)। বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে যখন বলা হয় সেগুলি এক তখন তদ্বারা স্বভাবের অভেদই বুঝায়, এবং সেই অভেদ যদি সত্য হয় তবে তৎসঙ্গেই তৎপ্রতিষেধক ভেদ কিরূপে সম্ভব হইবে?—জৈনের প্রতি বৌদ্ধের এই উক্তি মোটেই সঙ্গত হয় নাই; জৈন metaphysics-এর ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, বৌদ্ধ logic-এর ক্ষেত্রে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। ইহা যে আদৌ সঙ্গত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রকার আশঙ্কা শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের মনেও উদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ পরবর্তী কারিকায় উভয়েই বিশেষ ভাবে জোর দিয়া এই কথাই বলিয়াছেন যে পারমার্থিক অর্থে দ্রব্য ও পর্যায়ের মধ্যে অভেদ যখন প্রমাণিতই হইয়া গিয়াছে তখন এতদ্দ্বয়ের লক্ষণের অনন্যতা প্রতিপাদনই কেবল অবশিষ্ট। এই উদ্দেশ্যে বলা হইতেছেঃ—

অগৌণে চৈবমেকত্বে দ্রব্যপর্যায়য়োঃ স্থিতে।
ব্যাবৃত্তিমদ্ভবেদ্দ্রব্যং পর্যায়াণাং স্বরূপবৎ ॥ ৩১৭ ॥

যদি বা তেঽপি পর্যায়াঃ সর্বেঽপ্যনুগতাত্মকাঃ।
দ্রব্যবৎ প্রাপ্নুবন্ত্যেষাং দ্রব্যৈকাত্মতা স্থিতেঃ ॥ ৩১৮ ॥

অর্থাৎ, দ্রব্য ও পর্যায়ের একত্ব যখন পারমার্থিক, তখন দ্রব্যও বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্নধর্মশালী (ব্যাবৃত্তিমৎ) হইতে বাধ্য,—বিবিধ পর্যায় যেমন পরস্পর পৃথক্। আর সেই সকল পর্যায়াবস্থা যদি অনুবৃত্তিমূলক হয় তাহা হইলে দ্রব্যত্বের ন্যায় সে-গুলিকেও প্রতি অবস্থায় পাওয়া যাইবে না কেন, বিশেষ দ্রব্য ও পর্যায়াবলীর একাত্মতা যখন প্রমাণিত হইয়াছে!—কমলশীল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস সত্ত্বেও যদি "একত্ব" অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে ভেদব্যবহারই লুপ্ত হইবে।—সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ঃ—

ততো নাবস্থিতং কিঞ্চিদ্দ্ব্যমাত্মাদি বিদ্যতে।
পর্যায়াব্যতিরিক্তত্বাৎ পর্যায়াণাং স্বরূপবৎ ॥ ৩১৯ ॥

অর্থাৎ, ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে আত্মাদিরূপ কোন দ্রব্যের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই ; কারণ, দ্রব্য বিভিন্ন পর্যায়াবস্থা হইতে পৃথক্ নহে ; বিভিন্ন পর্যায়ের স্বরূপের মতই তাহা সর্বাবস্থায় অনন্য।—তাহার উপর আরও বক্তব্য ঃ—

ন চোদয়ব্যয়াক্রান্তাঃ পর্যায়া অপি কেচন।
দ্রব্যাদব্যতিরিক্তত্বাত্তদ্দ্ব্যনিয়তাত্মবৎ ॥ ৩২০ ॥

অর্থাৎ, দ্রব্যের বিভিন্ন পর্যায়াবস্থারও যে অভ্যুদয় ও নিগমন ঘটিয়া থাকে, তাহা বলা যায় না, কারণ এই সকল পর্যায় হইল সেই দ্রব্য হইতে অপৃথক্ (অব্যতিরিক্ত) এবং তাহাতেই নিয়ত (merged)। সুতরাং হয় স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, না হয় বলিতে হইবে যে কোন বস্তুরই কখন ধ্বংস ঘটে না। অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তিরূপ দুই বিপরীত ধর্ম একই বস্তুতে কখনই সমবেত হইতে পারে না ঃ—

ততো নিরন্বয়ো ধ্বংসঃ স্থিরং বা সর্বমিষ্যতাম্।
একাত্মনি তু নৈব স্তো ব্যাবৃত্ত্যনুগমাবিমৌ ॥ ৩২১ ॥

বস্তু যে কেবল বিভিন্ন পর্যায়াবস্থা হইতে অভিন্ন হওয়াতেই বস্তুত্বের অনুবৃত্তি অসম্ভব তাহা নহে ; উপলব্ধির সমস্ত লক্ষণ বর্তমান থাকিতেও বস্তু পর্য্যায়ক্রমে

ভিন্ন যেহেতু উপলব্ধ হয় না সেই হেতুও বুঝিতে হইবে যে বস্তু বাস্তবিকই অসৎ। এই কথাই পরবর্তী কারিকায় বলা হইয়াছে :—

ন চোপলভ্যরূপস্য পর্যায়ানুগতাত্মনঃ।
দ্রব্যস্য প্রতিভাসোঽস্তি তন্নাস্তি গগনাব্জবৎ ॥ ৩২২ ॥

অর্থাৎ, উপলব্ধ দ্রব্য কোথাও এমন নহে যে তাহার প্রতিভাস বিবিধ পর্যায়ের মধ্য দিয়া সমভাবে অনুবৃত্ত হইবে ; সুতরাং তাহা আকাশকুসুমের মতই অলীক।—কমলশীল ইহার উপর টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আত্মার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষই স্বরূপে অনুবৃত্ত হওয়ার কথা অসিদ্ধ ; কারণ বিভিন্ন পর্যায়াবস্থার অতিরিক্ত এমন কোন প্রত্যক্ষসম্মত আকার এই আত্মার দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা সর্বাবস্থাতেই অনুগত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ বস্তু যখন এক একটি বিশেষ অবস্থায় ভিন্ন প্রত্যক্ষ করা যায় না তখন তদতিরিক্ত একটি বৈশিষ্ট্যশূন্য আত্মা স্বীকার করার কোন সার্থকতা নাই।

এখন প্রশ্ন, পর্যায়ানুযায়ী বিভিন্ন অবস্থা ব্যতিরেকে দ্রব্যাত্মার অস্তিত্ব বাস্তবিকই যদি না থাকে তবে পূর্বোক্ত সংখ্যা, লক্ষণ, সংজ্ঞা ও অর্থের ভেদ কিরূপে সম্ভব হয় ? ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে :—

বিবিধার্থক্রিয়াযোগ্যাস্তুল্যাদিজ্ঞানহেতবঃ।
তথাবিধার্থসঙ্কেতশব্দপ্রত্যয়গোচরাঃ ॥ ৩২৩ ॥

অর্থাৎ, বস্তু বিবিধ অর্থকরী কার্য উৎপাদন করিতে পারে ; বস্তু সমান, অসমান প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানেরও হেতু। সেইজন্য এই প্রকার জ্ঞান যে-শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত হয় তদ্দ্বারা বস্তুরও প্রত্যয় উৎপন্ন হইতে পারে।—কারিকাটি আদৌ সুস্পষ্ট নহে ; তবে কমলশীলের কৃপায় ইহার অর্থোদ্ধার করা সম্ভব :—সমান অর্থাৎ সাধারণ ক্রিয়া বলিতে বুঝায় জলধারণাদি কার্য, এবং বস্ত্ররাগ প্রভৃতির জ্ঞানোৎপাদক কার্য হইল অসমান ক্রিয়া। এখন জলধারণাদি সাধারণ (homogeneous) ক্রিয়ার সময় সকল প্রকার পর্যায়াবস্থার প্রয়োগ একই সঙ্গে ঘটিয়া থাকে বলিয়া এই সবগুলিরই হেতুত্ব জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অভিন্ন (undifferentiated) দ্রব্যের অভাব সত্ত্বেও ভেদবিশিষ্ট ঘটাদি সম্বন্ধে একসংখ্যা-

বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু অসাধারণ (heterogeneous) ক্রিয়াবলীর উদ্দেশ্যে সংখ্যা ও কার্যের বহুত্বব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করাই রীতি।— অর্থাৎ দ্রব্য কতকগুলি গুণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নহে। এখন এই সকল গুণ যদি একসঙ্গে সমন্বিত হইবার মত হয় তাহা হইলেই আমরা "একটি" ঘটের কথা বলিয়া থাকি ; এবং ইহাদের সমন্বয় সম্ভব না হইলেই বহুত্ব দুর্বার হইয়া পড়ে। অস্তিত্ব ও একত্ব একই বস্তুতে সমন্বিত হইতে পারে, কিন্তু অস্তিত্ব ও দ্বিত্ব পারে না। উপরন্তু গুণাবলী সমন্বয়ের উপযোগী হইলেও সেগুলির বাহনস্বরূপ দ্রব্য যে একসংখ্যক হইবেই তাহা নহে। সংখ্যাভেদের ইহাই হইল প্রকৃত অর্থ।

এখন প্রশ্ন, দ্রব্যাত্মার যদি প্রকৃত অস্তিত্ব না থাকে তবে লক্ষণভেদ দেখা যায় কেন? ইহারই উত্তরে কারিকায় বলা হইয়াছে "তুল্যাদিজ্ঞানহেতবঃ"। অর্থাৎ, আম, পক্ব প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় ঘটাদি বস্তু প্রতিক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং নব নব বৈশিষ্ট্য ও সদৃশ সন্নিবেশ সহকারে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকে। নির্বিকল্প জ্ঞানে এক্ষেত্রে সর্বাবস্থাতেই পৃথক্ অথচ সদৃশ ঘটের উৎপত্তি হয় বলিয়া লোকে মনে করে ঘট ঘটই আছে।* কিন্তু পুনরুৎপত্তির সময়ে যদি বর্ণাদির বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় তখন একই বস্তুর অনুবৃত্তিরূপ ভ্রান্তি আপনা হইতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একরূপ কোন নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও পূর্ব ধর্মের অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি অনুযায়ী তুল্য বা অতুল্য বস্তু বিষয়ক ভ্রান্তজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই হইল লক্ষণভেদের কারণ।

কোন বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও সংখ্যা ও লক্ষণের ভেদ কিরূপে সম্ভব হয় তাহা না হয় বুঝা গেল ; কিন্তু সংজ্ঞা ও অর্থের ভেদ কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে কমলশীল বলিতেছেন,-- রূপাদির দ্বারা বিবিধ অর্থক্রিয়া এবং তুল্য অতুল্য প্রভৃতির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ; 'ঘট' প্রভৃতি শব্দ সঙ্কেতের সাহায্যে এই প্রকার রূপাদিই বুঝাইয়া থাকে।

---

* আমপক্বাদ্যবস্থাসু প্রতিক্ষণধ্বংসিনোঽপি সদৃশসন্নিবেশা বিশেষা এবোৎপদ্যমানা নির্বিকল্পানুভববিষয়া অনুভূযমানাঃ সর্বাবস্থাসু ঘটো ঘট ইত্যাদি সদৃশপ্রত্যয়হেতবো ভবন্তি।

ভাবাবলীর নৈরাত্ম্য এইরূপে প্রমাণ করিয়া শান্তরক্ষিত উপসংহারচ্ছলে বলিতেছেন ঃ—

উদয়ব্যয়ধর্মাণঃ পর্যায়া এব কেবলাঃ।
সংবেদ্যন্তে ততঃ স্পষ্টং নৈরাত্ম্যং চাতিনির্মলম্ ॥ ৩২৪ ॥

অর্থাৎ, পর্যায়ক্রমে বিবিধ ধর্মের অভ্যুদয় ও অন্তর্ধান ভিন্ন আর কিছুই যখন দেখিতে পাওয়া যায় না তখন ভাবাবলীর নৈরাত্ম্য স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

পূর্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন ঃ—

অথ সন্মূর্ছিতং রূপং দ্রব্যপর্যায়য়োঃ স্থিতম্।
তদ্দ্বিরূপং হি নির্ভাগং নরসিংহবদিষ্যতে ॥ ৩২৫ ॥

অর্থাৎ সদ্বস্তু কেবলমাত্র নিত্য দ্রব্য বা কেবলমাত্র পর্যায়াগত বিভিন্ন ধর্মের সমষ্টি না হইয়া এতদ্দ্বয়ের সংমিশ্রণেও উদ্ভূত হইতে পারে; এই মতে বস্তু দ্বিরূপ হইয়াও নির্ভাগ, সুতরাং নরসিংহমূর্তির ন্যায় সঙ্কর। কিন্তু জৈনের এই কথা যে যুক্তিসহ নহে তাহাই দেখাইবার জন্য শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

নন্বু দ্বিরূপমিত্যেব নানার্থবিনিবন্ধনঃ।
নির্দেশো রূপশব্দেন স্বভাবস্যাভিধানতঃ ॥ ৩২৬ ॥

অর্থাৎ দ্বিরূপ বলিতেই বুঝায় বিবিধার্থের পরস্পর সম্বন্ধ, কারণ রূপ-শব্দের অর্থ স্বভাব। এখন বস্তু যদি বাস্তবিকই নরসিংহের মত দ্বিরূপ হয় তবে আর তাহা নির্ভাগ হইতে পারে কিরূপে? যাহার দুইটি রূপ, অর্থাৎ দুইটি স্বভাব,— তাহাই হইল দ্বিরূপ; কিন্তু একই বস্তুর দুইটি স্বভাব সম্ভব হইতে পারে না, কারণ তাহাতে একত্বেরই হানি হয়। আর যে নরসিংহের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে 'এক হইয়াও দ্বিরূপ' নহে ঃ—

নরসিংহোঽপি নৈবৈকো দ্ব্যাত্মকশ্চোপপদ্যতে।
অনেকাণুসমূহাত্মা স তথা হি প্রতীয়তে ॥ ৩২৭ ॥

অর্থাৎ, নরসিংহ সম্বন্ধেও বলা যায় না যে তাহা এক হইয়াও দ্ব্যাত্মক। কারণ নরসিংহও একটি বিশিষ্ট আকারেই প্রতীয়মান হয় এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাও অনেক পরমাণুর সংহতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপে দিগম্বর জৈনদিগের আত্মবাদ খণ্ডন করিয়া শান্তরক্ষিত অদ্বৈত-

বেদান্তপ্রোক্ত আত্মবাদ আক্রমণ করিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্ত বঙ্গদেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সুতরাং সেই সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করার কোন সার্থকতা দেখি না। তবে এ-সম্বন্ধে শান্তরক্ষিতের একটি উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। ৩৩০ সংখ্যক কারিকাতে শান্ত-রক্ষিত বৈদান্তিকদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—তেষামল্পাপরাধং তু দর্শনং নিত্যতোক্তিতঃ। অর্থাৎ, বৈদান্তিকরাও ভ্রান্ত, তবে তাঁহাদের ভ্রান্তি যৎসামান্য। কমলশীল বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে বিজ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াই বৈদান্তিকগণ ভুল করিয়াছেন, অন্যথা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার থাকিত না। শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বিজ্ঞান-বাদ ও বেদান্তের মধ্যে বাস্তবিকই বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বাৎসীপুত্রীয় মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ পুদ্গলের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া শান্তরক্ষিত তাঁহাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং কাশ্মীরদেশীয় বৈভাষিকগণ আকাশাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করায় কমলশীল তাঁহাদের সৌগত বলিয়া স্বীকারই করেন নাই। অথচ অবৌদ্ধ বৈদান্তিকের প্রতি তাঁহাদের উভয়েরই যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় "Buddhism" ছিল হিন্দুধর্মেরই একটি মত, হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক্ "religion" ইহা কোন দিনই ছিল না। প্রাচীনতম কাল হইতে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সঙ্ঘই ছিল ইহার মেরুদণ্ড, সমাজ নহে।

এইবার সংক্ষেপে বাৎসীপুত্রীয় মতের আলোচনা করা যাউক। বাৎসী-পুত্রীয়গণ ছিলেন সর্বাস্তিবাদিদেরই একটি শাখা। কিন্তু কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় যাহা করিতে সাহস করে নাই বাৎসীপুত্রীয়গণ প্রায় তাহাই করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। অনাত্মবাদ বৌদ্ধ দর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাৎসী-পুত্রীয়গণ বৌদ্ধ হইয়াও ছিলেন জৈনদিগের ন্যায় পুদ্গলবাদী। 'পুদ্গল' বলিতে ঠিক soul বুঝায় না; এ-কথাটির প্রকৃত অর্থ হইল personality। কিন্তু personality যে soul-এরই বিকাশরূপ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন যে বাৎসীপুত্রীয়গণ হইল সৌগতম্মন্য :—

কেচিত্তু সৌগতম্মন্যা অন্যাত্মানং প্রচক্ষতে।
পুদ্গলব্যপদেশেন তত্ত্বান্যত্বাদিবর্জিতম্॥৩৩৫॥

অর্থাৎ, বাৎসীপুত্রীয়গণ 'পুদ্গল' নাম দিয়া আত্মাও স্বীকার করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে ইহা পঞ্চ স্কন্ধ হইতে পৃথকও নহে অপৃথকও নহে।—'স্কন্ধ' বলিতে বুঝায় "elements or attributes of being" (Childers), এবং রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হইল পঞ্চস্কন্ধ। এখন বৌদ্ধগণ সাধারণতঃ 'পুদ্গল' বলিতে বুঝেন এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি ; কিন্তু বাৎসীপুত্রীয়দিগের মতে পুদ্গল পঞ্চস্কন্ধ হইতে পৃথকও নহে, অভিন্নও নহে। পুদ্গল যে পঞ্চস্কন্ধ হইতে পৃথক্ নহে একথা বিজ্ঞানবাদীও মানিয়া লইতে পারেন ; কিন্তু পুদ্গল ও পঞ্চস্কন্ধের ভিন্নত্ব তিনি কোন ক্রমেই স্বীকার করিবেন না, কারণ তাহা হইলেই পুদ্গলে পরোক্ষভাবে পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত আরও কিছু স্বীকার করা হইল যাহা আত্মারই নামান্তর মাত্র। বাৎসীপুত্রীয়গণ কিন্তু তাহাই করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে (অবৌদ্ধদিগের আত্মার মত) পুদ্গলই শুভাশুভ কর্মের কর্তা এবং কর্মফলের ভোক্তা, এবং পূর্বস্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নবস্কন্ধ গ্রহণ করিতেও এই পুদ্গল তৎপর। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে বাৎসীপুত্রীয়গণ নামেই কেবল আত্মা স্বীকার করেন নাই, কার্যতঃ করিয়াছেন (কেবলং নাম্নি বিবাদঃ)।

পুদ্গলের অনির্বচনীয়ত্ব বাৎসীপুত্রীয়গণ এই বলিয়া সমর্থন করেন ঃ—

স্কন্ধেভ্যঃ পুদ্গলো নান্যস্তীর্থদৃষ্টিপ্রসঙ্গতঃ।
নানন্যোঽনেকতাদ্যাপ্তেঃ সাধ্বী তস্মাদবাচ্যতা ॥ ৩৩৭ ॥

অর্থাৎ, স্কন্ধাবলী হইতে পুদ্গল পৃথক্ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলেই তৈর্থিকদিগের (heretics) পরিকল্পিত আত্মা স্বীকার করা হইবে ; অপরদিকে পুদ্গল যদি বাস্তবিক রূপাদি স্কন্ধই হয়, তাহা হইলে পঞ্চস্কন্ধ হইতে অভিন্ন হওয়ায় পুদ্গলেরও পঞ্চত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কারিকাস্থ "আদি" শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে যে এই মতে পুদ্গলের কেবল পঞ্চত্ব নয়, অনিত্যত্বাদিও স্বীকার করা হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাই হইল উচ্ছেদবাদ, যাহা কৃতকর্মের বিনাশাশঙ্কায় বৌদ্ধ কখনই স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং পুদ্গল যে অনির্বচনীয় তাহা অস্বীকার করা যায় না।—বাৎসীপুত্রীয়ের এই মত খণ্ডনোদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

তে বাচ্যাঃ পুদ্গলো নৈব বিদ্যতে পারমার্থিকঃ।
তত্ত্বান্যত্বাদবাচ্যত্বান্নভঃকোকনদাদিবৎ ॥ ৩৩৮ ॥

অর্থাৎ, বাৎসীপুত্রীয় নিজে যে পুদ্গল স্বীকার করিয়াছেন তাহারও কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, কারণ পঞ্চস্কন্ধের সহিত পুদ্গলের এককালীন তত্ত্ব (identity) ও অন্যত্ব (difference) স্বীকার হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহাদের পুদ্গল আকাশকুসুমের মতই অলীক।

বিজ্ঞানবাদী তাহার পর বলিতেছেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বই (power of producing effective action) হইল অস্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু এই সকল বস্তুর অর্থক্রিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষণেই মাত্র দেখা যায়। সুতরাং বস্তুর এই তথাকথিত অস্তিত্ব—যাহা অবশ্যই প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে—বিশেষ বিশেষ ক্ষণে ভিন্ন স্বীকার করা হইবে কেন? সুতরাং যাহা অক্ষণিক তাহার বস্তুত্বই সিদ্ধ হয় না, এবং বাৎসীপুত্রীয়ের পুদ্গলও এই কারণে অলীক। অনুবর্তী কারিকায় এই কথাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ—

অর্থক্রিয়াসু শক্তিশ্চ বিদ্যমানত্বলক্ষণম্।
ক্ষণিকেষ্বেব নিয়তা তথাঽবাচ্যে ন বস্তুতা ॥ ৩৪৭ ॥

কমলশীল ইহার উপর টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন বৃক্ষত্বের নিষেধে শিংশপার নিবৃত্তির ন্যায় ক্ষণিকত্বের নিবৃত্তিতে বস্তুত্বেরও নিষেধ ঘটিয়া যাইবে।

পূর্বপক্ষী এখন বলিতে পারেন, পুদ্গলের অস্তিত্ব বাস্তবিকই যদি না থাকে তবে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল জীব ও শরীর পৃথক্ না অভিন্ন—তখন তিনি কেন বলিয়াছিলেন যে এ-প্রশ্ন অব্যাকৃত; কেন তিনি স্পষ্টতঃ বলেন নাই যে জীবের অস্তিত্ব নাই? শান্তরক্ষিত পূর্বপক্ষীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

আগমার্থবিরোধে তু পরাক্রান্তং মহাত্মভিঃ।
নাস্তিক্যপ্রতিষেধায় চিত্রা বাচো দয়াবতঃ ॥ ৩৪৮ ॥

এই কারিকার প্রথমার্ধটি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির একটি বিখ্যাত বচনের প্রতিধ্বনি মাত্র ঃ—ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্। অর্থাৎ সন্দেহস্থলে শাস্ত্রবচন বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কেবলমাত্র সন্দেহ

হইতেই বচনের অলক্ষণত্ব প্রমাণিত হয় না। এই রীতি অবলম্বন করিয়া শান্তরক্ষিত এখানে বলিতেছেন যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই বুদ্ধদেব ঐ সকল প্রশ্ন অব্যাকৃত রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্য হইল নাস্তিক্যপ্রতিষেধ। কমলশীল কারিকাটির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

পুদ্গল বলিয়া কোন বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব যদি প্রমাণিত হয় তবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা পঞ্চস্কন্ধ হইতে পৃথক্ না অভিন্ন*। ধর্মীই যদি প্রমাণিত না হয় তবে তাহার ধর্ম লইয়া মাথা ঘামানো বাতুলতা। অলীক শশশৃঙ্গের তীক্ষ্ণতাদি সম্ভব নয় বলিয়াই তাহার আলোচনা করা হয় না, কিন্তু সেইজন্য কি কেহ শশশৃঙ্গের তীক্ষ্ণত্বে বিশ্বাস করে? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, পুদ্গলের সত্তা যে কেবল প্রজ্ঞপ্তিতেই (mere designation) সমাবদ্ধ—এই কথা বুঝাইবার জন্যই বুদ্ধদেব এতৎসম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে, তিনি যে উত্তরে কেবল 'নাস্তি' বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই তাহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে প্রশ্নের সহিত এ-উত্তরের ঠিক সামঞ্জস্য থাকে না, কারণ প্রশ্ন ছিল 'জীব ও শরীর পৃথক্ না অভিন্ন'। অথবা সত্তার প্রজ্ঞপ্তি-মাত্রতাও পাছে লোকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে—এই আশঙ্কাতেই শূন্যবাদ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ মন্দধীজনের প্রতিপত্ত্যর্থে তিনি "নাস্তি" বলেন নাই :—কমলশীল এইখানে বলিয়াছেন যে আচার্য বসুবন্ধু তাঁহার "কোশ-পরমার্থসপ্ততিকা" প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তিনি নিজে এ-বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহেন না।

বাৎসীপুত্রীয় ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া আবার আপত্তি করিতেছেন, বাস্তব সত্তা যদি না থাকে তবে বুদ্ধদেব কেন বলিয়াছেন "উপপাদক সত্ত্ব"† আছে? পূর্বপক্ষীর এই আপত্তিও কমলশীল "বিশেষপ্রতিপত্তির" সাহায্যে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, এ-কথাও বিজ্ঞপ্তিমাত্রতার বিরুদ্ধ নয়। কারণ যে বিজ্ঞানসন্তানে সত্ত্বপ্রজ্ঞপ্তি আসিয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহার উচ্ছেদ সম্ভব নয়; এই কথা স্মরণ করিয়াই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন 'অস্তি সত্ত্ব' (যত্র হি

---

* যেরূপ ছাপা হইয়াছে তাহাতে কোন অর্থই হয় না। ধরিয়া লইতেছি যে প্রকৃত পাঠ হইল "তত্ত্বান্যত্বাদি-ধর্মং ব্যাকৃতমর্হেৎ"।

† আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'সত্ত্ব' কথাটি এখানে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে।

চিত্তসন্তানে সত্ত্বপ্রজ্ঞপ্তিস্তস্যাং সত্যামনুচ্ছেদমভিসন্ধ্যায়াস্তি সত্ত্ব ইত্যুক্তং ভগবতা)। ইহা স্বীকার না করিলে কার্যকারণ রূপে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত ক্ষণপরম্পরায় সর্বপ্রকার সংস্কারেরই অভাব স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সত্ত্বপ্রজ্ঞপ্তি ও সংস্কারবিজ্ঞান অসমজাতীয় নহে।*

বাৎসীপুত্রীয় এইবার বৌদ্ধাগমের প্রসিদ্ধ ভারহারসূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে বুদ্ধদেবের নিজের বচনের মধ্যে আত্মবাদের সমর্থক কথা রহিয়াছে। আধুনিক যুগেও যাঁহারা বৌদ্ধদর্শনে আত্মবাদ আরোপ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ এই ভারহারসূত্রের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। বুদ্ধদেব এই সূত্রে বলিয়াছেন "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে ভার, ভারগ্রহণ, ভারনিক্ষেপ এবং ভারবাহক সম্বন্ধে উপদেশ দিব। ভার বলিতে বুঝায় পাঁচটি উপাদানস্কন্ধ, ভারগ্রহণ হইল তৃপ্তি, ভারনিক্ষেপই মুক্তি, এবং পুদ্গলাবলীই হইল ভারবাহক।" কিন্তু এ-কথার অর্থ কি? ভার স্বয়ং কি কখনও ভারবাহক হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে ঃ—

সমুদায়াদিচিত্তেন ভারহারাদিদেশনা।
বিশেষপ্রতিষেধশ্চ তদ্দৃষ্টীন্ প্রতি রাজতে॥ ৩৪৯॥

অর্থাৎ, বুদ্ধদেব ঐ সূত্রে সমস্ত স্কন্ধগুলিকে একত্রে (স্কন্ধসংঘাত) ভারহার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন; আত্মদৃষ্টি (আত্মার অস্তিত্বরূপ মিথ্যা জ্ঞান) প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি তাহাদেরই মত নিষেধ করিয়াছেন যাহারা বলে রূপই আত্মা, বিজ্ঞানই আত্মা ইত্যাদি।—সমকালীন ভারাবলীর সমষ্টিকেই ভারহার বলা হইয়াছে; ইহাতেই যে ভার অর্থাৎ স্কন্ধের অতিরিক্ত আর কিছু স্বীকার করা হইয়াছে তাহা নহে। স্কন্ধাবলীর সমষ্টিই হইল পুদ্গল ও 'ভারহার'। এইজন্যই বুদ্ধদেব 'পুদ্গল' বা 'ভারহারে'র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—"হে আয়ুষ্মন্! যাহার এইরূপ নাম, এইরূপ জাতি, এইরূপ গোত্র, এইরূপ আহার এবং এইরূপেই যাহা সুখদুঃখের প্রতি অনুভাবশীল ও এইপ্রকার যাহার আয়ু"—তাহাই হইল পুদ্গল। সুতরাং স্কন্ধসমুদায়ই যখন পুদ্গলের লক্ষণ, কোন নিত্য দ্রব্য নহে, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তিমাত্র।

* কমলশীলের এই দুরূহ বচনের তাৎপর্য এই যে বিজ্ঞানবাদী আত্মারও বিজ্ঞান স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাহাতেই আত্মা স্বীকার করা হয় না।

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, "আত্মা অস্বীকার করিয়া কখনই তথাগতের এই উক্তির সদর্থ করা যায় না ঃ—'হে ভদন্ত, আমি রূপ নহি ; বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বা বিজ্ঞানও আমি নহি ; এবং হে ভিক্ষু, তুমিও রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বা বিজ্ঞান নহ।' এতদ্দ্বারা তথাগত স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে রূপাদি স্কন্ধ কখনই অহংকারের বিষয় হইতে পারে না। ইহা হইল বিশেষেরই নিষেধ, সামান্যের নহে। আত্মা অস্বীকার করাই যদি তথাগতের উদ্দেশ্য হইত তবে তিনি আত্মারূপ সামান্যেরই (universal) নিষেধ করিতেন। একটি বিশেষের (particular) প্রতিষেধে অপর বিশেষের সমর্থনই বুঝায় ; 'আমি বাম চক্ষু দিয়া দেখিতে পাই না' বলার অর্থ 'আমি দক্ষিণ চক্ষু দিয়া দেখিতে পাই'। সুতরাং তথাগত যখন বলিয়াছেন 'আত্মা রূপাদি নহে' তখন বুঝিতে হইবে যে তাঁহার মতে রূপাদি-ব্যতিরিক্ত অপর কিছু হইল আত্মা, এবং অবাচ্য হইলেও সেই আত্মার অস্তিত্ব আছে।"

এই প্রকার আপত্তি আশঙ্কা করিয়াই শান্তরক্ষিত কারিকায় বলিয়াছেন "বিশেষপ্রতিষেধশ্চ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, সামান্যকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যেই যে তথাগত ঐ বিশেষ মতগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে ; তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, কতকগুলি বিপরীত বিশেষ মত প্রত্যাখ্যান করা। কুমতি ব্যক্তিগণের সৎকায়দৃষ্টি (wrong view of an existing personality) বিংশশিখর পর্বতের ন্যায়। তাহাদেরই প্রচারিত বিশেষ বিশেষ সৎকায়দৃষ্টির প্রত্যাখ্যানের জন্যই যে তথাগত উদ্দ্যোতকরের দ্বারা উদ্ধৃত বচনটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন—এই কথা বুঝাইবার জন্য শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন "বিশেষ-প্রতিষেধশ্চ তদ্দৃষ্টীন্ প্রতি রাজতে"।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

তরঙ্গ

অত রাত্রে ট্রেন বদল করা একটু কষ্টকর বৈ কি। বড় একটা তোরঙ্গ, দুটো সুট্‌কেশ, রাশি পরিমাণ বিছানা, গোটা দুই লণ্ঠন, টিফিন্ ক্যারিয়র, জলদানি, দুধের বোতল,—কি নেই? ঘুম চোখে ছেলেমেয়ে তিনটের নড়া ধ'রে নামানো,—তার ওপর কার্তিক মাসের নতুন হিম; বিদেশ-বিভূঁই পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লে বেড়ানোর অনেক জ্বালা।

—রোসো, দস্যিগিরি ক'রো না, গাড়ী আগে থামুক। ওমা, বাইরে যে কিছু দেখা যায় না,—একে রাত, তা'তে আবার অত কুয়াসা,—আলোগুলোও বুজে গেছে। আর অত বাঁধাবাঁধি কর্ত্তে হবে না, যা হোক ক'রে দড়ি দিয়ে বিছানাটা জড়িয়ে নাও। হ্যাঁ গা, কুলি-টুলি এদিকে পাওয়া যাবে ত?—আঁচলখানা গায়ে জড়িয়ে শৈলবালা স্বামীর দিকে তাকালো।

ভূপতি বললে, জল হাওয়ার গুণে তোমার শ্রীঅঙ্গে ত' বেশ পোষ্টাই হয়েছে, কুলির খরচটা বাঁচিয়ে দাও না?

শৈলবালা হাসিমুখে বললে, তোমার এই পাঁচ মণ লগেজ বুঝি আমাকে দিয়ে—

ক্ষতি কি?—ভূপতি বললে, বাঙ্গলা দেশের মেয়ে পশ্চিমে গিয়ে পুরুষ হয়ে আসে। তুমি আর এইটুকু পারবে না? আচ্ছা, আমি না হয় একটু সাহায্য করব।

তুমি?—শৈলবালা বললে, তোমার না জ্বরভাব? যদি ভালো চাও র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নামো। মিণ্টুর হাতটা ধ'রো, বেণু নিজেই নামতে পারবে,—অজুকে দাও আমার কোলে। আঃ দাঁড়াও, গাড়ীখানা একদম থামুক আগে। হ্যাঁগা, রাত কত?

বারোটা বাজে।

আমাদের গাড়ী আবার কখন্ আসবে?

প্রায় আড়াইটে।

শৈলবালা বললে, বাবা, ভয় করে! যদি জ্বরের ওপর ঠাণ্ডা লাগে তোমার? এখানে ওয়েটিং রুম্ আছে ত?

ভূপতি বললে, পতিভক্তিতে অন্ধ! কোথাও দেখেছ যে ওয়েটিং রুম্ নেই?

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামলো। অত রাতেও যাত্রী, কুলি অথবা ফেরিওয়ালা—কারোই অভাব নেই। গাড়ী থামতেই তিন-চারজন কুলি এসে দরজা অবরোধ করলে। শৈলবালা বললে, থামো, ও সব হবে না। কম্ফার্টার হাতে নিয়ে আছি, এসো আগে গলায় জড়িয়ে দিই।

কৌতূহলী লোকচক্ষুর সামনে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করার ধৈর্য ভূপতির নেই। সে কাছে এগিয়ে এলো, শৈলবালা তার দুই কান ঢেকে গলায় কম্ফার্টার বেঁধে দিলে। বললে, চলো, ওয়েটিং রুমে গিয়ে আগে একটু দুধ গরম ক'রে দেবো।

যথা আজ্ঞা দেবী,—কেবল প্রাণে মেরো না।

জবরদস্ত মেয়ে সন্দেহ নেই। কোলের ছেলেটাকে কাঁকালে নিলে, একটার হাত ধরলে, এক চোখ রাখলে স্বামীর প্রতি, অন্য চোখ লগেজের সংখ্যার দিকে,—তারপর উপস্থিত জনতার পরোয়া না ক'রে মহা সোরগোল তুলে সে গাড়ী থেকে নামলো। বড় মেয়ে বেণুর হাত ধ'রে ভূপতি নেমে এলো। দুজন কুলি জিনিসপত্র মাথায় তুললে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাটাতে হবে, দীর্ঘকাল, সুতরাং বেশ গুছিয়ে বসার মতো জায়গা পাওয়া দরকার। শৈলবালা বললে, মেয়েদের ওয়েটিং রুমে আমি থাকতে পারব না, তোমাকে দেখবে কে? চলো পুরুষদের ঘরে,—ছেলেমেয়ে তিনটের আগে বিছানা ক'রে দিই। ভারি ঠাণ্ডা, চলো চলো—এই কুলি, এধারে আও, কই গো, কোথায়? কোন্‌দিকে?

ভূপতি বললে, এই যে, এখানে। এঃ, ভারি ব্যস্ত মানুষ তুমি, একটু সবুর সয় না!

সবুর সইবে বৈ কি, রোগা মানুষ না তুমি? ভালোয়-ভালোয় এখন দেশে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। এই কুলি, এধার আনো জিনিষপত্তর,—ভিতর্ আন্‌কে রাখো—

ভূপতি বললে,—হয়েছে থামো। তোমার অত্যাচার সয়, হিন্দিবুলি অসহ্য।

গলা নামিয়ে শৈলবালা বললে, ওগো, ছাখো ত' কে লোকটা সেই থেকে এখানে ঘোরাফেরা করছে ?

মুখ বাড়িয়ে দেখে ভূপতি বললে, ও কিছু না। এক গা গয়না, এক গা রূপ,—লোকের আর অপরাধ কি ?

শৈলবালা বললে, আ মরণ। ও কি কথার ছিরি ? গভীর রাত, ভয় করে তাই বলছি।

তোমাকে দেখে ডাকাতরাও ভয়ে পালাবে।

কেন শুনি ?

সোনার খোঁচাতেই ত' বেচারিদের রক্তপাত হবে।

ওয়েটিং রুমে ঢুকে কুলিরা জিনিসপত্র নামিয়ে রাখলো। ভূপতি বললে, আড়াইটের এক্‌স্‌প্রেসে আমরা কলকাতা যাবো, সেই গাড়ীতে তুলে দিয়ে তোমরা পয়সা নিয়ো, বুঝলে ?

কুলি তুজন রাজি হ'য়ে চলে গেল। তারা যাবার পর মেঝেয় বিছানা পেতে শৈলবালা ছেলেমেয়ে তিনটিকে শুইয়ে দিল। বড় বেঞ্চখানার উপর স্বামীর জন্য সতরঞ্চি ও কম্বল পাতলে, তারপর সন্তান ও স্বামীর মাঝামাঝি মেঝেটুকুতে নিজের জন্য একটুখানি জায়গা ক'রে নিল। ভূপতি বললে, আমি কিন্তু একটু ঘুমিয়ে নেবো, তা তোমাদের কপালে যাই থাক্।

শৈলবালা বললে, আগে একটু তুধ গরম ক'রে দিই, খেয়ে ঘুমোও।

আর তুমি ?

আমি জেগে থাকবো। তুদিন ধ'রে খাতায় জমা খরচ তোলা হয়নি, বরং সেইটুকু সেরে ফেলি। তুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা বৈ ত' নয়।

হা বিধাতঃ !

ষ্টোভটা বে'র ক'রে জ্বাল্‌তে গিয়ে শৈলবালার সহসা দরজার দিকে চোখ পড়লো। বাইরে রাত গভীর হ'লেও ষ্টেশন একেবারে নির্জন নয়, মাঝে মাঝে লোকজনের আনাগোনা আর কোলাহল, কখনও ফেরিওয়ালার কণ্ঠ, কখনও বা শান্টিং গাড়ীর হাঁসফাঁসানি। দরজাটা তারের জাল দিয়ে তৈরী, সেই দিকে ঠাউরে একবার লক্ষ্য ক'রেই শৈলবালা ভয়ে আঁৎকে উঠলো। ভয়ার্ত চাপা কণ্ঠে উত্তেজিত হয়ে বললে, ওগো, ওঠো দিকি একবার !

ভূপতি আরাম কেদারায় সোজা হ'য়ে বসলো। বললে, কেন? কি?

সেই লোকটা। একবার ভাখো ত বেরিয়ে, সেই লোকটা ছাড়া আর কেউ নয়। সেই যে ঘুরছিল আশপাশে?—এই ব'লে শৈলবালা গায়ের গয়নায় চাদর ঢাকা দিয়ে ষ্টোভ ছেড়ে ঘরের এক কোনে গিয়ে দাঁড়ালো। খবরের কাগজে ট্রেন-ডাকাতির সংবাদটা এখনও তার মনে রয়েছে।

ভূপতি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো। শৈলর কথা মিথ্যা নয়, আলো আর অন্ধকারের ছায়ায় মাথায় টুপিপরা একটি যুবক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখে চুপা এগিয়ে এল।

ভূপতি প্রশ্ন করলে, কি চান্?

মাথায় টুপি থাকলেও পরণে বাঙ্গালীর পোষাক। যুবক হাসিমুখে বললে, চাইনে কিছু, শুধু দেখছি আপনাদের অনেকক্ষণ থেকে।

কেন বলুন ত? কে আপনি?

চিনতে পারবেন কি আমাকে? আমার নাম নিরঞ্জন চাটুজ্যে। পারলেন না ত' চিনতে?

ভূপতিকে স্বীকার করতেই হোলো, অচেনা মানুষ। কিন্তু পরে বললে, আমাকে কি চেনেন আপনি?

নিরঞ্জন বললে, ক্ষমা করবেন, আপনাকে সামান্যই চিনি, কিন্তু আপনার স্ত্রীকেই চিনি বেশি।

আমার স্ত্রীকে? মানে, যিনি আমার সঙ্গে, এই ঘরে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিচিত্র বটে। আপনি কে বলুন ত?

নিরঞ্জন হাসলো। বললে, আপনার স্ত্রীর নাম কি শৈলবালা দেবী? একবার ডাকুন না তাঁকে?

ভূপতি একবার আপাদমস্তক তার দিকে তাকালো। বললে, ভারি জটিল মনে হচ্ছে। আপনি কি তাঁর কোনো আত্মীয়?

অনেকটা।

মানে?

মানে, শাস্ত্রসম্মত নয়, তবে গ্রাম সম্পর্কে—

ভূপতি বললে, তিনি ত গ্রামের মেয়ে নন্ ?

নিরঞ্জন সবিনয়ে বললে, কল্‌কাতা শহরের একটা অংশের নাম ছিল আগে গোবিন্দপুর গ্রাম। ভয় কি, একবার ডাকুন তাঁকে, আমি চোর ডাকাত নই, গান্ধীজির চেলা।

ভূপতিও এবার হাসলো। বললে, তা'তেও বিশেষ ভয় কমলো না।—এই ব'লে সে দু'পা ভিতরে গিয়ে ডাকলো, ওগো, এসো ত' একবার এদিকে ?

শৈলবালা কিছু বুঝতে না পেরে ইঙ্গিতে বললে, আমাকে কেন ? আমি যাবো না।

আরে, এসো এসো, উনি একজন অহিংস ব্যক্তি মনে হচ্ছে। গ্রাম সম্পর্কে সম্পর্ক কী তা এখনও জানতে পারিনি বটে, তবে আশা করি বিপজ্জনক নয়।

নিরঞ্জন বললে, চক্ষুলজ্জা কেটে গেছে। আচ্ছা, আমিই ভেতরে যাই।

ভিতরে এসে নিরঞ্জন টুপিটা খুলে ফেললে। ঘরের আলোটা ঘন, উজ্জ্বল—ছায়া, আবরণ কোথাও কিছু নেই। শৈলবালার মাথায় ঘোমটা টানা ছিল, এবার অবাক হয়ে ঘোমটা একেবারেই সরিয়ে দিল। হাসিমুখে বললে, ওমা...... তুমি ?

নিরঞ্জন বললে, কে আমি বলো ত ?

তুমি ত' সেই আমাদের শ্রীকান্ত !

ভূপতি সবিস্ময়ে বললে, শ্রীকান্ত ?

হ্যাঁ গো, ওর নাম অবশ্য নিরঞ্জন। ছোটবেলা একটু হাবাগোবা ছিল কিনা তাই আমরা বলতুম, শ্রীকান্ত। তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে ?—এই ব'লে হাসিমুখে শৈলবালা কাছে এসে দাঁড়ালো।—আর যে তোমাকে চেনাই যায় না। সেই ডিগডিগে ছেলে, পেটরোগা, এখন একেবারে কী লম্বা-চওড়া ! এত রং ফর্সা হোলো কেমন ক'রে, শ্রীকান্ত ?

নিরঞ্জন বললে, শ্রীকান্ত ব'লে ডাকলে কোনো কথার জবাব দেবো না।

তিন জোড়া চোখ তিনজনের প্রতি আবর্তিত হ'য়ে ঘরে তুমুল হাসির রোল তুললো।

শৈলবালাই আবার কথা আরম্ভ করলো। বললে, ওগো, তুমি বোধ হয় চিনতে পারবে না, সেই আমার বিয়ের দিন রাত্রে তুমি ওকে দেখেছিলে, সে

আজ প্রায় এগারো বছর হোলো। আমাদের মণিমাসিমার ছেলে, আমাদের বাড়ীতে ভাড়াটে ছিল ওরা। মণিমাসিমা কোথায় এখন ?

নিরঞ্জন বললে, লক্ষ্ণৌতে, কাকার ওখানে।

তোমার বোনরা কোথায় ? অণিমার বিয়ে হয়েছে ?

হ্যাঁ, তারা সব শ্বশুরবাড়ী।

ওঃ কদ্দিনের কথা। তুমি বিয়ে করেছ, নিরঞ্জন ?

করেছি।

বউ কোথায় ? ছেলেপুলে হয়েছে ?

হ্যাঁ, একটি ছেলে। ওরা পাশের ঘরে রয়েছে।

শৈলবালা সানন্দে বললে, পাশের ঘরে ? দাঁড়াও, আমি দেখতে যাবো। আমরা ভাই পশ্চিমে গিয়েছিলুম বেড়াতে, এখন ফিরছি। এখানে গাড়ী বদল করব। ওঁর শরীর ভালো থাকলে আরো দুচার দিন বাইরে থাকতুম।

ভূপতি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। নিরঞ্জন বললে, এবার আপনার নাম মনে পড়েছে,—ভূপতি মুখোপাধ্যায়। আপনার শুভদৃষ্টির সময় আমি কনের পিঁড়ি ধরেছিলুম, বরযাত্রীদের পরিবেষণ আমার হাতেই হয়েছিল মনে রাখবেন।

ভূপতি হাসিমুখে বললে, গ্রাম সম্পর্কে যিনি আমার শালা তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

শৈলবালা বললে, শেষের কথাটা বলতে বুঝি লজ্জা পাচ্ছ, নিরঞ্জন ? বরবিদায়ের দিনে ছেলের কী কান্না! আমরা দুজন ছিলুম এক বয়সী। কেউ ওকে শান্ত করতে পারে না, আমার আঁচল ছাড়ে না, বলে, তোমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাবো। আমি একটা আংটি উপহার দিলুম, সেটা কাঁদতে কাঁদতে ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। সেই পাগলামি মনে পড়ে, নিরঞ্জন ?

নিরঞ্জন বললে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তুমি একটিও চিঠি দিলে না তা'তেই ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেল। আমরাও বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেলুম।

ভূপতি চোখ বুজে হেসে বললে, আমিও বাঁচলুম!

একঘর হেসে শৈলবালা বললে, দাঁড়াও ভাই, ওঁকে একটু দুধ গরম ক'রে দিয়ে তোমার বউকে দেখতে যাবো।—এই ব'লে সে ষ্টোভ জ্বালতে বসলো।

বোতলের দুধ বাটিতে ঢেলে ষ্টোভের উপর বসিয়ে পুনরায় বললে, ছেলেটি তোমার কত বড় হয়েছে, নিরঞ্জন ?

বছর খানেকের হোলো বৈ কি।

বউ সুন্দর হয়েছে ত ?

নিরঞ্জন মুখ টিপে বললে, বউ মাত্রেই সুন্দর।

ওরে বাবা, এত ?

ভূপতি টিপ্পনি দিয়ে বললে, নিজের দেখে বুঝতে পারোনা ?

শৈলবালা বললে, থামো। ভারি বেহায়া তুমি। আচ্ছা নিরঞ্জন, বউ তোমাকে ভালবাসে খুব ?

ভূপতিই আবার উত্তর দিল,—সন্তানাদির পর এ-প্রশ্নটা বাতিল হয়ে যায়।

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে শৈলবালা বললে, আচ্ছা, তোমার বউকেই জিজ্ঞেস করব গিয়ে, কি বলো ভাই ?

নিরঞ্জন বললে, পোষ মেনেছে কিনা তাই জিজ্ঞেস ক'রো। তোমার বুঝি এই তিনটি ছেলেমেয়ে ?

হ্যাঁ, মেয়েটি বড়। আর কি, পাঁচ সাত বছরের মধ্যেই কন্যেদায়। দেখতে দেখতে বয়স কি আমাদের কম হোলো ভাই ?

ভালোই ত', বিয়ের কনে থেকে দিদিমা, একেবারে সোজা রাস্তা।

ভূপতি বললে, আপনারা কদ্দূর যাবেন, নিরঞ্জন বাবু ?

বাবু আর বলতে হবে না ওকে, নাম ধ'রে ডাকো। চোখে ভাসছে সব। সেই হ্যাংলা ছেলে, সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়ায়,—আর, দস্যি আমাদের ঘরে ঢুকে সব পুতুল ভেঙে দিত। কী মার খেয়েছি আমরা ওর হাতে। বোনেদের বাক্সে পয়সা রাখার জো ছিল না। নিরঞ্জন, মনে পড়ে সে সব দৌরাত্ম্যি ?

নিরঞ্জন হাসিমুখে বললে, না।

না ? দুষ্টু কোথাকার! ওগো শোনো, ওর বোনরা আর আমি একদিন ঘুমিয়ে আছি ঘরে, ও করলে কি, চুপি চুপি ঘরে ঢুকে কাঁচি দিয়ে আমাদের মাথার চুল কেটে নিলে। কী সাধের চুল আমাদের। আমরা কেঁদে কেটে খাইনি দুদিন। মনে পড়ে না ?

না।

আচ্ছা, চলো তোমার বউয়ের কাছে, মনে করিয়ে দেবো সব। ওগো, রাত কত দেখো ত ?

নিরঞ্জন হাত ঘড়ি দেখে বললে, প্রায় একটা বাজে। তোমাদের গাড়ী বোধ হয় আড়াইটেয়। আমাদের লক্ষ্ণৌর গাড়ী সেই তিনটের সময়।

শৈলবালা বললে, এবার কল্‌কাতা ফিরে আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে যাবে ত ? বউকে নিয়ে যেয়ো সঙ্গে।

নিরঞ্জন বল্‌লে, আচ্ছা।

ষ্টোভ থেকে বাটিটা নামিয়ে পেয়ালা ভ'রে শৈলবালা স্বামীকে গরম দুধ দিল। তারপর উনুনটা নিভিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বউ তোমার পাশের ঘরে ? ওগো, দুধটুকু খেয়ে তুমি একটু ঘুমোও, আমি ঠিক সময় এসে ডাকবো।

ভূপতি বললে, ঘরটায় ভাবি আরাম, সারারাত না ডাকলেও দুঃখিত হবো না।

নিরঞ্জন বললে, আপনিও আসুন না, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

ভূপতি হাসিমুখে বললে, আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ রইলো। আজ থাক্, এরা ঘুমিয়ে রয়েছে। বেশ ত', কল্‌কাতায় গিয়েই আলাপ পরিচয় হবে।

শৈলবালা দুপা এগিয়ে আবার ফিরে এলো। তারপর কাশ্মীরি শালখানা স্বামীর পা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে চুপি চুপি বললে, দেখো, খুলে ফেলো না যেন, মাথার দিব্যি।—বউটাকে যদি ভালো না লাগে এক্ষুণি চ'লে আসবো।—এই ব'লে সে নিরঞ্জনের পিছনে পিছনে ওয়েটিং রুম্ থেকে বেরিয়ে এলো।

ভিতরের আলোয়, আলাপে আর আরামে বাইরের কথাটা এতক্ষণ মনে ছিল না। হেমন্তরাত্রির অন্ধকারে প্লাটফরমটা ছাড়িয়ে দূরদূরান্তর অবধি ঘন-কুয়াসায় আচ্ছন্ন। জনবিরল ষ্টেশনের চারিদিকে রাত সাঁ সাঁ করছে। আলোয় ছায়ায় বিদেশের অজানা চেহারাটা কেমন যেন অস্পষ্ট রহস্যে ভরা। মানুষের

সমাগম রয়েছে বটে কিন্তু ছায়াচারীদের নির্ভুল চেনা যায় না। কে আসে, কে যায়, কোথা দিয়ে কারা চলে কোন্ দিকে,—যেন সব মিলিয়ে একটি অবাস্তব ঘুমজড়ানো মনের কল্পনা। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় শৈলবালার মুখের উপর তৃপ্তির আবেশ বুলিয়ে দিলে। সে যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

কিছুদূর গিয়ে শৈলবালা বললে, কই শ্রীকান্ত, পাশের ঘরে বললে যে ? এতদূরে এলুম কেন ? বউ কোথায় তোমার ?

তার হাসিমুখের দিকে চেয়ে নিরঞ্জনের মনটা খুশিতে ভ'রে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে বললে, অপরাধ নিয়ো না শৈল, একটি কথা বলি। মনে করো আমরা সেই আগেকার মতনই আছি।

মুখ ফিরিয়ে শৈলবালা বললে, বলো না কী বল্‌ছ ?

বিয়ে আমি করিনি।—নিরঞ্জন নিবেদন করলো।

সবিস্ময়ে শৈলবালা তার প্রতি তাকালো। বললে, ওমা, সে কি ? বউ দেখাবে ব'লে যে নিয়ে এলে ? উনি কি মনে করবেন বলো ত ? বিয়ে করোনি ?

না। বলছিলুম কি, তুমি একটু পরেই চ'লে যেয়ো, কেমন ?

শৈলবালা বললে, তা না হয় যাবো, কিন্তু তুমি মিছে কথা বললে কেন ? এতকাল পরে দেখা—

নিরঞ্জন বললে, বিয়ে হয়নি এ কথাটা বলতে একটু লজ্জা করে।

কি করছ আজকাল ?

কল্‌কাতায় নতুন প্রফেসারি নিয়েছি। এতদিন পরে তোমাকে দেখে তখন থেকে কী যে ভালো লাগছে।

তাই বুঝি প্রথমেই আমাকে ধাপ্পা দিলে ?—হাসিমুখে শৈলবালা একবার পিছন ফিরে তাকালো, তারপর পুনরায় বললে, উনি যদি বেরিয়ে আসেন ঘব থেকে ? আর একটু এগিয়ে চলো। কী দুষ্টু তুমি ?

নিরঞ্জন বললে, দুষ্টু কেন হবো ? আমি ত' এখন আর তোমার পুতুল ভাঙবো না ?

চলতে চলতে শৈলবালা বললে, আমাকে বিপদে ফেললে ত ? উনি যদি জানতে পারেন, তোমার বউ নেই,—আর দুজনে কেবল বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, ওঁর মনে কী হবে বলো ত ?

হঠাৎ যে দেখা হবে তোমার সঙ্গে, ভাবিনি—নিরঞ্জন বলতে লাগলো, মাত্র এগারো বছর, কালকের কথা। মানুষ স্বপ্ন দেখে একটি মুহূর্তের মস্তিষ্ক বিকলনে, কিন্তু তারই মধ্যে যেন থাকে যুগান্তকালের কাহিনী।

অদ্ভুত ছেলে তুমি। কী ক'রে চিনলে আমাকে এত ভিড়ের মধ্যে? ভাবছিলুম কে একটা লোক আমাকে লক্ষ্য করছে বার বার। তুমি যে সেই ডাকাত কে জানে।—শৈলবালা বললে, সত্যিই স্বপ্নের মতন লাগে। বাবা, কী কান্না তোমার, আমিও কেঁদে বাঁচিনে। ছোটবেলাকার ভালোবাসা কিনা, কাঁদায় বেশি। এখন যে কে কোথায় এসে পড়েছি বুঝতেই পারিনে। তোমার চেহারা দেখে প্রথমটা আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কি দেখ্‌ছ বলো ত?

নিরঞ্জন একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে বললে, দেখছি তোমাকে।

কী দেখ্‌ছ?

তোমার তেমনি কটা চোখ, একটুও রং বদলায়নি।

শৈলবালা হেসে বললে, তুমি ত' বলতে পানাপুকুরের জল।

হ্যাঁ, চেহারাটাও একই রকমের আছে।

দূর পাগল। তিন তিনটে ছেলেপুলে, তা জানো? চলো না, ওদিকে একটু যাই।

নিরঞ্জন বললে, হোঁচট লাগবে না ত? ভারি অন্ধকার।

শৈলবালা বললে, তা হোক। বেশ লাগছে ঠাণ্ডায় হাঁটতে। বিয়ে না ক'রে তুমি ভালোই আছো নিরঞ্জন, ভারি বাঁধাবাঁধি; জীবনটা যেন গোলক-ধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়ায়। নিজের পায়ে চলা যায় না, পরের ব্যবস্থায় ভেসে বেড়াতে হয়। বেশ আছো তুমি।

প্লাটফরমের শেষপ্রান্ত অতিক্রম ক'রে তারা গড়ানো জায়গাটা দিয়ে নেমে চললো। সম্মুখে কোনো আগল নেই, পিছনে কোনো বাঁধন নেই। সময় ও কাল মনেরই একটা বিভ্রম, সেটার আবরণ সরিয়ে ওরা দেখলে অতীত জীবনটাই এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে, বয়সের প্রশ্নটা বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেল। শৈলবালার আচরণে সঙ্কোচ অথবা জড়তা রইলো না, কারণ, এই পুরুষের মধ্যে যে-অতি পুরাতন মানুষটাকে সে চেনে, সে অতি নিরাপদ। এই অন্ধকার পথে কালের

ব্যবধান উত্তীর্ণ হয়ে সে যেন স্বভাবের আদিযুগে এসে পৌঁছল, সংস্কার আর নীতিবোধ তখনও তাকে স্পর্শ করেনি।

নিরঞ্জন বললে, তোমার স্বামীকে খুব ভালো লাগলো। বেশ পরিহাসবোধ আছে। বন্ধুর মতন ব্যবহার।

শৈলবালা বললে, মানুষটা দুর্বল, একটু ঠেলে ঠেলে চালাতে হয়। থাক্ স্বামীর কথা। বলো ত', মিষ্টি গন্ধ কিসের এখানে, শ্রীকান্ত ?

দেখতে পাচ্ছ না, ওই যে সব গাঁদার ঝোপ আর কাঠ-গোলাপ। সাবধানে এসো, রেল-লাইন প'ড়ে রয়েছে।

শৈলবালা তার হাতখানা বাঁ হাতে ধরলো। বললে, চমৎকার লাগছে, কী নিরিবিলি। বেড়ালুম এতদিন ধ'রে পশ্চিমের এত দেশে, কিন্তু সত্যি বলছি শ্রীকান্ত, আজ যেন মনের রাশ আল্‌গা। ইচ্ছে হচ্ছে ব'সে পড়ি নরম ঘাসে, কী ঘন গন্ধ কুয়াসায়। কী রোমাঞ্চ বাতাসে।

নিরঞ্জন শান্তকণ্ঠে বললে, এখানে কেউ নেই, শুধু আকাশ আর তারা আর আমরা। এমন আশ্চর্য রাত।

শৈলবালা বলে, তার চেয়েও আশ্চর্য তুমি আর আমি। হঠাৎ গ্রহের চক্রান্ত এনে দিলে তোমাকে। কাল সকালে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করতে পারবো না। চলো, আরো এগিয়ে।

অনেক দূরে যাবে ? দূরের গ্রামের দিকে ?

হ্যাঁ, নিয়ে চলো। চলো যেদিকে খুশি।

যদি ফিরতে দেরি হয় ? যদি ওরা খুঁজে বেড়ায় ?

শৈলবালা বললে, ভালো লাগছে না ফিরতে। রাতটা যেন নেশা, নিবিড় একটা মোহ। চলো, আরো যাই।

নিরঞ্জন বললে, অবাস্তব মনে হচ্ছে আজকের রাত, অদ্ভুত মনে হবে কাল সকাল। সেদিন তোমাকে চেনবার বয়স হয়নি, আজো চেনবার আগে তুমি চ'লে যাবে। এগারো বছর দেখিনি, সমস্ত জীবন না দেখলেও ক্ষতি মনে হোতো না, কিন্তু আজ দেখতে পেয়ে আর ছাড়তে মন চাইছে না। অতীত আর ভবিষ্যৎ সন্ধিস্থলে একবিন্দু কালের ওপর দাঁড়িয়ে যেন পরম চেনা-অচেনার রহস্য।

রেলপথের সীমানা ডিঙিয়ে ছ'জনে শহরপ্রান্তের অপরিচিত পথে উত্তীর্ণ হোলো। পথ জানা নেই, তার প্রয়োজনও নেই। ছুই ধারে ফণীমনসার ঝোপ, মাঝে মাঝে মাঠ, মাঝে মাঝে কৃষ্ণকায় প্রহরীর মতো গাছের সারি। দুজনে স্খলিত জড়িত পদে চলতে লাগলো।

কিছুদূর গিয়ে নিরঞ্জন বললে, শৈল ?

শৈলবালা তার কোমরে বাঁ হাতখানা জড়িয়ে বললে, ফিরে যেতে ব'লো না...আমার ঘুম আসছে।

নিরঞ্জন তার কাঁধের উপর ডান হাত রেখে বললে, আজ তুমি পরের, তবু আমার লজ্জা করে না যদি বলি—

কি বলো ত ?

যা ছোটবেলায় বলতে জানতুম না, এখন তাই মুখে আসছে। বলতে লজ্জা করে যা বলতে বাধে না।

শৈলবালা নিশ্বাস ফেলে বললে, দেরি হয়ে গেছে অনেক। তবু তোমার বলতে ভালো লাগে যদি, আমিও কান পেতে শুনবো, নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন বললে, সত্যি বল্‌ব, আনন্দের কান্নায় কাঁপছে সর্বশরীর। তোমার চুলেব গন্ধে এগারো বছরের করুণ বিরহের সঙ্কেত। ভালোবাসার কথা বলবার বয়স নেই,—উত্তাপ জুড়িয়ে এসেছে, আর তোমার জীবনে ব'য়ে গেছে বাৎসল্যের বন্যা। আজ দুজনের দেহ নেই, আছে অতীত কল্পনা।

মৃদুকণ্ঠে শৈলবালা বললে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। কোনোদিনই বলতে পারিনি, কোনোদিনই বলা যেতো না। আজ সেই হারানো কৌমার্যের কথা মনে পড়ছে নিরঞ্জন, যখন নিজের দিকে চোখ পড়েনি, যখন অন্যের দিকে চোখ খোলেনি। সেই সময়কার আশ্চর্য অচৈতন্যের তুমি সঙ্গী। জানতেও চাওনি, আমিও জানতে পারিনি। তারপর মাঝখানের বয়সটায় দেহটা পুড়ে ছারখার হোলো। আজ তোমাকে দেখে ফিরে পেলুম সেই নির্মল প্রাচীন আত্মা, তার চিরকৈশোর কখনই ক্ষুণ্ণ নয়। নিরঞ্জন, আজ তুমি রূপবান, বলবান—কিন্তু সেদিনকার সেই দুর্বল বালক আমার বড় আদরের, বড় আনন্দের। বিশ্বাস করতে পারো ?

নিরঞ্জন বললে, অবশ্যই পারি। তাই আজ নতুন ক'রে জানানো যায় না তুমি আমার কে। ঠিক বোঝাতে পারিনে কী বল্‌ব এ সম্পর্কটাকে। আমি ভাই নয়, বন্ধু নয়, ভূপতিবাবু নয়—অথচ সমস্ত মিলিয়ে তোমার সঙ্গে কেমন যেন অন্ধ, নিগূঢ়, নির্বোধ একটি আত্মার একাকার।

মুখ তুলে কম্পিতকণ্ঠে শৈলবালা বললে, থামতে দেবো না তোমাকে। বলো এই অন্ধকারে, বলো একটি রাতের জন্যে। একদিনও ভাবিনি তোমার কথা এই এগারো বছরে, আজ তোমাকে ছাড়া আর কিছু মনে পড়ছে না। তোমাকে দেবার কিছু নেই নিরঞ্জন, কিছু নিয়ে যাবারও পাত্র নেই—তবু যেন একটা প্লাবন মুক্তি চাইছে আমার বুকের রক্ততরঙ্গে।

পথের রেখা শাদা ধূলার সঙ্কেত টেনে উত্তর-পূর্ব থেকে পুনরায় দক্ষিণে ঘুরে গেছে। দুজনে ধীরে ধীরে চলেছে। নিশুতি রাত্রির অজানা পল্লীর ভিতর দিয়ে তাদের পথ। হারাবার ভয় নেই, ফিরে যাবার উদ্বেগ নেই, যেন একটা সর্বনাশা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বেপরোয়া অভিসার। আকণ্ঠ ঔৎসুক্যে রাত্রি চেয়ে রয়েছে তাদের পিছনে, সম্মুখে পথের রেখা নির্দেশ ক'রে উদাসিনী পৃথিবী চলেছে আঁচলের দাগ টেনে, আর উপরের হিমাঙ্গ আকাশ অগণ্য নক্ষত্রলিপিতে জানিয়ে চলেছে নব মিলনের অভিনন্দন। মধুর ক্লান্তিতে আর তন্দ্রায় দু'জনের চরণ অবসন্ন, জাগ্রত স্বপ্নে আর মোহমদির অচেতনায় তারা আতুর,—পথের ধারে ধারে প'ড়ে রইলো অভিসারিকার কেয়ুর-কুণ্ডল-কঙ্কন আর চন্দ্রমালা, প'ড়ে রইলো বাৎসল্য আর পাতিব্রত্য, দায়িত্ব আর কর্তব্য, ভয় আর সংস্কার—যেন ওরা আয়ু আর অস্তিত্বের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জীবন আর মৃত্যুর আনন্দ-বেদনা অঞ্জলি ভ'রে পান ক'রে নিচ্ছে।

নিরঞ্জন ?

এলো খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে নিরঞ্জনের বাহুর উপরে ; শৈলবালার বিলোল অবশ দেহ যেন পথের ধারে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্ট স্বরে নিরঞ্জন বললে, কেন ?

কথা বেরুচ্ছে না কেন বলো ত ? গলা বুজে আসছে। আচ্ছা নিরঞ্জন, ভয় নেই ?

জানিনে শৈলবালা।

নিন্দে করবে না কেউ ?

বুঝতে পারিনে। আচ্ছা, চলো এবার ফিরি। ওই যে ষ্টেশনের আলো দেখা দিয়েছে।

শৈলবালা জেগে উঠে একটি নির্বোধ আতুর চাহনিতে সেই দিকে তাকালো। তারপর মাথাটা হেলিয়ে তেমনি জড়িতকণ্ঠে বললে, যদি তোমার নিন্দে করে কেউ আমাকে দোষ দিয়ো। ব'লো আমিই তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে টেনে এনেছিলুম। ব'লো আমার মতন পাপিষ্ঠা পৃথিবীতে নেই।

নিরঞ্জন বললে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ? ওই যে, প্রায় আলোর কাছাকাছি এসেছি। এটা বোধ হয় অন্য গ্রাম।

রুদ্ধ নিশ্বাসে শৈলবালা বললে, আর পারিনে। ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে রুদ্রের হাত থেকে সতী দেবীর অচেতন দেহের মতন আমিও ঝরে পড়ি তোমার হাত থেকে এই পথের ধারে খণ্ড খণ্ড হয়ে। আমার সেই ভগ্নাংশ দিয়ে হোক এই মহাভারতের সকল তীর্থক্ষেত্র। নিরঞ্জন, আর কিছুক্ষণ থাকি তোমার সঙ্গে, আরো ডুবিয়ে দাও অন্ধকারে, আরো নামিয়ে দাও আত্মার রহস্যের তলায়।

নিরঞ্জন ডাকলো, শৈল ?

কেন ?

বলতে পারো, আমাদের সম্ভ্রম কি ক্ষুণ্ণ হোলো ?

জানিনে ত'।

অপরাধ জমা হয়ে রইলো কি ?

মাথাটা নিরঞ্জনের কাঁধের উপর হেলিয়ে শৈলবালা বললে, আঁচল ভ'রে আমি আজ অনেক পেলুম তোমার কাছে। যাবার সময় আমাকে প্রণাম করতে দিয়ো। যদি তোমাকে ভুলিয়ে এনে থাকি অপরাধ নিয়ো না।

নিরঞ্জন বললে, কোনদিন ভাবিনি শৈল, আমাদের মধ্যে সেই দুই বালক-বালিকা এতদিন ধ'রে বেঁচে ছিল।

পথের জটিল আবর্তনে তারা কল্পনাই করেনি যে, ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় তারা ষ্টেসনেরই কাছাকাছি এসে গেছে। একরাশ আলো আর কোলাহলের মাঝখানে

এসে দাঁড়িয়ে প্রথমটা তারা হতচকিত হয়ে গেল। আলোর এই অত্যুগ্রতায় দিশাহারা শৈলবালার সহসা ইচ্ছা হোলো আবার সে ছুটে পালায় অন্ধকারে নিরঞ্জনের হাত ধ'রে। কিন্তু তার আর সময় ছিল না, হাতঘড়িতে নিরঞ্জন দেখলে আড়াইটে বাজতে আর দেরি নেই।

চোখে তোমার জলের ধারা, মুছে ফেলো, শৈল। আমাকে ঠিকানাটা দিয়ো। এই ত ষ্টেসনে এসে গেছি।

শৈলবালা খোঁপাটা ফিরিয়ে বাঁধলো, হেসে মুছে ফেললো চোখের জল, আঁচল গুছিয়ে নিল, তারপর সকৌতুকে বললে, মনে করেছিলুম পৃথিবী ছাড়িয়ে গেছি। ঘানির চারিদিকে যে ঘুরেছিলুম কে জানতো।

নিরঞ্জন বললে, তোমার গাড়ী ছাড়বে এবার, শিগগির এসো।

শৈলবালা বললে, কই তোমার পায়ের ধূলো নিলুম না ত' ?

নিরঞ্জন হাসিমুখে দুই হাত দিয়ে তার দুই গাল সস্নেহে ধ'রে বললে, মাথায় বড় কিন্তু বয়সে যে এক, মনে নেই ? আজ থাক্, পায়ের ধূলো দেবো গিয়ে তোমার শয়ন-মন্দিরে।

হাসি তুলে শৈলবালা বললে, আচ্ছা, সেই ভালো, নিরিবিলি।

কিন্তু এমন প্রণয়কাহিনীর পরিশিষ্টটুকু তখনো যে বাকি ছিল, নিরঞ্জন সে কথা একটিবারও কল্পনা করেনি। হন্তদন্ত হয়ে ওয়েটিং রুমের কাছাকাছি আসতেই পিছন থেকে একটি বউ কাঁদো কাঁদো হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ওগো, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ? আমি যে কত খুঁজছি! উনি কে তোমার সঙ্গে ?

শৈলবালা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালো, নিরঞ্জন বিমূঢ় হতবুদ্ধি। বউটি কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, এঁকে ত চিনতে পারলুম না ?

এঁকে ? এঁকে চিনতে পারবে না বটে—নিরঞ্জন বললে, ইনি আমার বন্ধুস্ত্রী, —দাঁড়াও আর এক সেকেণ্ড, এঁকে স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। আসুন বৌদি—

যে বৌকে দেখার জন্য অত আগ্রহ ছিল দুঘণ্টা আগে, এখন তার প্রতি কোনো আকর্ষণই আর শৈলবালা খুঁজে পেলো না, কথা ক'য়ে সৌজন্য প্রকাশ করতেও রুচি হোলো না। তার বিবর্ণ মুখখানা ক্রমে রক্তাভ হয়ে উঠলো। বিশ্রী

একটা উত্তেজনা আর অসীম বিরক্তি মনে মনে দমন ক'রে সে সুধু বললে, তখন স্বীকার করোনি কেন যে, বিয়ে করেছ ?

নিরঞ্জন ক্লিষ্টকণ্ঠে একবার বলবার চেষ্টা করলো,—তোমার সঙ্গে একা থাকতে পারবো সেই লোভে, শৈলবালা।

এতও জানো তোমরা।—থাক্ আর আসতে হবে না।—এই ব'লে আঁচল দিয়ে মুখখানা ভালো ক'রে মুছে সে দ্রুতপদে তাদের ওয়েটিং রুমে গিয়ে ঢুকলো।

প্রবোধকুমার সান্যাল

রেণে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মৌর্যবংশ

ভারতবর্ষের পক্ষে সেকন্দরের যুদ্ধযাত্রার ফলাফলের গুরুত্ব কতদূর সে সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত। এক পক্ষের মতানুসারে মাসেডোনীয়দের আগমন থেকে ভারতবর্ষে এক প্রকৃত নবজাগরণের যুগারম্ভ হয়। অপর পক্ষের মতে সেকন্দরের অভিযান ভবিষ্য ফলশূন্য এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উপর তার কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম ও গ্রীক সভ্যতার সংযোগ অনেককাল পরে ঘটে, ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-শক আমলের আগে নয়। তবুও পরোক্ষভাবে মাসেডোনীয় আক্রমণের ফলাফল ভারতকে যে ভোগ করতে হয়নি, তা নয়। এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপেই ভারতের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য মৌর্যরাজ্যের পত্তন হয়।

সেকন্দরের প্রস্থানের পরে, বিপাশা নদী পর্যন্ত পঞ্জাব প্রদেশ জনৈক মাসেডোনীয় শাসন কর্তার অধিকারে থাকে। গঙ্গার যে উপত্যকায় সেকন্দর প্রবেশ লাভ করেননি, পূর্বেই বলা হয়েছে সে প্রদেশ মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল, ও তাঁদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (পাটনা)। মাসেডোনীয় আক্রমণজনিত বিপর্যস্ত অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত (গ্রীকদের সাণ্ড্রোকটাস) নামক এক ভারতীয় বৈশ্য-সন্তান অনুমান ৩২২-৩২১ অব্দে নন্দ বংশ ধ্বংস ক'রে সিংহাসন অধিকার করেন। সেকন্দরের পরবর্তী শাসনকর্তাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের সুযোগে তিনি পঞ্জাব থেকে মেসোডোনীয়গণকে বিতাড়িত করেন, এবং তদবধি গঙ্গার মোহনা থেকে কাবুল পর্যন্ত রাজত্ব করতে থাকেন—যে সৌভাগ্য তাঁর পূর্ব্বে কোন নৃপতির কপালেই ঘটেনি। সেলিউসী নামক সেকন্দরের আসিয়াখণ্ডে প্রধান উত্তরাধিকারীগণ এই মধ্যভারতীয় সাম্রাজ্যের গর্ব খর্ব করবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন। ৩০৫ অব্দে সেলিউকাস নিকাতর পঞ্জাব আক্রমণ করলেন কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে পারলেন না।

অগত্যা তিনি ভারতবর্ষ চন্দ্রগুপ্তের দখলি স্বত্ব মেনে নিলেন, এমন কি গান্ধার নামক কাবুল নদীর একটি মহলাও তাঁর অধিকারভুক্ত রইল, যদিও কোনকালে সেটি ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল না। সন্ধিস্থাপন হ'লে পর চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পাটলিপুত্রের রাজসভায় একটি সেলিউসীড দূতকে অভ্যর্থনা করেন। ইনি সেই বিখ্যাত মেগাস্থিনীস্, যিনি পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি পুঁথি লেখেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি হারিয়ে যায় (অনুমান ৩০০ অব্দ)।

চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ বা মৌর্য্যবংশ অনুমান খৃঃ পূঃ ৩২২—১৮৫ পর্য্যন্ত মগধ সাম্রাজ্যে অর্থাৎ গঙ্গামাতৃক প্রদেশে ও মালব দেশে রাজত্ব করেন। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বিন্দুসার আমিত্রঘাত (অনুমান ২৯৭-২৭৪)।

পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি টলেমি ফিলাডেলফাস ও প্রথম আন্টিয়োকস্ নামক মাসেডোনীয় রাজাদের দূতগণকে তাঁর রাজসভায় অভ্যর্থনা করেন। পরবর্তী রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের বহর দেখে ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রমুখ বহু ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে বিন্দুসার কৃষ্ণানদীর অপরপার পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন।

বিন্দুসারের পুত্র অশোক প্রিয়দর্শিন (র‍্যাপসন্-এর মতে অনুমান ২৭৪-২৩৭ ও ভিনসেণ্ট স্মিথ এর মতে ২৭৩-২৩২) ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের মহত্তম রাজাদের মধ্যে একজন। তাঁর পিতার ন্যায় বঙ্গ থেকে গান্ধার পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজ্যের বিস্তার। পূর্বদিকে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত তিনি জয় করেছিলেন। দক্ষিণে তাঁর সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের তিন চতুর্থাংশ নিয়ে মহীশূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় সন্দেহ করেন এই প্রদেশ জয়লাভের কীর্তি প্রমাণাভাবাৎ বিন্দুসারে আরোপিত হলেও, আসলে হয়ত অশোকেরই প্রাপ্য।

জৈনগণ চন্দ্রগুপ্তকে তাঁদেরই একজন বলে গণ্য করেন; এবং এ কিম্বদন্তির প্রতিবাদ করা দুষ্কর। সম্ভবত বিন্দুসার ও তিনি তাঁদের সমসাময়িক ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুধর্ম বিশ্বাস ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন, যথা বৈষ্ণবধর্ম শৈব-ধর্মাদি। অশোকের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কিঞ্চিদধিক। অনুমান খৃঃ পূঃ ২৬২ অব্দে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন; ও তার কিছুকাল পরে সন্ন্যাসীর

বেশ পর্যন্ত ধারণ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি যে বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করতে গিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করবার কারণ আছে এবং সাঁচির পূর্ব্বতোরণে উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর-চিত্রে সেই ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই ধর্মান্তর গ্রহণের পর থেকে তিনি রাজর্ষিরূপে সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রচার করবার উদ্দেশে তিনি তাঁর রাজ্যের চতুষ্কোণে প্রাকৃত ভাষায় শিলায় বা স্তম্ভে বহু অনুশাসন খোদিত করিয়েছিলেন, যেগুলি আমাদের কাল পর্য্যন্ত রক্ষিত রয়েছে; যথা ঃ—মীরাট, দিল্লী, এলাহাবাদ ও কাশীর নিকটস্থ সারনাথ, সাহবাজ্‌গড়হী, যমুনার উৎপত্তিস্থলে কালসী, কাথিয়াওয়াড়স্থ গিরনার, উড়িষ্যার জৌগড় ও ধৌলী এবং মহীশূরস্থ বেলারির শিলালিপিসকল। এই অনুশাসনের ভূমিকাগুলি মার্কস অরীলিয়সের উক্তির সমপর্যায়; একটিতে এই কথা আছে —"মনুষ্যমাত্রই আমার সন্তান: যেমন আমার সন্তানদের জন্য ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার অভ্যুদয় কামনা করি তেমনি সকল মনুষ্যের জন্য কামনা করি।" এই সমবেদনা সকল জীবের প্রতিই প্রসারিত ঃ "জীবগণের প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য।" অশোকের কাছ থেকে আমরা জানতে পাই যে বৌদ্ধধর্ম-সূত্র অনুসারে, তিনি হাঁসপাতালের সংখ্যাবৃদ্ধি, ধর্মশালাস্থাপন, কূপ খনন ও রাস্তা বরাবর কলাগাছের পরদা রোপণ করেছেন; রক্ত বলিদান নিবারণ করেছেন, অপরাধীদের শাস্তি দেবার আগে তাদের সংশোধন করবার চেষ্টা করেছেন, ইত্যাদি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অশোক বৌদ্ধধর্ম থেকে একটি সার্ব্বজনীন নীতি নিষ্কাশিত করেছেন যা সকল ধর্মাবলম্বীই গ্রহণ করতে পারেন। বস্তুত উদারতা ছিল তাঁর একটি প্রধান গুণ। একটি শিলালিপিতে তিনি বলেছেন; "সকল ধর্মসম্প্রদায়ই আমার কাছ থেকে বিবিধ-প্রকার সম্মান প্রাপ্ত হয়ে থাকে।"

কিম্বদন্তি অনুসারে (অনুমান ২৫৩ ?) অশোক পাটলিপুত্রে একটি বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করেন, যেটি তৃতীয় ব'লে গণ্য হয়। এই সভা আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে এই জন্য যে, আমরা দেখতে পাই বৌদ্ধগণ সে সময় সবেমাত্র তাঁদের ত্রিপিটক সমাপ্ত করেছেন; অর্থাৎ বুদ্ধের উপদেশ বা সূত্র, এবং সঙ্ঘের নিয়মাবলী বা বিনয়ের উপর আর একটি শাস্ত্রাধ্যায় বা অভিধর্ম্ম যোগ করেছেন, যেটি তাঁদের দর্শন শাস্ত্রের প্রথম ভিত্তি। উক্ত

কিম্বদন্তিরই অনুসরণে এই মহাসভায় স্থির হয় যে সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার করা হবে। বস্তুত অশোক তাঁর অনুশাসনে গর্ব্ব ক'রে বলেছেন যে তিনি পাশ্চাত্যের যবন অর্থাৎ গ্রীক রাজাদের কাছে পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রেরণ করেছেন, যথা, আন্তিয়ক, তুরময়, আন্তিকেন ইত্যাদি ; কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যে এ বিষয় সম্পূর্ণ নীরব সেটা বড় আশ্চর্য্যের কথা। অপর পক্ষে ভারতবর্ষের উত্তরদিকে অশোক যে-সকল প্রচারক প্রেরণ করেন, তাদের প্রচারকার্য বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছিল ব'লে বোধ হয় না, কারণ মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাল ইউ-চী যুগের আগে নয়। এই রাজর্ষির প্রচারকার্য ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা সফল হয়েছিল, এবং ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উপকণ্ঠে, যথা দাক্ষিণাত্য, সিংহল ও গান্ধারে। পুরাণ প্রমাণে অশোকের পুত্র ও কন্যা, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা দ্বারা খৃঃ পূঃ ২৫১-২৪৬-এর মধ্যে সিংহল দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ও গৃহীত হয়। এহেন যে-গান্ধারদেশ, যা পুণ্যভূমি মগধ থেকে এত দূরে অবস্থিত এবং এ পর্য্যন্ত ভারতের সীমানার বাইরে ব'লেই গণ্য ছিল, সেখানে যে গভীর বৌদ্ধ প্রভাব তদবধি লক্ষিত হয়, সে প্রতাপশালী সম্রাটের প্রচেষ্টার ফল ব'লেই বোধ হয়।

অশোকের পরে মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়। ২০৬ খৃঃ পূর্বাব্দে সিরিয়ার রাজা তৃতীয় আন্টিয়োকস্ গান্ধার আক্রমণ করেন, এবং কয়েক বৎসর পরে এই প্রদেশ ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজার অধিকার ভুক্ত হয়। এইরূপে আক্রমণের পথ আবার খোলসা হয়। ১৮৫ অব্দের দিকে ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীকগণ পঞ্জাব অধিকার করেন। অনুমান সেই সময়েই মৌর্যবংশের শেষ রাজা পুষ্যমিত্র নামক তাঁর একটি প্রজা কর্তৃক পরাজিত হন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি (১৮২-১৪৮) সুঙ্গবংশের পত্তন করে। সুঙ্গরাজগণ অনুমান ১৮৫-৭৩ পর্যন্ত গঙ্গামাতৃক ও মালব প্রদেশ রাজত্ব করেন। কিম্বদন্তি মতে পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষপাতী ও বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী ছিলেন। ১৫৫ অব্দের দিকে তিনি ও তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র ইন্দো-গ্রীক পঞ্জাবরাজ মিলিন্দের (= মিনান্ডার) একটি আক্রমণে প্রতিরোধ করেন ব'লে শোনা যায়। সুঙ্গবংশের পর আসে কণ্ববংশ যাঁরা ৭৩-২৮ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত গাঙ্গেয় প্রদেশে রাজত্ব করেন।

বর্ত্তমান যুগের প্রাক্কালে সংস্কৃত সাহিত্য, মহাকাব্য ও শাস্ত্র

একথা মনে করা ভুল হবে যে, অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মৌর্য যুগে ভারতবর্ষ একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে আমরা জানতে পাই যে, এ সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ প্রধানত হেরক্লিস্ অর্থাৎ কৃষ্ণকে পূজা করেন। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান এবং বৌদ্ধ বা জৈন অহিন্দু মতবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ নতুন নতুন পূজা পদ্ধতি বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম যোগ করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল।

এই নবদেবতার মধ্যে প্রধান দুটি, কৃষ্ণ ও শিব, ছিলেন সঙ্কীর্ণভাবে ব্যক্তিগত এবং মানবধর্মী। সে হিসাবে বেদের আকাশে ভাসমান দেবগণ বা উপনিষদের সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক ব্রহ্মণ, উভয়েরই সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। তাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সম্ভবত প্রলয়কর্তা শিব ছিলেন একটি ভূতপূর্ব দ্রাবিড় দেবতা। অপর পক্ষে কৃষ্ণের পূর্ণ মানবীয় চিত্র থেকে অনুমান হয় যে, তিনি ছিলেন কোন লোকপ্রিয় নায়ক, তাঁর যদুবংশে জন্ম, আদিম নিবাস মথুরা, পরে কাথিয়াওয়াড়ে দেশান্তরিত। নরদেবতার পদে উন্নীত হবার পর তিনি রাখাল দেবতা গোপালের সঙ্গে সম্মিশ্রিত হন। এই নররূপী দেবতাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ যুগপৎ পৌত্তলিকতা ও একেশ্বরবাদের পথ ধরলে। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ এই লোকরঞ্জন নরদেবতাদের একাধারে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের, ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কেমন ক'রে খাপ খাইয়ে নিতে হয় তা জানতেন। নতুন দেবতাদের পাশাপাশি তাঁর একটি বিশেষ বৈদিক দেবতাকে গড়ে তুল্লেন অথবা বেড়ে উঠতে দিলেন। তিনি হলেন সূর্য্যদেব বিষ্ণু, যিনি লোকসাধারণের ধর্মপ্রবণতাকে আশ্রয় দিয়ে একটি শক্তিমান সম্প্রদায় বা বৈষ্ণব ধর্ম পত্তন করলেন। তাঁরা পরে অথবা তখনই মেনে নিলেন যে কৃষ্ণ বিষ্ণুরই এক অবতার (ধরাধামে অবতীর্ণ, মনুষ্য দেহধারী দেবাত্মা)। অবশেষে তাঁরা স্বীকার করে নিলেন যে-নারায়ণ, বাসুদেব, বা ভগবৎ (ভগবত ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত) নামে বিষ্ণু-কৃষ্ণ, পরমেশ্বর বা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন। অপর-পক্ষে শিব, যিনি শৈবনামক বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের দেবতারূপে বিরাজ করছিলেন তাঁকেও ব্রাহ্মণগণ অধিকার করে বৈদিক রুদ্রদেবের (ঝড়ের অধিপতির) সঙ্গে

এক ক'রে নিলেন। বৈষ্ণবগণ, যাঁরা স্বভাবতই শৈব বিরোধী, তাঁরাও আনন্দে স্বাকার ক'রে নিলেন যে বিষ্ণু ও শিব দুজনে হরিহর নামে একটি দেবতার একীভূত হবেন। ব্রহ্মা নামক আর একটি নতুন ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট দেবতা সৃষ্টি ক'রে এই সঙ্কলনকে সম্পূর্ণ করা হল। তিনিও বিষ্ণু এবং শিবের আদর্শে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মণ থেকে উদ্ভুত, এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিত ভাবে পরে হিন্দু ত্রিমূর্ত্তিরূপ ধারণ করেন ; যদিও তিনি কোন কালেই তাঁদের মত লোকপ্রিয় দেবতা হতে পারেন নি।

মহাভারত ও রামায়ণ নামক দুই ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যে এই নবধর্ম্মের উৎপত্তি সুচিত হয়েছে। এই কাব্যদুটি যে সহস্রাব্দ গণনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয় সন্দেহ নেই। তার মধ্যকার কথাবস্তু হয় আর্য অভিযানের সমসাময়িক, নয় তারও পূর্ব্বতন কিম্বদন্তি ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এই সকল উপকরণকে সাজাতে গোছাতে বহু শতাব্দী লেগেছিল, সুতরাং যে সাহিত্যিক আকারে আমরা এখন এই মহাকাব্য পেয়েছি, তার প্রধান অংশগুলি কারো মতে খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার নয়, অপর মতে বর্তমান যুগের প্রারম্ভকালীন।

যদিও রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলী মহাভারতের পরবর্তী, তবু মনে হয় সে কাব্য পূর্বে রচিত। ম্যাক্‌ডনেল সাহেবের মতে, এই কাব্যের প্রাচীনতম অংশ আসলে একটি মাত্র লোকের রচনা ঃ—তিনি বাল্মীকি, খৃঃ পূঃ শতাব্দীর দিকে কোশল দেশে (অযোধ্যা) তাঁর বাস ছিল ; পরবর্তী অংশগুলি ক্রমশ ক্রমশ সংযোজিত হয়েছে, খৃষ্টীয় যুগারম্ভ পর্যন্ত। বস্তুত রামায়ণে যবন বা গ্রীক, শক, পহ্লব ও তুথার বা ইউ-চী, প্রভৃতি জাতির নাম উল্লেখিত হয়েছে, যা খৃঃপূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে ১ম বা ২য় খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভিন্ন তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয় বলেন যে যবন, শক, তুখার ও পহ্লবের নামোল্লেখকে কোনমতেই প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না ; অতএব মহাকাব্যটি নিশ্চয়ই সেই কালে রচিত হয়েছে যে কালে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে এই সকল জাতির উদয় হয়েছিল, অথবা বর্ত্তমান যুগের প্রাক্কালে। এদিকে রামায়ণের বিষয়বস্তু, অযোধ্যা বা কোশল রাজের রাম নামক পুত্র ও তাঁর সীতা নামক পত্নীর প্রেম ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী, লঙ্কার রাক্ষস দ্বারা সীতার হরণ ও তাঁর উদ্ধার,—

এটি আর্যগণ দ্বারা লঙ্কাবিজয়ের রূপক না সাধারণ কাহিনীমাত্র তা বলা যায় না।

অপর পক্ষে মহাভারত বাস্তবিকই একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে বোধ হয়; সেই মহাযুদ্ধ যাতে সেকালে পাণ্ডব ও কৌরব নামক দুই আর্য গোষ্ঠী কুরুক্ষেত্র এবং গঙ্গার মধ্যপ্রদেশের অধিকার নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এই পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন ক'রে, কাব্যরচয়িতাগণ বিবিধ-প্রকার ধর্ম, দর্শন এবং উপাখ্যান-সঙ্কলিত এত কথার অবতারণা করেছেন যে, মহাভারত প্রকৃত একটি বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে। তাহলেই বুঝতে হবে যে তার ভিন্ন ভিন্ন অংশ কত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত। তার প্রাচীনতম অংশগুলি ম্যাকডনেল সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত পিছিয়ে যায়; হেন্‌রির মতে চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত। দুজনেরই মতে এই মহাকাব্যটি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য যুগের যত কিছু জ্ঞানের শাস্ত্রীয় সার সংগ্রহ স্বরূপ ছিল। সে কারণে এই মহাকাব্যে শৈব ও বৈষ্ণব নব ধর্মের ছাপ থাকাই সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে, গ্রন্থের একাংশে শৈব প্রভাবই প্রবল ব'লে বোধ হয়। অপর পক্ষে অন্যান্য অনেক শ্লোকে বৈষ্ণব প্রভাবেরই জয় ঘোষিত হয়েছে, এবং কাব্যে পরিণত রূপে পাণ্ডবদের ছেড়ে কৃষ্ণের প্রতিই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষিত হয়, যিনি ব্রহ্মের অবতাররূপে কল্পিত। এই পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও শৈব ও বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্ট, এবং এস্থলেও সেই যবন, শক ও তুখারদের উল্লেখ থাকায় প্রমাণ হয় যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাভারতের শেষ সঙ্কলন হতে বাধ্য, তৎপূর্বে নয়। কিন্তু রামায়ণেও যেমন দেখা গিয়েছে, এ ক্ষেত্রেও সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয় মনে করেন যে এ সকল জাতির নাম কাব্যের অঙ্গীভূত, প্রক্ষিপ্ত নয়; অতএব মহাভারত ও আমাদের (=খৃষ্টীয়) অব্দের পূর্বে সঙ্কলিত হয়েছে বলতে হবে।

আদিম মহাভারতকে বৈষ্ণব ধর্মের ছাঁচে ঢালাই করবার দুটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন এই কাব্যে পাওয়া যায়; ভগবদ্গীতা এবং হরিবংশ। ভগবদ্গীতা, অথবা ভগবানের গীতি, কোন কোন ভারত-শাস্ত্রীর মতে খৃঃ পূঃ ১৫০—৫০ বৎসরের মধ্যে রচিত। যে মতবাদের ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায় সেটি ধর্ম ও দর্শন দ্বিবিধ রূপ নিয়েই আমাদের কাছে প্রকাশিত। দর্শনের দিক থেকে, এতে

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ এবং সাংখ্যের বহুবচনাত্মক শব্দনিচয়ের সম্মিলন ঘটেছে। উপনিষদের ন্যায় গীতাও সর্বভূতের অন্তরে একমাত্র সর্বব্যাপী আত্মাকে নির্দেশ করেন, সর্বত্রই যাঁর সমানরূপ। সর্বজীবের অন্তরে আত্মন্ এবং আত্মনের অন্তরে সর্বজীব দেখবার সাধনা করতে গীতা উপদেশ দেন, এবং এই আত্মনে লীন হতে বলেন, যিনি ব্রহ্মণ ছাড়া আর কেউ নয়। আবার গীতা একই সঙ্গে এই সর্বব্যাপী আত্মা, এই ব্রহ্মণ আত্মন্কে বলেন পুরুষ (অন্তরস্থিত আত্মা বা মানুষ) এবং তাঁর বহিঃপ্রকাশকে বলেন প্রকৃতি, বা তিন প্রকার বিশেষে ভাগযুক্ত নিসর্গ (ত্রিগুণাত্মক)। এই সকল মনোভাবের উপরেই সাংখ্যরূপ দ্বৈতবাদ ও বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ধর্মের দিক থেকেও গীতা প্রায় পরস্পর-বিরোধী দুই মতের সমন্বয় করেন; একদিকে ব্রহ্মণরূপ সম্পূর্ণ দার্শনিক সত্তা, যিনি এমন সূক্ষ্ম ও নিরাবলম্বরূপে কল্পিত যে, তাঁকে অস্তিত্ব নাস্তিত্ব উভয়েরই অতীত বলতে তাঁদের কিছুমাত্র বাধেনি; অপরদিকে নরনারায়ণ কৃষ্ণের প্রতি ব্যক্তিমূলক ভক্তি।

হরিবংশ এই একই ভাবে অনুপ্রাণিত। তার মধ্যে একটি সর্বাপেক্ষা মনোরম কাহিনী এই যে শিবের সহিত যুদ্ধকালীন একদা বিষ্ণুকৃষ্ণ হৃদয়ঙ্গম করলেন যে শিব ও ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর কি সুগভীর ঐক্য। ত্রিমূর্তির পথ দিয়ে প্রচলিত দুই লোকধর্মকে ব্রাহ্মণদের আত্মসাৎ করার যে-প্রচেষ্টা, এই খানেই তার সূত্রপাত দেখতে পাওয়া যায়।

মানব ধর্মশাস্ত্র, অথবা মনুসংহিতায় (অনেক ভারত-শাস্ত্রীর মতে বর্তমান অব্দের দুই শতাব্দী আগে বা দুই শতাব্দী পরে, সিলভ্যাঁ লেভির মতে ৩০০ খৃষ্টাব্দে রচিত) আমরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের এই প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ বিকাশের পরিচয় পাই। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই সৃষ্টির উৎপত্তি-তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই ব্রহ্মণ নিজ সত্তাকে ক্রমান্বয় সমষ্টি থেকে ব্যষ্টির দিকে সৃজন ক'রে চলেছেন, আবার নির্দ্দিষ্ট কালান্তে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে ফিরিয়ে আনছেন। এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয়ের দ্বৈত ছন্দে দোদুল্যমান পৃথিবী অনন্ত কাল-সাগর পার হয়। ভগবদ্গীতায় যেমন এখানেও তেমনি দেখতে পাওয়া যায় অদ্বৈতবাদের লিঙ্গরহিত নির্গুণ শুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্মণ-আত্মনের সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের বহুবচনাত্মক, যান্ত্রিক ও বিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিবাদরত সৃষ্টি তত্ত্ব পাশাপাশি একত্র

রয়েছে। এই ভূমিকার পরে, মনু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মতে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কর্তব্য নির্দেশ করে দিয়েছেন। আর শেষে ব্রহ্মাণে লীন হবার আনন্দ সম্বন্ধে একটি স্তব দিয়ে সমাপ্ত করেছেন।

ভারতবর্ষের দুটি মহাকাব্য এবং সমসাময়িক শাস্ত্রসকল সংস্কৃত ভাষায় লেখা (কাব্যের ভাষা পৌরাণিক সংস্কৃত এবং শাস্ত্রের ভাষা সনাতন সংস্কৃত); কিন্তু সংস্কৃত আর্য্যাবর্তের কথ্য ভাষা ছিল না; ছিল কেবলমাত্র সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ভাষা, যার নিয়মকানুন পাণিনি (অনুমান খৃঃ পূঃ ৩৫০ ?) কাত্যায়ন (অনুমান ২৫০ ?) ও পতঞ্জলি (অনুমান ১৫০ বা বরং পরে ?) প্রমুখ বৈয়াকরণিকগণ বিধিবদ্ধ করেছিলেন। পাশ্চাত্য মধ্যযুগের পক্ষে ল্যাটিন যেমন, ব্রাহ্মণ্য সমজের পক্ষে সংস্কৃত ছিল তাই। সাধারণের কথ্য ভাষা তখন ছিল প্রাকৃত বা লৌকিক ভাষাবলী, যেমন লাটিনের তুলনায় য়ুরোপের রোমক ভাষা সকল। অশোকের অনুশাসন এই ভাষাতেই রচিত; বৌদ্ধ পালিভাষা এই প্রাকৃত ভাষাবলীরই অন্যতম; সম্ভবত মালব দেশস্থ উজ্জয়িনীর অথবা যমুনাতীরস্থ কৌশাম্বীর ভাষা, যেটি স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের স্পর্শে পবিত্রীকৃত এবং সিংহলী হীনযান দ্বারা আমাদের কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছে।*

(ক্রমশঃ)

* শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী কর্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত রেণে গ্রুসে-র "ভারতবর্ষ" সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ্ প্রকাশ করিবেন।

অহিংসা

(৫)

কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরী সারিয়া উঠিলেন। এ কয়দিন কত লোক আসিয়া যে তার খবর জানিয়া গেল হিসাব হয় না। কেবল খবর জানা নয়, পায়ের ধূলা চাই। সদানন্দের আশ্রম জয় করিয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরীও পর্য্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন। লোকের ভিড়েই মহেশ চৌধুরীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, মাধবীলতাকে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়া কথায় কথায় এই বিপদের কথাটা শুনিয়া বিপিন ভাল পরামর্শ দিয়া গেল। পরদিন হইতে শশধর সকলকে একটি করিয়া তুলসীপাতা বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল—উঠানের মস্ত তুলসী গাছটি দেখিতে দেখিতে দু'একদিনের মধ্যে হইয়া গেল প্রায় ন্যাড়া। যারা আসে তাদের প্রায় সকলেই চাষী-মজুর কামার-কুমার শ্রেণীর এবং বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক—তুলসীপাতা পাইয়াই তারা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

বিপিন প্রত্যেক দিন খবর জানিতে আসে। কার খবর জানিতে আসে, মহেশের অথবা মাধবীলতার, সেটা অবশ্য ঠিক বুঝা যায় না। যদিও মহেশের কাছেই সে বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ, আলাপ করে নানা বিষয়ে। আশ্রমে বিপিনের কাছে মহেশ বহুদিন ধরিয়া যে অবহেলা অপমান পাইয়া অসিতেছে সে কথা কেউ ভুলিতে পারিতেছিল না, এখন মহেশের খাতির দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের কদমগাছের নীচেই কি মহেশের সব লাঞ্ছনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে? সদানন্দ কি সত্যই এতকাল মহেশকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, বিপিন এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলে তারই ইঙ্গিতে মহেশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেছিল? পরীক্ষায় মহেশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবার বিপিন বাড়ী আসিয়া তার সঙ্গে ভাব করিয়া যাইতেছে, সেবার জন্য মাধবীলতাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে?

বিপিন আসে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে, আর মহেশ চৌধুরীর ভক্তদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া ছাখে। কয়েক দিন পরে মহেশ চৌধুরীর আশীর্ব্বাদ

প্রার্থীদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতে থাকে, বিপিনের উৎসাহেও যেন ভাঁটা পড়িয়া যায়। প্রতিদিন আর তাকে বাগবাদায় দেখা যায় না। আসিলেও মহেশের কাছে সে বেশীক্ষণ বসে না।

মহেশ ব্যাকুলভাবে মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বিপিনবাবু যে আর আসেন না মা?'

মাধবীলতা বলে, 'কাজের মানুষ, নানা হাঙ্গামায় আছেন, সময় পান না।'

'বড় ভাল লোক। কি বুদ্ধি, কি কর্ম্মশক্তি, কি তেজ, কি উৎসাহ—সবরকম গুণ আছে ভদ্রলোকের। এমন একটা মানুষের মত মানুষ, জানো মা, আমি আর দেখি নি।'

বিপিনের এরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া মাধবীলতা হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। বুদ্ধি হয় তো আছে, কিন্তু বুদ্ধি থাকিলেই কি লোক ভাল হয় নাকি? ওই স্তিমিত নিস্তেজ মানুষটার কর্ম্মশক্তি, তেজ আর উৎসাহ!—যার মুখের চিরস্থায়ী বিষাদের ছাপ সংক্রামিত হইয়া মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগে?

এখানে মাধবীলতার ভাল লাগে না। মহেশ যে কদিন দক্ষিণের ভিটার ঘরটিতে দেড়শো বছরের পুরাণো খাটে শুইয়া জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে থাকিয়া থাকিয়া বলিত, 'ওরা আমার কাছে আসছে কেন? প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দাও ওদের', সে ক'দিন সেবার হাঙ্গামায় একরকম কাটিয়া গিয়াছিল, মহেশ সুস্থ হইয়া উঠিবার পর মাধবীলতার সব একঘেয়ে লাগে। গ্রামের মেয়েরা দু'চার জন করিয়া সকলেই প্রায় মাধবীলতাকে দেখিয়া গিয়াছে। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এদের মাধবীলতার ভাল লাগে না। তাই নিজেও সে এদের কাউকে কাছে টানিবার চেষ্টা করে নাই, নিজে হইতে তার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া ভাব জানাইবার ভরসাও এদের হয় নাই। বেড়াইতে আসিয়া অভদ্র বিস্ময়ের সঙ্গে এরা মাধবীলতাকে শুধু দেখিয়াই যায়। আশ্রমবাসিনী কুমারী সন্ন্যাসিনী (বয়স কত হইয়াছে ভগবান জানেন) সাধারণ বেশে আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করিতেছে, গাঁয়ের মেয়েদের কাছে সে কতকটা স্বর্গচ্যুতা অপ্সরী কিন্নরীর মত রহস্যময়ী জীব।

এখানে মানুষ নাই, বৈচিত্র্য নাই। স্নেহমমতা আদর যত্ন আছে, বিভূতির মা মেয়ের মতই মাধবীলতাকে আপন করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কেবল মেয়ের মত সব সময় একজনের আপন হইতে কি মানুষের ভাল লাগে? আশ্রমের জীবনের পর কেমন নীরস একঘেয়ে মনে হয়। আশ্রম নির্জ্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জ্জনতা; আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শান্তিও অসামান্য। কি যেন ঘটিবার অপেক্ষায় গাছ-পালায় ঘেরা আশ্রমের ছোট ছোট কুটীরগুলিতে প্রতিমুহূর্ত্তে উন্মুখ হইয়া থাকা যায়—মনে হয়, এই বুঝি আশ্রমের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্তভাব চুরমার করিয়া প্রচণ্ড একটা অবরুদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে, এমন একটা কাণ্ড ঘটিবে যা দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া নাচা যায়। এখানে কোনদিন কোন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিপিনকে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, 'উনি কি বললেন?'

'কিছু বলেন নি।'

'কিছুই না? একেবারে কিছু না?'

বিপিন মাথা নাড়িয়া বলে, 'কি বলবে? বলবার ক্ষমতা থাকলে তো বলবে। কি কুক্ষণে যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল মাধু।'

মাধবী ভয় ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকে। তার জন্য বিপিন আর সদানন্দের মনান্তর হইয়া গেল? জানালা দিয়া গ্রামের পথ দেখা যায়, বর্ষায় একেবারে শেষ করিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও ভালরকম মেরামত হয় নাই। পথের ধারে অবনী সমাদ্দারের বাড়ীর সামনে একটি গরু বাঁধা আছে। রোজই বাঁধা থাকে, ঘাসপাতা খায় আর কয়েকদিনের বাছুরটির গা চাটে। আজ বাছুরটি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য না? মাধবীলতা যেদিন যে-সময় কথা পাড়িল সে চলিয়া আসায় সদানন্দের কি অবস্থা হইয়াছে, সেইদিন সেই সময় বাছুরটি উধাও হইয়া গিয়া গাভীটিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে!

'আশ্রমের কিসে উন্নতি হবে সে চিন্তা ওর নেই, দিনরাত নিজের কথাই ভাবছে। আমার এটা হল না, আমার ওটা হল না, আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই। ওকে নিয়ে সত্যি মুস্কিলে পড়েছি মাধু।'

'কেন, উনি বেশ লোক।'

মাধবীলতার মুখে একথা শুনিয়া বিপিন প্রায় চমকাইয়া যায়। নৌকায় উঠিবার আগে রাগের মাথায় সদানন্দের কুটীরের দিকে পা বাড়াইয়া, ষ্টেজে সরলা কোমলা বনবালার অভিনয় করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গরম মেজাজে সাজঘরে ফিরিয়া আসা বেশ্যার মত ফুঁসিতে ফুঁসিতে মাধবীলতা যেসব কথা বলিয়াছিল বিপিন তার একটি শব্দও ভোলে নাই। জ্যোৎস্নালোকে দেখা মুখভঙ্গিও ভোলে নাই মাধবীলতার। সদানন্দের অত্যাচার মেয়েটার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার চোখের আড়ালে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিবার সুযোগ সদানন্দ পাইয়াছে ভাবিয়া সে রাগের চেয়ে অনুতাপের জ্বালাতেই জ্বলিয়াছিল বেশী। সে বিপিন, আশ্রমের কোথায় মাটির নীচে কোন চারার বীজ হইতে অঙ্কুর মাথা তুলিতেছে এ খবর পর্য্যন্ত যে রাখে, তাকে ফাঁকি দিয়া সদানন্দ এত কষ্ট দিয়াছে মাধবীলতাকে! কি হইয়াছিল তার? আগেই কেন সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে নাই? কেন আশ্রমকে চুলায় যাইবার অনুমতি দিয়া নিজে গা এলাইয়া দিয়াছিল অসহায় শিশুর মত?

সদানন্দের কুটীরের সামনে একটা কদমগাছের নীচে মহেশ চৌধুরীর মহাযুদ্ধ এবং মাধবীলতার মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধের সমাপ্তির পর কয়েকটা দিন যেভাবে কাটিয়াছিল ভাবিলে বিপিনের এখন লজ্জা করে। শরীরটা একটু দুর্ব্বল ছিল কিন্তু দাঁতের ব্যথা ছিল না। স্নায়ু ভোঁতা হইয়া থাকা উচিত ছিল বিপিনের, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে দু'তিনদিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানোই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে কি তীব্র মানসিক যন্ত্রণাই সে ভোগ করিয়াছে। বার বার কেবলি তার মনে হইয়াছে, সে কি ভুল করিয়াছে? ছলে বলে কৌশলে দিগন্তের কোল হইতে তার আদর্শের সফলতাকে আশ্রমের এই মাটিতে টানিয়া আনিবার সাধনা কি তার ভ্রান্তিবিলাস মাত্র? এভাবে কি বড় কিছু মানুষ করিতে পারে না? নিজের জন্য সে কিছু চায় না, এইটুকুই কি তার নৈতিক শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? ন্যায় অন্যায়ের বিচারের চেয়ে কার্য্যসিদ্ধিকে বড় ধরিয়া লইয়াছে বলিয়াই কি তার এত চেষ্টা আর আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মনে মনে নিজের দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের হিসাব করিয়া বিপিন বড় দমিয়া গিয়াছে। কতটুকু লাভ হইয়াছে, কতটুকু সার্থকতা আসিয়াছে? কোনদিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে? আশ্রম

বড় হইয়াছে, আশ্রমের সম্পত্তিও বাড়িয়াছে, লোকজনও বাড়িয়াছে, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। ভাল উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজিকে সে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, সে-সব একান্তভাবে তার নিজস্ব গোপন পরিকল্পনার অঙ্গ, আশ্রমের জীবনে কেন সে সমস্তের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া ওঠে? আর এদিকে মহেশ চৌধুরী, সরল নিরীহ বুদ্ধিহীন ভালমানুষ মহেশ চৌধুরী, না চাহিয়া তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়াছেন, না জানিয়া নিজের দুঃখময় ব্যর্থ জীবনকে পর্য্যন্ত সার্থকতায় ভরিয়া তুলিয়াছেন। কি এমন মহাপুরুষ মহেশ চৌধুরী যে তার পাগলামী পর্য্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয়? আর কি এমন অপরাধ বিপিন করিয়াছে যে, সকলে তাকে কেবল ফাঁকিই দেয়, সদানন্দ হইতে মাধবীলতা পর্য্যন্ত? এইসব ভাবিতে ভাবিতে বিপিন মড়ার মত বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াছে—অন্য মানুষ সে অবস্থায় ছটফট করে। সেই সময়েই বিপিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে ভাব করিয়া লোকটাকে একটু ভালভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে বিশেষ উৎসাহ তার ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে মহেশ চৌধুরীকে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর আশ্রমের পরিসর বাড়ান সম্ভব নয়, সম্প্রতি যে আমবাগানটা পাওয়া গিয়াছে তাই লইয়াই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং রাজাসায়েবের ভয়ে মহেশ চৌধুরীকে এড়াইয়া চলিবার আর তো কোন কারণ নাই। আশ্রমে অর্থ সাহায্য করাও রাজাসায়েব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিছুদিন আর পাওয়া যাইবে না। ভবিষ্যতে আবার যদি রাজাসায়েবের কাছে কিছু আদায় করা সম্ভব মনে হয়, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

এদিকে, যাদের চাষাভূষো মানুষ বলে, জনসাধারণ নামে আশ্রমকে যারা ঘিরিয়া আছে গ্রাম আর পল্লীতে, তাদের সঙ্গে আশ্রমের একটু যোগাযোগ ঘটানো দরকার। ওদের বাদ দিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ওদের সঙ্গে এখন যে সংযোগ আছে আশ্রমের, সে না থাকার মত। কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের নরনারী আশ্রমে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে এবং সদানন্দকে প্রণাম করিতে আসে, প্রণামান্তে কিছু প্রণামীও দিয়া যায়—কিন্তু সে আর ক'জন মানুষ, সে প্রণামী আর কত! তিনদিনের পথ হাঁটাইয়া অনেক দূরের

গ্রাম হইতে মানুষকে যদি আশ্রমে টানিয়া আনিতে হয় আর এক একদিনের প্রণামীর পরিমাণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেশের সর্ব্বত্র আশ্রমের শাখা খুলিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেওয়া সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য কিছু করা চাই, কেবল সদানন্দকে দিয়া কাজ চলিবে না।

মহেশ চৌধুরীকে এরা পছন্দ করে—এইসব সাধারণ মানুষগুলি।

মানুষটাও ভাল মহেশ চৌধুরী।

শিশুর মত সরল।

কয়েকদিন আসা-যাওয়া মেলা-মেশা করিয়া বিপিন কিন্তু একটু ভড়কাইয়া গেল। মহেশ চৌধুরীর আসল রূপটা সে আর খুঁজিয়া পায় না। ভালমানুষ, শিশুর মত সরল, কিন্তু জোর কই? আশ্রমের কদমতলায় তার যে মনের জোরের পরিচয় বিপিনকে পর্য্যন্ত কাবু করিয়া কয়েক দিন আনমনা করিয়া রাখিয়াছিলেন? ছেলের কথা বলেন, ঘরের কথা বলেন, নিজের কথা বলেন আর এই সব কথার মধ্যে ফোঁড়ন দেন ভগবানের কথার—শান্তি চাই মহেশের, শান্তি! অনেক দুঃখ পাইয়াছেন মহেশ, সে জন্য কোন দুঃখ নাই, এবার একটু শান্তি না পাইলে যে শেষ জীবনটাও মন দিয়া ভগবানকে ডাকা হয় না মহেশের!

'ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করিনি।'

মহেশ চৌধুরী কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলেন, 'এখনও আমার সঙ্গে ছলনা করবেন বিপিনবাবু? ভগবানকে ডাকার জন্য ছাড়া আশ্রম হয়! তবে ভগবানকে ডাকার সুবিধের জন্যে অন্য কিছু যদি করেন—সে সবও ভগবানকে ডাকারই অঙ্গ।'

'আপনি তো প্রভুর বাণী শোনেন?'

'শুনি বৈকি।'

'উনি কি কোনদিন বলেছেন, আশ্রমে যারা আছেন তাদের কাজ হল ভগবানকে ডাকা?'

'বলেন বৈকি— সব সময়েই বলেন। আমরা সবাই পাপী তো বিপিনবাবু?' প্রশ্ন শুনিয়া বিপিন গুম খাইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী সায় না পাইয়াও বলেন, 'মহাপাপী আমরা। আমাদের

কি ক্ষমতা আছে নিজে থেকে ভগবানকে ডাকবার? তাই যদি পারতাম বিপিনবাবু, মনে আমার এমন অশান্তি কেন—সকলের মনে অশান্তি কেন! প্রভু আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কি করলে ভগবানকে ডাকবার ক্ষমতা হয়, কি করলে আমরা ভগবানকে ডাকতে পারি। কাণ্ডারী একমাত্র ভগবান, কিন্তু গুরুদেবের চরণতরীই ভরসা—।' তর্কের কথা নয়, তর্ক বিপিন করে না, কথায় কথা তুলিয়া মানুষটাকে বুঝিবার চেষ্টা করে। অন্য সব দিক দিয়া সে হতাশ হইয়া যায়, একটিমাত্র ভরসা থাকে মহেশের নিজের বিশ্বাস, আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা। নিজে যা জানিয়াছেন তার বেশী কিছু জানিতে বা বুঝিতে চান না, সদানন্দের কথা হোক, শাস্ত্রের বাক্য হোক, তার নিজের ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা। এদিক দিয়া মহেশ ভাঙ্গিবেন কিন্তু মচকাইবেন না।

এ রকম মানুষ দিয়া বিপিনের কাজ চলিবে কি?

'আচ্ছা, প্রভু যদি আপনাকে কোন অন্যায় আদেশ দেন, সে আদেশ আপনি পালন করবেন?'

'প্রভু অন্যায় আদেশ দিতে পারেন না।'

'মনে করুন দিলেন—'

'ওরকম ছেলেমানুষী অসম্ভব কথা মনে করে কি লাভ হবে বলুন?'

বিপিনের ধৈর্য্য অসীম।

'ওঁর আদেশ অন্যায় আমি তা বলছি না। ধরুন, উনি ঠিক মত আদেশই দিয়েছেন, আপনার মনে হল আদেশটা সঙ্গত নয়। তখন আপনি কি করবেন?'

মহেশ নিশ্চিন্তভাবে বলেন, 'আদেশ অন্যায় বলে ওঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।'

'আদেশটা পালন করবেন তো?'

'উনি যদি আমার মনের ধাঁধা মিটিয়ে দিয়ে আদেশ পালন করতে বলেন, তবে নিশ্চয় করব।'

'আর যদি মনের ধাঁধা না মিটিয়ে শুধু আদেশ পালন করতে বলেন?'

মহেশ হাসিয়া বলেন, 'যান মশায়, আপনার আজ মাথার ঠিক নেই। ওরকম উনি কখনো বলতে পারেন ?'

'যদি বলেন ?'

'আপনি আবার সেই অসম্ভব কল্পনার মধ্যে যাচ্ছেন।'

বিপিনের ধৈর্য্য সত্যই অসীম।

'বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বলেন ? এতদিন আপনাকে সেরকম পরীক্ষা করছিলেন না, এই রকম কোন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আপনাকে অন্যায় আদেশ পালন করতে বলেন ?'

'পরীক্ষার জন্য ? আরও পরীক্ষা করবেন ?'—মহেশের মুখ চোখের পলকে শুকাইয়া যায়। ভীত সন্ত্রস্ত শিশুর মত অসহায় চোখ মেলিয়া তিনি বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। সদানন্দের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন কি ফেল করিয়াছেন আজও মহেশ চৌধুরী ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই, শুধু জানিয়াছেন যে সদানন্দ তাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, জানিয়া এই সৌভাগ্যেই সর্ব্বদা ডগমগ হইয়া আছেন। পরীক্ষার কথা মনে হইলেই তাঁর মুখ শুকাইয়া যায়।

বিপিনের পিছনে বিভূতির মা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। দুধের বাটি হাতে করিয়া আসিয়াছেন। দুধটা বেশী গরম ছিল, এমনিভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতেও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতে কোন বাধা হইতেছে না তাই এতক্ষণ দু'জনের অপরূপ আলাপে বাধা দেন নাই। এবার বলিলেন, 'বিপিনবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনি কথায় পারবেন না। গুরুদেবের সমস্ত আদেশ উনি চোখ কান বুজে মেনে চলবেন—ভাববেন না।'

তবু বিপিনের ভাবনার শেষ হয় না। এমন সমস্যায় সে আর কখনও পড়ে নাই। একটা মানুষকে গ্রহণ বা বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে যে এত ভাবিতে হয় বিপিনের সে ধারণা ছিল না। আশ্রমে যদি স্থান দেওয়া হয় মহেশকে, কাজে কি তার লাগিবে মহেশ ?

মাধবীলতাকে পর্য্যন্ত অন্যমনে এক সময় সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'মহেশবাবু লোক কেমন মাধু ?'

মাধবীলতা সংক্ষেপে বলে, 'ভাল নয়।'

সদানন্দকে মাধবীলতা ভাল লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। মনে পড়াতেও বিপিনের হাসি আসিল না। মাধবীলতা অন্য মানদণ্ড দিয়া বিচার করিতেছে—ভাল শব্দটায়ও অনেক রকম মানে আছে।

গম্ভীরমুখে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আশ্রমে ফিরে যাবে মাধু ?'

'যাব।'

'কি করবে আশ্রমে গিয়ে ?'

এ প্রশ্নের জবাব মাধবীলতা দিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের এই মুহূর্ত্ত

সাঙ্গ হোল আরাধনা এইবার নির্ব্বিকার মন।
অধুনা বেকার-বেশী শিয়রেতে শূন্য ভবিষ্যৎ।
সীমান্তে মহড়া চলে সমরের নব আয়োজন,
রৌদ্রতাপে ঘুরি ফিরি স্পর্শভিক্ষু যাযাবরবৎ।
পাটের কলের ঘরে রুদ্ধশ্বাস পথের বাতাস।
পাঞ্জাবীটা জোড়াতালি, চুলগুলি কটা তৈলহীন।
বেয়োনেট নিচে জ্বলে, বিমানেতে ভরেছে আকাশ,
কোথা থেকে এরি মাঝে এলে তুমি সোনালী আশ্বিন?

আজো কি বৈঠকে চলে আড়চোখে কঠিন তামাসা,
ঘাড় গুঁজে তাকিয়ায় নাসারন্ধ্র স্ফীত হ'য়ে নড়ে?
টাকা কুড়ি হ'লে পরে মেলে বটে মুখোস গ্যাসের,
কিন্তু তাতে কি-বা ফল! হে বণিক রাখা সে তুরাশা।
যুক্তরাষ্ট্র ভাগাভাগি যে সুযোগ এলো এতো পরে,
কী আশ্চর্য্য! সিমলায় সে সুযোগ নষ্ট হোল ফের॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কণিকা

দিনটা গোলাপী,
রঙ্গীন নেশায় ভরপূর দেহমন।
অকারণ আনন্দ
ক্ষণে ক্ষণে দোলা দেয়
আমার চিত্তটাকে।

বসে আছি আন্‌মনা,
—কি যে ভাবি জানিনা কিছুই ;
হাল্‌কা ভাবনার টুক্‌রো
পাখা মেলে চলে
অসীম আকাশে।

আমি বসে আছি ;
অতি দূর সঙ্গীতের মত
কানে ভেসে আসে
কিসের আভাস ?

সৃষ্টির রহস্য বুঝি !
যে আনন্দের ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঘাস জেগে ওঠে,
গাছে গাছে পাতা—
তারই এক কণা ছুঁয়ে গেল আমার প্রাণ,
সার্থক হ'ল সৃষ্টিছাড়া ভাবনা ॥

শোভা মহলানবিশ

ওরা

ওরা ঘোরে
জিঘাংসু শ্বাপদ সম রজনীর ঘন অন্ধকারে
অতৃপ্ত পিশাচ-যূথ
আশাহত মানুষের মৃত আত্মা যত
বীভৎস স্বপ্নের মত
পৃথিবীর শান্তি কেড়ে নেয়

ওরা
ঐ সব উপবাসী বিষণ্ণ প্রেতেরা
মাংসহীন রক্তহীন কঙ্কালের স্তূপ
(অসংখ্য নক্ষত্র যেন
বীতনিদ্র হিংস্র চোখগুলি লোলুপ হিংসায়)

উহাদের সবিষ নিঃশ্বাসে
বর্ণাঢ্য মেঘের
আর আকাশের রঙ মুছে আসে

সৌন্দর্য্য শ্মশান
মাঠে মাঠে ঝরে যায় সবুজ ফসল—কচি ধান
ঘাসও নাই
শীর্ণ গাভী ক্ষুধাতুর ঘুরিয়া বেড়ায়
প্রখর সূর্য্যের তাপে আকাশ কঠিন

বিশুষ্ক জমিতে শুধু
পদচিহ্ন স্পষ্ট উহাদের
শূন্যাশ্রয়ী নিরালম্ব নগ্ন পিশাচের

নীরস বাতাসে
বৃক্ষশাখা ফলপত্র হীন
ঘনাল দুর্দিন

হে বিধাতা
আমাদের কিছুদিন দিবে কী বাঁচিতে

সুকৃৎকুমার মৈত্র

চার অধ্যায়

[শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়-কে]

১

সচকিত জাগে ঘুমন্ত অমারাত,
অজানিত উষা আসে মন্থর পায়।
পাতালের গুহা-গহ্বরে বিপ্লব,
সুরধুনী-আলো নব ভগীরথে চায়।
কুঠার-দীপ্তি জনসমুদ্রে নামে,
তুষার-তুষ্টি ক্ষুরধার শঙ্কায়।

২

চুপি-চুপি কথা কয় তাহারা,
নতুন পাতায় ঘন শালবন।
নিথর ঘুমায় রাত বাহিরে,
এদিকে উধাও হ'লো প্রাণ-মন।
জ্যোছনা-উতল নিশি যাপিয়া,
কে জানে কোথায় যায় পাপিয়া!

৩

নিষ্ফল যদি মণি-আহরণ
স্বপ্ন তো আছে সন্ধানে,
তেপান্তরেই বিচরণ তবে,
শান্ত এ ঘোড়া পোষ মানে।
রাজনীতি চায় সততার জয়,
মন নিবৃত্তি সার জানে।

৪

লোল চর্ম্মের কুঞ্চনে জাগে সময়ের শিলালিপি।
মিথ্যার দূত পলাতক যৌবন।
পাহাড় ভেবেছে আপনারে মদ-গর্ব্বিত উইঢিবি ;
বিশ্ব অসীম—এবার তো মানে মন।
অনিত্য এই বেলাভূমে তবে বালির সৌধ নিয়ে
মিছে খেয়োখেই, অধিকার-বণ্টন॥

হরপ্রসাদ মিত্র

পুস্তক-পরিচয়

Moses and Monotheism—by Sigmund Freud (Hogarth Press) 8/6.

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাস্থাপন আজ প্রায় অসম্ভব : জটিল গণিতের সাহায্যে বরং বা প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবীই সৌর জগতের কেন্দ্র ; কিন্তু মানুষকে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিতে আর কোনো রাষ্ট্রপতিই ইচ্ছুক নন। অথচ মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মতবাদই ছিলো মানবসভ্যতার সামান্য লক্ষণ। অবশ্য তখনো কর্ত্তৃপক্ষ নিরীহনিগ্রহে কোথাও কার্পণ্য দেখাতেন না ; এবং আপন ভাগ্যনির্ব্বাচন দূরের কথা, অব্যাহত প্রতিযোগের পেষণে দৈবদত্ত ক্ষমতার বিকাশও ব্যক্তির কাছে দুঃসাধ্য ঠেকতো। তবে সেকালের অত্যাচারীরা সুদ্ধ লোকলজ্জার ভয় পেতেন ; একটা যেমন-তেমন বিপদের অছিলা ব্যতীত কেউই কখনো সাধারণের স্বাধীনতাসঙ্কোচে এগোতেন না ; এবং কার্য্যত দুর্ব্বলকে প্রবলের ক্রীতদাস ব'লে ভাবলেও, অন্তত বক্তৃতার সময়ে সকলেই এক বাক্যে মানতেন যে আমরা প্রত্যেকে ইচ্ছাশক্তির আধার তথা সদাচারে অধিকারী।

সে-আদর্শে বিশ্বাস রাখলে, অবচেতন মনের পরিকল্পনা স্বভাবতই অসহ্য লাগে ; এবং সেইজন্যে যখন ১৯১২ সালে ফ্রয়েড্-এর 'টোটেম্ এণ্ড্ ট্যাবু'-নামক বইখানি বেরোয়, তখন তার প্রতিবাদে পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই সমস্বরে মুখ ছুটিয়েছিলেন। কারণ তাতে পরীক্ষালব্ধ মনোবিকলনশাস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ক'রে ফ্রয়েড্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে মানুষের হৃদয়ব্যাপার কোন্ ছার, তার অধ্যাত্ম জীবনও অকথ্য প্রবৃত্তির লীলাভূমি, এবং ধর্ম্ম আধির সঙ্গেই তুলনীয়, উভয়ত্রই আমাদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধি-বিবেচনার চোখে ধুলো দিয়ে আপনার নিষিদ্ধ চরিতার্থতার সুবিধা খোঁজে। বলাই বাহুল্য যে এ-স্বীকারোক্তি মানুষী অহমিকায় এতখানি বাধে যে এ-প্রসঙ্গে নাস্তিকেরা সুদ্ধ ফ্রয়েড্-এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ; এবং জড়বিজ্ঞানের কল্যাণে ন্যায়নিষ্ঠ বিধাতার প্রতি তাঁদের ভক্তি যেহেতু তৎপূর্ব্বেই উবে গিয়েছিলো, তাই তাঁরাই

সর্ব্বাগ্রে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তাঁদের ব্যবহার যেমন নীতিপরায়ণ, তেমনি যুক্তিযুক্ত।

এতাদৃশ সর্ব্বসম্মতির আনুকূল্য সত্ত্বেও প্রাজ্ঞ মানুষের আত্মপ্রসাদ খুব বেশী দিন টিঁকলো না: বিগত মহাযুদ্ধের মারণ সে কোনো ক্রমে কাটিয়ে উঠলো বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী শান্তি তাকে ধনে প্রাণে মারলে; এবং তার পরে বিশ্লেষণী মনস্তত্ত্বের অনেক ছিদ্রই যদিচ আমাদের চোখে পড়লো, তবু আর কারো মনেই সন্দেহ রইলো না যে মনুষ্যসমাজ কেবল জাড্যগুণেই জঙ্গম। ফলত জীবের বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে ফ্রয়েড্ আবার প্রচার করলেন যে মৃত্যুই আদিম নিশ্চেষ্টার অন্তিম নিদর্শন, অপেক্ষাবাদী দার্শনিকেরা আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্মে 'ন্যূন চেষ্টা' বিধির সন্ধান পেলেন, এবং যেন তাঁদের অনুমানের প্রমাণ-স্বরূপ দেশে দেশে হরেক রকমের ডিক্টেটর পদানত প্রজাবর্গের উপরে অবাধ কর্ত্তৃত্ব খাটিয়ে দেখালেন যে মানুষে আর মেষে সত্যই কোনো তফাৎ নেই। অন্ততপক্ষে এ-সিদ্ধান্ত আজ তর্কাতীত যে বৃদ্ধেরাও শিশুদের মতোই নির্ব্বোধ ও আবেগসর্ব্বস্ব, এবং যে-প্রেরণায় তারা আজীবন চলে, তার উৎপত্তি পিতা-পুত্রের প্রাথমিক সম্পর্কে। উপরন্তু আমাদের উপর পিতার আবশ্যিক প্রভাব তাঁর দেহান্তেও ফুরোয় না, অন্তকালে আমাদের শাসনভার তিনি যাঁর হাতে দিয়ে যান, সেই প্রতিনিধিকেই আমরা কখনো ডাকি ভগবান-নামে, কখনো বা ভাবি নেতা ব'লে।

দুর্ভাগ্যবশত উক্ত হস্তান্তরপ্রথা স্বনির্ব্বাচিত নর্ডিক্-দের মধ্যেই প্রচলিত নয়, তথাকথিত "বৃত" জাতিও অনুরূপ চিরাচারের দাস। অর্থাৎ অপরাপর বিষয়ের মতো এখানেও য়িহুদিরাই জার্মান্দের গুরু; এবং এত শতাব্দীর চেষ্টা সত্ত্বেও তারা এখনো প্রায় সকল ব্যসনে জ্যু-দের পদানুসরণে বাধ্য ব'লেই, তাদের সীমাইট্-বিদ্বেষ সম্প্রতি হয়তো উন্মাদরোগে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই দুই জাতি পিতৃগ্রন্থিতে আবদ্ধ কিনা, সে-বিশেষ আলোচনার স্থান অন্যত্র; বর্ত্তমানে এইটুকুই স্মরণীয় যে দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে মানুষমাত্রেই পিতৃমুখাপেক্ষী; এবং শুধু তাই নয়, ব্যক্তির বেলায় এ-মনোভাব যেমন জন্মায় মাতার অনুগ্রহে পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে দেখে, তেমনি জাতি-নামক ব্যক্তি-সমষ্টির ক্ষেত্রে এর অস্তিত্ব অধুনালুপ্ত পিতৃতন্ত্রের স্মারক। সেই প্রাগৈতিহাসিক

যুগে যখন গোষ্ঠীর সকল নারীকে একা পিতাই ভোগ-দখল করতেন, তখন অপরাধীর পুরুষত্বহানি ভিন্ন অন্তর্ব্বিবাহনিবারণের আর কোনো উপায় ছিলো না। অথচ বহির্ব্বিবাহের অসুবিধা অনেক; পত্নীর লোভে প্রাণদান কারো মতেই প্রশস্ত নয়; এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড চির দিনই বিদ্রোহপ্রসূ। সুতরাং পৈত্রিক প্রতাপ শেষ পর্য্যন্ত টিঁকলো না: পুত্রেরা দল পাকিয়ে পিতাকে মেরে ফেললে; এবং সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যিক স্বৈর শাসনের স্থানে স্বাভাবিক স্বায়ত্তশাসনের আবির্ভাব হলো।

এই স্বায়ত্তশাসন সমাজবিজ্ঞানে মাতৃতন্ত্র-নামে পরিচিত; এবং এ-ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক লক্ষণ পশুপূজা। সে-পশু গোষ্ঠীপতি, অর্থাৎ পিতার প্রতীক; এবং তাই প্রত্যহ সে যেমন অর্চ্চনীয়, তেমনি বৎসরে এক দিন তাকে বলি দিয়ে তার রক্ত-মাংস না খেলে, পিতার প্রতিপত্তি ও পরাক্রম পুত্রদের আয়ত্তে আসে না। কারণ ইতিমধ্যে পিতৃহত্যার স্মৃতি তাদের মনে আদিম পাতকের আকার ধরে; এবং পাপবোধমাত্রেই নিউরোসিস্-এর অন্তর্গত; সে-আধির আবেশ থেকে তখনই মুক্তি মেলে, যখন পাপপরিস্থিতির পুনরভিনয়ে অবদমিত অভিজ্ঞতা অভীষ্টসিদ্ধির উন্মাদনায় অন্তত কিছু ক্ষণের জন্যে অতীত অপরাধ ভুলতে পারে। কিন্তু পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ এমনই মৌল, এতই সর্ব্বব্যাপী ও জটিল যে তার গ্রন্থি বছরে এক বার খুললেও, শান্তি পাওয়া যায় না। অতএব পশুপূজা ক্রমশ একেশ্বরবাদে বদলায়; মৃত পিতা অমর মূর্ত্তিতে ফিরে এসে সেই পশু-রূপী কলুষকে হয় মেরে ফেলেন, নয় তাকে বাহন বানিয়ে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়ান। তবে এ-বারে তাঁর আধিপত্য আর অত্যাচারের উপরে দাঁড়ায় না: তাদের যৌন জীবনের স্বাধীনতা বজায় রেখে, সন্তানেরা তাঁকে স্বেচ্ছায় ডেকে তাঁর হাতে তুলে দেয় ন্যায়বিচারের ভার; এবং এ-বন্দোবস্ত যেকালে তাদের নিজেদের মঙ্গলার্থে, তখন এর স্থায়িত্ব যেমন ভূতপূর্ব্ব পিতৃতন্ত্রের চেয়ে বেশী, তেমনই তারা ঠ'কে এর আদর করতে শেখে ব'লে, এ-অবস্থা বুদ্ধির দিক থেকেও সমধিক অগ্রসর।

ফ্রয়েড্-এর মতে উল্লিখিত ইতিহাস সকল ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু অন্যান্য মহামনীষীদের মতো তিনিও যেহেতু আপন জ্ঞানের সীমা জানেন, তাই এ-পুস্তকে তিনি তাঁর প্রভূত পাণ্ডিত্য দেখাবার প্রয়াস পান নি, যে-ধর্ম্ম তাঁর

আজন্মপরিচিত, তাতেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। এ-প্রসঙ্গেও তিনি যতটা মনস্তাত্ত্বিক, ততটা ঐতিহাসিক নন ; এবং এখানে তিনি যদিও তাঁর জাতিগত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সদা-সর্ব্বদা প্রস্তুত, তবু তাঁর প্রত্নতত্ত্বচর্চ্চা সর্ব্বত্রই গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ও নিউরোসিস্-এর প্রাক্প্রস্তাবিত উপমিতির পুনর্নির্ম্মাণ। অবশ্য সে-উপমিতি যাতে ঐতিহাসিক গবেষণার বিশ্বাসযোগ্য ফলাফল মেনে চলে, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবান। কিন্তু যে-গবেষণা তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে, তা কেবল জেলিন্-এর অনুমোদিত।

অর্থাৎ অন্যান্য গবেষকদের বৈমত্য সত্ত্বেও ফ্রয়েড্ জেলিন্-এর সঙ্গে মানেন যে মোজেস্ মিসরসম্রাট ইখ্নাটন্-এর একজন অমাত্য ছিলেন, এবং প্রভুর মৃত্যুর পর রাজকীয় একেশ্বরবাদ যখন ইজিপ্ট্ থেকে বিদূরিত হলো, তখন মোজেস্ পলাতক হিব্রুদের সেই ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়ে তাদের পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু য়িহুদিদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সে-সময়ে খুব উঁচুতে ওঠে নি। তাই তারা বেশী দিন নিরাকারের উপাসনা সইতে পারলে না, সনাতন রীতিতে পিতৃপ্রতিম মোজেস্-কে মেরে, আবার টোটেম্-পূজায় ফিরে গেলো। তবু বিবেকের দংশন থামলো না ; বরং প্রত্যাগত অধিষ্ঠাতা জাভে-র বজ্রনির্ঘোষ তাদের অহোরাত্র কাঁপাতে লাগলো ; এবং সেইজন্যেই অল্প দিন পরে মোজেস্-নামধারী আর এক নেতা যেই তাদের পুনরায় ব্রহ্মবাদের মন্ত্র শোনালেন, তারা তৎক্ষণাৎ তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে ভাবলে যে তিনি বুঝি সেই পুরাতন মোজেস্ যাঁর থেকে এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের, তথা নিহত প্রথম পিতার, বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। অন্ততপক্ষে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই সমীকরণই সুন্নতের একমাত্র ব্যাখ্যা ; এবং সে-সংস্কারের সূত্রপাত যেখানে বা যবে ঘটে থাক না কেন, তার উদ্দেশ্য যখন সর্ব্বত্রই শুদ্ধি, তখন তাকে পিতৃহত্যার প্রাক্তন পাতকের প্রতীকী প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দেখতে আমরা অতি অবশ্য বাধ্য।

সে যাই হোক, দ্বিতীয় মোজেস্-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই য়িহুদিদের উদ্গতির আরম্ভ আর যথার্থ একেশ্বরবাদের উৎপত্তি ; এবং পিতা-পুত্রের এই পুনর্মিলন যেহেতু অসহ্য সন্তাপের ফল, তাই হিব্রুরা ভবিষ্যতে আর কখনো তাঁকে ছাড়তে পারে নি, উল্টে প্রবক্তা-পরম্পরার মধ্যে তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি দেখেছিলো। অবশ্য শুধু পিতৃপ্রতিম ব'লেই জ্যুইশ্ প্রফেট্রা মহাপুরুষ-

পদবাচ্য নন, বুদ্ধি-বিবেচনায় ও আদর্শনিষ্ঠায়, কর্ম্মক্ষমতায় ও কবিত্বশক্তিতে, পুরাতত্ত্বে ও দূরদৃষ্টিতে তাঁদের সমকক্ষ মেলা ভার; এবং অন্যত্র জন্মালেও তাঁরা নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধি পেতেন। কিন্তু প্রসিদ্ধি আপনা আপনি লোকপ্রসিদ্ধিতে বদলায় না, মহত্ত্ব কেবল তখনই মাহাত্ম্যের পর্য্যায়ে ওঠে, যখন কোনো একজন মানুষ জ্ঞানত নিজেকে সমগ্র জাতিগত অচৈতন্যের আধার হিসাবে দেখে; এবং মৃত মোজেস্-এর শূন্য সিংহাসনে নিরন্তর আপনাদের বসিয়ে য়িহুদি প্রবক্তারা সে-জাতিকে তো পাপভয় থেকে মুক্ত করেছিলেন বটেই, এমনকি তজ্জনিত আশ্বাসের অভাবে জ্যু-রা আজ মাত্র ভাবয়িত্রী প্রতিভা নয়, কারয়িত্রী প্রতিভার জন্যেও ঈর্ষ্যাপর বিজাতীয়দের অভিশাপ কুড়তো কিনা সন্দেহ।

তবে প্রবক্তারা স্বজাতির ক্ষতিও কিছু কম করেন নি: তাঁদের কাছে পুত্রবৎ আচরণ পেয়েই য়িহুদিরা ধরাকে সরা ব'লে ভাবতে শেখে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়োজন ভোলে, বর্ত্তমানের দাবি-দাওয়ায় কান না পেতে সাধারণ আধিগ্রস্ত মানুষের মতো অতীতের পুনরভিনয়ে কাল কাটায়। সুতরাং যখন যীশু এসে আত্মবলিদানে আদিম পাপের প্রায়শ্চিত্ত সারলেন, তখন পিতা-পুত্রের চিরন্তন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তারা যোগ দিতে পারলে না, সেই নবজাত ঐক্যের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে পিতার দিকেই ঊর্দ্ধ নেত্রে তাকিয়ে রইলো। অর্থাৎ জ্যু-রা কখনো মানতে চায় নি যে তারাই এক দিন মোজেস্-কে প্রাণে মেরেছিলো; এবং এই অবদমনের ফলেই তারা আজও পৌত্তলিকতার উল্লেখে শিউরে ওঠে, ভগবানের নামকরণে বিরত থাকে, মুখে না মানলেও, মনে মনে বোঝে যে আধ্যাত্মিক প্রগতির নিয়ামক আর তারা নয়, সে-সম্মান এখন খৃষ্টানদের প্রাপ্য। তারা অনুতাপের জ্বালা জুড়তে গিয়ে অজ্ঞানত পিতৃপক্ষে ভিড়েছে; এবং সেইজন্যে পুত্রপূজা তো তাদের অসহ্য লাগেই, এমনকি স্বীকৃতিই যেহেতু মোক্ষলাভের অনন্য উপায়, তাই তাদের পাপবোধ কোনো কালেই কাটে না, পীড়নমাত্রই তাদের কাছে প্রাপ্য ঠেকে।

আকারে ক্ষুদ্র এবং পুনরুক্তিময় হলেও, "মোজেস্ এণ্ড্ মনোথীয়িজম্" ফ্রয়েড্-এর সর্ব্বশেষ রচনা। কিন্তু সেইজন্যেই এ-বইখানি মূল্যবান নয়; এর অভিপ্রায় এতই ব্যাপক যে-উল্লিখিত সংক্ষেপে এর মর্ম্মোদ্‌ঘাটন অসম্ভব, ববং

এ-ক্ষেত্রে সারসংগ্রহের চেষ্টাও অবিচার। কারণ এ-পুস্তকও যদিচ আগা-গোড়াই বিকলনী মনোবিজ্ঞানের দলিল, তবু এর সিদ্ধান্ত শুধু সামান্য মনের পরিচায়ক নয়, ফ্রয়েড্-এর নিজস্ব চিত্তবৃত্তি ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এতে যতখানি ধরা দিয়েছে, অন্যত্র তেমন ফুটে ওঠে নি; এবং এই স্বকীয়তা যেহেতু প্রমাণনিরপেক্ষ, তাই এখানে তর্ক-বিতর্কের উষ্ণাবোধ তো নেই বটেই, এমনকি এর একদেশদর্শিতাও ভিতরে ভিতরে অনেকান্ত। পক্ষান্তরে গ্রন্থখানির পটভূমি য়ুরোপীয় সভ্যতার চিতাগ্নিতে আলোকিত; এবং সে-আলোর দীপ্তি এমনই অন্তরস্পর্শী যে তার সম্মুখীন হয়ে ফ্রয়েড্-এর মতো নৈর্ব্যক্তিক পুরুষও অগত্যা আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। তবে সে-আত্মপ্রকাশ কোথাও অসংযত নয়, তার মধ্যে অভিযোগের নাম-গন্ধ নেই, তাতে আছে কেবল বিশ্লেষণ, অংশত আপনাকে, সাধারণত স্বজাতিকে যার প্রতিভূ ব'লেই, ফ্রয়েড্-এর স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য, সীমাজ্ঞান ও শালীনতা হয়তো আমরণ অবিকৃত ছিলো।

তাহলেও বইখানির মূল বক্তব্য আনুমানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট। তবে সে-কথা যখন ফ্রয়েড্ নিজেও জানতেন, তখন সে-বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার নিশ্চয়ই অশোভন। তৎসত্ত্বেও "মোজেস্ এণ্ড্ মনোথীয়িজম্" পড়তে পড়তে অনেকেরই স্মরণে আসবে যে য়ুং-এর বিবেচনায় আমাদের পারমার্থিক উপলব্ধি আধিজানিত নয়, অন্ততপক্ষে তার মধ্যে যৌনাতীত উপাদানও এত প্রকট যে তাকে কামপ্রবৃত্তির এলাকায় না আনাই সঙ্গত। শিষ্যের এই সিদ্ধান্তে গুরুর আপত্তি কোথায় ও কেন, তা এই পুস্তকে লেখা থাকলে, সাধারণ পাঠক বিশেষ ভাবে উপকৃত হতো। তত্রাচ ফ্রয়েড্ সে-তর্ক যেন ইচ্ছাসহকারেই এড়িয়ে গেছেন; এবং বিদ্রোহী শিষ্যের প্রতি তাঁর মন এমনই বিরূপ যে গোষ্ঠীগত অচৈতন্যের আলোচনায় নেমেও তিনি য়ুং-এর নাম নেন্ নি। অবশ্য এই নিরাধার অচৈতন্য তাঁর মতে কোনো অতিমর্ত্ত্য পদার্থ নয়, একে তিনি বহু ব্যক্তিগত অচৈতন্যের যোগফল ব'লেই ভাবতেন; এবং তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে ব্যষ্টির অসুখ সারলেই, সমষ্টির স্বাস্থ্য ফিরবে। কিন্তু সাম্প্রতিক জগতে সে-ধারণাকে তো টিঁকিয়ে রাখা শক্তই, এমনকি আজও যে-সমস্ত জাতি প্রাক্‌পৌরাণিক যুগেই আবদ্ধ রয়েছে, যন্ত্রসভ্যতার কবলে পড়ে নি, তাদের বেলাও ব্যক্তির মন আর গণের মন ভিন্নধর্ম্মী, হয়তো বা

বিপরীতধর্ম্মী। দুঃখের বিষয়, ফ্রয়েড্ নৃতত্ত্ববিদ্যায় বীতশ্রদ্ধ; এবং বোধহয় সেইজন্যেই তিনি এ-প্রশ্নেরও জবাব দেননি, কেবল মনোবিকলনের উত্তর সাক্ষ্যে প্রত্যক্ষদর্শী নৃতত্ত্ববিদেরা কেন মানবেন যে পিতৃতন্ত্র আর পশুপূজা পরস্পরবিরোধী, উভয়ের তাৎকাল্য কোনো সমাজেই সম্ভব নয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মৈত্র্যপনিষৎ ও বজ্রসূচিকোপনিষৎ—আদিনাথ আশ্রম হইতে, শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা।

অধুনা যে সকল উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই অথর্ব্ববেদের সহিত সংযুক্ত। কোন্ উপনিষদ্ কোন্ শাখার সহিত সংযুক্ত, প্রায়ই তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অথর্ব্ব উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। মুক্তিকোপনিষদের মতে ৩১ খানি উপনিষদ্ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। তাহার মধ্যে মৈত্রী উপনিষদের উল্লেখ নাই। শঙ্করাচার্য্য ১১ খানি উপনিষদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন।

শঙ্করের মতানুযায়ী নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ কয়েকখানি অথর্ব্ব উপনিষদের দীপিকা বা টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ২৮ খানি উপনিষদ্ পুণার আনন্দাশ্রম হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুণা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ মধ্যে মৈত্র্যপনিষদ্ সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৈত্রী উপনিষদের কতকগুলি শ্লোক মৈত্রেয়ু উপনিষদের শ্লোকের সহিত একরূপ।

বজ্রসূচিকা উপনিষৎ সামবেদান্তর্গত। মুক্তিকোপনিষদ্ বলেন যে ১৬ খানি উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত, তাহার মধ্যে বজ্রসূচিকা একখানি।

জীব দেহধারী হইয়া জগতে আসিয়াছে, দেহ-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়া তাহার স্ব সত্তা লুপ্ত হইয়াছে, সে দেহাত্মবাদী হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে তাহার মুক্তির জন্য যজ্ঞের প্রয়োজন। সেই যজ্ঞ হইতেছে যে জগৎ-উপাদানে নির্ম্মিত দেহসত্ত্ব আত্মসত্ত্বে উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইবে। আমার এই শরীর

এবং শরীর সম্পর্কীয় জগৎ-সম্পর্ক আত্মায় উৎসর্গ করিয়া পরমাত্মার চিন্তা করিতে হইবে।

ঋষি তদীয় উপাখ্যান বৃহদ্রথ রাজার আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন।

বৃহদ্রথ নামে কোন রাজা শরীরকে অনিত্য ভাবিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বনোগমন করেন। তথায় তিনি আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া সহস্র বৎসর তপস্যায় অতীত করিলেন।

সেখানে আত্মবিৎ ভগবান্ শাকায়ন্য মুনি বৃহদ্রথের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে রাজন্! উঠ, বর প্রার্থনা কর।" রাজা বৃহদ্রথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি আত্মবিৎ নহি, কিন্তু আপনি আত্মবিৎ, অতএব আপনি আমাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।"

গুরু বলিলেন যে, প্রকৃতিভাবসম্পন্ন শরীর হইতে উত্থান লাভ করিয়া, দেহের অভিমান পরিত্যাগ করতঃ, জীবাবস্থা অতিক্রম করিয়া জীব নিজ স্বরূপ লাভ করেন। ইহাই 'মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ' (গীতা—১৪।২)।

ঋষি সকল উপনিষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা রাজাকে দান করিলেন।

যিনি গুণযুক্ত এই শরীরের ঊর্দ্ধ দেশে তেজ স্বরূপে অবস্থান করিয়া যেন গুণগত হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা; শরীরের গুণ দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, জগতের কোন পদার্থের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই, অশান্ত শরীর মধ্যে শান্তভাবে তিনি বর্ত্তমান। তিনি আদি অন্ত বর্জ্জিত বলিয়া, সকল সৃষ্ট পদার্থ হইতে তিনি স্বতন্ত্র।

শরীর মধ্যে তিনি মনোরূপে অবস্থান করিয়া উপভোগাদি কার্য্য করিতেছেন ('অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুসেবতে'—গীতা—১৫।৯)। তিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি তাঁহার স্ত্রী। প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য মনোরূপে তাঁহার অবতারণা হইল। পরিশেষে শরীর সম্পর্কে মোহমুগ্ধ হইয়া, পূর্ব্বভাব ভুলিয়া, তিনি বদ্ধজীব হইলেন। ইহাই মনের ক্লীব ভাব বা বৈক্লব্য। এই স্বপ্নাবস্থা হইতে আত্মাকে জাগরিত করিতে হইবে। যখন গুরূপদেশে, মনের মোহ ঘুচিয়া

যাইবে, তখনই মতের ক্লীবভাব পরিত্যক্ত হইবে। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—'ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ'—২।৩।

আত্মা মনোরূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতিবশে এই শরীরকে বিষয় গ্রহণের জন্য ঘূর্ণায়মান করিতেছেন ('পরিভ্রমতীদং শরীরং চক্রমিব' ২।৬ খ)। গীতাতেও এই ভাবের একটি শ্লোক আছে, যথা—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

আত্মা দেহে কি ভাবে আছেন ?

ঋষি বলিতেছেন—'প্রেক্ষকবদস্থিতঃ স্বস্থশ্চ' অর্থাৎ অনাসক্তভাবে উদাসীনের ন্যায় কেবলমাত্র স্ব স্ব রূপে অবস্থিত।

যেমত কুম্ভকারের দ্বারা চালিত চক্রে ঘটাদিরূপে নানাভাবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, তদ্ভাবে অন্তঃপুরুষের দ্বারা চালিত চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ যন্ত্রে মন আরূঢ় হইয়া বহু আকার ধারণ করিতেছে। এই উপনিষদে গুরু উপদেশ দিয়াছেন যে কি বিধি অনুসারে ভূতাত্মা এই শরীর পরিহার করিয়া আত্মাতে গিয়া সাযুজ্য লাভ করিতে পারে।

এই উপনিষদের মধ্যে পরম জ্ঞানপূর্ণ কৌৎসায়নী স্তুতি আছে, যাহা সকলের পাঠ করা উচিত।

মন প্রকৃতি গর্ভে থাকিয়া আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে ঋষির উপদেশ মনন করিয়া গর্ভাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া নিবৃতত্ব লাভ করিল।

আলোচ্য গ্রন্থে মূল মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা, অবতরণিকা ও ভূমিকাসহ সহজ-বোধ্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যদিও মূল মন্ত্রগুলির সংস্কৃত ভাষায় অন্বয় লিখিত হয় নাই, তথাপি গ্রন্থকার তাঁহার ব্যাখ্যা এরূপ বিশদভাবে করিয়াছেন যে মূল মন্ত্রগুলি বুঝিতে কাহারও বিশেষ কষ্ট হইবে না। আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত যে, মন্ত্র সকলের মর্ম্মার্থ অবগতির জন্য সাধনা আবশ্যক।

বজ্রসূচী নামক যে উপনিষৎ, ইহা বজ্র অর্থাৎ হীরকের ন্যায় দীপ্তিমৎ এবং সূচির ন্যায় ভেদগুণাত্মক। ইহা অজ্ঞান ভেদক অর্থাৎ জীবের জ্ঞান চক্ষুর আবরণ করিয়া যে মালিন্য দোষ যুক্ত আবরণ তাহারই ভেদক। এই উপনিষদের বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে, কে ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

দেহসেবী হইয়া কেবলমাত্র গলদেশে উপবীত আকারে সূত্রগুচ্ছ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। কেবলমাত্র দেহসম্পর্ক স্বীকার করিলে জীবত্বই লাভ হয়, দেহসম্পর্ক ছাড়িয়া জীবত্ব অতিক্রম করিয়া, শিবত্ব লাভ করিয়া, ব্রাহ্মণ হইতে হয়। জাতিগত লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিচয় হয় না। আত্মসংস্কার যোগে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া, ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়। ব্রহ্মে গতি হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়।

সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক সমাধিযুক্ত কৌশিক, বল্মীক হইতে জাত বাল্মীকি, মৃগ হইতে উৎপন্ন ঋষ্যশৃঙ্গ, কলশ হইতে জাত অগস্ত্য, ভেকের গর্ভ হইতে জাত মাণ্ডুক্য, শূদ্রাণী গর্ভজাত ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত্ত্য কন্যা গর্ভজাত বেদব্যাস, উর্ব্বশীর পুত্র বসিষ্ঠ, তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। গীতাও এই কথাই বলিয়াছিলেন—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৯।৩০

সবই সাধনসাপেক্ষ, সাধনার দ্বারা ব্রহ্মদর্শী হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে, শ্রীভগবান্ চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন (গীতা—৪।১৩)। সচ্চিদানন্দরূপ প্রকাশিত ব্রহ্মধ্যানে থাকাই হইতেছে উপনিষদের উপদেশ।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার বিশদ ব্যাখ্যা, টীকা ও টিপ্পনী দ্বারা উপনিষদের মন্ত্রসকল সরলভাবে সকলের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন।

এই যুগে আমরা এইরূপ সারগর্ভ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

অধুনা সকলেরই ব্রাহ্মণ সাজিবার যুগে, এই উপনিষৎখানি, আমরা সকলকে

বিশেষ করিয়া জাতি-গত (অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মগত নয়) ব্রাহ্মণদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

স্বগত—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতী-ভবন। মূল্য ২॥০

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সমালোচনা বিভাগ উৎকর্ষে বা পরিমাণে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য ইহার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একেবারে বাল্যকাল হইতে বাংলা ভাষায় প্রাচীন ও নবীন, স্বদেশী ও বিদেশী, সর্ব্বকালের ও সর্ব্ব জাতীয় সাহিত্যের আলোচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনীর অসামান্য যাদুর ও তাঁদের ব্যক্তিত্বের অপূর্ব্ব স্বকীয়তার ফলে তাঁহার সাহিত্য সমালোচনা বেশির ভাগ স্থলেই হইয়াছে সাহিত্য সৃষ্টি। অর্থাৎ যে-সকল রচনা বা লেখকদের উপলক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন তাহারা তাঁহার সৃজনী প্রতিভার আড়ালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সুতরাং অনেক স্থলেই রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনা পড়িবার সময়ে তিনি কি বলিতেছেন তাহা পাঠকের মনে এত বড় হইয়া উঠে যে কি উপলক্ষ্যে তিনি বলিতেছেন তাহা মনে করিবার অবসর হয় না। অনেক স্থলে, সর্ব্বত্র নয়। কেননা একাধিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অতি নগণ্য রচনাও তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সকল দোষ গুণ এত পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে পাঠকের সম্মুখে তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই রচনাগুলি সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ স্থানীয়।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিশেষ করিয়া মনে পড়ে পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর কথা। বাংলা সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের রচনা সমগ্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি প্রথম ও বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত প্রধান। তাঁহার সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও উল্লেখযোগ্য।

অজিতকুমারের পর বহুদিন কেহ বাংলা ভাষায় বিদেশী সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা করেন নাই। তাই শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' বইখানি আমি বিশেষ মূল্যবান মনে করি, কেননা ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধের প্রেরণা জোগাইয়াছে বৈদেশিক সাহিত্য। এই সব প্রবন্ধের প্রায় সবগুলিই 'পরিচয়' পাঠকদের পরিচিত। তাই তাহাদের বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা, বিশেষভাবে তাঁহার সাহিত্য সমালোচনা, সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে।

সুধীন্দ্রনাথের প্রধান গুণ তাঁহার ব্যাপক দৃষ্টি ও তাঁহার প্রখর বিশ্লেষণ শক্তি। দেশকালগত পক্ষপাতিত্বের দ্বারা তাঁহার রুচি কলুষিত হয় নাই, সাহিত্যের যাহা শাশ্বত উপাদান তাহার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন এবং প্রাচীন বা আধুনিক যে কোন রচনার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে। এই জন্যই তিনি ধ্রুপদী পন্থার এত ভক্ত, ঐতিহ্যে তাঁহার এত গভীর বিশ্বাস। তাই তাঁহার কাছে একমাত্র অর্ব্বাচীন তাহাই ঐতিহ্যের ধারা হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন।

এই জ্ঞান একমাত্র সুধীন্দ্রনাথেরই আছে তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এত বিশদভাবে ইহার ব্যাখ্যা এবং স্বদেশী ও বিদেশী সমসাময়িক সাহিত্য-বিচারে ইহার এত তীক্ষ্ণ প্রয়োগ আর কোনো আধুনিক বাঙ্গালী লেখক করিয়াছেন কিনা আমি জানি না। সুধীন্দ্রনাথকে আধুনিক বাংলা লেখকদের মধ্যে তাই আমি একমাত্র সাহিত্য-সমালোচক বলিয়া মনে করি।

সমালোচক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাঁহার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা। দেশ বা কালের মোহ হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই তিনি এই কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেন যে বার্ণাড্ শ'র 'ম্যান্ এণ্ড স্যুপর্ম্যান্' পড়িতে পড়িতে তাঁহার ঘুম আসে, কিম্বা, একাধিক আধুনিক কবিরা "ব্যস্ত তাঁদের স্বকীয়তা প্রমাণে ; এবং ধ্রুপদী ঢং বর্ত্তমান কাব্যের ছদ্মবেশমাত্র, তার তন্মাত্র স্বকীয়তা, উদ্‌গ্র, আত্মজ্ঞ স্বকীয়তা। এই স্বকীয়তাই আধুনিক অনর্থের মূল..."

অপরপক্ষে নবীন লেখক উইলিয়ম ফক্‌নর-এর এক উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি বলিতে ভয় পান না ঃ

"...তরুণ লেখকদের মধ্যে একা উইলিয়ম ফক্‌নরই যে-বিশ্বব্যাপী অনুকম্পার পরিচয় দিয়েছেন, সে-করুণা থেকে পায়ে-চলা পথের ধূলিকণা পর্য্যন্ত বঞ্চিত নয়। সেইজন্যেই এই নীচতা ও নৃশংসতার কাহিনী মনো-মালিন্য আনেনা, জাগায় প্রমাদ। সেইজন্যেই এই বিকৃতচেতাদের আলাপে অন্তরে কলুষ ঢোকে না, আসে চিত্তশুদ্ধি। সেইজন্যেই নায়ক ক্রিস্‌মাস্‌ নিজের বিসদৃশ বিকটতা শেষ অবধি বজায় রেখেও বিশ্বমানবের প্রতিভূ। এতখানি সার্ব্বজনীনতা যে-পুস্তকের আছে, তার মধ্যে সহস্র ছিদ্র থাকলেও, তাকে মহৎ না বলা আমার মতে ভীরুতা।"

এই ভীরুতা সুধীন্দ্রনাথের নাই বলিয়া তিনি অকুণ্ঠভাবে মহৎ সাহিত্যের যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন তেমনি যেখানে ত্রুটি পাইয়াছেন তাহা নির্ম্মমভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের সকল তত্ত্বসম্বন্ধে যে-বিস্তারিত আলোচনা তিনি করিয়াছেন তাহা পড়িলে সত্যই মন আলোকিত হয়। সুধীন্দ্রনাথের বিশেষ দান বর্ত্তমান কালের যে-সাহিত্য অর্ব্বাচীন বলিয়া উপেক্ষিত বা উগ্রভাবে নবীন বলিয়াই যাহা সমাদৃত প্রখর বিশ্লেষণ দ্বারা সেই সাহিত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন। এই কার্য্যে তাঁহার সাফল্যের প্রধান সহায় আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁহার আশ্চর্য্য উপলব্ধি। আঙ্গিকের আলোচনায় তিনি যেমন একদিকে প্রাচীনতম বা আধুনিকতম মহৎ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তেমনি যাহা আধুনিকতার মুখোস পরিয়া মহৎ সাহিত্যের কোঠায় স্থান পাইবার চেষ্টা করে, তাহার মেকিত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

আঙ্গিকের বিশ্লেষণে সুধীন্দ্রনাথের অসাধারণ কৃতিত্বের একটি দৃষ্টান্ত দিই। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক লিটন্‌ ষ্ট্রেচি-র গদ্য রচনার বিশেষত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন ঃ

...তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর প্রত্যেক ভগ্নাংশই বৈশিষ্ট্যবিহীন, শব্দগুলি এতই অভিমানবর্জ্জিত যে তদ্দ্বারা নিকৃষ্ট দৈনিকের সংবাদ সরবরাহও সহজ ও সম্ভব, শুধু সামঞ্জস্য আর সঙ্গতির সংস্পর্শেই সে অসার ধ্বনি-পিণ্ড সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্যোতনা-ব্যঞ্জনার ভারবহনে সক্ষম। এইখানেই ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে রচনারীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ; এবং মানুষ জন্মগত পক্ষপাত পেরিয়ে

সামান্যতার সার্ব্বজনীন সঙ্গমে না পৌঁছলে যেমন ব্যক্তিস্বরূপে অধিকার পায় না, তেমনি লৌকিক ভাষা অলৌকিক স্তরে ওঠে বিষয়ের গুরুত্বে অথবা বহিরাশ্রয়ের জোরে।”

দুঃখ হয় লৌকিক ভাষা কি করিয়া অলৌকিক হইবার প্রক্রিয়া যাঁহার নিকট এত পরিষ্কার, তাঁহার নিজের ভাষার শব্দসম্ভার এত অলৌকিক যে তাহা কখনই লোকপ্রিয় হইতে পারিবে না।

বর্ষশেষ—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কবিতা-ভবন) দেড় টাকা।

চঞ্চলকুমার আধুনিকতম কবিদের একজন। তাঁহার বইখানি হাতে করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—প্রচ্ছদপট হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষায়, ছন্দে, বিষয়-নির্ব্বাচনে আধুনিকতমতার অভ্রান্ত ছাপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আধুনিক কোনো কবিতা মনকে যখন স্পর্শ করে, তখন আর তাহা আধুনিক বলিয়া মনে হয় না—মনে হয় শুধু তাহা কবিতা। চঞ্চলকুমারের কবিতা পড়িতে পড়িতে কোথাও ভুলিতে পারিলাম না যে তাহা আধুনিক—একেবারে অতি-মাত্রায় আধুনিক। ইহাতে ছন্দ-নৈপুণ্য আছে, ভাষার সৌষ্ঠব আছে এবং আছে সর্ব্বোপরি চমকপ্রদ চাতুরি। এক এক সময়ে এই চাতুরি মনে হয় একেবারেই অকারণ।

> শুনেছি চেকের স্বাধীনতা অধিকার
> ইসারায় সারে জনৈক হিটলার।
> দুর্দিনে তাই ভরসা বা করি কার।
> সস্তা বাটার জুতাও পাব না আর!

ইহা পড়িয়া নগ্নপদ হইবার আশঙ্কায় আকুল কবির প্রতি সমবেদনা হইতে পারে কিন্তু তাঁহার কবিতা সমাদরের প্রবৃত্তি হয় না।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা—রমাপতি বসু সম্পাদিত (উদয়াচল পাবলিশিং হাউস)

১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্কলন ক'রে সম্পাদক মহাশয় যদি ১৫৪৫ সাল পর্য্যন্ত স্মরণীয় হ'য়ে থাকেন ত' তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কারণ তিনি নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন, '২০০ বছর পরে যে কোন পাঠক আজকের দিনের কবিতার ধারা কিরকম ছিল তা এই সঙ্কলন মারফৎ বুঝতে পারবে।' তাতে ভরসা এই যে, এ দেশে অনাবৃষ্টি নেই ; তাই এই জাতীয় অনাসৃষ্টির আয়ু বড় অল্প।

আলোচ্য পুস্তকের বিশেষত্ব হচ্ছে সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা। মাত্র চার পৃষ্ঠার মধ্যেই ট্রট্স্কী, ইয়েটস্, স্পেণ্ডার, অডেন, পলগ্রেভ, কুইলার-কুচ, টমাস মন্ট, গগার্টি, মেরী ল্যাঙ, ডেকার, আণ্ড্রু মার্ভল, জন সকলিঙ্, টমাস হুড, ক্যাম্পিয়ন প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

এ সব ছাড়া তিনি এমন বহু নূতন তথ্য প্রচার করেছেন, যা শিল্পীদের দিয়ে বড় হরফে লিখিয়ে প্রদর্শনীতে টাঙানো চলে। ট্রট্স্কীর সঙ্গে যাঁর মত মেলে, ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতাই যাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাকে স্পর্শ করতে পারে না, তিনি কি একটা যে-সে লোক ?

অসমীক্ষ্যভাষিতা কর্কট রোগের মতো আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করেছে, জানি। কিন্তু তার মূল যে এত গভীর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে, তার পরিচয় এর আগে পাইনি।

সম্পাদক মহাশয়ের ত জানাই আছে দেখছি যে, 'গাঁইতির মুখ বড় ধারালো, তবু তার মুখ চাই তীক্ষ্ণ।' কিন্তু তবু তিনি কেন লেখনী নিয়ে বৃথা পড়ে আছেন ? 'গাঁইতির মুখ' 'তীক্ষ্ণ' করাই তাঁর পক্ষে ভাল। তাতে কবিরাও রক্ষা পান, পাঠক-দেরও অশান্তি ঘটে না। গাঁইতিকে ধারালো করা দরকার কি না তা 'দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা'তেই ধরা পড়ে ; কিন্তু কবিতা নির্ব্বাচনের জন্য চাই বোধশক্তি ও অনুভব সূক্ষ্মতা।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মরুযাত্রা—বিমল সেন (র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব)

গ্রন্থকার ছ' বছর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তেত্রিশ। আলোচ্য পুস্তকটি কত বয়সের রচনা তার পরিচয় প্রকাশক দেননি। বোধ করি শেষ বয়সের হবে, তাহলেও তখন তিনি নবীন। হৃদয় আশা ভরসায় ভরা ও উত্তেজনায় উদ্বেল ছিল সন্দেহ নাই। কল্পনার প্রসার দেখে তাই মনে হয়। প্রচ্ছদপটে উদ্ধৃত অংশটির মতো অনেক স্থান ভাবালুতার আধিক্যে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু ভাষার সংযম ও উৎকর্ষ বিস্ময়কর। বাক্যগুলি ঝরঝরে ও বাহুল্য বর্জ্জিত। গল্পের গতি ক্ষিপ্র অথচ সুসংযত ও সাবলীল।

প্রকাশক নিবেদন করেছেন যে গ্রন্থখানি প'ড়ে বাংলার কিশোর কিশোরীরা আনন্দ পেলেই তাঁদের প্রকাশ ক'রবার উদ্যম সার্থক হবে। এ বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন ছিল না। রচনাটি শুধু তরুণ কেন বহুদর্শী প্রবীণ পাঠককেও আকৃষ্ট ক'রবে।

একটা কারণ হচ্ছে এখানি বিলাতী গ্রন্থের নকল নয়। ইউরোপীয় বয়স্কাউট্ ও গার্লগাইড্ মণ্ডলীর মধ্যে যে জাতীয় 'এ্যাড্ভেঞ্চার'-সাহিত্য প্রচলিত আছে এখানি সে শ্রেণীর নয়। এতে তিনজন বাঙালী যুবকের বীরত্ব-গাথা বিবৃত হয়েছে বটে কিন্তু ঘটনার বিন্যাস এত অসম্ভব ও আজগুবি যে পাঠকের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম জাগরিত না হয়ে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ পরী-কাহিনীর আবহাওয়া সৃষ্ট হয়। বিলাতি রচনার মধ্যে ভৌগলিক বর্ণনাগুলি থাকে নিখুঁত ও আলোকচিত্রের মত ত্রুটিহীন, কিন্তু বর্ত্তমান মরুচিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে নিছক কল্পনার তুলি দিয়ে, তাই তা এতখানি অবাস্তব রকমের রঙিন ও মসৃণ। ঊষার অরুণাভা ও সূর্য্যাস্তের বর্ণবৈচিত্র্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রশস্তিকীর্ত্তন এত স্বল্পবাক্ যে দুর্ব্বল গল্পের ওপর দুর্ব্বহ ভাবে চেপে না বসে হীরক চূর্ণের মত ছড়িয়ে গেছে।

গল্পটি যে দুর্ব্বল নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত সারে তা' বোঝা যাবে।

তিনটি তরুণ যুবক এক কলেজের ছাত্র। পরম বন্ধু। একজন অপেক্ষাকৃত কিছু বড়। একদিন তারা বিদ্যালয়ের ইংরাজ অধ্যক্ষের দ্বারা অপমানিত হয়ে

তাঁর বাড়ী চড়াও করলো প্রতিবাদ জানাতে। ঠিক সেই সময় একটি দুর্দ্দান্ত পেশোয়ারী গুণ্ডা সাহেবের মস্তিষ্কে লগুড়াঘাত করে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় অপহরণ করে পালিয়ে গেল। ছাত্ররা আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করে নিজেরাই ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে গেল। সাজা অনিবার্য্য দেখে ফেরার হলো তারা। কলিকাতার কোন নৈশ বৈঠকে গুণ্ডার সন্ধান মিললো কিন্তু অপহৃত অলঙ্কার পাওয়া গেল না। যুবকত্রয় ছুটলো তখন সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অভিমুখে দুরাত্মার সন্ধানে। সেখানে সামান্য কিছু কৌশল প্রয়োগেই অঙ্গুরীয়ের উদ্ধার হলো কিন্তু বিপদ হলো সুরু। দলে দলে সশস্ত্র অশ্বারোহী গুণ্ডাবাহিনী তাড়না করে তাদের নিয়ে ফেল্লে মরুবক্ষের ওপর। গ্রন্থকারের সহায় সত্ত্বেও ক্ষিপ্রগামী ও সংখ্যা-গরিষ্ঠ শত্রুর দল তাদের প্রায় ধরে ফেলেছিল এমন সময় এল প্রবল ঝড়। সে দুর্দ্দম দুরন্ত ঝড়ে বাহিনীর অধিকাংশের হলো জীবন্তে কবর। উদভ্রান্ত বন্ধুত্রয় ছিটকে গেল ভিন্ন প্রান্তে। সেখানে হলো এক অভাবনীয় কাণ্ড। পূর্ব্বকথিত প্রিন্সিপাল-এর সহধর্ম্মিণী চলেছিলেন নিকটস্থ কোন সৈন্যনিবাসে স্বামীর সন্ধানে। ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন মরুবক্ষে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় হয়ে—আর্ত্তনাদ অনুসরণ করে যুবকদের একজন এসে পড়লো। দেখে ডুলির দ্বারদেশে প্রকাণ্ড এক সিংহ। হিংস্র পশু পিস্তলের গুলিতে নিহত হলো কিন্তু মেম সাহেব বাঁচলেন না। দেহত্যাগ করবার পূর্ব্বে যুবকদের হাতে তুলে দিলেন একটি নবজাত শিশু। ডুলির মধ্যে হরলিক্স পাওয়া গেল কিন্তু জলের অভাব মোচন হলো না। শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে তারা উদভ্রান্তের মত ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন হয়ে পড়লো। সেনানিবাসের দিশা মিললো না। ঊর্দ্ধের আকাশ, নিম্নের স্বর্ণরেণু ও সঙ্গের ছোট্ট বদনমণ্ডলটির অলৌকিক সৌন্দর্য্য তাদের মনোরঞ্জন ক'রলেও ক্লান্তি বিনোদন করলো না। যুবক তিনটির একজন বক্ষপঞ্জরের মধ্যে কার্তুজ বহন করে চলেছিল সঙ্গী-দ্বয়ের অজ্ঞাতে। সে ক্ষতস্থান পচে উঠলো। প্রবল জ্বর ও অসহনীয় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জলের অপব্যয় বন্ধ করবার জন্যে সে আত্মঘাতী হলো। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় যুবক তার পদানুসরণ করলো শিশুটির মুখ চেয়ে। কনিষ্ঠ যুবক তখন দায়ীত্বভার স্কন্ধে নিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে ছুটলো মরীচিকার পিছে পিছে। সাহসীমার শেষ প্রান্তে এসে সন্ধান মিললো একটি নির্ঝরিণীর—কিন্তু সেখানকার

জল বিষাক্ত। আশে পাশের শিলা-খণ্ডগুলি জীবজন্তুর মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন। যে কাষ্ঠখণ্ডের ওপর জলের বিষাক্ততার কথা বিজ্ঞাপিত ছিল তারই অপর পার্শ্বে পাওয়া গেল সেনানিবাসের দিক-বৃত্তান্ত। বিষাক্ত জল আকণ্ঠ পান করে যুবক শরীরকে কার্য্যক্ষম করে নিয়ে ছুটে গেল ঊর্দ্ধশ্বাসে। শেষের দৃশ্যটি সহজেই অনুমেয়। গীর্জ্জার অভ্যন্তরে সমবেত ইংরাজ ভদ্রমণ্ডলী পরিবেষ্টিত প্রিন্সিপালের পদপ্রান্তে শিশু ও অঙ্গুরীয় স্থাপন করে মহাপ্রয়াণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে সকল ঘটনা বিবৃত করে গেল।

যুবকত্রয়ের এ আত্মাহুতির কোন অর্থ হয় না কিন্তু গ্রন্থকারের অসুবিধা বোধগম্য। বাঙ্গালীর ছেলের বীরত্বপূর্ণ কীর্ত্তিকলাপের উপসংহার আর কী হতে পারে? ইউরোপীয় বালকের বড়লাট ছোটলাট প্রভৃতি অনেক কিছু হবার লোভনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে। পাঞ্জাবী যুবক হাভিলদার হতে পারে কিন্তু বাঙ্গালী—নিষ্ফল পরাক্রমে পাথরে মাথা ঠুকে মরা ছাড়া কোন উপায় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থে ঘটনাপরম্পরার মধ্যে অভাবনীয় ব্যাপারের অভাব নেই অথচ শক্তিহীন ভাবে বিবৃত হয়েছে। যুবকেরা যখন মরুগহ্বরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে এবং আক্রমণকারী দুর্দ্ধর্ষ পাঠান শ্রবণ-সান্নিধ্যের মধ্যে এসে পড়েছে তখন তারা গলা ছেড়ে গান গাইতে সুরু করে দিল। এইরূপ বহু অকারণ প্রগল্‌ভতা গল্পের মধ্যে নাটকীয় শক্তি সঞ্চারের সম্ভাবনা নষ্ট করেছে। কিন্তু সে সব গ্রন্থকারের ইচ্ছাকৃত অপরাধ। নায়কের সমুত্থান যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে শক্তির যোজনা নিরর্থক।

তথাপি অন্যান্য শিশু-সাহিত্যের চেয়ে এখানি আমার ভাল লেগেছে যেহেতু এতে বিলাতী গল্পের ছায়াপাত নেই। কোন সাহিত্যই ঋণলব্ধ মূলধন অবলম্বনে স্বাস্থ্যবান হতে পারে না এই দুর্বোধ্য সত্যটি গ্রন্থকারের বোধগম্য হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর লেখবার সম্ভাবনা ক্ষান্ত হয়ে গেছে।

সজনীবাবু ভূমিকাতে লিখেছেন যে গ্রন্থকার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের ভবিষ্যৎ-পথ আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুতীর্থে পৌঁছে গেছেন।

সামান্য যে কয়টি রচনা দিয়ে আমাদের আশাকে উদ্দীপিত ক'রে তিনি সরে পড়লেন তার মধ্যে তাঁকে চিরকাল মনে রাখবার মত বস্তু হয়ত অনেকে খুঁজে পাবেন না কিন্তু যাঁরা সহৃদয় তাঁদের অনেক অশ্রুমোচন করবার কারণ রচনাগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

গ্রন্থকারের অন্য কোন রচনার সঙ্গে পরিচিত হইনি কিন্তু এখানি প'ড়ে আমি সজনীবাবুর ক্ষোভ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করেছি।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

পরিচয়

জীবের সাংপরায়

উপনিষদ্ বলেন—

> ন সাংপরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্—কঠ, ২।৬

'যাহারা প্রমত্ত, বিত্তমোহে মূঢ়—'সাংপরায়' তাহাদের চিত্তে প্রতিভাত হয় না।'

সাংপরায় অর্থে পরলোকতত্ত্ব—পশ্চিমে যাহাকে 'Eschatalogy' বলা হয়—'the Doctrine of the last or final things, as death, judgment, the state after death.' সাংপরায় সম্পর্কে উপনিষদের উপদেশ কি? আমরা দেখিয়াছি, 'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যতি?'—এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—জীব মৃত্যুর পর পরলোকে উৎক্রান্তি করে এবং তাহার সঙ্গে যায় তাহার 'বিদ্যাকর্মণী'। পরলোকে তাহার গতি হয় কর্মানুসারে—'যথাকর্ম যথাশ্রুতম্'।

কারণ, পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ ৩।২।১৩

'লোকে পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান্ হয় এবং পাপকর্মের ফলে পাপী হয়।'

পুনশ্চ—যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৪।৪।৫

'যে যেরূপ কর্ম করে, আচরণ করে, সে সেই প্রকার হয়—সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়; লোকে পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, পাপকর্মের ফলে পাপী হয়।'

সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম—'As you sow, so verily shall you reap.'

সে জন্য উপনিষদ্‌ কর্মের উপর বিশেষ 'ঝোঁক' দিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে দেখি আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলে—যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি—'মৃত পুরুষ কোথায় থাকে?'—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'হে সোম্য! সজনে ইহা আলোচ্য নহে—উঠিয়া আইস, নির্জনে আলাপ করি।'

তৌ চোৎক্রম্য মন্ত্রয়াংচক্রাতে, তৌ হ যদ্‌ উচতুঃ
কর্ম হৈব তদ্‌ উচতুঃ, অথ যৎ প্রশংশসতুঃ
কর্ম হৈব তৎ প্রশংসতুঃ—বৃহ, ৩।২।১৩

'তাঁহারা নিভৃতে যে আলাপ করিলেন, তাহা 'কর্ম' সম্বন্ধে, তাঁহারা যাহার প্রশংসা করিলেন তাহা কর্মেরই।'

কারণ, শঙ্করের ভাষায়, কর্ম হৈব আশ্রয়ং কার্যকরণোপাদান-হেতুম্‌ (কর্মই দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধাত্মক সংসারের হেতুভূত)। কিন্তু এমন ত' জীব আছে, যাহাদের 'কর্ম' নাই—তাহাদের মৃত্যুর পর কিরূপ গতি হয়?

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি ত্রিবিধ জীবের উল্লেখ আছে—উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জীবজ।

তেষাং খলু এষাম্‌ ভূতানাম্‌ ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজম্‌, জীবজম্‌, উদ্ভিজ্জম্‌ ইতি।

এখানে স্বেদজের উল্লেখ নাই। শঙ্করাচার্য বলেন স্বেদজ উদ্ভিজ্জেরই অন্তর্গত। ঐতরেয় উপনিষদে স্বেদজের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

ইতরাণি চ ইতরাণি চ অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চ—ঐত, ৫.৩
[জারুজানি (জরায়ুজানি) = মনুষ্যাদীনি—শঙ্কর]

অতএব আমরা চতুর্বিধ জীবের কথা পাইলাম—উদ্ভিজ্জ (তরুলতাদি), স্বেদজ (দংশমশকাদি), অণ্ডজ (পক্ষী সরীসৃপাদি) এবং জরায়ুজ (পশু মনুষ্যাদি)। ইহাদিগের মধ্যে মনুষ্য ভিন্ন আর কোন জীবই 'কর্ম' করে না। এখানে 'কর্ম' অর্থে শারীরিক চেষ্টা মাত্র নয়, 'কর্ম' অর্থে সঙ্কল্প-পূর্বক ক্রিয়া, যাহাতে কর্তৃত্ব-বুদ্ধি থাকে, —যাহা কামনা দ্বারা প্রেরিত হয় এবং আশয় (motive) দ্বারা প্রণোদিত হয়। উদ্ভিদ্‌ ও কৃমিকীটের ত কথাই নাই, পশু-পক্ষীতেও ঐ জাতীয় 'কর্ম' দৃষ্ট

হয় না। তাহাদের কর্ম্মই যদি না থাকে তবে তাহার ফল স্বরূপ 'সাংপরায়' হইবে কিরূপে? সেইজন্য অনেকে (যেমন খৃষ্টানেরা) পশু পক্ষীর 'soul' স্বীকার করেন না। থিয়সফিষ্টেরাও বলেন মনুষ্য ভিন্ন অপর কোন জীবের 'individual soul' নাই, মাত্র group-soul আছে। এই group-soul-কেই সম্ভবতঃ উপনিষদে 'জীব' বলা হইয়াছে। একটি মহীরুহকে লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

অস্য সোম্য! মহতো বৃক্ষস্য যো মূলে অভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ, যো মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ, যোঽগ্রে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ। স এষ 'জীবেন' আত্মনা অনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানঃ তিষ্ঠতি—৬।১১।১

'হে সোম্য! যদি কেহ এই মহীরুহের মূলে আঘাত করে, তবে রসস্রুতি হইবে কিন্তু বৃক্ষ জীবিত থাকিবে; যদি কেহ মধ্যে আঘাত করে, তবে রসস্রুতি হইবে কিন্তু বৃক্ষ জীবিত থাকিবে; যদি কেহ অগ্রে আঘাত করে, তবে রসস্রুতি হইবে কিন্তু বৃক্ষ জীবিত থাকিবে। কারণ, সেই বৃক্ষ 'জীব'-আত্মা দ্বারা পরিপূরিত হইয়া রসপান করিয়া মোদমান হইয়া অবস্থিত থাকিবে।'

কিন্তু—অস্য চেদ্ একাং শাখাং জীবো জহাতি অথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাতি অথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাতি অথ সা শুষ্যতি, সর্বং জহাতি সর্বং শুষ্যতি—৬।১১।২

'কিন্তু জীব যদি প্রথম শাখা ত্যাগ করে, তবে সে শাখা শুষ্ক হয়; দ্বিতীয় শাখা ত্যাগ করে, সে শাখা শুষ্ক হয়; তৃতীয় শাখা ত্যাগ করে, সে শাখা শুষ্ক হয়; সমস্ত শাখা ত্যাগ করে, সমস্ত শুষ্ক হয়।'

অতএব ঋষি বলিতেছেন—

জীবাপেতম্ বাব কিলেদম্ ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।

'অতএব জীবাপেত বৃক্ষই মৃত হয়, জীবের মৃত্যু হয় না।'

ঐ যে 'জীব'-আত্মা, ইহা কেবল উদ্ভিজ্জের মধ্যেই অনুস্যূত আছে তাহা নয় —কৃমিকীট প্রভৃতি স্বেদজ, পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডজ এবং পশু প্রভৃতি জরায়ুজ প্রাণি-জাতের মধ্যেও অনুস্যূত আছে। এই 'group-soul' কিরূপে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর আবসথ আশ্রয় করিয়া চরমে মনুষ্যে ব্যক্তিত্বাপন্ন বা 'individualised' হয়, সে অনেক কথা। বর্ত্তমানে তাহা আমাদের আলোচ্য নয়; আমাদের লক্ষ্য

করিবার বিষয় এই যে মনুষ্যেতর এই সকল জীবের 'কর্ম' নাই সুতরাং তাহাদের পরলোকও নাই। তবে দেহান্তে তাহাদের কি গতি হয়? ইহাদিগের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন—

অথ এতয়োঃ পথো র্ন কতরেণ চ ন তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃৎ-আবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি; জয়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থানং। তেন অসৌ লোকঃ ন সংপূর্যতে
—ছাঃ, ৫।১০।৮

অর্থাৎ, কর্মী মনুষ্যের জন্যই পিতৃযান ও দেবযানগতি। ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রাণী ঐ দ্বিবিধ যানের কোন যানেই উৎক্রান্ত হয় না। তাহারা 'অসকৃৎ-আবর্তীনি' অর্থাৎ, শঙ্করাচার্যের ভাষায়,—

উভয়মার্গ-পরিভ্রষ্টাঃ হ্যসকৃৎ জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ * * জননমরণক্ষণেনৈব কালযাপনা ভবতি—নতু ক্রিয়াসু ভোগেষু বা কালোঽস্তি।

এই সকল প্রাণীর 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান এবং যেহেতু তাহাদের পরলোকগতি নাই, অতএব সে লোক কখনও পরিপূর্ণ হয় না।

বৃহদারণ্যকও এই মর্মে বলিয়াছেন—

অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যদিদং দন্দশূকম্—বৃঃ, ৬।২।১৬

অর্থাৎ কীট পতঙ্গ দংশমশকাদি ঐ উত্তর ও দক্ষিণ মার্গের কোনটিই প্রাপ্ত হয় না—কারণ, উত্তরস্য দক্ষিণস্য বা পথঃ প্রতিপত্তয়ে জ্ঞানম্ বা কর্ম বা নানুতিষ্ঠন্তি—শঙ্কর।

Theosophy-র গ্রন্থেও আমরা শুনিতে পাই, ঐ group-soul বা 'জীব'-আত্মার যে ভগ্নাংশ (fragment) ঐরূপ কোন প্রাণীর শরীরে লীলায়িত ছিল, সেই শরীরের মৃত্যুতে সে ভগ্নাংশ অংশী জীব-সরিতে ফিরিয়া যায় এবং তজ্জাতীয় অন্য প্রাণীর শরীরে অচিরে অনুপ্রবেশ করে। মনুষ্যেতর প্রাণীর এই 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-রূপ তৃতীয় স্থানের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া অধ্যাপক ডয়সন বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি এ সম্পর্কে তাহার 'Philosophy of the Upanishads' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

By the side of the way of the gods, which for the wise and faithful leads to an entrance into Brahman without

return, and the way of the fathers, which in requital for sacrifice, works of piety and asceticism guides to the moon and thence back to earth,—our text originally but only obscurely pointed to the 'third place' as the fate of the wicked, who were born again as lower animals. * * By this means, the 'third place' by the side of the ways of the gods and the fathers becomes now superfluous and ought entirely to disappear but is nevertheless allowed to remain.—The Philosophy of the Upanishads, pp 336-7.

সে যাহা হউক, আমরা কর্ম্মী জীব, অর্থাৎ, মনুষ্যের পরলোক গতিরই অনুসরণ করি, কারণ, তাহার পক্ষেই সাংপরায়—যেহেতু তাহারই কর্ম্ম, অর্থাৎ পাপ পুণ্য আছে।

এই পরলোক-গতি বুঝিবার জন্য আমাদের আলোচিত জড়তত্ত্বের কয়েকটি কথা পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে। ঐ আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষ একটি নয়—সাধারণতঃ তিনটি ভূমিকায় বিহরণ করে,—স্থূল, সূক্ষ্ম, ও সুসূক্ষ্ম। ঐ তিন ভূমিকার এ দেশীয় নাম ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ। বৃহদারণ্যকে ইহাদিগকে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক বলা হইয়াছে—

অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোকঃ ইতি—বৃহ, ১।৫।১৬

অধ্যাপক মায়ার ইহাদিগকে the physical, the etherial and the met-etherial বলিয়াছেন। ভূর্লোক আমাদের এই পৃথিবী—Physical plane; ভুবর্লোক = অন্তরিক্ষ থিয়সফির—Astral Plane; এবং স্বর্লোক = স্বর্গ (Heaven world), থিয়সফির দেবযান বা Mental Plane। এই স্বর্গলোককে কোথাও কোথাও ইন্দ্রলোক বা মহেন্দ্রলোক বলা হইয়াছে—মাহেন্দ্রঃ স্বর্ ইতি প্রোক্তঃ। উহার দুইটি স্তর বা ভূমি আছে। বৌদ্ধেরা স্বর্লোকের সূক্ষ্মতর স্তরকে 'অরূপ' ভূমি এবং স্থূলতর স্তরকে 'রূপ' ভূমি বলেন।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকের মিলিত নাম 'ত্রিলোকী'। এই ত্রৈলোক্যই সাধারণ জীবের লীলাক্ষেত্র। প্রতিদিন জাগ্রত অবস্থায় জীব ভূর্লোকে বিহরণ করে, স্বপ্ন বা নিদ্রাবস্থায় সে ভুবর্লোকে যায় এবং গাঢ় নিদ্রায় সুষুপ্ত হইলে সে

স্বর্লোকে গমন করে। সেই জন্য মায়ার্স বলিয়াছেন—Man lives in three environments—ইহা জীবের পক্ষে দৈনন্দিন ঘটনা।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই ত্রিলোকীর পারে ঐতরেয় উপনিষদ্ অম্ভঃলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। কোথায় সে অম্ভঃলোক ?

অদঃ অম্ভঃ পরেন দিবম্—ঐত, ১।২

—দ্যুলোকের পরপারে—অর্থাৎ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকীর ঊর্ধ্বতন যে লোক, তাহারই সাধারণ নাম অম্ভঃ। এই অম্ভঃলোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে গার্গীকে বলিয়াছেন—

কস্মিন্ নু খলু ইন্দ্রলোকাঃ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ? প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্ নু খলু প্রজাপতিলোকাঃ ওতাশ্চপ্রোতাশ্চেতি ? ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি।—বৃহঃ, ৩৷৬৷১

অতএব এখানে আমরা স্বঃ বা ইন্দ্রলোকের উপরিতন প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকের উল্লেখ পাইলাম। এই প্রজাপতিলোকের অপর নাম মহর্লোক।

ভূঃ ইত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবঃ ইতি বায়ৌ। স্বর্ ইতি আদিত্যে। মহঃ ইতি ব্রহ্মণি।

যাহাকে আমরা ব্রহ্মলোক বলিলাম তাহারও তিনটি স্তর বা ভূমি আছে—ব্রাহ্ম স্ত্রিভূমিকো লোকঃ। এই তিনটি স্তরের নাম যথাক্রমে জনঃ, তপঃ ও সত্য ; এই তিনে মিলিয়া ঊর্ধ্ব ত্রিলোকী। আর ঐ মহর্লোক নিম্নতর ত্রিলোকী ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এবং ঊর্ধ্বতর ত্রিলোকী জনঃ তপঃ সত্য—এই উভয়ের মধ্যবর্তী। এইভাবে উপনিষদ্ স্থানে স্থানে সপ্তলোকের কথা বলিয়াছেন—

আসপ্তমান্ তস্য লোকান্ হিনস্তি—মুণ্ডক, ১৷২৷৩

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঐ সপ্তলোকের নামোল্লেখ আছে—

ওঁ গায়ত্রীং আবাহয়ামীতি

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বুবঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্—তৈত্তি আঃ, ১০৷২৭-২৮

কিন্তু জনঃ তপঃ ও সত্য যখন এক ব্রহ্মলোকেরই তিনটি বিভিন্ন স্তর, তখন লোকের গণনায় পঞ্চ লোকই প্রশস্ত—পৃথিবীলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্ এই যে পঞ্চ তত্ত্ব—উহারাই পঞ্চীকৃত হইয়া যথাক্রমে এই পঞ্চলোকের রচনা করিয়াছে।

এই পঞ্চলোকই থিয়সফির পরিচিত Physical Plane, Astral Plane, Mental Plane, Buddhic Plane and Nirvanic Plane.

আমরা দেখিয়াছি ঐ পঞ্চ লোকের অনুযায়ী জীবের পাঁচটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও নির্বাণ। জাগ্রৎ অবস্থায় জীব অন্নময় কোশের দ্বারা ভূর্লোক বা Physical Plane-এর সংস্রবে আইসে, এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ভূর্লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। স্বপ্নাবস্থায় জীব প্রাণময় কোশের দ্বারা ভুবর্লোক বা Astral Plane-এর সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ভুবর্লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। সুষুপ্তি অবস্থায় জীব মনোময় কোশের দ্বারা স্বর্লোকের বা Mental Plane-এর রূপস্তরের সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ঐ স্তরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; পুনশ্চ, নিবিড় সুষুপ্তি অবস্থায় জীব বিজ্ঞানময় কোশের দ্বারা স্বর্লোকের অরূপ স্তরের সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে সেই স্তরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। তুরীয় অবস্থায় জীব আনন্দময় কোশের দ্বারা প্রজাপতিলোক বা Buddhic Plane-এর সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে প্রজাপতি-লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। নির্বাণ অবস্থায় জীব হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে ব্রহ্মলোক বা Nirvanic Plane-এর সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ব্রহ্মলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে।

জীবের মৃত্যু ঘটিলে কি ঘটনা হয়? প্রথমতঃ সাধারণ মনুষ্যের কথা ধরা যাউক। তখন অন্নময় কোশের বিনাশ হয় এবং ঐ জীব প্রাণময় কোশ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ ভুবর্লোকে গমন করে। কর্মানুসারে সেখানে তাহার স্থিতির পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। এই ভুবর্লোককে শাস্ত্র কোথাও কোথাও 'কামলোক' বলিয়াছেন। যাহাকে লৌকিক ভাষায় নরক, Hell, Purgatory প্রভৃতি বলা হয়, উহারা ঐ কামলোকের অন্তর্গত। ঐ কামলোকে কিয়ৎকাল বসতির পর যখন জীবের প্রাণময় কোশের বিলয় ঘটে, তখন সে মনোময় কোশ আশ্রয় করিয়া স্বর্লোকের রূপভূমিতে উপনীত হয়। এই রূপ-ভূমিতেই সাধারণতঃ জীবের স্বর্গভোগ হয়। ভোগান্তে মনোময় কোশের বিলয়ে জীব বিজ্ঞানময়াদি কোশ-সম্বলিত কারণ-শরীর অবলম্বন করিয়া স্বর্লোকের অরূপ-ভূমিতে উন্নীত হয়। ইহাই জীবের স্বধাম—True Habitat.

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সাধারণভাবে সূত্র করিয়াছেন ঃ—

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।৯

'জীব মৃত্যুতে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোকে যাত্রা করে।'

বলা বাহুল্য, স্বর্গলোকেও জীবের বসতি চিরস্থায়ী হয় না—আমরা দেখিয়াছি অনন্ত স্বর্গ নরক ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। পুণ্যক্ষয় হইলে 'যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা' জীবের ঐ স্বর্গলোক হইতে চ্যুতি হয়। স্বধামে কিছুকাল স্থিতির পর জীবের চিত্তে প্রবাসে যাইবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। বুদ্ধদেব ইহাকে 'তন্‌হা' বলিয়াছেন। ঐ তন্‌হার তাড়নায় সে ভূতসূক্ষ্ম বা Permanent Atoms-দ্বারা সংবেষ্টিত হইয়া স্বর্গলোকের রূপভূমি পার হইবার পর ভুবর্লোকের মধ্য দিয়া অবতরণ করিয়া ভূর্লোকে উপনীত হইয়া জনকের দেহে প্রবেশ করে। সেখান হইতে জননীর কুক্ষিতে নিষিক্ত হয় এবং যথাকালে মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ইহাই জীবের জন্মান্তর। এই জন্মান্তর সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

এই দেহান্তর গ্রহণের বিষয় ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে ঃ—

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ—ব্রঃ সূঃ, ৩।১

ইহার শঙ্কর-ভাষ্য এইরূপ—

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তর-প্রতিপত্তৌ, দেহবীজৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষ্বক্তো রংহতি গচ্ছতি ইতি অবগন্তব্যম্।

অর্থাৎ, জন্মান্তর গ্রহণের জন্য জীব দেহবীজ 'ভূত-সূক্ষ্ম' সমূহ দ্বারা পরিষ্বক্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে ভুবর্লোকের মধ্য দিয়া ভূর্লোকে অবতরণ করে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, জীব যখন স্বর্গলোকের অরূপ-ভূমিকা হইতে জন্মান্তর গ্রহণের জন্য অবরোহণ করে, তখন সে সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম দেহ দ্বারা অর্থাৎ প্রাণময় ও মনোময় কোশ দ্বারা বেষ্টিত থাকে না; কিন্তু দেহবীজ 'ভূত-সূক্ষ্ম' দ্বারাই পরিষ্বক্ত থাকে। পরবর্তী সূত্রে বাদরায়ণ এই 'ভূত-সূক্ষ্মের' কিছু পরিচয় দিয়াছেন—

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ—৩।১।২

ত্র্যাত্মকস্ত দেহঃ ত্রয়াণামপি তেজোঽপ্-অন্নানাং তস্মিন্ কার্যোপলব্ধেঃ—শঙ্করভাষ্য।

ভূত-সূক্ষ্ম কি কি ? তেজ, অপ্ ও অন্ন অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব, অপ্তত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্ব-নির্মিত তিনটি পরমাণু। থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে ইহাদিগকেই 'Permanent Atoms' বলে।

এতক্ষণ আমরা সাধারণ মনুষ্যের পরলোকগতি বর্ণন করিলাম। এই গতাগতিকে শাস্ত্রের ভাষায় ধূমযান বা কৃষ্ণাগতি বলে। এ গতি ছাড়া উন্নততর জীবের—যাঁহারা জ্ঞানী, ভক্ত, ধ্যানী—আর এক গতি আছে—তাহার নাম শুক্লা গতি বা দেবযান। এই ধূমযান ও দেবযান সম্বন্ধে আগামী অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখানে কেবল গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতে চাই।

> শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
> একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥—৯।২৬

অর্থাৎ জীবের এই দুই গতি—কৃষ্ণাগতি বা ধূমযান এবং শুক্লাগতি বা দেবযান। ধূমযানে জীবের আবৃত্তি হয় কিন্তু দেবযানে জীবের আবৃত্তি হয় না। সাধারণ জীব ধূমযান মার্গে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকে যে গতাগতি করে—তাহার নাম 'আবৃত্তি'। কিন্তু যিনি উন্নত সাধক, যিনি অ-সাধারণ জীব—তিনি দেহান্তে ঐ তিন লোক পার হইয়া দেবযান মার্গে, বিজ্ঞানময়-আনন্দময়-হিরণ্ময় কোশ-সম্বলিত কারণ শরীর অবলম্বনে ত্রিলোকীর উচ্চতর মহঃ জনঃ তপঃ বা সত্য লোকে গমন করেন। ঐ প্রজাপতিলোক বা ব্রহ্মলোক হইতে তাঁহার আর আবৃত্তি হয় না। ইহাই অনাবৃত্তিঃ—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২)।

সাধারণ ও অ-সাধারণ জীবের পরলোকগতি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে যাহা সংক্ষেপে বলিলাম, আগামী অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ বিস্তার করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ও বাড়ীর বৌ

সুন্দর একটি মাধবী রাত্রি। বাহিরের গোলমাল বেশী শোনা যায় না, ক্লান্ত সুরে দু একটা 'বেলফুলের মালা চাই' শব্দ। সুগৌর ঘাড়ের উপর একগোছা রজনীগন্ধা, মণিমালা আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। সে ভাবিতেছিল, ঠিক্ এই সময়ে প্রিয়নাথ খবরের কাগজের নীরস খবরগুলা না পড়িলেও হয়ত পারিত।

পাশের বাড়ীটা হইতে হঠাৎ একটু আর্ত্তনাদ, কান্না মিশানো চাপা কোলাহল, খুব অল্পক্ষণের জন্য। তাহার পরই সশব্দে জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

ঘরে গিয়া মণিমালা প্রিয়নাথকে বলিল, শিগগির উঠে ও বাড়ী যাও তো একবার, আবার মারধোর সুরু হয়েচে।

প্রিয়নাথ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। সেটা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কাগজ রাখিয়া ধীরে, সুস্থে আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিল, পাড়াটাই নেহাৎ ছাড়তে হোলো দেখচি। শান্তিভঙ্গের অপরাধে লোকটাকে হয়ত পুলিশের হাতে দেওয়া যায়, প্রত্যেক নাগরিকেরই সে অধিকার আছে। তবে আইন ও তুটো করে কিনা,—

মণিমালা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটাই তুমি একবার যাও, আমার মুখ চেয়ে। নিশ্চয়ই আবার সেদিনের মত সুরু হয়েচে।

অগত্যা। যেতেই যখন হচ্চে, তখন তোমার মুখ চেয়ে ছাড়া আর কি যুক্তি থাক্‌তে পারে?

মণিমালা টেবিল হইতে একটা টর্চ্চ আনিয়া প্রিয়নাথের হাতে দিল। প্রিয়নাথের দীর্ঘ দেহ সিঁড়ির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কড়া নাড়ার শব্দের সাথে প্রিয়নাথের গলার আওয়াজ শোনা গেল, মশাই শুনচেন, একটু খুলুনই না, এতক্ষণ ত বেশ সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল,—

দড়াম করিয়া দরজা খুলিল। যে মূর্ত্তির অবির্ভাব হইল, তাহা ভদ্রলোকের।

অর্থাৎ পোযাক পরিচ্ছদে সুবিন্যস্ত যত্ন, মায় চেরা সিঁথ। ভদ্রলোক অভদ্রভাবে বলিলেন, পাড়াপড়শির সাথে আলাপ পরিচয় করতে আসার পক্ষে রাতটা একটু বেশী হয়ে গিয়েচে না ?

প্রিয়নাথ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, মশাই, এটা ভদ্র প্াড়া, রাত দুপুরে মারধোর, মেয়েদের কান্নাকাটি, এ সব কী ব্যাপার ?

লোকটি বাধা দিয়া বলিল, ভদ্র পাড়াই ত জানতুম, এখন বুঝ্চি ভুল করেচি। যদি পাঁচজন সজ্জনের বসবাসের পল্লীই হবে, তবে দুপুর রাতে আপনিই বা এসে আমার বাসা চড়াও হবেন কেন, আর বাড়ীর মধ্যে কি হচ্চে না হচ্চে এ নিয়ে মাথা ঘামাবেনই বা কেন,—

প্রিয়নাথ লোকটির নির্ল্লজ্জ সহিষ্ণুতা ও বাক্পটুতা দেখিয়া খানিকটা স্তব্ধ হইয়া থাকিল। বলিল,

দেখুন, এর আগেও গোলযোগ শুনেছি, গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু স্ত্রীলোকের ওপর গায়ের জোরের পরীক্ষাটা দৈনন্দিন ব্যাপারে দাঁড়ালে, ফলাফল সুবিধের হবে না জানবেন।

লোকটা কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, মশাই কি এম্নিই যাবেন, না সাদর অভ্যর্থনা আরো চাই ? বলি বাসাটা আমার। আমার পরিবারকে আমি মারি, কাটি যা খুসি করি, তাতে আপনার তো সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবার কারণ দেখতে পাইনে ! ছাদে ছাদে ব্যাপারটা জটিল হয়ে আস্চে বুঝি—

প্রিয়নাথ আরক্ত মুখে ধমক দিয়া উঠিল, শাট্ আপ। আপনার স্ত্রীর সাথে আমার স্ত্রীর পরিচয় আছে—কিন্তু সে কথা থাক। আপনি যে ভদ্রবেশী জানোয়ার, সে পরিচয় পেয়ে গেলাম। অন্যায় দেখ্চি আমারই, কারণ আমি ভেবেছিলাম হয়ত আপনি ভদ্রলোক। তবে শুনুন, ভদ্রই হোন, আর জানোয়ারই হোন, জানের মায়া করেন তো ? বলিয়া প্রিয়নাথ লোহার মত পাঞ্জায় ভদ্রলোকের ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়া ফিরিল। বলিল, নমস্কার।

লোকটি তৎক্ষণাৎ জোড় হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, নমস্কার। আহা, আসা যাওয়া, খোঁজ খবর নেয়া চাই বই কি, নইলে আর লোকে পড়শির আশা করে কেন ?

প্রিয়নাথ জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * *

মণিমালার মনটা বিরক্ত হইয়াই ছিল।

বড় জা একথালা ডালবাটা লইয়া আসিলেন।

তোমার কি ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি, ছোট বৌ? পরের বাড়ীর বৌয়ের দুঃখে বুক ফেটে যায়, বাড়ীর লোকের সুখদুঃখও তো এক আধটু দেখতে হয়,—

মণিমালা থালাটা তাঁর হাত থেকে নামাইয়া বলিল, অর্থাৎ এই পর্ব্বত প্রমাণ বাটা ডালকে বড়ির রূপ দিতে হবে। তা, স্কুল কাছারীর ভাত দেওয়া, কাপড় কাচা,—এইত সবে মালগাড়ী ছাড়লো, রাত বারোটার আগে ত আর থামবে না। তোমার এই একই কথা রোজ বলতে ভালোও লাগে,—

বড় বৌ তপ্ত হইয়া বলিলেন, জানোই ত সব, তবে আর বলাও কেন? বলিয়া জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই নামিয়া গেলেন। রান্না কামাই করিয়া বসিবার কি কথা বলিবার সময় তাঁহার সত্যই নাই।

উহার জন্য মণিমালার কষ্ট হয়, পাশের বাড়ীর বধূটির জন্যও হয়। তাহাকে প্রিয়নাথ নিত্য নূতনরূপে দেখিতে ভালোবাসে,—বড়দির জীবনে সেদিন কবে আসিল, কবে চলিয়া গেল? বুঝি এমন মাধবী রাত্রি, এমন শারদ-প্রভাত উহার জীবনে আসে নাই, আসিয়াছে শুধু উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের রৌদ্র।

পাশের বাড়ীর ডাক শুনিয়া মণিমালার আত্মস্থভাব কাটিয়া গেল, শুনচেন, অ' ভাই,—

মণিমালা গিয়া বারান্দার ধারে দাঁড়াইল, ব্যবধান মাত্র একটা সঙ্কীর্ণ গলি। মণিমালার মন কঠিন হইয়া আছে, ইহারই জন্য প্রিয়নাথকে সে রাত্রে অপমান সহিতে হইয়াছে।

কি বলচ? যে পায়ের লাথি খাও, সেই পায়ে তেল মাখাতেও তো ক্লান্তি দেখি না। সেদিন তোমাদের হয়েছিলো কি?

নেহাত-ই একটি সাধারণ মেয়ে। রোগা চেহারা, নিষ্প্রভ চোখ, হাতে দুগাছি রুলি। দেখিলে মায়া হয়, কিন্তু আজ উহাকে আঘাত দিবে বলিয়া মণিমালা মনস্থির করিয়াছে।

হয়নি তো বিশেষ কিছুই ভাই। উনি একটু বদ্‌রাগী কিনা, সেদিন মেজাজটা ভালো ছিল না, তাই।

ও, তাই তোমায় ধরে মারছিলেন? পতি দেবতার হয়ে সেদিন আবার আমাকেও ত কম শোনালে না। ঘাট হয়েছিল আমার, যে দেখতে পাঠিয়েছিলাম মরেই গেল, না কি হোল—

দম নিয়া আবার বলিল, সেদিন তো বড়দিকে বেশ শোনানো হচ্ছিল,—একটুখানি কি গোলমাল হয়েচে, তাই শুনে আপনার দেওর বয়ে এসে ওঁকে যা নয় তাই বলে গেছেন। যদি বা মারেই, সে তো আমাকেই মারবে, না রাস্তার লোকের ওপর রাগ ফলাবে!—এখন আবার মিষ্টি মিষ্টি করে আলাপ করতে এসেছেন।

বধূটি ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, দু দণ্ড আলাপ করব সে অবসর কি আছে? বলছিলাম কি, বড় বিপদে পড়েছি। যদি কিছু মনে না করেন, মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেব, সেরটাক চাল যদি দেন। সেদিনের আর আজকের চাল সবই এ মাসের দুটো দিন বাদেই পাঠিয়ে দেব।

তাচ্ছিল্যভরে মণিমালা বলিল, ও, এই জন্যেই এত ডাকাহাঁকি। তাই ত বলি, অকারণে কি আর বিনোদবাবু আলাপ করবার অনুমতি দিয়েছেন!

তিনি তো বাড়ীতে নেই।

থাক্‌লে হয়তো এই নিয়েও একটা অঘটন ঘটাতেন। থাক্—সুর নরম করিয়া মণিমালা বলিল, মেয়েটাকে আর খানিক পরে, বড়দি পূজোয় বসলে, পাঠিও। তিনি টের পেলে আবার,—জানোইত, আমি ত বাড়ীর কর্ত্তা নই।

মণিমালার মনে হইল আহা, অতটা আঘাত দেওয়া ভাল হয় নাই। কতই বা বয়স, অভাবের সংসার, তাহার উপর চরিত্রহীন স্বার্থপর স্বামী।

বড় বৌয়ের তীক্ষ্ণ স্বরে সচকিত হইয়া মণিমালা নামিয়া গেল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়া গেল, এসো ভাই একদিন দুপুরবেলা, আমাদের এই সময়টা বড় কাজের ভিড়,—

নীচে দরদালানে মেজ জা নলিনী তাঁহার চারটি, ও বড় জা-র ছয়টি, একুনে দশটি ছোট বড় ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতে বসিয়াছেন। হাত ও মুখ

এক সঙ্গে চালাইবার একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা তাঁহার আছে। অদূরে একখানি পিঁড়ে পাতিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী বসিয়া আছেন।

মণিমালাকে দেখিয়া শ্বাশুড়ী কহিলেন, ছোট বৌ, এটা কি বাছা শুয়ে বসে কাটাবার সময়? হাতে হাতে করো, তবে ত শিখবে।

বড় বৌ প্রকাণ্ড ঝোলের কড়াইখানা নামাইয়া কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া বলিলেন, এ আর শেখাতে হবে না মা, তোমার বৌ হয়ে যখন এ বাড়ীতে ঢুকেচে, আপনিই শিখবে। আমাদেরই বা হাত ধরে কে শিখিয়েছিল? তা ছাড়া, ওর ওপর আমরা দু'জন আছি,—

নলিনী বাঁ হাতে কৌশলে খানিকটা জর্দ্দা মুখে ফেলিয়া বলিল, দিদির ঐ এক কথা। পরে করতে হবে বলে এখন বসে থাকবে? আমরাই বা কি এমন বুড়ী হয়ে গিয়েছি শুনি? ওর বয়েসে আমার কোলে কাঁখে দুটি, কিন্তু কোন কাজটা না করতে হয়েছে? অ মণি, অমন দাঁড়িয়ে শুনচ কি? ডাল তরকারীগুলো দাও, ওদিককার এঁটো পেড়ে বড়ঠাকুরের জায়গা দাও,—

বড়বৌ সহসা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ঠাকুরপো খেয়ে গেছে, পান দিয়ে আসোনি, এক কথা কতদিন বলব ছোটবৌ? পান, পোষাক দিয়ে একেবারে এসোগে, যাও। নলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, নীলু আমার ওর বয়েসিই ছিলো মেজবৌ। ওকে দেখলেই আমার তার মুখখানা মনে পড়ে।

নীলমণি ওঁর বড় মেয়ে, চৌদ্দবছর বয়েসে বিয়ে দেওয়া হইয়াছিল। দু বৎসর শ্বশুর বাড়ীতে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিয়া সেখানেই মারা গিয়াছে। উহারা বলিয়াছিল, কলেরা, কিন্তু মায়ের মন তাহা মানে নাই।

রান্নাঘরের জানালা দিয়া সবুজ একটা নিমগাছ চোখে পড়ে। তাহার রৌদ্রস্নাত রূপের দিকে চাহিয়া বড় বৌয়ের নিজের যৌবনকাল মনে পড়ে। মণিমালা, নীলমণি, তিনি নিজে,—সব মিলিয়া একাকার হইয়া যায়।

* * *

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে মণিমালা তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে শুইয়াছিল। দরজার সামনে একটি বছর পাঁচেকের মেয়েকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। পিছনে মেয়েটির মা। পরিধানে আধময়লা কাপড় সেমিজ। মণিমালা বলিল,

বোসো ভাই। এই বুঝি খাওয়া-দাওয়া মিটল?

বধূটি শুধু ঘাড় নাড়িল।

আমাদেরও তাই। তা প্রায় একটা দেড়টা রোজই, ছুটির দিনে তিনটে। তোমার কথা বলো, শুনি।

আপনি বলুন। আমার বলবার কিই বা আছে। অনেকদিনই আসবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু কি মনে করবেন ভেবে সাহস পাইনে।

কি মনে করব? বাড়ীতে কেউ এলে সবাই ত খুসীই হয় ভাই, আমরাও হই। তবে বলতে পারো, আমি যাইনে কেন। কি জানো, আমি হলাম এ বাড়ীর ছোটবৌ, সবাই আমার ওপরে। তোমার তো ভাই তুমিই গিন্নী।

বধূটি বলিল, আমার নাম মালা, আপনি তাইই বলবেন।

আমি যে তোমায় 'তুমি' বলি, তুমি কেন আমায় 'আপনি বলবে ভাই?

বয়সে মালাই বড়। মণিমালার রংয়ের ঔজ্জ্বল্য, চোখের কালো গভীর দৃষ্টি, একরাশ মেঘের মতো চুল, সব মিলিয়া সুন্দর একটি ভাব,—আর মালা? স্বামীর আচরণে আসিতেও সঙ্কোচ হয়।

মালা নিষ্প্রভ চোখ তুলিয়া বলিল, তোমরা কোথাও বেরোও না? থিয়েটার, কি বায়োস্কোপ,—

কৌতুকোজ্জ্বল মুখে মণিমালা বলিল, একদিন ভাই গিয়েছিলাম, সে কত লুকিয়ে। সে কি কাণ্ড, সিনেমা দেখে, সাহেবি হোটেলে ঢুকে কি কি সব খেয়ে, তবে আসি। আমি ভাই কিছুতেই যাবো না, উনিও ছাড়বেন না। হ্যাঁ ভাই, লজ্জা করে না?

মালা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। মণিমালা কতটুকুই বা বলিয়াছে, মালা কিন্তু নিঃসংশয়ে জানিয়াছে এমন কতশত মধুর ঘটনা মণির জীবনে কতবার ঘটিয়াছে।

মণিমালার প্রশ্নের উত্তরে অন্যমনে বলিল, করে বৈ কি। তা তোমার বর বুঝি খুব ছেলেমানুষ? খুব সুন্দর দেখতে, না? আমি একদিন দেখেছিলাম।

মণিমালা সহসা ব্যস্ত হইয়া বলিল, তুমি ত নিজের কথা কিছুই বলচ না? তুমি এতো রোগা কেন, অসুখ হয়েছিল?

নিজের রক্তহীন স্বল্পাভরণ হাত দুখানির দিকে চাহিয়া বধূটি বলিল, না, এমন কিছু অসুখ নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, শরীর ত সারতেই পায় না।

তা, তুমি কেন বাপের বাড়ী গিয়ে থাকো না ? বোধ হয় বিনোদবাবুকে বড্ড ভালোবাসো, তাই ছেড়ে থাক্‌তে পারো না। এবার যাও, আর কিছুতেই আসবে না, অনেক করে বললেও না। আমি হলে ঠিক তাই করতাম।

সরল সুন্দর সমাধান। মালা বলিল, সেখানেই বা কে আছে ? এক ভাই, বাপ মা তো নেই। আর গেলে এখানে চলে না যে।

হঠাৎ মালার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া জল মুছিতে মুছিতে বলিল, উঠি এখন, বেলা গেল। চল্‌ খুকি।

মণিমালা দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে গেল। বলিল, সকালে যা বলেছি, কিছু মনে কোরো না ভাই।

ও ঘর হইতে বড়বৌ ডাক দিয়া বলিলেন, কার যেন গলা শুনলাম ছোটবৌ ? ও বাড়ীর সেই বৌটা নাকি ? কি দিলি আবার ? সে দিনের চালটা এনে দিয়েচে নাকি ? মনে করিয়ে দিস্‌নি ত,—

মণিমালা বিমনাভাবে বলিল, সে আর একদিন বলব বড়দি। আজ কিছু চায়নি, এম্‌নিই এসেছিল।

ধরিত্রী দেবী

রেণে-গ্রুসের ভারতবর্ষ

মৌর্য শিল্পকলা। সাঁচি।

একাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে আমরা যত পুরাশিল্পের নিদর্শন দেখতে পেয়েছি, তার মধ্যে বৌদ্ধ স্থাপত্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ; চৈত্য বা মন্দির (অধিকাংশ ভূগর্ভে), বিহার, স্তূপ এবং লাট বা খোদিত লিপিযুক্ত স্তম্ভ ছিল বৌদ্ধদের স্মৃতিরক্ষার প্রধান উপায়। ধর্মসংক্রান্ত কোন ঘটনা স্মরণ রাখা বা কোন মহাপুরুষের চিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই স্তূপরচনার উদ্দেশ্য। স্তূপে থাকে তোরণসজ্জিত একটি ঘেরা বারান্দা, এবং একটি অর্দ্ধগোলাকার গম্বুজ, তার তলায় সাধারণতঃ একটি বেদীর ভিত্তি এবং মাথায় একটি চৌকোণা ছোট পেটিকা, সম্ভবতঃ স্মৃতিচিহ্ন-রক্ষার জন্য। যখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় স্তূপ, খোলা আকাশের তলায় না বানিয়ে চৈত্যের মধ্যস্থলে রাখা হয়,—গির্জার ভিতরে বেদীর মত—তখন তাকে বলে দাগোবা।

এই স্মৃতি-স্থাপত্যের মধ্যে যা আমরা দেখতে পেয়েছি ও যথাযথভাবে সনাক্ত করতে পেরেছি, তার মধ্যে অশোকের স্তম্ভলিপিগুলি (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি)। সেগুলির নিখুঁত কারুকার্য দেখে আমরা স্বীকার না করেই পারিনে যে তার আগে নিশ্চয়ই অধুনালুপ্ত অন্য কারুকার্য ছিল, যথা কাঠের স্থাপত্য ও ক্ষোদাই-কার্য। মৌর্যযুগের একমাত্র নূতনত্ব ছিল পূর্ববর্তী কাঠের বা হাতির দাঁতের শিল্পকার্যগুলিকে পাথরে নকল করা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর একটি স্বতঃসিদ্ধান্ত এই যে, অশোকের পূর্ববর্তী অজানা যুগে ভারতবর্ষীয় কারুকলা পূর্বতন আসিরীয় শিল্পকলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। বস্তুতঃ অশোকস্তম্ভের উপর কতকগুলি অলঙ্কার দেখতে পাওয়া যায়, যা প্রকৃতপক্ষে আসিরীয় (যথা, ছোট তালগাছ, জলপাই গাছ ও ঘোড়দোলন সমন্বিত প্রাচীরগাত্রসজ্জা), অথবা আকেমিনীডদের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত আসিরীয় নক্সা, যথা পক্ষযুক্ত সিংহবিশেষ।

অশোকের যুগে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, কাশীর নিকটস্থ সারনাথের স্তম্ভলেখের মাথার মুকুট, যার উপর দু'টি সিংহ পিঠপিঠি বসে রয়েছে। শিরোদেশের

ঘণ্টাকৃতি ভিত্তি এবং সিংহগুলি আকেমিনীড ইতিহাসের অনুস্মৃতি বলে মনে হয়। অপর পক্ষে, যদিও আসিরীয় শিল্পের সরল সংস্করণ আকেমিনীড শিল্পে জন্তুজানোয়ারের কতকগুলি বিশেষ সুদক্ষ ক্ষোদাইকার্যের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়, তবু সারনাথের প্রাচীরগাত্রে যে চমৎকার ছুটন্ত ঘোড়া জিব্রা এবং হাতীর নক্সা আছে, সেগুলি গ্রীক শিল্পের আইনকানুনজানা শিল্পী ভিন্ন কেউ গড়তে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। অথচ এই তিনটি জন্তুর চিত্রণপদ্ধতিতে এমন একটি স্বতঃস্ফূর্তি, এমন একটি তারুণ্যের তাজা ছোপ আছে, যার সঙ্গে গ্রীসীয় ধারার কোন যোগ নেই। অতএব সবদিক বিবেচনা পূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, গ্রীসীয়-ইরানীয় ঋণলব্ধ পদ্ধতিকে আত্মসাৎ এবং স্বদেশীকৃত করবার মত শক্তি মৌর্য শিল্পের ছিল। ভারতবর্ষীয় শিল্পকলার প্রথম নিদর্শন অবধি একটি যে মনোরম স্বাভাবিকত্ব প্রকাশ পায়, সেটিও লক্ষ্য করবার বিষয়।

ভাগেলখণ্ডস্থিত ভরহুত-স্তূপের পারিপার্শ্বিক ক্ষোদাইকার্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক (খৃঃ পূঃ ২০০ অথবা মার্শাল সাহেবের শেষ অনুমান মতে ১৫০)। এগুলির ছাঁদ সম্পূর্ণ স্বদেশী। বিশেষতঃ কলকাতার যাদুঘরে যে একটি ক্ষোদিত রাজমুণ্ড অধুনা রক্ষিত, তার চেয়ে বেশি দেশীয় আর কি হতে পারে? এই ধরণের চক্রাকার মূর্তি (রাজমুণ্ড, হাতী, পক্ষযুক্ত হস্তী) বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পাথরের বেড়ায় দেখতে পাওয়া যায় (খৃঃ পূঃ প্রথম, অথবা মার্শাল সাহেবের মতে দ্বিতীয় শতাব্দী)। কোঙ্কনস্থ কার্লি চৈত্যের প্রবেশপথে পাথরের শিল্পে (Cohn সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী, অথবা পরে?) আমরা যে দুটি আলিঙ্গনবদ্ধ ও প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ যুগলমূর্তির দর্শন পাই, তাতে সেই আদিম ভারতীয় আদর্শ লক্ষিত হয়, যাকে ভারতবর্ষের অনার্য শিল্পধারা বলা যেতে পারে। পুরুষ দুটি ভরহুত ও বুদ্ধগয়ার চক্রাকার রাজমূর্তিরই অনুরূপ পগ্‌গধারী, এবং তাঁদের পেশীবহুল ব্যায়ামপুষ্ট শরীরের গড়নের সঙ্গে শেষ গুপ্ত যুগের নরম, বস্ত্রাচ্ছাদিত ও কমনীয় শিল্পের প্রভেদ বিস্তর। তেমনি নগ্ন স্ত্রীমূর্তিগুলির বলিষ্ঠতা ও পরবর্তী লক্ষ্মীমূর্তির তন্বী আদর্শের পরিপন্থী মনে হতে পারত, যদি ভরহুতের ঐ স্তূপেরই পারিপার্শ্বিক একটি স্তম্ভের উপর ক্ষোদিত চণ্ডাযক্ষিণীর মূর্তিতে আমরা সাঁচির অনিন্দ্যসুন্দর যক্ষিণীর পূর্বাভাস না দেখতে পেতুম।

সাঁচির স্তূপটিও অশোক কর্তৃক নির্মিত বলে বোধ হয়। তার তোরণগুলি পরবর্তী সুঙ্গ ও কণ্বযুগের। দক্ষিণ তোরণটিই সর্বপ্রাচীন ; তার উপরের শিলালেখ অনুসারে অন্ধ্ররাজ দ্বিতীয় শাতকর্ণীর সময়কার, খৃঃ পূঃ ৭৫-এর দিকে। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম তোরণগুলি ক্রমশঃ পর পর এসেছে, খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ধাপে ধাপে। পূর্ব তোরণের একটি দৃশ্য (মাথার নিম্নাংশের সামনের দিক) বোধিবৃক্ষের প্রতি অশোকের তীর্থযাত্রা বলে মনে হয়, সেটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

সাঁচির শিল্পধারা বিশেষভাবে বৌদ্ধ ; মানুষ অথবা পশু সকল অভিনেতাই বৌদ্ধ প্রতীক বা বুদ্ধের জীবনের কোন দৃশ্যের চতুর্দিকে সজ্জিত। আর যদিও বুদ্ধদেব স্বয়ং কোথাও মূর্তি পরিগ্রহ করেন নি, তবু সেটা নিশ্চয়ই এই কারণে যে যিনি স্পষ্টত নির্বাণলাভ করেছেন, তাঁর মুখাবয়ব পুনরুজ্জীবিত করা ভাল দেখায় না। অথচ এই শিল্প যে বৈরাগ্য এবং নির্বাণের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছে, তা মনে হয় না ; বরং জীবনের প্রতি একটি অতি নবীন, অতি সরল, অতি আদিম আসক্তির পরিচয় দেয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এখানে অবশিষ্ট আছে শুধু তার মাধুর্য এবং সারল্য। আমরা এস্থলে সম্পূর্ণ স্বভাবের প্রভাব দেখতে পাই। অন্যত্র কোথাও এমন কি সনাতন গ্রীসদেশেও প্রাণধারণের স্বাভাবিক ও নির্ম্মল আনন্দের এমন নিখুঁৎ প্রকাশ দুর্লভ। নারীর অঙ্গসৌষ্ঠবের কবিত্ব এমন মনোরমভাবে কখনো প্রস্ফুটিত হয়নি, যেমন হয়েছে সেই যক্ষিণীর মূর্তিতে, দুই তোরণের নিম্নভাগের সঙ্গে যাদের অধমাঙ্গ সম্মিলিত। এই যক্ষিণীগণ কতক পরিমাণে গ্রীসীয় Caryatidesএর অনুরূপ। কিন্তু শেষোক্তগণ "জীবস্তম্ভ" রূপে তাদের স্থাপত্যভূমিকায় নিবদ্ধ। অপর পক্ষে সাঁচির যক্ষিণীরা স্বাধীনভাবে পাষাণস্তূপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। উত্তর তোরণের একপ্রান্তে যে আম্রলতা উঠেছে, তারই উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে পল্লবকুঞ্জের মধ্যে একজন দণ্ডায়মান ; কিম্বা পূর্ব্ব তোরণে জীবস্তলতার মত দুই হাত দিয়ে গাছে ঝুলে আর একজন সামনে ঝুঁকে অতি অপরূপ ভঙ্গিতে যেন নিজ যৌবন-কুসুমিত দেহ নিয়ে শূন্যে দোদুল্যমান।

দরজার চৌকাটের উপর উৎকীর্ণ মূর্তিতে প্রকৃতির প্রতি কি প্রেম দেখতে পাই ; বৌদ্ধ প্রতীকের চতুর্দিকে সজ্জিত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ফুলের ও পশুর

গঠনরীতির কি সূক্ষ্ম জ্ঞান; সমগ্র বিশ্ব তাদের কাছে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করছে—গো-জাতি, ব্যাঘ্রজাতি, নাগজাতি, হরিণ, পোষা ও বন্য হস্তীগণ বোধিবৃক্ষ বা স্তূপের চারিপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। আমাদের গির্জাগুলি যেমন প্রস্তরের বিশ্বকোষ বিশেষ, তেমনি সাঁচির তোরণগুলি ভারতীয় প্রকৃতির অপরূপ কাব্য-গ্রন্থের ধারাবাহিক পত্রসমূহ, যথার্থই "জঙ্গলের কেতাব।" উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ—পূর্ব দরজার মাঝের lintelএর পিছন দিকে, পশুজাতি কর্তৃক বোধিবৃক্ষের পূজা ; ঐ দরজার নীচের lintelএর পিছনদিকে বন্যহস্তী কর্তৃক স্তূপের পূজা, এবং উত্তর দরজার মাঝের lintelএর প্রান্তে যে চমৎকার ময়ূর উৎকীর্ণ। অপিচ, পূর্ব্ব এবং উত্তর দরজার মাথায় যে সুন্দর পোষা হাতীর মূর্ত্তি রয়েছে। আরো লক্ষ্য করবার বিষয়, বোধিসত্ত্বের গর্ভাধান বা ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর স্নানের সময় যে চমৎকার হাতীগুলিকে আমাদের দেবদূতের কাজে নিযুক্ত করা হয়। শেষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ দ্বারের মাঝের lintelএর উপর অরণ্যে হস্তীযূথপরিবৃত বোধিসত্ত্ব হস্তীর অপরূপ দৃশ্য ; এই সুকুমার ও প্রাণস্পর্শী স্বাভাবিক চিত্রের কাছে আসিরীয় ক্ষোদাইকার্যগুলি গতানুগতিক, এমন কি গ্রীসীয় ক্ষোদাইকার্য পর্যন্ত প্রাণশূন্য বোধ হবার সম্ভাবনা। উপরন্ত বক্তব্য এই যে, বুদ্ধের জীবনে চিত্রিত মনুষ্যমূর্তি-গুলি,—কপিলবস্তুর জানলায় দর্শকমণ্ডলী অথবা রথ, ঘোড়সওয়ার, হাতী ইত্যাদির শোভাযাত্রা কখনো এলোমেলো হয়ে পড়ে না, যেমন গান্ধার শিল্পে এত শীঘ্র হতে দেখা যায়। ভারতীয় শিল্পকলার প্রথম প্রকাশ এবং চরম বিকাশের একত্র সমাবেশ সাঁচির শিল্পে লক্ষিত হয়।

॥ ২ ॥ বৈদেশীয় শাসন ঃ ইন্দো-গ্রীক এবং ইন্দো-শক।

ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক রাজ্য।

ব্যাক্‌ট্রিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ—সগ্‌দিয়ানা, আরিয়া, মার্জিনিয়া, দ্রাঙ্গিয়ানা, আরাকোশিয়া প্রভৃতির সেকালে একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রাধান্য ছিল ; যেমন আমাদের একালে আফগানিস্তান ও রুশীয় তুর্কিস্থানের আছে। যে-সকল রাস্তা ইরান হতে ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যে চলে গিয়েছে, এটি হল সেগুলির চৌমাথা ; পার্থীয় সাম্রাজ্য, পাঞ্জাব এবং কাশগরের সাধারণ

দেউড়ি। মহাবলী সেকন্দর শা, এই উচ্চভূমির কদর বুঝতে পেরে এখানে কয়েকটি সারবন্দী সেনানিবাস করেছিলেনঃ—ব্যাক্‌ট্রিয়ায় ব্যাক্‌ট্রা (অধুনা বল্‌হ বা বাল্‌খ্‌) এবং অক্সস্‌ নদীর আলেক্‌সাণ্ড্রিয়া; সগ্‌দিয়ানায় মারাকান্দা (সামারকন্দ); ফরগনায় আলেক্‌সাণ্ড্রিয়া এসখাতে (হোয়েন্দ্‌ বা খোয়েন্দ্‌); আরিয়ায় আলেক্‌সাণ্ড্রিয়া আরেয়োন (হিরাট); মার্জিয়ানায় আলেক্‌সাণ্ড্রিয়া (পরে আন্টিয়ক); দ্রাঙ্গিয়ানায় আলেকসাণ্ড্রিয়া প্রপ্তাশিয়া; আরাকোশিয়ায় আলেকসাণ্ড্রিয়া কান্দাহার; এবং কাবুল উপত্যকার কপিশায় এক নিসীয়া, এক আষ্টেরূশিয়া এবং ককেসস্‌ অর্থাৎ হিন্দুকুশের আলেক্‌সাণ্ড্রিয়া।

সেকন্দরের সাম্রাজ্য বিভাগের সময়, এই প্রদেশগুলি সেলিউসিডদের অংশায়। ২৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে ব্যাক্‌ট্রিয়ার অধিপতি, গ্রীসীয় ডিওডোটস বা প্রথম থিয়োডোটাস সেলিউসীডদের সুযোগ নিয়ে নিজের এবং পার্থীয় শাসনকর্তা প্রথম আরসাকিসের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পূর্বে ইরানের কতকগুলি গ্রীসীয় রাজ্যের উপর তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন, যেগুলির সঙ্গে অতঃপর সেলিউসীড সিরিয়ার পার্থক্য ঘটিয়েছিল পার্থদের ইরানী রাজ্য। তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ডিয়োডোটসকে (২৪০—২২৫-এর দিকে?) সগ্‌দিয়ানার শাসনকর্তা, মাগ্‌নীসিয়ার গ্রীক ইউথিডেমস্‌ সিংহাসনচ্যুত করেন (অনুমান ২২৫—২০০)। খৃঃ পূঃ ২০৮-এ আসিরীয় রাজা তৃতীয় আন্টিয়োকস্‌ পার্থদের হারিয়ে এসে ইউথিডেমস্‌কে আক্রমণ করেন। আন্টিয়োকস্‌ ব্যাক্‌ট্রায় দীর্ঘকাল ইউথিডেমসকে অবরোধ করেন; কিন্তু অবশেষে বোধহয় বুঝলেন যে এই ভ্রাতৃ-বিরোধের ফলে শকশত্রুর কাছ থেকে গ্রীসীয় সভ্যতার কতদূর বিপদের সম্ভাবনা, তাই উভয় রাজা পরস্পর সন্ধিস্থাপন করলেন। আন্টিয়োকস্‌ ইউথিডেমসের আত্মোৎসর্গ গ্রহণ করলেন, এবং তার ছেলে ডিমীট্রিয়সের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন, অর্থাৎ কাবুল উপত্যকায় (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিখ্যাত গান্ধার প্রদেশ); এবং সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সম্ভবতঃ ইউথিডেমসকে নবাধিকৃত রাজ্যের শাসনভার দিয়ে গেলেন (২০৬)।

এইরূপে গ্রীকদের কাছে ভারতবর্ষের দ্বার আবার খুলে গেল। ইউথিডেমসের ছেলে, ব্যাক্‌ট্রিয়ার রাজা ড্রিমীট্রিয়স্‌ (১৯০—১৬০?) পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ

জয় করলেন। তিনি তুইটি ডিমীট্রিয়াড স্থাপন করেন, একটি আরাকোশিয়ায়, অপরটি পাটালেনিতে (সিন্ধুদেশে); এবং পাঞ্জাবের শাকল বা সাগলকে (শিয়ালকোট) এক ইউথিডেমিয়া বানালেন। যখন তিনি ভারতবর্ষে কালহরণ করছেন, তখন তাঁরই এক সেনাপতি ইউক্রাটীডিস্ বিদ্রোহী হয়ে তাঁর কাছ থেকে ব্যাক্ট্রিয়া ও সগ্দিয়ানা কেড়ে নিল (অনুমান ১৭৫ ?)। এর পর ইউক্রাটীডিস্ ভারতবর্ষে পর্যন্ত ডিমীট্রিয়স বা তাঁর উত্তরাধিকারী আপলো-ডোটস্কে সাজা দিয়েছিল বলে শোনা যায়। রাপসন সাহেবের মতানুসারে তিনি গান্ধার প্রদেশ ও পশ্চিম-পাঞ্জাব (তক্ষশীলা) জয় করেন এবং ডিমীট্রিয়সের বংশের জন্য কেবলমাত্র শাকলের চতুর্দিকে পাঞ্জাবের পূর্ব প্রদেশ (ঝিলাম নদীর বাম তীর) ছেড়ে দেন (অনুমান ১৫৫ ?)।

এদিকে যতক্ষণ তুই গ্রীক রাজবংশ যুদ্ধরত, ততক্ষণ মধ্য আসিয়ায় বিরাট শক-আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেছে। চীন সীমান্তবর্তী কান্-সু দেশাগত য়ু-চে নামক জাতি, গোবি এবং ইলি প্রদেশ অতিক্রম করে, ইউক্রাটীডিসের কাছ থেকে সগ্দিয়ানা কেড়ে নিলে; শেষোক্ত কোনরকমে ব্যাক্ট্রিয়া রক্ষা করলে; কিন্তু তার পশ্চিমের প্রতিবেশী পার্থরাজ প্রথম মিথ্রিডাটিস্কে হীরাট প্রদেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল (খৃঃ পূঃ ১৬২ ও ১৫৫ এর মধ্যে ?)। এই বিপর্য্যয়ের পরে ইউক্রাটীডিসকে হত্যা করা হল। তাঁর ছেলে হেলিয়ক্লিস্ ডিকাইয়স্ ব্যাক্ট্রিয়া, গান্ধার ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উপর সম্ভবত আধিপত্য করেছিলেন; অপর পক্ষে ডিমীট্রিয়সের উত্তরাধিকারী আপলোডোটস্ ও মিলিন্দ পাঞ্জাবের পূর্ব প্রদেশে রাজত্ব করে থাকবেন। ১৩৫-এর দিকে ট্রান্স-অক্সিয়ানার শকগণ, য়ু-চেদের দ্বারা তাড়িত হয়ে, হেলিয়ক্লিসের কাছ থেকে ব্যাক্ট্রিয়া ও তাঁর অন্যান্য ইরানীয় সম্পত্তি কেড়ে নিলে, এবং গ্রীকদের হিন্দুকুশের দক্ষিণে তাড়িয়ে দিলে।

ইন্দো-গ্রীকগণ।

এই পরাজয়ের পরে, হেলিয়ক্লিস্ তাঁর ভারতবর্ষীয় রাজ্য রক্ষা করতে বাধ্য হলেন ঃ—যথা গান্ধার (রাজধানী পিউকেলাওটিস, সংস্কৃত পুষ্কলাবতী বা

পুষ্করাবতী) ও তার সংস্থষ্ট দুটি প্রদেশ উড্ডিয়ন এবং কাপিশ আর পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ। এখানকার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে এই প্রদেশে তাঁর উত্তরাধিকারী হবার কথা আন্টিয়াল্কিদাস নিকেফরাসের (১২০-র দিকে ?)। আন্টিয়াল্কিদাসকে আমরা জানি এই কারণে যে, তিনি একজন মালবরাজের কাছে দূত করে পাঠিয়েছিলেন এক ফিরঙ্গী হেলিওডোরসকে। তার বাপ ছিলেন তক্ষশীলা নিবাসী ডিয়ন। হেলিওডোরস্ সাঁচির নিকটস্থ বিদিশা বা ভিল্সায় বাসুদেব বা বিষ্ণুর নামে সেই বিখ্যাত স্তম্ভলেখ স্থাপন করেন (রাপসনের মতে খৃঃ পূঃ অনুমান ৯০। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে ১৪০ ও ১৩০-এর মধ্যে)।

ইতিমধ্যে ডিমীট্রিয়সের (?) উত্তরাধিকারীগণ আপলোডোটস্ ও মিলিন্দ পূর্ব পাঞ্জাবে (রাজধানী শাকল) গ্রীক রাজ্য বিস্তার করতে লাগলেন। সম্ভবত আপলোডোটস্ (অনুমান ১৫০ ?) কাম্বে পর্যন্ত ঠেলে গিয়েছিলেন, কারণ এক শতাব্দী পরেও তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন ছিল বারিগাজ্জায় (ব্রোচ)। আর মিলিন্দের বিষয় (অনুমান ১৫৫) যেটুকু আমরা জানতে পাই, তা'তে মনে হয় তিনি ভারতবর্ষে সেকন্দর সার কীর্তিকে অনুসরণ ও ম্লান করেছিলেন। গ্রীকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সেই গাঙ্গেয় প্রদেশে প্রবেশ করতে সমর্থ হন, যেখানে স্থাপিত ছিল মগধ সাম্রাজ্য (রাজধানী পাটলিপুত্র বা পাটনা), যার অধিপতি ছিলেন সুঙ্গ বংশের রাজগণ। ভারতীয় ঐতিহ্যে এখনো রাজপুতানার রাজধানী (চিতোরের নিকটস্থ মাধ্যমিকা বা নগরী) এবং অযোধ্যার রাজধানীর (সাকেত বা শাকেত, অযোধ্যারই নামান্তর) বিরুদ্ধে এই আক্রমণের স্মৃতি রক্ষিত রয়েছে। হয়ত বা তিনি পাটলিপুত্র পর্যন্ত ধাওয়াই করে গিয়েছিলেন।

মিলিন্দের পরে পাঞ্জাবের দুই গ্রীসীয় রাজ্য সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানিনে। রাপসনের মতানুসারে, পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজ্য (গান্ধার ও তক্ষশীলা, ইউক্রাটীডিসের বংশ ?) প্রায় আর এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত বজায় ছিল,—ডিয়মীডেস্, ফিলক্সিনস্, আর্টেমিডরাস্, আরখেবিয়স্, আমিণ্টাস্ ও হর্ম্মাইয়স্ প্রভৃতি রাজার অধীনে। এই শেষোক্ত হর্ম্মাইয়স্ ৭৫ ও ২৫-এর (?) মধ্যে শকদ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন বলে অনুমিত হয়। পূর্ব পাঞ্জাবের রাজ্যও

(শাকল, ইউথিডেমস্ ও মিলিন্দ বংশ ?) সমসাময়িকভাবে প্রথম স্ট্রাটন, দ্বিতীয় স্ট্রাটন প্রভৃতি রাজার অধীনে ছিল, যতদিন না সে দেশও শকদ্বারা অধিকৃত হয় (খৃঃ পূঃ ৫৮-এর দিকে ?)।

ইন্দো-গ্রীক রাজগণ কেবলমাত্র তাঁদের মুদ্রা দ্বারা পরিচিত; এই মুদ্রাগুলি অতীব শিক্ষাপ্রদ। সেগুলি থেকে বোঝা যায় গ্রীকগণ কত সত্বর পাঞ্জাবের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এই দেখ ডিমীট্রিয়সের মাথায় এক হস্তীমুণ্ডাকার শিরস্ত্রাণ; আন্টিয়াল্কিদাসের আর একটি মুদ্রায় অপর এক হাতী জিয়স নিখেফরস্‌কে শুঁড় তুলে অভিবাদন করছে। অধিকাংশ মুদ্রাই দ্বিভাষী, গ্রীক ও প্রাকৃত দুই ভাষাতেই অঙ্কিত : বাসিলেয়স্ সোতেরস্ মেনান্দ্রু; মহারাজস ত্রাতরস মেনাদ্রস। পার্থ বিদ্রোহ দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমধ্য সাগরের গোষ্ঠী হতে বিচ্যুত এবং শক আক্রমণ দ্বারা গান্ধার ও পাঞ্জাবে বিতাড়িত হওয়ায়, ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক রাজাদের উত্তরাধিকারীগণ ভারতীয় সমাজের সঙ্গে নিজেদের মিশ খাওয়াতে বাধ্য হলেন। সিরিয়ার সেলিউসীড বা মিশরের লাজীড প্রভৃতি অন্যসকল মাসেডোনীয় রাজবংশের মত, তাঁদের প্রধান বিশেষত্ব ছিল স্থানীয় ধর্মের সঙ্গে আপোষমীমাংসা। এখন এ মীমাংসা ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে করবার চেষ্টা ভারতীয় গ্রীকগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ বিধানানুসারে সে সমাজে তাদের ছিল প্রবেশ নিষেধ। অপরপক্ষে বৌদ্ধধর্ম বাস্তবিকই বিশ্বধর্ম, সে ধর্ম ছিল সামাজিক বা জাতীয় সংস্কারের প্রতি উদাসীন। সুতরাং বৌদ্ধগণ যে "যবন" বিজেতাদের অভ্যর্থনা করবে, এমন কি তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবে, সে ত অতি স্বাভাবিক। গ্রীক রাজগণ বৌদ্ধধর্মকে একটি মহামূল্য সুনিশ্চিত রাজনৈতিক আশ্রয় দান করলেন, এবং বৌদ্ধগণ গ্রীক সভ্যতাকে "ভারতবর্ষীয় জাতীয়তার সনন্দপত্র দিলেন" (সিলভ্যাঁ লেভি)।

এই আপোষমীমাংসা মুদ্রাদ্বারা সমর্থিত বলে বোধ হয়। মিলিন্দের একটি তাম্রমুদ্রায় অঙ্কিত একটি হস্তিমুণ্ড শুঁড় তুলে অভিবাদন করছে; সম্ভবত সেটি শাক্যমুনির গর্ভাধানের হস্তীর প্রতিকৃতি। আর একটিতে এক চক্র অঙ্কিত, সেটি মনে হয় বৌদ্ধ ধর্মচক্র। আগাথোক্লির একটি মুদ্রায় বোধিবৃক্ষ

এবং স্তূপ দেখতে পাই। অন্যদিকে মিলিন্দপঞ্‌হ নামক বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থে, একটি দার্শনিক কথোপকথনে রাজা মেনান্দ্রকে (মিলিন্দ নামে) বৌদ্ধ স্থবির নাগসেনের সম্মুখীন করা হয়েছে। এই গ্রন্থে যবনরাজ বৌদ্ধধর্মের প্রকাশ্য আশ্রয়দাতা বা দ্বিতীয় অশোকরূপে প্রতিভাত। রচয়িতা "অতুলন মিলিন্দের" গুণাবলী ও সাধুতার যে প্রশংসা করেছেন তার সঙ্গে দেখতে পাই প্লুটার্ক একমত, সেখানে তিনি এই রাজার ন্যায়পরতা, এবং তাঁর প্রতি তাঁর প্রজাদের পরাভক্তির কথা বলেছেন।*

(ক্রমশঃ)

* শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত রেঁণে গ্রুসে-র "ভারতবর্ষ" সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।

সিখ সম্রাট ও সতীর শাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অমৃৎসরে কুঁয়র আগবাড়ান হইয়া পত্নীকে লইতে আসিল। তাহার কী পোষাকের জাঁক। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ছয় হাজার পল্টন রেশালা। আমরা রামবাশের মধ্যে ডেরা ফেলিবামাত্র, কুঁয়র বালকের মত লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া আমাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, ও চিক তুলিয়া কমলার বারাদরিতে প্রবেশ করিল। পাঁচ মিনিট না যাইতে আমার ডাক পড়িল। গিয়া দেখি তুজনের চক্ষে জল, মুখে হাসি। কুঁয়র কমলার বাহুতে "সুভাগ কঙ্কণ" পরাইতেছে ও বলিতেছে "তায়াজীর সামনে আমাকে ছুঁয়ে দিব্য করো, আর আমাকে ছেড়ে তীর্থ করতে যাবে না। জানো, আমি তোমার সব চেয়ে বড় তীর্থ।" আজও আমার প্রাণে কুঁয়রের সেই মৃদঙ্গ-গর্জ্জনবৎ গম্ভীর অথচ মধুর কণ্ঠ নিসৃত কথাগুলি ধ্বনিত হইতেছে। আমার গলায় কুঁয়র সুবর্ণশৃঙ্খল সুদ্ধ ফরাসী দেশ হইতে আনিত জেবঘড়ি ঝুলাইয়া দিল। কমলা, যে অমূল্য কঙ্কণ খুলিয়া "সুভাগ কঙ্কণ" পরিয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণীর জন্য আমাকে দিল। কুঁয়রের একজন আরদালি প্রকাণ্ড রূপার তশতরীভরা মোতীয়া ও মৌলস্ত্রীর্ মালা ও পুষ্পগুচ্ছ তাঁহার আজ্ঞায় আনিয়া হাজির করিল। কমলার উপর সেই পরাত উজাড় করিয়া ঢালিয়া, কুঁয়র গান ধরিল—"হার ফুলাঁ দে নী পাওয়াঁ হার ফুলা দে। ফুল্ ল্যায়দে খরীদার পাওয়াঁ হার ফুলাঁ দে।"*

দরবার সাহেবকে পূজা ভেট আদি দিয়া তিনদিন পরে আমরা লাহোর চলিলাম। গোবিন্দগড় কেল্লায় তোপের সেলামী হইল। আমাদের সঙ্গে কী জনতা, ও কী ধুম! রাজপথের তু'ধারে মেলা বসিয়া গিয়াছে। অসংখ্য রমণীকণ্ঠ হইতে "বাধাই! বাধাই!" শব্দ উঠিতেছে। বাধাই বাজনা বাজিতেছে। শত শত পাখাল্ ও মশক দ্বারা জল ঢালিয়া রাস্তার ধুলা বসান

---

* টিক্কা শের সিংহ রচিত এই গানটি এখন পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে সকল চলিত গান অপেক্ষা লোক-প্রিয়।

হইয়াছে। কুঁয়র পূরাসাজে, ঘোড়ায় করিয়া, কমলার পালকির পাশে চলিয়াছে।

চার পাঁচ ক্রোশ পথ রোজ অতিক্রম করিয়া, তৃতীয় দিবসে আমরা ঐতিহাসিক বাদশাহি সপ্তত্তল উদ্যান, লাহোরের সন্নিকট, শালিমার বাগে পৌঁছি। এখানে কমলাকে লইতে স্বয়ং সিংহজী দরবার সহ আসিয়াছেন। সিংহজী পুত্রবধূকে যারপর নাই আদর যত্ন করিলেন। পরদিন একটি বিরাট আনন্দ ভোজ দিলেন, ও অষ্টপ্রহর ব্যাপী "জলসা" করিলেন। আমি ও আমার সহকারীরা সিরোপা ও খেলাত বিতরণ করিতে করিতে ক্লান্তিবশত প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম।

পৌষ সংক্রান্তির বৈকালে সিংহজী, বধূকে লইয়া, রাজধানীর দুর্গপ্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। কমলা এক গজরাজ পৃষ্ঠে আম্বারীতে। অন্দরের বড় দেউড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া গিয়া সিংহজী হজূরীবাগে চলিয়া গেলেন। অন্দরের জৌলক্ষা মন্দিরে শত শত ব্রাহ্মণ ও সিখ ভাইরা চণ্ডী ও গ্রন্থসাহেব পাঠ করিতেছিল। প্রথমে কমলা সেখানে গিয়া গ্রন্থসাহেব ও অষ্টভূজাদেবীকে প্রণাম করিল। তারপর সোজা জীন্দাঁ মহারাণীকে প্রণাম করিতে গেল। আমি বরাবর সঙ্গে সঙ্গেই হাজির ছিলাম। জীন্দাঁর সম্মুখে কতক্ষণ কমলা হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর মুখে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সর্দ্দারজী, গর্ভ কি কখনও এ বাড়ীতে কাহারো হয় নি? এতো বাড়াবাড়ি কেন?" বড় কুঁয়রাণী পাশের ঘর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটু হাসিয়া বলিল, "গর্ভ না ছাই! জাটনী আদর নেবার জন্যে পেটে তুলো বেঁধে আপনাকে ঠকিয়েছে।" তারপর দুইজনেই, কমলার দিকে দৃক্‌পাত্ না করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, হিংসা, দ্বেষ এবং ক্ষোভে দগ্ধ হইয়া এই দুই রমণী প্রায় উন্মাদিনী হইয়াছেন। নচেৎ জীন্দাঁর মত চতুরা নারী আমার সম্মুখে এরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিতেন না। কমলা ম্লান মুখে নিজ দেউড়িতে প্রবেশ করিল। জীন্দাঁর আজ্ঞায় ফটকে কোন মাঙ্গলিক চিহ্ন স্থাপন করা হয় নাই, আর নিয়মমত সখী বাঁদীরা স্বাগতের জন্য দরজাতে কেহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া

নাই। কেবল চোপদার, অহলকার, আমলা ও অন্য কর্ম্মচারীরা নজর পেশ করিয়া কমলাকে সেলাম করিল।

বলিয়াছি সেদিন পৌষ পার্ব্বণ।* কমলার আঙ্গিনায় শহরের প্রায় দু তিন হাজার ভদ্র ঘরের বালক বালিকারা মহা উল্লাসে ছড়া গাইতেছিল। কমলা ইহাদের দেখিয়া সব মনের কষ্ট ভুলিয়া গেল। আমারও বুকের উপর হইতে যেন ভার নামিয়া গেল। কমলা এই শিশু ফৌজকে, চাকর চাকরাণীদের সাহায্যে, মিঠাই ও মেওয়া খাওয়াইয়া, খেলনা, বস্ত্র দিয়া, মহলের চকে ২০।২৫টা বড় বড় "লোহড়ির" অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া দিয়া, আনন্দ করিতেছে, এমন সময় কুঁয়র আসিয়া একেবারে দলে ভিড়িয়া গেল। কাজেই আমাকেও লম্বা দাড়ি লইয়া ছেলেমানুষিতে যোগ দিতে হইল।

সিংহজী রাজ্যের পণ্ডিত, ভাই, দৈবজ্ঞ, সাধু, সাঁই, ফকির একত্রিত করিলেন। রোজ নূতন রকম দান ধ্যান, নূতন রকম যাগ-যজ্ঞ। আমার মনে আছে, কাশী, নাসিক ও ঢাকা বাংলা হইতে কর্ম্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্থানে স্থানে মাঙ্গলিক ক্রিয়া বসাইলেন, যথা কোটি গায়ত্রী, সহস্র চণ্ডী, সোমযজ্ঞ, বিশ্বম্ভর যজ্ঞ ইত্যাদি। গ্রন্থসাহেবের অখণ্ড পাঠ তো সাম্রাজ্য মধ্যে প্রত্যেক ধর্ম্মশালা ও গুরুদ্বারায়, সিংহজীর আজ্ঞায় চলিতেছিল।

দৈবজ্ঞরা মুসলমান নজুমীরা গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে পুত্র সন্তান হইবে। আমার বেশ মনে আছে, একদিন একজন বাঙ্গালী তান্ত্রিকসাধক, যাহার উপর সিংহজীর বড় বিশ্বাস ছিল, ও যাহার দ্বারা তিনি তান্ত্রিক ক্রিয়াদি করাইতেন, সুচেতা দরবারে আসিয়া বলিল, সে হোমাগ্নির মধ্যে মাতা ও সন্তানের রক্তাক্ত ছায়া দেখিয়াছে। আমি কমলার সেই রক্ত-সমুদ্রে সন্তরণ স্বপ্ন, মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সিংহজীকে সে কথা বলায়, তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন।

এই সময় পেশাওয়ার হইতে বড় দুঃসংবাদ আসিল। উত্তর পশ্চিম প্রান্তের

---

* পাঞ্জাবে এ পর্ব্বকে "লোহড়ি" বলে। ছোট ছেলেমেয়েরা পথে ও লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া ছড়া গায়। পয়সা না লইয়া ছাড়ে না। সেই পয়সায় কাঠ কিনিয়া জ্বালা হয়, ও অগ্নিকে ঘিরিয়া বালক-বালিকারা ভুজা, রেউড়ি ও তিলের "ভুগ্গা" চিবাইতে চিবাইতে নাচিয়া বেড়ায়।

সমস্ত পাহাড়ী পাঠান একজোট হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহা সামান্য উৎপাত নহে, বিদ্রোহ। পাহাড় হইতে পাঠান লস্কর নামিয়া নগর গ্রাম লুণ্ঠন করিতেছে, ও কতকগুলি কেল্লা সরকারি সৈন্যের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। প্রধান অমাত্যরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে ২৫,০০০ "খাস্ ফৌজ" (অর্থাৎ ফরাসী ধরণে শিক্ষিত) ও ৪০,০০০ "আম ফৌজ" (অর্থাৎ সাবেক ধরণের সৈন্য) সীমান্ত প্রদেশে প্রেরিত হউক, এবং স্বয়ং যুবরাজ পিতার প্রতিনিধি হইয়া সীমান্ত প্রদেশে শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য যান। দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদের দমন করিয়া, রাজধানীতে ফিরিতে তাঁহার এক বৎসরের অধিক লাগিবে। কমলাকে এ অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে কুঁয়রের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতেই হইল। কমলা হাস্যমুখে স্বামীকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার ভোরে বিদায় দিল, ও নিজ হাতে তাহার গলায় ভদ্রকালী দেবীর প্রসাদি বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া দিল। কুঁয়র, "এই দেখতে দেখতে এক বৎসর কেটে যাবে; তুমি একটুও মন খারাপ করো না; এসেই খোকাকে তোমার হাত থেকে কোলে নেবো" বলিয়া, মহা উল্লাসের ভান করিয়া, কমলার বাহির আঙ্গিনায় হাতীর উপর হাওদায় সওয়ার হইয়া চলিয়া গেল। কমলার আটতলা হাবেলীর চিলের ছাদ হইতে পেশওয়ারের পথ অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইত। কুঁয়রের আগে আগে, হাতীর উপর "নিশান সাহেব" ও আর এক বারণ-বাহিত সিংহ-নাগারা চলিল। ঐ দীর্ঘ স্বর্ণদণ্ডের উপর কৃষ্ণবাসন্তী ধ্বজা যতক্ষণ দেখা গেল, প্রায় বৈকাল পর্য্যন্ত, কমলা দূরবীন হস্তে ছাতের উপর বসিয়া রহিল। সিংহজী আসাতে সে নীচে নামিল। সিংহজী রোজ বেলা দেড়প্রহর সময় এবং রাত্র একপ্রহর শেষে নিয়মিত আসিতেন ও কমলার নিকট কিছুক্ষণ বসিতেন। মধ্যে মধ্যে কমলার নিকট রাত্রে আহার করিতেন। কমলাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য নিত্য নূতন "সলুনা" বা চাটনি ফরমায়েস করিতেন। দিনের মধ্যে ৩।৪ বার খবর লইবার জন্য আমার প্রতি হুকুম ছিল। ধরিতে গেলে, কমলার দেউড়িতেই আমাকে দিনরাত হাজির থাকিতে হইত। যখন তাহার ইচ্ছা হইত, আমাকে ডাকাইয়া গল্পসল্প করিত। সদাসর্ব্বদা নিকটে থাকায়, জীন্দাঁর ও বড় কুঁয়রাণীর কমলার প্রতি নানাপ্রকার জুলুম আমি অবগত হইতাম। শীকার মুখ হইতে ফস্কাইয়া গেলে বাঘ যেমন ক্রোধে জ্ঞানশূন্য

হইয়া যায়, কিংবা বন্দুকের "ওয়ার"* খালি গেলে ওস্তাদ নিশানাবাজ, আর তলওয়ারের চোট বৃথা হইলে বুড়া খেলওয়াড়, যেমন ক্ষেপিয়া যায়, তেমনি তাঁহারা, কমলা তাহাদের অত্যাচার উপেক্ষা করিতেছে মনে করিয়া, ও সিংহজীর স্নেহ কমলার প্রতি বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া। এবং সর্ব্বোপরি কমলার প্রশান্তভাব লক্ষ্য করিয়া, জীন্দাঁর ক্রোধ বহ্নি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া আর প্রচ্ছন্ন থাকিতেছে না, তাঁহার দমনশক্তির বাহির হইতে চলিয়াছে। আমি এ ভীষণ ব্যাপার সিংহজীকে ইঙ্গিতেও জানাইবার চেষ্টা কখন করি নাই, এ আপশোষ আমার মরিলেও যাইবে না।

আজ শ্রাবণী অমাবস্যা। সমস্ত রাত কমলার প্রাসাদে লোকের আসা যাওয়া হইয়াছে। সে আসন্নপ্রসবা। সিংহজী, এ গ্রীষ্মে কমলার জন্য দীনানগর যান নাই; কেল্লায় শিশমহলে আছেন। এ মহলে, ও মহলের সাত ফটক-গারদে, অসংখ্য আলো সমস্ত রাত্র জ্বলিয়াছে। আমি ও অন্য বড় বড় সর্দ্দাররা, মশালধারী পাহারা সঙ্গে, পলে পলে, কমলার দেউড়িতে ছুটিয়া গিয়াছি ও সংবাদ লইয়া সিংহজীর শয়ন মন্দিরে ছুটিয়া আসিয়াছি। সিংহজী, আমাদের বার বার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া, এক নিমেষও চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই; একবার চারপাইয়ে বসিয়াছেন, একবার পায়চারি করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়গণ এবং প্রিয় পরিসদবর্গ সকলে ফরাশের উপর বসিয়া নানাপ্রকার গল্পগুজব হাসি তামাসা দ্বারা সিংহজীকে চিন্তাশূন্য করিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছে। চিন্তার কোন কারণ নাই। রাজপরিবারের প্রধান ধাই, মাই শুভরাই, সিংহজীকে বার বার আশ্বাস দিয়া গিয়াছে কোন ভয় নাই। কলিকাতা হইতে একজন মেম ধাই আনানো হইয়াছে। সেও বলিয়াছে, কোন ভয় নাই। তবুও, সিংহজী ও আমরা সকলে কেমন শঙ্কাপূর্ণ, যেন মাথার উপর কোনো মহাবিপদ উদ্যত হইয়া আছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ বৃষ্টি হইতেছে। হাওয়াটা ভিজা কাপড়ের মত ভারি। মানুষ যে মনের মধ্যে আসছে-বিপদের আভাস পায়, ইহা বিলকুল ঠিক।

দুপ্রহর রাত্রের নহবৎ বাজিবামাত্র সিংহজী আমাকে লইয়া পাশের খাস

* গুলি নিশানায় না লাগিলে।

কামরায় জীন্দাঁর নিকট গেলেন। বলিলেন, "আমি কমলাকে আনতে চললুম। তুমি তাহার সম্পূর্ণ ভার নিলে আমি নিশ্চিন্ত হব।" জীন্দাঁ দাঁড়াইয়া, করজোড়ে "সৎবচন" মাত্র কহিল। আমি দেখিলাম তাঁহার চক্ষু, সিঁথির হীরককে হার মানাইয়া, ধক্ ধক্ জ্বলিতেছিল। "ইহা কি উন্মাদের লক্ষণ?" আমি ভীতচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম।

সিংহজী স্বয়ং গিয়া, নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া কমলাকে সযত্নে লইয়া আসিলেন। সে যেমন শয্যায় শয়ান ছিল, তেমনি চারপাই শুদ্ধ ২০।৩০ জন মজবুত বাঁদী অতি সন্তর্পণে তাহাকে তুলিয়া লইয়া আসিল। উপরে উচ্চ চলন্ত চন্দ্রাতপ, মাটি পর্য্যন্ত কেরেপের পরদা ঝুলানো। আমরা সকলে সতর্কে খুঁটিগুলি বহন করিয়া লইয়া আসিলাম। শয্যাপার্শ্বে শুভরাই ধাই, মেম ধাই ও বৃদ্ধ ফকীর আজীজ উদ্দিন খোদ। মোটা মোটা মোমবাতি লইয়া মশালচিরা আগু পাছু।

সিংহজী, আমি, উজিরসাহেব, ধাইদ্বয় ও সহচরীগণ ছাড়া অন্য সকলকে বিদায় দিয়া, জীন্দাঁকে ডাকাইলেন। "তোমার জিম্মায় কমলা রইল" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দেওয়ানখানাতে দরবারীরা সকলে অপেক্ষা করিতেছিল। কমলাকে তিনি কেন এত স্নেহ করেন, ইহার কৈফিয়ৎ সেখানে সিংহজী বার বার দিলেন ও তাহার অসাধারণ গুণাবলীর বর্ণনা করিতে থাকিলেন।

দেখিতে দেখিতে আশা-দী-ওয়ারের সময় হইল, নিয়মিত প্রভাতী ভজন আরম্ভ হইল। শুভরাই বলিয়া পাঠাইল, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কমলার ক্লেশের সুখাবসান হইবে। "প্রত্যুষে আজ দরবার হজুরীবাগে হইবে" এই হুকুম ঘোষণা করিতে নকীবদের আজ্ঞা দিয়া, সিংহজী প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের জন্য উঠিয়া গেলেন।

ভোর হইতে না হইতেই সিংহজী, হজুরীবাগের বারাদরীতে, পাত্র মিত্র, অমাত্য সহিত বার দিয়া বসিয়াছেন, ও উৎসুক হইয়া সুখবরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে আমার হজুরী রেশালা সাতশো ঘোড়শওয়ার সজ্জিত হইয়া, বাধাইয়ের সেলামী দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। দমদমার উপর, তোপের সারের পাশে পাশে, গোলন্দাজরা, জ্বলন্ত পলিতা হাতে, সেলামী

দাগিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সিংহ তোরণের সম্মুখে ময়দানে, হাজার হাজার গরীব দুঃখী দান লইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। নগরের ভদ্রলোকেরা, সম্রাটকে বাধাই দিবার জন্য, উদ্যানময় দলে দলে দাঁড়াইয়া আছে। রহিয়া রহিয়া মেঘ গর্জ্জন হইতেছে।

সিংহরাজকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—দেবরাজের ন্যায় রূপবান্ রাজা ধ্যান্সিংহ, প্রধান মন্ত্রী; লম্বা শ্বেত শ্মশ্রুযুক্ত উজীর আজীজউদ্দীন; ভীমকায় পাঁচো হাতিয়ার বাঁধা জমাদার খুশালাসিংহ; সুশ্রী উজ্জ্বলবর্ণ কাশ্মিরী পণ্ডিত রাজা দিনানাথ পেশকার; পণ্ডিত কুলতিলক সর্দ্দার লেহনা সিংহ মাজীঠীয়া; বীরবর শ্যামসিংহ আটারীওয়ালা ও অন্যান্য সচিব ও সেনাপতিবৃন্দ। দরবারে বড় হাসির ধুম পড়িয়াছে। সিংহজী উজীর সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন, "সাহেব, কখনো শয়তান দেখিয়াছেন কি?" জোড় হস্তে বিনীত উত্তর, "হজুর, রোজ দেখি।" "সে কি? কেমন দেখিতে শয়তান?" "হজুর, লম্বা পাতলা সাদা দাড়ি, কালো, রোগা, মুখে বসন্তের দাগ, খোঁড়া, এক চোখ কানা।" (একেবারে সিংহজীর ছবি) সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সিংহজীও হাসিতে যোগ দিলেন।

ঠিক ঐ মুহূর্ত্তে অন্দর মহলে এক এমন নিদারুণ শয়তানী কাণ্ড সংঘটিত হইল, যে, খালসা দরবারে হাসি চিরকালের জন্য নিবিয়া গেল; অচিরে খালসা সাম্রাজ্য ধ্বংসের সূত্রপাত হইল।

কমলা নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইল। পুত্র সন্তান। শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতে কমলা ইঙ্গিতে বারণ করিল। নাড়ি কাটিয়া, স্নান করাইয়া ধবধবে শিশুটিকে তাহার পাশে শোয়াইবামাত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া পাশের ঘরে যেখানে জানলার ধারে জীন্দাঁ বসিয়াছিল সেখানে চলিয়া গেল। কোন আপত্তি মানিল না। জীন্দাঁর পায়ের কাছে মেঝের উপর ছেলেটিকে রাখিয়া, হাতজোড় করিয়া কহিল, "মাতা মহারাণীজী, পৌত্রের মুখ দেখিয়া আমাকে এই বখশীশ দিন, যে মনের বিরূপভাব দূর করিয়া ইহার কল্যাণে আমার প্রতি সদয় হউন।" এই বিনয়বাক্য শুনিয়া উপস্থিত কুটুম্বিনীরা কাঁদিয়া ফেলিল। জীন্দাঁ—হায়! হায়! বলিতে আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে—ননীর পুত্তলকে পা ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গবাক্ষের বাহিরে ফেলিয়া দিল। নিচেই গভীর শুষ্ক

পরিখা। কমলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। একটু পরেই সোজা খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার মুখ দেখিয়া সকলে ভয় পাইল। চক্ষুতে দৃষ্টি নাই, কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। খোলা চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত থর থর কাঁপিতেছে। বিদ্যুৎবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ফটকের দিকে ধাবিতা হইল। হাঁ হাঁ করিয়া ৪।৫ জন স্ত্রীলোক ধরিতে গেল। তাহাদের অবহেলে দশ হাত তফাতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। ফটকের পর ফটক পার হইল। পেছু পেছু আত্মীয়া ও দাসীদের দল ছুটিতেছে, ধরিতে পারিতেছে না। পুরুষদের কাহারো সাহস হইতেছে না কুয়রাণীকে ধরে।—

দরবারে হাসির তুফান থামে নাই, এমন সময় জন কোলাহল ভেদ করিয়া বহু স্ত্রী পুরুষ কণ্ঠনিঃসৃত একরকম বিকট ভয়ব্যাকুল চিৎকার অন্দরের দিকে শুনা গেল। বীভৎস গোলমাল ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল। কী এ, কী এ, দেখ, দেখ করিতে করিতে হঠাৎ মেঘক্রোড়ে দামিনীর ন্যায়, আর্ত্তনাদকারী ভীড়ের আগে আগে, কমলা সিংহ দরজা হইতে বহির্গত হইল। ভিক্ষাপ্রার্থীর জমাট জনতা দোফাঁক হইয়া রাস্তা করিয়া দিল। আমি ছুটিয়া গিয়া কমলার গায়ের উপর একখানা চাদর ফেলিয়া দিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলাম। সে আমাকে চিনিল না, আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। সিংহজীর তখনকার মুখের ভাব আমার কলিজায় এখনও লোহা পুড়াইয়া দাগ দেওয়া আছে। দরবারে সবাই ও অন্য অগণিত লোকেরা, অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। কমলা একেবারে সিংহজীর সামনে গিয়া আকশের দিকে এক হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। সে যাহা বলিল, এক একটি শব্দ আমরা স্পষ্ট শুনিলাম। এখনও আমার মাথার মধ্যে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। "ময় বেখনী আঁ ইক্কো পীড়ী বিচ সব গরক যাউ—আমি দেখতে পাচ্ছি এক পুরুষের মধ্যে সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে।" এই কটি কথা বলিবামাত্র কমলার প্রাণহীন দেহ কচি সবুজ ঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িল। সিংহজী সেই প্রথম সাক্ষাতের মত—দেহলতা কোলে তুলিয়া লইলেন।

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[সমাপ্ত]

মনস্তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব

আরম্ভেই দুই চারিটি সংস্কৃত কথার এবং তাহাদের অর্থের উল্লেখ করি। দেখা যাইবে যে প্রত্যেক কথার দুইটি বিপরীত অর্থ রহিয়াছে; যেমন—

(১) আরাৎ—ইহার অর্থ—(ক) দূর (খ) সমীপ; (২) বত—ইহার অর্থ—(ক) খেদ (খ) হর্ষ; (৩) হন্ত—ইহার অর্থ—(ক) হর্ষ (খ) বিষাদ; (৪) ভূতি—ইহার অর্থ—(ক) ভস্ম (খ) ঐশ্বর্য্য।

পরে আর এক শ্রেণীর যুগ্ম কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই যুগ্ম কথা দুইটি একরূপ ধ্বন্যাত্মক। কিন্তু তাহাদের অর্থ বিপরীত ভাবের বোধাত্মক। এই শ্রেণীর কথাগুলি সংস্কৃত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত। লিখিবার সময় এই কথা দুইটির বানান অদল বদল হইবার সম্ভাবনা বলিয়া বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষকদের এই শ্রেণীর কথার উপর আপনা হইতেই দৃষ্টি পড়ে। পূর্ব্বের তালিকার এবং এই তালিকার অনেক কথাই শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ, এম্, এ, পি, আর, এস সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট লেখক কৃতজ্ঞ। একরূপ ধ্বন্যাত্মক বিপরীত অর্থের দৃষ্টান্ত সংস্কৃত ভাষা হইতে নিম্নে কতকগুলি দেওয়া হইতেছে।

শকল—(অর্থ) খণ্ড; সকল—(অর্থ) সমগ্র; রিক্ত—(অর্থ) শূন্য; রিকথ—(অর্থ) ঐশ্বর্য্য; বর্জ্জ্য—(অর্থ) পরিত্যাগের যোগ্য; বর্য্য—(অর্থ) প্রধান, শ্রেষ্ঠ; অশন—(অর্থ) ভোজন বা উদরস্থ করা; অসন—(অর্থ) ত্যাগ; পুৎ—(অর্থ) নরক বিশেষ; পূত—(অর্থ) পবিত্র; ভান—(অর্থ) প্রকাশ, দীপ্তি; ভাণ—(অর্থ) অপ্রকৃত ভাব; বিস্মিত—(অর্থ) আশ্চর্য্যান্বিত; বিস্মৃত—(অর্থ) বিস্মরণযুক্ত; জাত—(অর্থ) উৎপন্ন; যাত—(অর্থ) গত; ধাতৃ—(অর্থ) বিধাতা (Father substitute); ধাত্রী—(অর্থ) ধাইমা (Mother substitute);

প্রতীক-(Symbol)-এর ছবি উল্টা রকমের হইলে উল্টা ভাব প্রকাশ পায়। ইহার দৃষ্টান্ত আদিম যুগের চিত্রকলার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন

Encyclopædia of Religion and Ethics (12th Volume)-এর ৫৫ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে যে একটি সমকোণ ত্রিভুজের চূড়া উৰ্দ্ধদিকে থাকিলে পুরাকালে অগ্নি বুঝাইত। কিন্তু যদি এই সমত্রিকোণ ত্রিভুজের চূড়া নিম্নদিকে করিয়া অঙ্কন করা হয়, অর্থাৎ ত্রিভুজটি উল্টা করিয়া অঙ্কন করা হয়, তাহা হইলে অগ্নির বিরুদ্ধধৰ্ম্মী জলকে বুঝায়।

এই তালিকার দুই চারিটি কথা সম্বন্ধে একটু সমালোচনা করা দরকার। আমরা এই দৃষ্টান্তের মধ্যে জোড়া কথার বিপরীতার্থের দৃষ্টান্ত দিয়াছি রিক্ত এবং রিক্থ। ইহার একটি কথা, যেমন রিক্ত, সংস্কৃত শব্দ, কিন্তু অপরটি, যথা রিক্থ, পারস্য ভাষার শব্দ। এইরূপ বিভিন্ন ভাষার একরূপ ধ্বন্যাত্মক বিপরীতার্থবোধক শব্দের দৃষ্টান্ত ইহার পর আরও দেওয়া যাইবে।

'শকল' এবং 'সকল' এই যুগ্ম শব্দের মধ্যে 'শকল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, এখনও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হয় নাই, মাত্র 'সকল' শব্দটি প্রচলিত হইয়াছে।

বৰ্জ্জ্য ও বর্য্য এবং জাত ও যাত এইরূপ যুগ্ম শব্দের উচ্চারণ যথার্থভাবে করিলে অনেক পৃথক, যদিও বাঙ্গালা ভাষায় উহাদের উচ্চারণ প্রায়ই একরূপ ভাবে করা হয়।

উচ্চারণের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বিপরীত অর্থ, এইরূপ কথা আরও অনেক আছে, যেমন—ইতর, ভদ্র, অধম, উত্তম, কৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন ইত্যাদি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে (১) আমাদের পুরাতন সংস্কৃত ভাষাতেই কি এক কথার বা একরূপ ধ্বন্যাত্মক কথার বিপরীতার্থের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কি এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যান্য পুরাতন ভাষায় পাওয়া যায় ?

(২) ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া এইরূপ ঘটনার কিরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ?

জগৎ বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ ফ্রয়েডের একটি প্রবন্ধ যাহার নাম,—"The Antithetical Sense of Primal Words" তাহার প্রারম্ভে ডাঃ ফ্রয়েড লিখিয়াছেন, যে "আমি স্বপ্ন-বিশ্লেষণ আলোচনা করিয়া একটি তথ্য আবিষ্কার করিয়া তদ্ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, তখন আমি তাহা সম্পূর্ণভাবে নিজেই ধারণা করিতে পারি নাই। সুতরাং আমার এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের (অর্থাৎ

The Antithetical Sense of Primal Words) গোড়ায় সেই কথার পুনরুল্লেখ করিব।

"একটা ভাবের আর একটা বিপরীত বা বিরুদ্ধভাব স্বপ্নের মধ্য দিয়া প্রকাশ করার প্রণালী বড়ই অদ্ভুত। স্বপ্নে বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতা যেন একেবারেই অস্বীকার করা হয়। স্বপ্নের মধ্যে "না" বলিয়া কোন কথার স্থান নাই। স্বপ্নের মধ্যে দুইটি বিরুদ্ধ বিষয় এক হইয়া যাইবার একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। আর সেই উভয় বিরুদ্ধ বিষয় অনেক সময় একই প্রকার চিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। স্বপ্নের মধ্যে এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোন একটা কিছু পাইবার ইচ্ছা ঠিক উল্টা একটা কিছু পাইবার ইচ্ছা দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে, সেইজন্য স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিবার সময়, অনেক সময় মুস্কিল হয় যে স্বপ্নের মধ্যে যে চিন্তাটা পাইতেছি, সেইটিই গ্রহণ করিব বা তাহার উল্টাই ধরিয়া লইব।"

তাহার পর ডাঃ ফ্রয়েড বলেন যে—"দৈবক্রমে ভাষাতত্ত্ববিদ্ K. Abel লিখিত পুরাতন ইজিপ্ট-এর ভাষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা আমার হাতে পড়ে। স্বপ্ন সৃষ্টির মধ্যে নেতিভাব উড়াইয়া দেওয়া এবং বিরুদ্ধ বিষয় একই স্বপ্ন-চিত্র দিয়া প্রকাশের প্রবণতার স্বরূপটি কি, সেইটি সর্ব্ব প্রথমে ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম যখন K. Abel-এর এই পুস্তক পড়িলাম।"

ডাঃ ফ্রয়েড যে আবেল (Abel)-এর পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আবেল লিখিয়াছেন—"এই পুরাতন ইজিপসিয়ান ভাষা আদিম যুগের ভাষার বিশেষ দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ভাষায় অনেক কথা আছে, যাহার দুইটি অর্থ আছে, এবং একটি অর্থ আর একটির ঠিক বিপরীত।"

এই সব কথা বলিয়া Abel ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে সে সময় ইজিপ্ট দেশবাসীগণ নির্ব্বোধ ছিল এরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। সেই সময়ই পিরামিড (Pyramid)-এর মতন সমস্ত পৃথিবীর আশ্চর্য্যকারী কীর্ত্তি সংস্থাপন করা হইয়াছিল, যাহা এখনও আমরা বুঝিতে পারি না কি করিয়া গঠিত হইল। এই জাতি সেই পুরাকালে কাঁচ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিল। বাইবেল-এ যে নৈতিক বিষয়ে ভগবানের দশটি আদেশ আছে, তাহা তাহারা খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বেই নিজ হইতে শাস্ত্র বাক্য করিয়া

লইয়াছিল। এক্ষণে এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে যে এমন সভ্য ও উন্নত জাতি ভাষা গঠনের বিষয়ে এরূপ নির্বুদ্ধি প্রকাশ করে কেন?

এক প্রকার ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিপরীত অর্থ কেবল দৈব ঘটনাক্রমেই (by chance) হইয়াছে, এরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না, এ বিষয়েও Abel গবেষণা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে তাহা সম্ভবপর নহে।

ইজিপ্টের ভাষায় কথা আছে যেমন old-young অর্থাৎ প্রথম অংশের অর্থ old বা বৃদ্ধ, দ্বিতীয় অংশের অর্থ young বা যুবা। মিলিত কথাটির অর্থ যুবা। এইরূপ far-near কথা আছে, যাহার অর্থ near বা নিকটে। outside-inside কথা আছে, যাহার অর্থ inside ইত্যাদি।

ইংরাজী ভাষায় এইরূপ একটি কথা আছে without। এই কথাটি দুইটি কথা মিলিত হইয়া হইয়াছে যেমন with অর্থাৎ সঙ্গে বা নিকটে এবং out অর্থ বাহিরে। মিলিত কথা without-এর অর্থ বাহিরে। আবার শুধু out কথাটির অর্থ বাহিরে।

ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে দুইটি বিপরীত ভাবাত্মক কথা মিলিত হইয়া একটি নূতন ভাবাত্মক কথা সৃষ্টি হয় নাই। চীন দেশের ভাষায় এইরূপ বিপরীত অর্থ-সংযুক্ত বাক্য দেখা যায়, কিন্তু সেই সংযুক্ত বাক্যটি একটি নূতন ভাব-প্রকাশক বাক্য হয়, ইজিপ্ট দেশের মত, সংযুক্ত দুইটি কথার একটি সম-অর্থ বিশিষ্ট বাক্য হয় না।

এইরূপ দুইটি বিপরীত অর্থবোধক কথার সংযোগ দ্বারা উহার মধ্যে একটির অর্থবোধক কথার সৃষ্টির মধ্যে ভাব ও ভাষার সংযোগসূত্র বিষয়ে একটা ইঙ্গিত পাই। আমরা বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে মনের মধ্যে যাহা ধারণা করি, সেই ধারণা তুলনার মধ্য দিয়াই গঠিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি সর্ব্বদাই আলো থাকিত, তাহা হইলে আমরা আলো ও অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম না। আলোর সম্বন্ধে মনের মধ্যে কোন একটি ধারণা গঠিত হইয়া উঠিত না। কিম্বা আলোক বুঝায় এমন কোন কথার সৃষ্টিও হইত না।

আমাদের এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা পরস্পর-সাপেক্ষ। একটা

জিনিসের স্বাধীন সত্তা অন্য জিনিসের সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আছে এবং অন্য জিনিসের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় বলিয়াই আছে। আমাদের প্রত্যেক ধারণাই ছুটি যমজ বিপরীত ধারণার একটি ধারণা। এইজন্য একটি ধারণা প্রথম চিন্তা করিতে হইলে, কিম্বা এই ধারণার বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিতে হইলে তাহার বিপরীত ধারণার সহিত পরিমাণ করিয়া প্রকাশ করা ছাড়া উপায় কি ?

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি সরল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। পুরাতন ইজিপসিয়ান ভাষায় কেন্ (Ken) কথাটি বলশালীও বুঝাইত, ছুর্ব্বলও বুঝাইত। কোন বলশালী লোকের ধারণা ছুর্ব্বল লোকের বৈপরীত্যের ধারণার মধ্য দিয়া ছাড়া মনে আনা অসম্ভব, সেই জন্য কেন্ (Ken) কথাটা বলশালী বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে ছুর্ব্বলের ধারণা মনে আনিয়া দেয়। বাস্তবিক পক্ষে ঐ কথাটি বলশালীকে দেখাইয়া দিতেছে না, ছুর্ব্বলকে দেখাইয়া দিতেছে না, কিন্তু এই ছুইটির সম্বন্ধ দেখাইয়া দিতেছে, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়া দিতেছে, যাহা দ্বারা ছুই প্রকার ধারণাই সমান পরিমাণে হইতেছে। এইরূপ ছুইটি বিপরীত ধারণার মধ্য দিয়া ছাড়া মানুষ পুরাকালে সহজ ধারণা করিতে পারে নাই। জ্ঞানময় মনের মধ্য দিয়া এই বিপরীত ধারণার ছুটি দিককে একসঙ্গে তুলনা না করিয়া পৃথকভাবে ধারণা করা মানুষ ক্রমশঃ শিক্ষা করিয়াছে।

ঐ যুগের ইজিপসিয়ান ভাষায় কেন্ (Ken) কথাটা সবল বুঝাইবার জন্য (Ken) লেখার পর, একটা দণ্ডায়মান মানুষ, যাহার হাতে অস্ত্র রহিয়াছে, এইরূপ একটি ছবি অঙ্কন করিয়া দেওয়া হইত। যদি (Ken) কথাটি ছুর্ব্বল অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে অক্ষর দ্বারা কথাটি লিখিত হওয়ার পর, একটি পরিশ্রান্ত মানুষ গুড়ি শুড়ি মারিয়া বসিয়া রহিয়াছে এইরূপ একটি ছবি দেওয়া হইত। কথিত ভাষায় স্বরের বিভিন্নতার মধ্য দিয়া অথবা অঙ্গ-ভঙ্গীর মধ্য দিয়া কথার বিভিন্ন অর্থের ইঙ্গিত থাকিত।

আবেল (Abel)-এর মতে যে সব কথা অতি পুরাতন তাহাদের মধ্যেই এইরূপ ছুই বিপরীত অর্থ পাওয়া যায়। তাহার পর ক্রমশঃ যেমন ভাষা বিকশিত হইতে লাগিল, তেমনি ক্রমশঃ এক কথার এই ছুই বিপরীত অর্থ লোপ পাইতে লাগিল। অন্ততঃ ইজিপসিয়ান ভাষায়, বহুস্থলে, এইরূপ ক্রমশঃ

পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া, পুরাতন কথা কিরূপ করিয়া এই দুই বিপরীত অর্থ-যুক্ত অবস্থা হইতে বর্ত্তমান কথায় পরিবর্ত্তিত হইয়া একটি অর্থ লাভ করিল সে বিষয়ে বহু গবেষণা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে পুরাতন কথা যাহার দুই বিপরীত অর্থ ছিল, সেটি পরবর্ত্তী কালের ভাষায় দুইটি বিভিন্ন কথায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি কথার উচ্চারণের মধ্যে সামান্য প্রভেদ হইয়াছে। এইরূপ উচ্চারণের সামান্য পৃথকত্ব যুক্ত দুইটি শব্দের একটিতে বিপরীত অর্থের একটি অর্থ যুক্ত হইয়াছে, অপরটিতে বিপরীত অর্থের মধ্যে আর একটি যুক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ইজিপসিয়ান ভাষায় এইরূপ হইয়াছে —যেমন কেন্ (Ken) যাহার সবল ও দুর্ব্বল এই উভয় অর্থ ছিল, তাহার আর দুইটি অর্থ রহিল না। কেবল সবল অর্থই রহিল। এই কথাটির উচ্চারণের সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়া একটা অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি হইল। তাহার উচ্চারণ হইল ক্যান্ (Kan); ইহার অর্থ হইল দুর্ব্বল। এইরূপে একটি কথা দুইটি বিপরীত অর্থে ব্যবহার জন্য যে মুস্কিল হইতেছিল, তাহা কাটিয়া গেল।

পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা হইতে বিপরীতার্থ-বোধক যে যুগ্ম শব্দের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যেমন অনেকস্থলে এক কথার বর্গীয় 'ব', দন্ত্য 'স', দন্ত্য 'ন' স্থলে, আর এক কথার অন্তস্থ 'ব', তালব্য 'শ', মুর্দ্ধণ্য 'ণ' হইয়াছে।

আবেল (Abel) তাঁহার পুস্তকে একটি পরিশিষ্ট দিয়াছেন তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, ইজিপসিয়ান ভাষার মতন, Indo-European ভাষাতেও একই কথার ঠিক দুইটি বিপরীত অর্থ রহিয়াছে, যেমন ল্যাটিন (Latin) ভাষায় Altus অর্থ High উচ্চ আবার Deep গভীর, Sacer অর্থ Holy পবিত্র এবং Accursed অভিশপ্ত। Frazer's Golden Bough নামক পুস্তকে এইরূপ ধর্ম্মমূলক কথার বিপরীত অর্থ সম্বন্ধে কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, আদিম যুগের ধর্ম্মের বিধি-বিধানের মধ্যে দুইটি বিরুদ্ধ ভাব ছিল যেমন একটি নিষ্ঠুরতা আর একটি পবিত্রতা।

অন্য ভাষায় একরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিপরীত অর্থের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে নিম্নে নমুনা স্বরূপ দুই চারিটি দেওয়া যাইতেছে।

ল্যাটিন (Latin) ভাষায় clamare অর্থ to cry চিৎকার করা, clam অর্থ softly আস্তে ; Seccus অর্থ dry শুষ্ক, Succus অর্থ juice রস। জার্ম্মাণ (German) ভাষায় Bös অর্থ bad মন্দ, Bass অর্থ good ভাল ; Stumm অর্থ dumb বোবা, Stemme অর্থ voice স্বর।

এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় শব্দ গৃহীত হইবার সময় শব্দের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অর্থে বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ডাঃ ফ্রয়েড দিয়াছেন, যেমন জার্ম্মান ভাষায় kleben কথাটি হইতে ইংরাজী ভাষার cleave কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু জার্ম্মাণ ভাষায় kleben কথাটির অর্থ to adhere অর্থাৎ লাগিয়া থাকা, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় to cleave শব্দটির অর্থ ছাড়াইয়া লওয়া।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন আয়াস, আয়েস। এখানে আয়াস কথাটি সংস্কৃত ; অর্থ শ্রম ও শ্রান্তি। আয়েস কথাটি পারস্থীয় ; অর্থ আরাম, বিশ্রাম ও সুখ। আবার রিক্ত অর্থ শূন্য, রিকৃথ অর্থ ঐশ্বর্য্য। প্রথম কথাটি সংস্কৃত, পরের কথাটি পারস্থীয়।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বকালে একটি পুরাতন ভাষা ছিল যাহা হইতে সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

পুরাতন ইজিপসিয়ান ভাষায় আর এক রকমের বিশেষত্ব দেখা যায় যেটা আমাদের স্বপ্নসৃষ্টির সময় অবচেতন মন যেরূপ ক্রিয়া করে, সেই ক্রিয়ার মধ্যেও দেখা যায়।

পুরাতন ইজিপসিয়ান ভাষায় অনেক কথা আছে যেগুলির উচ্চারণ উল্টাইয়া বলিলেও কোন আপত্তি হয় না। মনে করুন Good এই ইংরাজী কথাটা ইজিপসিয়ান ভাষার একটি কথা। ইজিপসিয়ান এই কথাটা ভাল বা মন্দ এই উভয় অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এবং ইহার ঠিক উল্টা কথা Doog-ও ভাল ও মন্দ এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত করা যাইতে পারে। ইজিপসিয়ান ভাষায় এইরূপ দৃষ্টান্ত এত অধিক যে এইগুলি দৈবক্রমে ঘটিয়াছে এরূপ মনে করা যায় না।

আবেল (Abel) তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অন্যান্য ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যাহার উচ্চারণ উল্টাইয়া গেলে অর্থ উল্টাইয়া যায় বা ঠিক থাকে। যেমন ইংরাজী ভাষায় care এবং wreck এই দুইটি শব্দের উচ্চারণ উল্টা এবং অর্থও উল্টা। একটির অর্থ যত্ন করা, আর একটির অর্থ ধ্বংস করা।

জার্ম্মাণ ভাষায় Balken এবং Kloben ইহাদের উচ্চারণ উল্টা, কিন্তু দুই শব্দের একই অর্থ club অর্থাৎ লাঠি। ইংরাজীতে Boat এবং Tub ইহাদের উচ্চারণ উল্টা কিন্তু মানে প্রায় এক।

ইহা ছাড়া Abel আরও দেখাইয়াছেন যে যখন এক ভাষা হইতে অন্য ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তখন এই দুই ভাষার শব্দের মধ্যেও এইরূপ শব্দের এবং অর্থের সম্বন্ধ থাকে, যেমন ইংরাজীতে Hurry, এই কথার মানে তাড়াতাড়ি। জার্ম্মাণ ভাষায় Ruhe কথার উচ্চারণ উল্টা অর্থও উল্টা। ইহার অর্থ rest বা বিশ্রাম। ল্যাটিন Folium এবং ইংরাজী Leaf এই দুই কথার উচ্চারণ উল্টা। অর্থ দুই কথারই এক—গাছের পাতা।

এই উদাহরণগুলির মধ্যে একস্থলে আবেল (Abel) সংস্কৃত ভাষার একটি কথা টানিয়া আনিয়াছিলেন—রাসিয়ান কথা Duma এবং সংস্কৃত কথা মূঢ়, ইহাদের একটির অর্থ সুধীবর্গ এবং অপরটির অর্থ বুদ্ধিশূন্য। ইহাদের উচ্চারণ উল্টা অর্থও উল্টা।

এই উপলক্ষে আমাদের সংস্কৃত ভাষার দুইটি শব্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। একটি শব্দ দূর আর একটি শব্দ আরাৎ। লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে যে ইহাদের উচ্চারণ উল্টা। আরাৎ কথাটির দুইটি বিপরীত অর্থ দূর এবং সমীপ। এস্থলে আরাৎ কথাটির দূর কথা হইতে উল্টা হইয়া যাওয়াতে অর্থ বিপরীত হইয়াছে, আবার সমীপ মানে ধরিলে এক হইয়াছে।

কথার উচ্চারণ এইরূপ ভাবে উল্টাইয়া যাওয়া এবং তাহার সঙ্গে অর্থের পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপার, আবেল (Abel) এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যে মূল শব্দটির দ্বিত্ব হয়, পরে পরিবর্ত্তন হয়। মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ ফ্রয়েড এ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এইটি আমাদের অবচেতন মনের ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়া থাকে।

আমাদের অবচেতন মনের ক্রিয়ার ফলে যখন স্বপ্ন সৃষ্ট হয়, তখন অনুরূপ ঘটনা আমাদের স্বপ্ন-চিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। একজন ব্যক্তির স্বপ্নচিত্রের মধ্যে প্রথমে হয়ত কতকগুলি স্বপ্নচিত্র পর পর একরূপ ভাবে সাজান দেখা গেল, পরে হয়ত আর একটি স্বপ্নে ঐ স্বপ্নচিত্র পর পর ঠিক উল্টাভাবে সাজান দেখা গেল, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে প্রথম স্বপ্নচিত্রের মধ্যে যেরূপ ভাব রহিয়াছে, পরের স্বপ্নচিত্রের মধ্যে তাহার উল্টাভাব রহিয়াছে। অবচেতন মনের ক্রিয়া যেমন ভাষাসৃষ্টির মধ্যে দেখা যায়, অনেক স্থলে তেমনি কবিতার সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায়।

শ্রীসরসীলাল সরকার

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিপিন ভাবিতেছিল, মাধবীলতাকে প্রথমে আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবে তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশকেও আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে বলিবে কিনা ঠিক করিবে। ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিতে লাগিল। সদানন্দের নাগালের মধ্যে আবার মাধবীলতাকে আনিয়া ফেলিতে বিপিন আর সময়ই পায় না। নিজেই সে বুঝিতে পারে না মাধবীলতাকে ফিরাইয়া আনিবে ঠিক করিয়াও মহেশের ওখানে মেয়েটাকে কেন্ ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবার অবশ্য সে মাধবীলতার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিবে, নিজেও সতর্ক থাকিবে, তবু যেন ভয় হয়।

সদানন্দ বড় ভয়ানক মানুষ।

সদানন্দের মানুষ বশ করার যে ক্ষমতাকে অসামান্য গুণ মনে করিয়া বিপিন এতদিন আশ্রমের কাজে লাগাইয়াছে, আজ সেই ক্ষমতাকে অনিষ্টকর ভয়ানক কিছু বলিয়া গণ্য করিতে বিপিনের দ্বিধা হয় না। বিজ্ঞানের সুবিধাভোগীরা যে ভাবে বিজ্ঞানকে অভিশাপ দেয়, সদানন্দকেও বিপিন আজকাল তেমনি ভাবে কাজ ফুরানো পাজীর দলে ফেলিয়াছে। কেবল মাধবীলতার জন্য এ বিরাগ নয়, সদানন্দের কাজ প্রকৃতপক্ষে ফুরায় নাই, মনে হইয়াছিল সদানন্দকে বাদ দিয়াও আশ্রম চালানো যাইবে কিন্তু কল্পনাটা কার্য্যে পরিণত করিবার নামেই নানারকম আশঙ্কা মনে জাগায় আপনা হইতেই বিপিন্ টের পাইয়াছে যে সদানন্দকে সে বিদায় দিতে চায় বটে কিন্তু এখনও সেটা সম্ভব নয়।

যে কোন বুদ্ধিমান উৎসাহী-লোক সদানন্দকে সামনে দাঁড় করাইয়া এরকম একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিবে—সদানন্দকে বিদায় করার পক্ষে এই এখন সব চেয়ে বড় বাধা। সদানন্দ শুধু চলিয়া গেলে আরও বেশী কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া আশ্রমকে সে চালাইয়া নিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে সদানন্দ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলে পারিবে না। হয়তো পারিবে,

কোন বিষয়েই নিজেকে বিপিন অক্ষম ভাবিতে পারে না, কিন্তু সাধ করিয়া সে হাঙ্গামা টানিয়া আনিবার সাহস বিপিনের নাই।

বিপিনের সাহস কি কম? বিপিন কি ভীরু?

মাধবীলতা তাই বলে। বলে, 'বিপিনবাবু? উনি অপদার্থ ভীরু কাপুরুষ—'.

বলে মহেশকে। প্রাণ খুলিয়া বিপিনের নিন্দা করিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর উপর বিরক্তিটা তার এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, লোকটাকে দেখিলেই গায়ে যেন আজকাল তার জ্বর আসে। কিছুদিন আগে মাধবীলতা বিপিনকে বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরী লোক ভাল নয়। তখন বিপিনের সাহচর্য্য সে সহ্য করিতে পারিত না। আজকাল মহেশ চৌধুরীর একসুরে বাঁধা মনোবীণার একঘেয়ে ঝঙ্কারগুলি একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলায় বিপিনের মধ্যেও হঠাৎ সে কিছু কিছু বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। বিপিনের কাছে আর তাই মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য করে না, মহেশ চৌধুরীর কাছে বিপিনকে বিশেষণের পর বিশেষণে অভিনন্দিত করিয়া চলে—চালবাজ, মিথ্যুক, লোভী, অসংযত প্রভৃতি কত সংজ্ঞাই যে বিপিনকে সে দেয়।

বিপিনের প্রশংসায় মহেশ কিন্তু পঞ্চমুখ। কারও সম্বন্ধে মহেশ কখনও কোন কারণেই মত বদলায় না—অন্ততঃ স্বীকার করে না যে নিন্দা প্রশংসায় কারও সম্বন্ধে তার ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিন্দা সে জগতে কারও করে না, একবার যার যে গুণগান করিয়াছে চিরকাল সমান উৎসাহের সঙ্গে তার সেই গুণকীর্ত্তনই করিয়া যায়।

মাধবীলতার মুখে বিপিনের বিশেষণগুলি শুনিয়া সে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিতে বসে যে, মাধবীলতা ভুল করিয়াছে, ওসব বিশেষণ বিপিনের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না। বিপিন মহান, উদার, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ,—চাল বিপিনের নাই, মিথ্যা সে কখনও বলে না, লোভী সে নয়, সংযমের তার তুলনা নাই। বিপিনের ভীরুতার অপবাদটিরও মহেশ প্রতিবাদ করে।

মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে, 'বিপিনবাবু ভীরু কাপুরুষ? কি যে তুমি বলো মা! ওঁর মত বুকের পাটা কটা মানুষের থাকে?'

মাধবীলতা রাগিয়া বলে, 'কি যে দেখেছেন আপনি বিপিনবাবুর মধ্যে! উনি যদি ভীরু কাপুরুষ নন, কে তবে ভীরু কাপুরুষ? শুনুন বলি তবে। আশ্রমের ক্ষতি করবেন ভয়ে আপনাকে উনি আশ্রমে নিতে ভরসা পাচ্ছেন না।'

রাগের মাথায় ভিতরের মস্ত বড় কথা যেন ফাঁস করিয়া দিয়াছে এমনি গর্ব্বভরা অনুতাপের ভঙ্গিতে মাধবীলতা একদৃষ্টে মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মহেশ চৌধুরী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়। মনে হয়, ভিতরের আসল কথাটা জানিতে পারিয়া বুঝি চটিয়াই গিয়াছে! কিন্তু কথা শুনিয়া বুঝা যায় এত সহজে খেইহারা হইবার মানুষ সে নয়।

'ভয় তো বিপিনবাবুর মিথ্যে নয় মা! আমাকে আশ্রমে ঠাঁই দিলে আশ্রমের ক্ষতির আশঙ্কা আছে বৈকি! আমি হলাম মহাপাপী, আমার সংস্পর্শে—'

বিপিনের ভীরুতার প্রমাণটি ফাঁসিয়া যায়। চালের উপরেই বিপিন চলে এ ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কিন্তু উদাহরণ দাখিল করিতে গিয়া বিপিনের চালবাজির একটি দৃষ্টান্তের কথাও মাধবীলতা আগে একদিন অনেক চেষ্টাতেও মনে করিতে পারে নাই। বিপিনের ভীরুতার আরেকটি জোরালো দৃষ্টান্ত আজ সে কোনরকমেই স্মরণ করিতে পারে না। বিপিন ভীরু সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে কোথায় সে ভীরুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে?

ভাবিতে গেলে সত্যই বড় বিস্ময় বোধ হয়। বিপিনের কি তবে দোষ বলিয়া কিছুই নাই? অভাব কেবল তার গুণের? সদ্‌গুণ একেবারে নাই বলিয়াই লোকটার চালচলন এমন নিন্দনীয় মনে হয়? সংসারে মানুষ হয় ভালমন্দ মেশানো, কারো মধ্যে ভাল থাকে বেশী কারও মধ্যে কম, কিন্তু বিপিনের মধ্যে ভালর নামগন্ধও নাই। তাই কি বিপিনকে মনে হয় খারাপ লোক, যদিও তার মধ্যে মন্দের ভাগটাও খুঁজিয়া মেলে না? কথাটা যেন দাঁড়াইয়া যায় ধাঁধাঁয়—ভালও নাই মন্দও নাই, কি তবে আছে বিপিনের মধ্যে? কিসের মাপকাঠিতে মানুষ তাকে মানুষ হিসাবে বিচার করিবে? তাকে কি ধরিয়া নিতে হইবে নিন্দা প্রশংসার অতীত মহামানব বলিয়া?

বিপিন মহামানব! ভাবিলেও মাধবীলতার হাসি আসে। কিন্তু ধারণা দিয়া—আপনা হইতে মনের মধ্যে যে সব ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে সেই ধারণাগুলি

দিয়া—বিপিনের বিচার না করিলে, বিপিনের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে ওজন করিতে বলিলে, বিপিন সত্যই পরিণত হয় মহামানবে।

নিজের সমস্যাগুলি নিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে বিপিনের দিন কাটিতেছে, মাধবীলতার খবর নেওয়ার সময়ও বিশেষ পাইতেছে না, বিভূতি একদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মহেশের অসুখ উপলক্ষে তাকে বাড়ী ফিরিতে দেওয়া হইয়াছে। না বলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিবে না, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকিবে।

ছেলের চেহারা দেখিয়া বিভূতির মা কাঁদিয়াই আকুল। মহেশ বলিলেন 'কাঁদছ কেন ? পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না ?'

বিভূতি বলিল, 'খিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও। খালি খেতে দাও, দিনরাত শুধু খেতে দাও, আর কিছু নয়।'

পরদিন ভোরবেলা মহেশ ছেলেকে নিয়া সদানন্দের চরণ বন্দনা করিতে বাহির হইলেন। চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে আশ্রমে যাইতেছেন একথা অবশ্য বিভূতিকে জানাইলেন না, শুধু বলিলেন, 'আমাদের একবার আশ্রম থেকে ঘুরিয়ে আনবি চল্‌তো।'

'কি হবে আশ্রমে গিয়ে ? এ্যাদ্দিন পরে এলাম, গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখা-টেকা করি ?'

'পরে দেখা করিস। আগে আশ্রম থেকে ঘুরে আসবি চল।'

কিন্তু বিভূতির কাছে আশ্রমের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। গ্রামের চেনা মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই মনটা তার ছটফট করিতেছিল। তার আসিবার খবরটা সে আসিয়া পৌঁছিবার অনেক আগেই গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু কাল কেউ তাকে দেখিতে আসে নাই বলিয়া বিভূতি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। তার সংস্পর্শে আসিতে কয়েকজনের ভয় হওয়া সম্ভব, অন্ততঃ ভয় ভাঙ্গিতে কিছুদিন সময় লাগিবে, কিন্তু চোরা গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইয়ের বাঁধা পড়িবার আতঙ্কটা কি সকলের মধ্যেই এত বেশী প্রচণ্ড যে একজনও তার খবর নিতে আসিল না ?

না আসুক, বিভূতি নিজেই সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া ভয় ভাঙ্গাইয়া দিয়া আসিবে। আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাবে সে তাই ইতস্ততঃ করিতে থাকে।

আশ্রমে যাওয়ার নামে মাধবীলতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলে, 'তাই চলুন, আশ্রম দেখে আসবেন।'

বিভূতি হাসিয়া বলে, 'আশ্রম দেখা কি আর আমার বাকী আছে, ঢের দেখেছি।'

'সে আশ্রম আর নেই, কত পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।'

বিভূতির জেলে যাওয়ার আগে সদানন্দের আশ্রম কেমন ছিল এবং তারপর আশ্রমের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাধবীলতার জানিবার কথা নয়, এটা তার শোনা কথা। মাধবীলতার উৎসাহ দেখিয়া বিভূতি আর আপত্তি করিল না, তিনজনে আশ্রমের দিকে রওনা হইয়া গেল—মহেশ, মাধবীলতা আর বিভূতি। বিভূতির মা গেলেন না, বলিলেন, 'আশ্রম মাথায় থাক, তোমরা ঘুরে এসো।'

বাড়ীর সামনে কাঁচা পথ ধরিয়া তিনজনে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, শশধর আসিয়া জুটিল। আশ্রমে যাওয়ার একটা সুযোগও শশধর ত্যাগ করে না।

মহেশ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁটতে পারবে তো মা?'

মাধবীলতা হাসিয়া বলিল, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।'

মহেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'দুর্গা, দুর্গা। সত্যি ওর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।'

আশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথমেই দেখা হইয়া গেল রত্নাবলীর সঙ্গে। মাধবীলতাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল, 'বেঁচে আছিস?'

মহেশ তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছ মা?'

কাছেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল, কদিন আগে গাছটা কাটা হইয়াছে। বিভূতি গুঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া সে আর নড়িবে না।

মাধবীলতা বলিল, 'কাঠপিঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দেবে কিন্তু।'

বিভূতি বলিল, 'দিক, গোখরো সাপ কামড়ালেও এখন আমি নড়ছি না।'

তখন সেইখানে কাঠের গুঁড়িতে বসিয়া সকলে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

শীতের সকালের প্রথম মিষ্টি রোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল সকলের গায়ে। আরামে এমন জমিয়া উঠিল আলাপ যে মনে হইতে লাগিল, সদানন্দের চরণ বন্দনার কথাটা মহেশও ভুলিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে কুটীর হইতে বাহির হইয়া তাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সময় স্বয়ং সদানন্দকেও কেউ দেখিতে পাইল না। খেয়াল হইল সদানন্দ যখন সামনে আসিয়া রোদ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে প্রণাম করিল মহেশ, তারপর মামার অনুকরণে শশধর। রত্নাবলী প্রণাম করায় মাধবীলতাও টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছ মাধু?'

মাধবী বলিল, 'ভালই আছি।'

মহেশ বিভূতিকে বলিল, 'এঁকে প্রণাম কর।'

আগের কথা সদানন্দের মনে ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, 'থাক্, থাক্।'

মহেশ জোর দিয়া আবার বলিলেন, 'প্রণাম কর বিভূতি, এঁর আশীর্ব্বাদে তুমি ছাড়া পেয়েছ।'

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিভূতি উঠে নাই। বসিয়া থাকিয়াই সে দু' হাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'নমস্কার, ভাল আছেন? অনেকদিন পরে দেখা হল। আপনার আশীর্ব্বাদ গবর্ণমেণ্টকেও টলিয়ে দিতে পারে তা তো জানতাম না!'

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, 'আমার বলে নয়, আশীর্ব্বাদ আন্তরিক হলে ভগবানকে পর্য্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে বাবা।'

বিভূতি আরও বেশী শান্তভাবে বলিল, 'ভগবানের কথা বাদ দিন, তিনি তো সব সময়েই টলছেন মাতালের মত। টাল সামলাতে প্রাণ বেরোচ্ছে আমাদের।'

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া থাকে। রত্নাবলীর সাদা দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করে। অস্থির হইয়া ওঠেন মহেশ। কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়াই তিনি যেন প্রথম দিকে ব্যাকুলভাবে শুধু বলিয়া চলেন, 'আহা', 'ওকি' আর 'ছি ছি'। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া, সোজা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরকণ্ঠে ডাকেন, 'বিভূতি!'

বসা অবস্থাতেই সোজা আর শক্ত হইয়া বিভূতি বলে, 'কেন ?'

'পায়ে হাত দিয়ে এঁকে প্রণাম কর, নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।'

'এঁকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না বাবা। ক্ষমা চাওয়ার মত অন্যায় কথা কিছু বলি নি।'

'এঁকে আমি দেবতা মনে করে পূজা করি, আমার ছেলে তুই, এঁকে তোর প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না ? যা মনে এল বলে বসলি মুখের ওপোর, তবু তোর অন্যায় কথা বলা হল না ?'

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

'করবি না প্রণাম ?'

'না।'

এবার প্রশান্তকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, 'মহেশ, কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করে দিলে তুমি ?'

'ছেলেমানুষী প্রভু ?'

'তুমি কি ভাব ওর প্রণাম পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি ?'

'তা ভাবিনি প্রভু। ও প্রণাম করুক না করুক আপনার তাতে কি আসবে যাবে—সর্ব্বনাশ হবে ওর নিজের। ও যে আমার সন্তান প্রভু ?'

সদানন্দ অভয় দিয়া বলিল, 'ভয় নেই, ওর কিছু হবে না। প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্ব্বাদ বিক্রী করি না মহেশ, আশীর্ব্বাদ করাটা আমার ব্যবসা নয়, ভুলে যাও কেন ? ছেলেমানুষের কথায় যদি আমি রাগ করি, আমি যে ওর চেয়েও ছেলেমানুষ হয়ে যাব।'

মহেশ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল, 'তা কি জানি না প্রভু ? আপনি দেবতা, আপনার কি রাগ দ্বেষ আছে ? কিন্তু আপনাকে প্রণাম না করলে ওর অকল্যাণ হবে।'

'অনিচ্ছায় প্রণাম করার চেয়ে না করাই ভাল মহেশ।'

'না প্রভু। প্রণম্যকে প্রণাম করতেই হয়। প্রণাম করতে করতে মনে ভক্তি আসে।—বিভূতি, প্রণাম কর এঁকে!'

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

মহেশ আবার বলিল, 'বিভূতি, প্রণাম কর। এই দণ্ডে যদি প্রণাম না কর এঁকে, আমি যেমন আছি তেমনিভাবে যে দিকে দু' চোখ যায় চলে যাব, কোনদিন আর ফিরব না।'

বিভূতি শুকনো মুখে কোন রকমে বলিল, 'আমি পারব না বাবা।'

মাধবীলতার সব কথাতেই ফোঁড়ন দেওয়া চাই। পিতার আদেশ আর মিনতি যেখানে ব্যর্থ হইয়া গেল, যে দিকে দু' চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার ভয় প্রদর্শন পর্য্যন্ত কাজে লাগিল না, সেখানে কাতরকণ্ঠে বিভূতিকে অনুরোধ না জানাইয়া সে পারিল না, 'আহা, এমন করে বলছেন সবাই, করুন না প্রণাম একবারটি?'

এমন সময় আসিল বিপিন।

কারও দিকে বিপিন চাহিয়াও দেখিল না। সোজাসুজি মাধবীলতার কৈফিয়ৎ দাবী করিয়া বলিল, 'আমায় না জানিয়ে আশ্রমে এলে যে মাধু?'

বিপিনের মুখ দেখিয়া আর গলার আওয়াজ শুনিয়া মাধবীলতার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। মহেশ বলিল, 'আমি ওকে এনেছি বিপিনবাবু।'

বিপিন তীব্রস্বরে ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ করুন, আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি!'

প্রকাশ্যভাবে কেউ কোনদিন বিপিনকে উঁচু গলায় কথা বলিতে শোনে নাই—বিশেষতঃ সদানন্দের সামনে।

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষণিকবাদ (১) *

বৌদ্ধ দর্শনের একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে কোন বস্তুই, (অর্থাৎ বস্তু সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান) স্থির নহে। কমলশীল বলিয়াছেন, এই জ্ঞানেই সকল শাস্ত্রার্থের পরিসমাপ্তি। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকদিগের ন্যায় বৌদ্ধগণও বিশ্বাস করিতেন সবই সচল—panta rhei। এই একই মূল বিশ্বাস হইতে গ্রীক্ ও বৌদ্ধগণ জগৎ সম্বন্ধে যে সকল অনুমান করিয়াছিলেন তাহা কিন্তু এক নহে। এই দিক্ দিয়া বরংBerkeley ও Hume-এর সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এ কথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে Berkeley ও Hume যাহা পরে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাই ছিল বিজ্ঞানবাদিদের মূলতত্ত্ব। Berkeley-র প্রধান কথা—appearence-ই সব, reality কিছু নাই ; যাহার প্রকৃতি অস্তিত্ব নাই তাহাই বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হয়;—ইহা হইতেই Berkeley ঈশ্বরের লোকোত্তর বিভূতির প্রমাণ পাইয়াছিলেন। Hume প্রধানতঃ যাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই যে কার্যকারণ সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। Hume-এর নিজের কথায় :—"When it is asked, what is the nature of all our reasonings concerning matter of fact, the proper answer seems to be that they are founded on cause and effect. When again it is asked, what is the foundation of all our reasonings and conclusions concerning that relation, it may be replied in one word : experience।" বিজ্ঞানবাদিগণ নৈয়ায়িকদিগের বিরুদ্ধে Hume-এর ঠিক এই যুক্তিই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, কার্যের সহিত কারণের যুক্তিগত কোন সম্বন্ধ প্রমাণ করা যায় না। কার্য পরের ঘটনা, এবং তথাকথিত কারণ পূর্বের ঘটনা ; এখানে কেবল পৌর্বাপর্য সম্বন্ধই বর্তমান, তদতিরিক্ত কার্যকারণ সম্বন্ধের কোন চিহ্নই

* Prabodh Basu Mullick fellowship Lecture No. 16

এখানে নাই। Post hoc, ergo propter hoc—এই যুক্তির অসারতা ভারতীয় দার্শনিকগণ অতি প্রাচীন কালেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। Hume ইহার অধিক আর অগ্রসর হন নাই। Hume কেবল ঘটনাকেই কার্যরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন; বিজ্ঞানবাদিগণ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, সামান্য অস্তিত্বও একটি কার্য, এবং প্রথম ক্ষণের অস্তিত্বই হইল দ্বিতীয় ক্ষণের অস্তিত্বের তথাকথিত কারণ। Hume-এর মতে কারণ ও কার্য যেমন discrete, বিজ্ঞানবাদিদের নিকট সেইরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষণের অস্তিত্বও সম্পূর্ণরূপে পরস্পর-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ, বৌদ্ধ মতে প্রথম ক্ষণের বস্তু ও দ্বিতীয় ক্ষণের বস্তু এক নহে। ইহাই হইল বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের পক্ষে প্রধান যুক্তি। বর্তমান ও অনুবর্তী প্রবন্ধদ্বয়ে দেখান হইবে বৌদ্ধগণ কিরূপে নৈয়ায়িক প্রোক্ত বস্তুর অক্ষণিকত্ব খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে formal logic-এর পক্ষ হইতে এই আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে।

শান্তরক্ষিত প্রথমে বস্তুর স্থিরভাবে বিশ্বাসবান্ কয়েকটি বিপক্ষবাদীর মতের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

> কৃতকাকৃতকত্বেন দ্বৈরাশ্যং কৈশ্চিদিষ্যতে।
> ক্ষণিকাক্ষণিকত্বেন ভাবানামপরৈর্মতম্ ॥ ৩৫২ ॥

অর্থাৎ, কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে বস্তু দুই প্রকার,—সৃষ্ট ও অসৃষ্ট (কৃতকাকৃতক); আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাবাবলী ক্ষণিকত্ব ও অক্ষণিকত্ব ভেদে দ্বিবিধ।—নৈয়ায়িকগণ কোন বস্তুরই ক্ষণিকত্বে বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের মতে বস্তু সৃষ্টত্ব ও অসৃষ্টত্ব ভেদে দ্বিবিধ ঃ—ঘটাদি হইল কৃতক, এবং পরমাণু ও আকাশাদি হইল অকৃতক। বাৎসীপুত্রীয়াদি মতের দার্শনিকগণ কিন্তু ক্ষণিকত্ব ও অক্ষণিকত্বানুযায়ী ভাবাবলীর ভেদ বিচার করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মতে বুদ্ধি, শব্দ, রশ্মি ক্ষণিক, কিন্তু ক্ষিতি, ব্যোম প্রভৃতি অক্ষণিক।—বস্ত্বাবলীর মধ্যে যে-গুলি পূর্বপক্ষীর দ্বারা কৃতক (=সৃষ্ট) বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে সেইগুলির চলত্ব প্রতিপাদনের জন্য বলা হইতেছে ঃ—

> তত্র যে কৃতকা ভাবাস্তে সর্বে ক্ষণভঙ্গিণঃ।
> বিনাশং প্রতি সর্বেষামনপেক্ষতয়া স্থিতেঃ ॥ ৩৫৩ ॥

অর্থাৎ, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ক্ষণভঙ্গী হইতে বাধ্য, কারণ বিনাশের প্রতি বস্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।—শান্তরক্ষিতের যুক্তিটি সাংঘাতিক। তিনি বলিতেছেন, বিনাশ বস্তুরই একটি স্বাভাবিক অবস্থা যে-জন্য বিশেষ কোন কারণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহাই যদি হয় তবে প্রতি ক্ষণেই তো বস্তুর বিনাশ হওয়া উচিত।—পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে এই কথাই বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

যদ্ভাবং প্রতি যন্নৈব হেত্বন্তরমপেক্ষতে।
তত্তত্র নিয়তং জ্ঞেয়ং স্বহেতুভ্যস্তথোদয়াৎ ॥ ৩৫৪ ॥
নির্নিবন্ধা হি সামগ্রী স্বকার্যোৎপাদনে যথা।
বিনাশং প্রতি সর্বেঽপি নিরপেক্ষাশ্চ জন্মিনঃ ॥ ৩৫৫ ॥

অর্থাৎ, যে-ভাব উৎপন্ন করিবার জন্য যাহা অপর কোন হেতুর অপেক্ষা করে না সেই ভাবের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে, যে-হেতু এ-ক্ষেত্রে উৎপাদকের স্বহেতু হইতেই ঐ ভাব উৎপন্ন হইতেছে। এখন, বস্তু যেমন স্বকার্যোৎপাদনে ইতরনিরপেক্ষ, সমস্ত উৎপন্ন সামগ্রীও বিনাশের প্রতি সেইরূপ (অর্থাৎ, বাহ্য কোন কারণ উপস্থিত না থাকিলেও সর্ব বস্তুর বিনাশ ঘটিয়া থাকে)।

পূর্বপক্ষী কিন্তু বলিতে পারেন যে এই যুক্তি অনৈকান্তিক; কারণ ভাবাবলী বিনাশের প্রতি ইতরনিরপেক্ষ হইলেও এই বিনাশ অপর কোন দেশে বা কালে ঘটিতে পারে; তাহা যে উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিতে হইবে এমন কি কারণ আছে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে:—

অনপেক্ষোঽপি যদ্যেষ দেশকালান্তরে ভবেৎ।
তদপেক্ষতয়া নৈষ নিরপেক্ষঃ প্রসজ্যতে ॥ ৩৫৬ ॥

অর্থাৎ, বস্তুর বিনাশ ইতরনিরপেক্ষ হইয়াও যদি দেশান্তরে ও কালান্তরেই সম্ভব হয়, তবে তদপেক্ষ হওয়ায় বিনাশকে আর ইতরনিরপেক্ষ বলা চলিবে না।—যে কার্য বিশেষ কাল ও দেশ ভিন্ন ঘটিতে পারে না তাহাকে কি নিরপেক্ষ বলা যাইতে পারে? বিশেষ কাল ও দেশের সহিত বিনাশ রূপ ঘটনার এই সম্পর্ককেও কেবল সমীহা (expectation) বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সমীহা সম্ভব হয় না; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্যও সম্ভব নহে।

কিন্তু বিনাশকে সম্পূর্ণরূপে ইতরনিরপেক্ষ বলা যায় কিরূপে? অন্ততঃ কোন কোন বিনাশ যে ইতরসাপেক্ষ তাহা দেখাই যায়,—যেমন ঘটাদির বিনাশ, যাহা মুদ্গরের আঘাতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি, শব্দ প্রভৃতির বিনাশ তত্তুলনায় কারণনিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল বিনাশও বিশিষ্ট দেশে ও কালে ভিন্ন ঘটিতে পারে না, সুতরাং ইহাও প্রকৃতপক্ষে কারণনিরপেক্ষ নহে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে ঃ—

সর্বত্রৈতানপেক্ষাশ্চ বিনাশে জন্মিনোঽখিলাঃ।
সর্বথা নাশহেতূনাং তত্রাকিঞ্চিৎকরত্বতঃ॥ ৩৫৭॥

এই কারিকাটির যদি কোন বিশেষ সার্থকতা থাকে তবে ইহার অর্থ এইরূপ করিতে হইবে ঃ—ভাবাবলীর জন্ম যেমন ইতরনিরপেক্ষ, ভাবাবলীর বিনাশও তদ্রূপ; কারণ বিনাশের হেত্বাবলী সর্বত্র অকিঞ্চিৎকর।—হেত্বাবলীর অকিঞ্চিৎকরত্ব পরবর্তী কারিকায় বুঝান হইয়াছে ঃ—

তথাহি নাশকো হেতুর্ন ভাবাব্যতিরেকিণঃ।
নাশস্য কারকো যুক্তঃ স্বহেতোর্ভাবজন্মতঃ॥ ৩৫৮॥

অর্থাৎ, নাশক হেতুকে নাশের এমন একটি কারক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না যাহা নষ্ট ভাব হইতে পৃথক্ নহে, কারণ ভাবের উৎপত্তি স্বহেতু হইতেই হইয়া থাকে।—কমলশীল এই দুরূহ কারিকাটির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিনাশ যাহারই হউক না কেন, এই বিনাশ হয় বস্তু না হয় অবস্তু। যদি বিনাশ বস্তু হয় তবে তাহা বিনাশের হেতুর দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে; এ-ক্ষেত্রে বিনাশ তদ্ধেতুরূপ ভাব হইতে অপৃথক্ রূপেই উৎপন্ন হইবে না পৃথক্ রূপে? কোন সদ্বস্তু সম্বন্ধেই এই দুইটি ভিন্ন অপর কোন পক্ষ সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু এ-কথা বলা যায় না যে বিনাশ তদ্ধেতুরূপ ভাব হইতে অপৃথক্ রূপেই উৎপন্ন হইবে, কারণ ভাবই যাহার স্বভাব তাহা আপন হেতু হইতে ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, যে-হেতু তাহাও ভাবের ন্যায় তাহা হইতেঅপৃথক্ কারণের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এবং যাহা নিষ্পন্ন তাহার আবার অন্য কারণ থাকিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে কারণের কারণ, তস্য কারণ—এইরূপ করিয়া কারণপরম্পরার শেষ আর কখনও পাওয়া যাইবে না (ন চ নিষ্পন্নস্য কারণং যুক্তম্ কারণাবিরামপ্রসঙ্গাৎ)।

কিন্তু ইহাও তো হইতে পারে যে ভাব সম্পূর্ণ রূপেই স্বহেতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না, কেবল আংশিকভাবে হয়। তাহা হইলে বলিতে পারা যায়, বস্তু কারণান্তর হইতে যে-টুকু লাভ করে তাহারই কেবল বিনাশ ঘটিয়া থাকে। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে ঃ—

> ন চানংশে সমুদ্ভূতে ভবাত্মন্যাত্মহেতুতঃ।
> তদাত্মৈব বিনাশোহন্যৈরাধাতুং পার্যতে পুনঃ॥ ৩৫৯ ॥

অর্থাৎ, কোন ভাববস্তু যখন স্বহেতু হইতে নিরংশভাবে সমুদ্ভূত হয় তখন অন্য হেতুর দ্বারা সেই বস্তুর বিনাশ তদনুরূপই হইতে বাধ্য।—একই বস্তুর কখনও দুইটি স্বভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং অংশতঃ উৎপত্তিও বস্তুর পক্ষে সম্ভব নহে। ভাববস্তু সর্বত্র নিরংশ, এবং তাহা স্বহেতু হইতে পূর্ণাকারেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উৎপত্তির উত্তরকালে কারণান্তর দ্বারা তাহাতে আবার অন্য স্বভাবের আরোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বস্তু নিষ্পন্ন হইলেও যাহা অনিষ্পন্ন থাকে তাহা বস্তুর স্বভাব হইতে পারে না। সুতরাং বিনাশরূপ যে ভাব উত্তরকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি স্বভাব; এবং এই বিনাশ যদি বস্তুটি হইতে বিভিন্নই হয় তবে আর তাহা বস্তুটির হইল কিরূপে?—এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল হে বিনাশ তদ্ধেতুরূপ ভাব হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। পূর্বপক্ষী এখন যদি বলেন যে বিনাশ নাশশীল বস্তু হইতে পৃথক্ একটি ভাব, তাহা হইলে বক্তব্য ঃ—

> পদার্থব্যতিরিক্তে তু নাশনাম্নি কৃতে সতি।
> ভাবে হেত্বন্তরৈস্তস্য ন কিঞ্চিদুপজায়তে॥ ৩৬০ ॥
> তেনোপলম্ভকার্যাদি প্রাগ্বদেবানুষজ্যতে।
> তাদবস্থ্যাচ্চ নৈবাস্য যুক্তমাবরণাদ্যপি ॥৩৬১ ॥

অর্থাৎ, বস্তুর বিনাশ যদি সেই বস্তু হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ হয় তাহা হইলে ভাববস্তুটির নিজের সত্তায় তো কোন কিছুরই উপযোগ ঘটিল না। সুতরাং বিনাশ সত্ত্বেও পূর্বের ন্যায় বস্তুর উপলম্ভাদি (apprehension) ঘটিতেই থাকিবে। বিনাশ সম্পূর্ণ একটি পৃথক্ পদার্থ হইলে এ-কথাও বলা যাইবে না যে তদ্দ্বারা বস্তুর সাময়িক আবরণ মাত্র ঘটিয়াছে। কারণ যাহা আবরক

বা প্রতিবন্ধক, বস্তুরই স্বভাব খণ্ডন করা বা বস্তুতেই নবধর্ম উৎপাদন করা তাহার রীতি।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে বিনাশ সত্বেও বস্তুর পূর্ববৎ উপলব্ধ্যাদির কথা উঠিতেই পারে না, কারণ বিনাশ পৃথক্ হইলেও তদ্দ্বারা ভাববস্তুটির বিলোপ ঘটে। ইহার উত্তর ঃ—

নাশনাম্না পদার্থেন ভাবো নাশ্যত ইত্যসৎ।
অন্যত্বাদিবিকল্পানাং তত্রাপ্যর্থান্নুবৃত্তিতঃ ॥ ৩৬২ ॥

অর্থাৎ, নাশনামক পদার্থের দ্বারা যে ভাববস্তুর বিনাশ হয়—এ-কথা ঠিক নহে, কারণ বিনাশ বিনষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন—এ প্রশ্ন সে-ক্ষেত্রেও করা যাইতে পারে।—বিনাশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছে, নাশের দ্বারা ভাববস্তু যখন বিনষ্ট হয় তখন সেই বস্তুটি বিনাশ হইতে ভিন্ন না অভিন্ন। বিনাশ বলিতে যখন প্রধ্বংস (complete destruction) বুঝায় তখনও ঐ দুই সম্ভাবনা বর্তমান, এবং তদ্বিরুদ্ধে অনুরূপ আপত্তিও উত্থাপন করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিনাশ স্বয়ং একটি বস্তু নহে।

বিনাশ যে আবার অবস্তুও নহে তাহা দেখাইবার জন্য এইবার বলা হইতেছে ঃ—

ভাবাভাবাত্মকো নাশঃ প্রধ্বংসাপরসংজ্ঞকঃ।
ক্রিয়তে চেন্ন তস্যাপি করণং যুক্তিসঙ্গতম্ ॥ ৩৬৩ ॥
অভাবস্য চ কার্যত্বে বস্তুনৈবাঙ্কুরাদিবৎ।
প্রসক্তাজন্যরূপস্য হেতুশক্ত্যা সমুদ্ভবাৎ ॥ ৩৬৪ ॥

অর্থাৎ, যদি বলা যায় যে ভাবের অভাবরূপ নাশেরই অপর নাম প্রধ্বংস, তবে তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। অভাবও যদি কার্যরূপে পরিগণিত হয় তবে অঙ্কুরাদির ন্যায় তাহাও বস্তুরূপে পরিগণিত হইবে, কারণ অভাব যে জন্যরূপ (that which is produced by cause) নহে এ-কথা স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে তাহা হেতুশক্তি দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে।—করণ ভাবেরই হইয়া থাকে, অভাবের নহে, কারণ অভাবের কোন স্বভাব না থাকায় তাহার উৎপাদ্য রূপও কিছু নাই। সুতরাং ভাবের অভাবরূপ নাশ

কখনই সম্ভব হইতে পারে না, কারণ তাহা অবস্তু এবং শশশৃঙ্গের মতই অলীক। নতুবা অভাবকেও যদি উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে তাহা হইয়া পড়িবে কার্য, এবং সেইজন্য অঙ্কুরাদির ন্যায় তাহারও বস্তুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কার্য কাহাকে বলে ? কারণের শক্তিবলে যাহা স্বাতিরিক্ত কিছু লাভ করিয়া থাকে (বিশিষ্টম্ আত্মাতিশয়মাসাদয়তি) তাহারই নাম কার্য। এবং এই স্বাতিরেক আত্মসাৎ করিয়াই নিষ্পন্ন হয় বস্তু (সমাসাদিতাত্মাতিশয়মেব চ বস্তু)। নৈয়ায়িকাদিও এই বিষয়ে ভিন্নমত নহেন, কারণ তাঁহারাও সত্তাসমবায় বা স্বকারণসমবায়কেই কার্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু নাশের পক্ষে সত্তাসমবায় (inherence in its proper cause) সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে নাশও দ্রব্যাদির ন্যায় অস্তিত্বাদির আশ্রয় হইতে পারে।

পূর্বপক্ষী এখন বলিতে পারেন, তাহাই যদি হয় তবে নাশ বস্তুই হউক না কেন—তাহাতে ক্ষতি কি ? তাহার উত্তর ঃ—

বিধিনৈবমভাবশ্চ পর্যুদাসাশ্রয়াৎ কৃতঃ।
যস্তত্র ব্যতিরেকাদিবিকল্পো বর্ততে পুনঃ॥ ৩৬৫ ॥

এই কারিকাটি বড়ই অস্পষ্ট, এবং কমলশীলও এটির বিশদ ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রথমার্ধে বলা হইতেছে পর্যুদাস (exception) আশ্রয় করিয়া বিধির বলে অভাব প্রমাণ করার কথা ; দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইতেছে যে ইহাতেও ব্যতিরেকাদির প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। কারিকাকারের প্রধান উদ্দেশ্য যে কি তাহা কিন্তু কমলশীলের একটি বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় ঃ—বিবক্ষাবশাদ্ধি কুতশ্চন ভাবাদ্বিলক্ষণো ভাব এবাভাব ইত্যাখ্যায়তে। অর্থ, কখন কখন কোন একটি বিশেষ ভাব হইতে পৃথক্, অপর ভাবকেই অভাব বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অভাবের এইরূপ ব্যাখ্যাতেও যে পূর্বের ন্যায় আপত্তি উঠিতে পারে—ইহা দেখানই এই কারিকার উদ্দেশ্য।

এই আপত্তির ভয়ে যদি পূর্বপক্ষী এখন বলেন যে বিনাশের হেতুদ্বারা যে অভাবের সৃষ্টি হয় তাহা পর্যুদাসাত্মক নহে (not in the nature of excluding something) প্রতিষেধাত্মক (but in the nature of absolute negation)—তাহা হইলেও যে বিনাশের হেতুর অকিঞ্চিৎকরত্বই

প্রমাণিত হয় তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

অথ ক্রিয়ানিষেধোঽয়ং ভাবং নৈব করোতি হি।
তথাপ্যহেতুতা সিদ্ধা কর্তুর্হেতুত্বহানিতঃ ॥ ৩৬৬ ॥

অর্থাৎ, যদি বলা হয় যে বিনাশের অর্থ ক্রিয়ার নিষেধ, নূতন ভাব তদ্দ্বারা উৎপন্ন হয় না,—তাহা হইলেও বিনাশের অহেতুতাই সিদ্ধ হয়, কারণ এ-কথায় বিনাশকর্তার হেতুত্বই অস্বীকার করা হইতেছে।—কমলশীল টিপ্পনীতে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন ঃ—যখন পূর্ণ-প্রতিষেধ বুঝায় তখন ("ন কার্যং করোতি"—এইরূপ বাক্যে) নঞ্ এর সহিত সম্বন্ধ করোতি ধাতুর; ইহাতে বুঝায়, অভাব উৎপন্ন হইতেছে, ভাব উৎপন্ন হইতেছে না। কিন্তু এতদ্দ্বারা ক্রিয়াই প্রতিষেধ বুঝাইতেছে, এবং তাহা হইতে নাশের অকর্তৃত্বই প্রমাণিত হয়। যাহা অকর্তা তাহা কখনই হেতু হইতে পারে না; সুতরাং বিনাশের কোন হেতু নাই।—নৈয়ায়িকপ্রবর অবিদ্ধকর্ণ বিনাশের হেতুবিশিষ্টতা সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাই পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

নন্থ নৈব বিনাশোঽয়ং সত্তাকালেঽস্তি বস্তুনঃ।
ন পূর্বং ন চিরাৎ পশ্চাদ্বস্তুনোঽনন্তরং ত্বসৌ ॥ ৩৬৭ ॥
এবং চ হেতুমানেষ যুক্তো নিয়তকালতঃ।
কাদাচিৎকত্বযোগো হি নিরপেক্ষে নিরাকৃতঃ ॥ ৩৬৮ ॥

অর্থাৎ, বস্তুর সত্তাকালে তাহার বিনাশ সম্ভব হইতে পারে না; বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে অথবা বস্তুর উৎপত্তির অনেক পরেও সেই বস্তুর বিনাশ ঘটিতে পারে না। সুতরাং বিনাশ বিশিষ্ট কালেই ঘটিতেছে এবং সেই জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহা হেতুসিদ্ধ, কারণ বিনাশ হেতুনিরপেক্ষ হইলে তাহা কেবল বিশিষ্ট কালেই ঘটিবার কোন কারণ থাকিত না।—অবিদ্ধকর্ণ এখানে বৌদ্ধদিগের যুক্তিদ্বারাই বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সত্তা ও বিনাশ পরস্পরের বিরোধী হওয়ায় সত্তাকালে বিনাশ সম্ভব নয়। অনুৎপন্ন বস্তুর বিনাশও সম্ভব নয়, কারণ তাহা বন্ধ্যাপুত্রের মতই অলীক। আর বৌদ্ধগণ নিজেরাই যখন বলিয়া থাকেন যে উৎপত্তির অচিরকাল মধ্যে,—অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণে বস্তুর বিনাশ হয় তখন উৎপত্তির অনেক পরে বিনাশ স্বীকার করিলে

বৌদ্ধগণের একই বস্তুর দুইবার বিনাশ স্বীকার করা হইবে।* যাহা ভস্মীভূত হইয়াছে তাহা যেমন পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে না, উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট বস্তুও সেইরূপ পরবর্তী অপর এক মুহূর্তে পুনরায় বিনষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং বৌদ্ধমতে উৎপত্তির অচিরকাল মধ্যেই বস্তুর বিনাশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সুনির্দিষ্ট কালে যে বিনাশ ঘটিয়া থাকে তাহাকে কিরূপে নিষ্কারণ বা হেতুনিরপেক্ষ বলা যাইতে পারে? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে বীজোৎপন্ন অঙ্কুর যেমন সহেতুক বিনাশও তদ্রূপ। এই মতের পক্ষে আরও যুক্তি আছে :—

বস্ত্বন্তরভাবাচ্চ হেতুমানেব যুজ্যতে।
অভূত্বাভাবতশ্চাপি যথৈবান্যঃ ক্ষণো মতঃ ॥ ৩৬৯ ॥

অর্থাৎ, বিনাশ যে হেতুমান্ তাহা ইহা হইতেও অনুমিত হয় যে বস্তুর অনন্তর কালেই ইহা উপস্থিত হয়। পূর্বমুহূর্তে বিনাশ ছিল না কিন্তু পরমুহূর্তে বিনাশ ঘটিল; ইহা হইতে বুঝা যায় যে স্থিতি ও বিনাশের সম্বন্ধ পূর্বমুহূর্ত ও পরমুহূর্তের সম্বন্ধের অনুরূপ। এই কারিকাটি সুস্পষ্ট না হইলেও কমলশীলের টিপ্পনী সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, বিনাশের সহেতুকত্ব সম্বন্ধে এখানে তিনটি যুক্তি দেখান হইয়াছে। সে-তিনটি হইল এই যে বিনাশ সকল সময়ে না ঘটিয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে ঘটে; বিনাশ যে বস্তুর উৎপত্তির পরে ঘটিয়া থাকে তাহা বৌদ্ধগণও স্বীকার করিয়া থাকেন; এক মুহূর্তের পর যেমন আর এক মুহূর্ত উপস্থিত হয় বিনাশের অভাবের পরেও সেইরূপ বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বিনাশ সহেতুক, তাহা শশশৃঙ্গের মত অলীক নহে।

এইবার বিনাশের সহেতুকত্ব সম্বন্ধে উদ্দ্যোতকরের যুক্তি উত্থাপন করা হইতেছে :—

অহেতুকত্বাৎ কিঞ্চায়মসন্ বন্ধ্যাসুতাদিবৎ।
অথবাকাশবন্নিত্যো ন প্রকারান্তরং যতঃ ॥ ৩৭০ ॥

* ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ বস্তুর তিন ক্ষণ ব্যাপী অস্তিত্ব স্বীকার করেন—প্রথম ক্ষণে উদ্গমন, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে বস্তুর বিনাশ। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে উদ্গমন, স্থিতি ও বিনাশ হইল purely logical। ইহা যে ব্যাবহারিক অর্থে সত্য নহে তাহা বৌদ্ধগণ বারবার বলিয়া গিয়াছেন।

অসত্ত্বে সর্বভাবানাং নিত্যত্বং স্যাদনাশতঃ।
সর্বসংস্কারনাশিত্বপ্রত্যয়শ্চানিমিত্তকঃ ॥ ৩৭১ ॥
নিত্যত্বেঽপি সহস্থানং বিনাশেনাবিরোধিতঃ।
অজাতস্য চ নাশোক্তির্নৈব যুক্ত্যনুপাতিনী ॥ ৩৭২ ॥

অর্থাৎ, বিনাশ যদি অহেতুক হয় তবে তাহা বন্ধ্যাপুত্রাদির মত অসৎ হইবে অথবা আকাশের ন্যায় নিত্য হইবে, কারণ যাহা অহেতুক তাহার তৃতীয় কোন অবস্থা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু বিনাশ যদি অসৎ হয় তবে সকল ভাববস্তুই বিনাশের অভাববশতঃ নিত্য হইয়া পড়িবে ; উপরন্তু সর্ব সংস্কারের নাশিত্ব বিষয়ক যে প্রত্যয়—তাহারও আর কোন ভিত্তি থাকিবে না। আর বিনাশ যদি নিত্য হয় তবে স্বীয় বিনাশের সহিত সকল বস্তুর সহাবস্থানও সম্ভব হইবে! যাহা অনুৎপন্ন তাহার বিনাশ অবশ্যই কখন যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।—বৌদ্ধদিগের মতে সর্ব সংস্কারই (latent forces) বিনাশশীল। কিন্তু বিনাশই যদি অসৎ হয় তবে আর সংস্কারের বিনাশিত্ব আসিবে কোথা হইতে ? কমলশীল সেই জন্য বলিয়াছেন, গতি না থাকিলে যেমন বলা যায় না যে "অমুক যাইতেছে", সেইরূপ বিনাশ না থাকিলে এ-কথাও বলা যাইবে না যে সংস্কারের বিনাশ ঘটিতেছে। ইহাই হইল বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে উদ্দ্যোতকরের যুক্তি। ইহা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

তদত্র কতমং নাশং পরে পর্যনুযুঞ্জতে।
কিং ক্ষণস্থিতিধর্মাণং ভাবমেব তথোদিতম্ ॥ ৩৭৩ ॥
অথ ভাবস্বরূপস্য নিবৃত্তিং ধ্বংসসংজ্ঞিতাম্।
পূর্বপর্যনুযোগে হি নৈব কিঞ্চিদ্বিরুধ্যতে ॥ ৩৭৪ ॥

অর্থাৎ কোন্ প্রকার বিনাশের অহেতুকতা সম্বন্ধে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন ? ভাববস্তুর ক্ষণস্থিতি সম্বন্ধেই কি তাঁহাদের আপত্তি ? অথবা ভাবস্বরূপের যে নিবৃত্তি ধ্বংসনামে পরিচিত তাহারই অহেতুকতা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না ? ক্ষণস্থিতির অহেতুকতা সম্বন্ধেই যদি তাঁহাদের আপত্তি হয় তবে আমরাও তাঁহাদের সহিত একমত।—কমলশীল এই দুই প্রকারের বিনাশের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্ষণস্থিতিই যে ভাববস্তুর ধর্ম তাহারও চলস্বভাব

লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে উহা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ধ্বংসনামক আরও এক প্রকারের বিনাশ আছে যাহাতে ভাববস্তুর স্বভাবেরই বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। এখানে যদি প্রথম প্রকারের বিনাশের হেতুশূন্যতা সম্বন্ধেই পূর্বপক্ষী আপত্তি করেন তবে তাহা যুক্তিসঙ্গত, কারণ ঃ—

যো হি ভাবঃ ক্ষণস্থায়ী বিনাশ ইতি গীয়তে।
তং হেতুমন্তমিচ্ছামঃ পরাভাবাত্ত্বহেতুকম্ ॥ ৩৭৫ ॥

অর্থাৎ, যে ভাব ক্ষণস্থায়িত্ববশতঃ বিনাশ নামে পরিচিত তাহাকে আমরাও হেতুবিশিষ্ট বলিয়া মনে করি; কিন্তু যে বিনাশের মধ্যে সেই বিনাশ ভিন্ন অপর কিছুই নাই (পরাভাবাৎ) তাহাই আমাদের মতে অহেতুক।—কমলশীল আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে উৎপত্তির কারণের অতিরিক্ত অপর কোন কারণ যে বিনাশের নাই তাহাই অহেতুক বিনাশ। মুদ্গরাঘাতে ঘটের যে বিনাশ হয় তাহাকে অহেতুক বলা যায় না, কারণ মুদ্গর ঘটোৎপত্তির সহায়ক নহে।

কিন্তু প্রধ্বংসরূপ বিনাশের অহেতুকতা সম্বন্ধেই যদি পূর্বপক্ষী আপত্তি করেন তবে তাহা অগ্রাহ্য, কারণ ঃ—

প্রধ্বংসস্য তু নৈরাত্ম্যান্নাস্ত্যনন্তরভাবিতা।
নাভূত্বাভাবযোগস্য গগনেন্দীবরাদিবৎ ॥ ৩৭৮ ॥

অর্থাৎ, প্রধ্বংস সম্পূর্ণরূপে নিরাত্ম হওয়ায় তাহা কখনই অপর এক বস্তুর অনন্তর ঘটিতে পারে না; যাহা পূর্বে একেবারেই ছিল না, অথচ পরে হইতেছে দেখা যায় তাহা আকাশকুসুমের সমজাতীয়।—যাহা বস্তু তাহার সম্বন্ধেই কেবল এই কথা বলা চলে যে তাহা আর একটি ভাবের অনন্তর উপন্ন হইয়া থাকে; শশশৃঙ্গাদির মত অবস্তু সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। প্রধ্বংসও হইল নিরাত্ম ও নিঃস্বভাব; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিরূপে বলা যাইবে যে তাহা অপর এক ভাবের অনন্তর উৎপন্ন হইতেছে?

কিন্তু প্রধ্বংস যদি কোন ভাবের অনন্তর কালেই সংঘটিত না হয় তবে কেন বলা হয় যে ভাববস্তুর প্রধ্বংস ঘটিতেছে? তাহার উত্তর ঃ—

প্রধ্বংসো ভবতীত্যেব ন ভাবো ভবতীত্যয়ম্।
অর্থঃ প্রত্যায্যতে ত্বত্র ন বিধিঃ কস্যচিন্মতম্। ৩৭৯ ॥

অর্থাৎ, "প্রধ্বংস ঘটিতেছে" বলিতে বুঝায় না যে কোন ভাবের উৎপত্তি হইতেছে; ইহা ভাবের নিবেধ মাত্র, ভাবের উৎপাদক কোন বিধি নহে।—কিন্তু "চৈত্রস্য পুত্রো ভবতি"—এই বাক্যে "ভবতি" বলিতে যেমন উৎপত্তি বুঝায়, প্রধ্বংসের বেলাতেই বা সেইরূপ বুঝাইবে না কেন? ইহার উত্তরে কমলশীল বলিয়াছেন যে শব্দ প্রয়োগের উপর বস্তুর সত্তা বা অসত্তা নির্ভর করে না। কোন মানুষকে যদি রাসভ বলিয়া অভিহিত করা যায় তাহা হইলে কি বাস্তবিকই সে গর্দভ হইয়া যায়? প্রধ্বংস বলিতে অবশ্যই ভাবের নিষেধ মাত্র বুঝিতে হইবে।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছেন যে বিনাশ যদি অসৎ হয় তবে সকল ভাববস্তুই নিত্য হইয়া পড়িবে (কারিকা ৩৭১)। তাহার উত্তর ঃ—

ভাবধ্বংসাত্মনশ্চৈবং নাশস্যাসত্ত্বমিষ্যতে।
বস্তুরূপবিয়োগেন ন ভাবাভাবরূপতঃ ॥ ৩৮২ ॥

অর্থাৎ, ভাবের প্রধ্বংসরূপ যে বিনাশ—তাহাকেই কেবল অসৎ বলা হইয়াছে; বস্তুর এক রূপ পরিত্যাগ করিয়া অপর রূপ গ্রহণ করা রূপ যে বিনাশ (বস্তুরূপবিয়োগেন), তদ্দ্বারা ভাববস্তুর সম্পূর্ণ অভাব বুঝায় না।—সুতরাং বলা যায় না যে বিনাশ অসৎ হইলেই সর্ব ভাব নিত্য হইয়া পড়িবে। বিনাশ বলিতে যে স্বভাবের নিষেধ বুঝায় তাহা যদি অসৎ হইত তবে ভাবাবলীর নিত্যত্ব দুর্বার হইয়া পড়িত। কিন্তু বিনাশ বলিতে যে স্বভাবের নিষেধ বুঝায় তাহার যখন একটি সদ্রূপ আছেই—তখন আর ভাবাবলী নিত্য হইবে কেন?

পূর্বপক্ষীর মতে (কারিকা ৩৭২) বিনাশ যদি অসৎ না হয় তবে তাহা নিত্য হইবে, এবং তাহার ফলে বস্তু ও তাহার বিনাশের সহস্থান স্বীকার করিতে হইবে। এই যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

নিবৃত্তিরূপতাঽপ্যস্মিন্ বিধিনা নাভিধীয়তে।
বস্তুরূপানুবৃত্তিশ্চ ক্ষণাদূর্ধ্বং নিষিধ্যতে ॥ ৩৮৩ ॥
অতো ব্যবস্থিতং রূপং বিহিতং নাস্য কিংচন।
ইতি নিত্যবিকল্পোঽস্মিন্ ক্রিয়মাণো নিরাস্পদঃ ॥ ৩৮৪ ॥

অর্থাৎ, যখন বলা হয় যে নিবৃত্তিই বিনাশের রূপ তখন তদ্দ্বারা কোন বিধি (positive affirmation) বুঝায় না; ইহার দ্বারা কেবল এই নিষেধ বুঝায় যে বস্তুর রূপ এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং ইহার দ্বারা বিনাশের কোন রূপ নির্দেশ করা হয় নাই। অতএব পূর্বপক্ষী যে বলিতেছিলেন বিনাশ অসৎ না হইলে নিত্য হইবে—সে যুক্তির কোন ভিত্তিই নাই।

কমলশীল এই কারিকাটির উপর অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। 'নিবৃত্তি হয়' বলিলেই যে প্রধ্বংস সম্বন্ধে একটি বিধি দেওয়া হইল তাহা নহে, কারণ প্রধ্বংসের বিধেয় কোন রূপই নাই। এ-কথার প্রকৃত অর্থ এই যে বস্তুর স্বভাব ক্ষণস্থায়ী। সম্পূর্ণ অভাব জ্ঞাপন করাই হইল এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য, নিত্যত্বের বিকল্প (alternative) এখানে আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্বপক্ষী যে বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধমতে বস্তু অকারণ হইলে নিত্য অথবা অসৎ হইতে বাধ্য—তাহা তাঁহাদের বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক, কারণ ন্যায়বাদী বৌদ্ধগণও বলিয়া থাকেন যে যাহা নিষ্কারণ তাহা অসৎ। ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—"বোধিসত্ত্ব সধর্ম দ্রব্যাবলীর মধ্যে ধর্ম অনুসন্ধান করিয়া অণুমাত্র ধর্মও দেখিতে পান নাই যাহা প্রতীত্যসমুৎপাদ হইতে বিনির্মুক্ত (i. e., whose origin is not conditioned)*। যে সকল বৈভাষিক অকাশাদির বস্তুর সত্তায় বিশ্বাসবান্ তাহারা শাক্যপুত্রীয় নামেরই অযোগ্য। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে নাশের যত প্রকার হেতু প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহার কোনটিই যুক্তিসহ নহে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে বিনাশ সম্পূর্ণরূপে অহেতুক। এবং তাহা হইলে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে প্রতি ক্ষণেই প্রতি বস্তুর বিনাশ ঘটিতেছে, কারণ যাহা কোন হেতুর উপর নির্ভর করিতেছে না তাহা যদি ঘটে তো প্রতি ক্ষণেই ঘটিবে।—বিনাশের অহেতুকত্ব সম্বন্ধে কমলশীল আরও কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়াছেন :—

ভাববস্তু স্বহেতু হইতে যখন উৎপন্ন হয় তখন তাহার প্রকৃতিগত বিনাশিত্বও

---

* বৌদ্ধ দর্শনের Law of Causation এর নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। নৈয়ায়িক যে স্থলে বলিবেন "অস্মাদিদং ভবতি", বৌদ্ধ সে স্থলে বলিবেন "অস্মিন্ সতি ইদং ভবতি"। ইহাতে বুঝায়, কার্য কারণনিরপেক্ষ হইলেও কারণ ব্যতিরেকে কার্য সম্ভব হয় না।

তৎসঙ্গে উৎপন্ন হয় না হয় না? নশ্বরত্ব যদি প্রকৃতিগতই হয় তবে নাশের জন্য আর কোন হেতুর প্রয়োজন হইবে না, কারণ নাশই হইবে সে-ক্ষেত্রে উৎপন্ন বস্তুর স্বভাব। যাহা যে-বস্তুর স্বভাব তাহা সেই বস্তুর স্বহেতু হইতেই উৎপন্ন এবং তাদৃশ হইয়া থাকে,—সেজন্য নূতন কোন হেতুর আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি বলা যায়, অঙ্কুরাদি উৎপাদন করাই বীজাদির স্বভাব হইলেও সলিলাদি কারণান্তর ব্যতিরেকে বীজ যেমন তাহা করিতে পারে না, ভাবও সেইরূপ অনশ্বর হইয়াও কারণান্তরের বশেই কেবল নশ্বর হইয়া পড়ে—তবে সে-কথাও ঠিক হইবে না; কারণ বীজের অন্ত্যাবস্থারই কেবল অঙ্কুর উৎপাদন করিবার সামর্থ্য আছে, সলিলাদির সে বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই।—এইখানে নৈয়ায়িক-দিগের সহিত বৌদ্ধদিগের চিরবিরোধের আর একটি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক ঘটোৎপত্তির জন্য কুলাল, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি নানাবিধ কারণের সহকারিত্ব স্বীকার করেন। বৌদ্ধ কিন্তু ইহা মানিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। তিনি বলিবেন যে-মুহূর্তে ঘটাভাব শেষ হইল তাহার পর মুহূর্তেই ঘটভাবের উৎপত্তি; সুতরাং ঘটাভাবের শেষ মুহূর্ত ব্যতীত তৎপরক্ষণস্থ ঘটভাবের আর কোন কারণ নাই, এবং এখানেও কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ discrete। এই নীতি অনুযায়ীই কমলশীল বলিতেছেন যে বীজের অন্ত্যাবস্থাই অঙ্কুরোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ। বীজ তাঁহার মতে অঙ্কুরের কারণের কারণ মাত্র, প্রকৃত কারণ হইল বীজের অন্ত্যাবস্থা।

অপর দিকে যদি বলা যায় যে নশ্বরত্ব ভাববস্তুর প্রকৃতিগত নহে, তাহা হইলেও বিনাশের সহেতুকত্ব স্বীকার করিবার কোন কারণ পাওয়া যাইবে না, কারণ এই অনশ্বর বস্তুর স্বভাব পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কোন পদার্থেরই নাই। বস্তুর স্বভাব যদি উৎপত্তির অনন্তর কালেই বিনষ্ট না হয় তাহা হইলে পরবর্তী কোন ক্ষণেও তাহার বিনাশ সম্ভব হইতে পারে না; কারণ উৎপত্তির পর প্রথম ক্ষণে যদি বস্তুটি স্থিতিধর্মাই হয় তবে পরবর্তী কোন ক্ষণে তাহা সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিবে কেন? যদি বলা যায় যে তাম্রাদি যেমন কঠিন হইলেও অগ্নি সংস্পর্শে আসিয়া অন্য রূপ (দ্রবত্ব) পরিগ্রহণ করে ভাববস্তুও সেইরূপ স্বভাবতঃ অবিনশ্বর হইলেও নাশহেতুর প্রভাবে পড়িয়া স্বধর্মচ্যুত হয়—তবে সে-কথাও যুক্তিযুক্ত হইবে না। এ-কথা ঠিক নহে যে সেই বস্তুই অন্য

বস্তুতে পরিণত হয়, কারণ অন্যথাত্বের লক্ষণই হইল ভাবান্তরের উৎপত্তি। এখন এই অন্যথাত্ব সেই ভাববস্তুটি হইতে পৃথক্ না অভিন্ন ? ভাববস্তু ও এই অন্যথাত্ব কখনই অভিন্ন হইতে পারে না, কারণ ভাববস্তুটি স্বহেতু দ্বারা পূর্বেই নিষ্পন্ন হইয়াছে ; অন্যথাত্ব ইহা হইতে অভিন্ন হইলে তাহাও ঐ-সঙ্গেই নিষ্পন্ন হইয়া যাইত। অপর দিকে, অন্যথাত্ব এই ভাববস্তু হইতে পৃথক্‌ও হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলেই ভাববস্তু অন্যথাত্বের হাত হইতে মুক্তি লাভের ফলে অচ্যুতিধর্মা স্থিরভাবে পরিণত হইবে এবং তাহাতে অন্যথাত্বই আর সম্ভব হইবে না। তাম্রাদির দৃষ্টান্তও এখানে অসিদ্ধ। পূর্বের কঠিনাবস্থার ক্ষণাবলী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি প্রভৃতি কারণের সাহায্যে তাম্রের স্বীয় উপাদান এবং অন্যান্য সামগ্রী হইতে দ্রব নামক আর একটি স্বভাব উৎপন্ন হয়। সেই দ্রবস্বভাবও আবার যখন আপনা হইতেই বিনষ্ট হয় তখন সহকারী কারণাদির সাহায্যে পূর্ব উপাদান হইতে কাঠিন্য নামক আবার এক নূতন স্বভাবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায় না যে এই সকল ব্যাপার একই বস্তুর বিভিন্ন পরিবর্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে।—অতএব প্রমাণিত হইল যে নাশের সহেতুকত্ব কোন দিক হইতেই প্রমাণ করা যায় না।

ইহার পর শান্তরক্ষিত অকৃতক (uncreated) দ্রব্য সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

> যে তু ব্যোমাদয়ো ভাবা অকৃতত্বেন সংমতাঃ।
> বস্তুবৃত্ত্যা ন সন্ত্যেব তে চ শক্তিবিয়োগতঃ ॥ ৩৮৫ ॥
> ক্ষণিকাক্ষণিকত্বাদিবিকল্পস্তেষ্বনাস্পদঃ।
> তদা বস্ত্বেব যেন স্যাৎ ক্ষণিকং যদিবান্যথা ৩৮৬ ॥ ॥

অর্থাৎ, ব্যোমাদি যে-সকল পদার্থ অকৃতক বলিয়া পরিগণিত হয় সে-গুলির বস্তুরূপে কোন অস্তিত্বই নাই, কারণ সে-সকল পদার্থ "শক্তি"-বিহীন। তাহাদের সম্পর্কে ক্ষণিকত্ব, অক্ষণিকত্ব প্রভৃতির প্রশ্নই উঠিতে পারে না, অথচ ক্ষণিকত্ব বা তদ্বিপরীত ধর্মের উপরেই বস্তুত্ব নির্ভর করে।—বৌদ্ধগণ এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না যাহার active বা passive কোন কার্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাকথিত বস্তুও যে-মুহূর্তে কার্যকরী (অর্থক্রিয়াকারিত্ব) কেবল সেই মুহূর্তেই বৌদ্ধদিগের দ্বারা সৎ বলিয়া স্বীকৃত হইত। মুদগরাঘাতে

যখন ঘট চূর্ণ হয় তখন একই মুহূর্তে দুইটি কার্য দেখিতে পাওয়া যায়—মুদ্গরের আঘাত করা এবং ঘটের ভগ্ন হওয়া। কাজেই ঐ মুহূর্তে ঘট ও মুদ্গর এই উভয়েরই বাস্তব না হউক "বৈজ্ঞানিক" অস্তিত্ব বৌদ্ধ স্বীকার করিতেন। কিন্তু জগতে যত কার্যই দেখা যায় সবই ক্ষণিক বা ক্ষণিক কার্যাবলীর সমষ্টি। সুতরাং "বৈজ্ঞানিক" অস্তিত্ব যদি স্বীকার করিতেই হয় তবে তাহা ক্ষণিক ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে যাহা অক্ষণিক তাহার অস্তিত্ব নাই। এখন প্রশ্ন, আকাশ সৎ না অসৎ ? যদি সৎ হয় তবে আকাশের কোন. কার্যও (যথা, দৃশ্যত্ব) থাকিবে! এই বিষয়ে বৌদ্ধদিগের নিজেদের মধ্যেই মতদ্বৈধ ছিল। বাৎসীপুত্রীয়গণ বলিতেন আকাশের রূপ আছে, কিন্তু বিজ্ঞানবাদিগণ বলিতেন আকাশ শূন্য মাত্র। কেবল তাহাই নহে। অপরাপর বিজ্ঞানের অন্য বিজ্ঞান উৎপন্ন করিবার "শক্তি" (potency) আছে, যাহা হইতে কার্যকারণ সম্বন্ধ রূপ ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। কিন্তু আকাশের তাহাও নাই। সুতরাং বিজ্ঞানবাদীর মতে তাহা সর্বতোভাবে অসৎ।—আকাশের ন্যায় অবস্তু সম্বন্ধে ক্ষণিকত্ব ও অক্ষণিকত্বের প্রশ্ন যে কেন উঠিতে পারে না তাহা এইবার বলা হইতেছে ঃ—

ক্ষণাবস্থিতরূপং হি বস্তু ক্ষণিকমুচ্যতে।
স্থিররূপসমাক্রান্তং বস্ত্বেবাক্ষণিকং পুনঃ ॥ ৩৮৭ ॥

অর্থাৎ, বস্তু ক্ষণকালস্থায়ী হইলে ক্ষণিক এবং স্থিররূপ হইলে অক্ষণিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু যাহা বস্তুই নহে তাহার সম্বন্ধে এ-প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

মহাপ্রস্থান

সূর্য-মুখর শ্বেত কৈলাস প্রেততীর্থের পারে
ডাকে অহরহ মহাপ্রস্থিত আত্মার মেঘমালা।
দ্রৌপদীসম অবগুণ্ঠিত তুষার-সমাধি কারে
কবে নেবে ঘিরে, শুধু প্রতীক্ষা সুমেরু-পান্থশালা।

দেখি দূরে চলে পিপীলিকা-সারি, তীর্থযাত্রী শত
তুষার-ক্ষেত্রে—আঁকাবাঁকা বহে কালো মসৃণ ছায়া।
ঊর্ধে সূর্য ; বক্ষে শঙ্কা-ডঙ্কা-নিনাদও কত।
অর্জ্জুন শ্লথ ; অক্ষয় তূণ কাঁপে যে ! এই কি মায়া !

কৌতুকময়ী রজনী নামিল যাত্রীর স্রোত বাহি ;
অন্ধকারের প্রপাতে মগ্ন অধীর চিন্তা যত।
পশ্চাদ্ধাবী সারমেয় কাঁদে ক্ষীণ চাঁদ পানে চাহি।
ধূম্রের বেণী শতপাকে বাঁধে রাত্রিকে অবিরত।

প্রাক্-জীবনের কর্ম্মপিছল দিনগুলি ছিল ব্যেপে
যে ভাবনাগুলি, শৈবাল-ঢাকা প্রস্তর নির্ম্মম,
মেরুপ্রান্তিক রাত্রির কোলে মৃত মুণ্ডের মত
তারা একে একে খসে খসে পড়ে গলিত উল্কা-সম।

আশ্রম নাই ; তরবারি হানে কৈলাস-চূড়া হতে
মাঘের বাতাস—; অবসর নাই মিতালির আয়ু শেষ।
জয়দ্রথের জয়ে পরাজয়ই সম্বল আছে পথে ;
শূন্যকুম্ভ-ঘটাকাশে ঘোর ঝঞ্ঝার পরিবেশ।

সেই মত দেখি এই প্রপঞ্চে লৌহ-কটাহ-মাঝে
ত্রিকাল-পক্ক লঘু জীবগণ পাচন-চক্রে ঘোরে।
স্বাদু ব্যঞ্জন-ভোক্তা রূপে ত শুধু মহাকালই রাজে
পাকস্থলীর অমোঘ ন্যায়ের কোটি বন্ধন ডোরে।

শান্ত আকাশ ; তুষার-মুকুরে কোটি তারকার ছায়া।
ঝুঁকে-পড়া মাথা, দণ্ডলগ্ন বোঝা নিয়ে চলে তারা।
সমুখে পাহাড় ভ্রূকুটি হানিছে, ঘন দম্ভের কায়া
পার হতে হবে ; পতন এলো কি ? হাতছানি দেয় কারা ?

এরা ওরা আর ষড়রিপুদের রসঘন রূপ নিয়ে
অনেকেই দেখি পুরাতন সাথী ফেলে আসা পৃথিবীর ;
তান্মাত্রিক রূপায়ণ শুধু। জ্বলে ওঠে বারে বারে
বহুদূরে ক্ষীণ সুত্রের মত, প্রাণী-জগতের তীর।

নির্ম্মম এরা। শরীর মনের পেশী প্রয়োগেই চলে।
কত খর চূড়া পার হল, কত মরু-রাত্রির শেষে।
পরস্পরের ক্লান্তিতে এরা তুড়ি দেয় ; মুখে বলে
মাভৈঃ এবার, এইটুকু পথ পার হব খেলে হেসে।

মায়াবন্ধন দীর্ণ, ছিন্ন মাধ্য আকর্ষণও,
অমোঘ আজ্ঞা সম্মুখে ডাকে মহাপরিনির্ব্বাণে।
তবু শোনা যায় করুণ বিলাপ, বিধবার ক্রন্দনও ;
বন্ধুর মত ডাকে পিছু হতে, মৃদু শ্বাস লাগে কাণে।

একে একে খসে প্রাণের স্তম্ভ যাত্রী-সরণি হতে ;
অদৃশ্য কোনো বিরাট হস্ত লুফে নেয় প্রাণবায়ু ;
হাহাকার মহাশূন্যে মিলায়। ফিরে দেখে কোনোমতে
সহযাত্রীরা পিছনের পানে—কাঁপে ক্ষয়বাণ স্নায়ু।

হতাশার মেঘ সান্দ্র সন্ধ্যা আলোকেরে করে ভারি ;
নির্ব্বাক মনে যাত্রীরা থামে উপত্যকার ধারে।
জিজ্ঞাসু চোখে পরস্পরের মুখ গোণে তাড়াতাড়ি ;
প্রণাম জানায় হৃত আত্মার উদ্দেশে বারেবারে।

আবার যাত্রা—নিরন্ধ্র গতি, মর্ম্মর পুত্তলী
সারি সারি নড়ে যন্ত্রচালিত অপ্রাকৃত অবয়বে।
পশ্চাতে ধায় শবের গন্ধ। পিশাচ পাহাড়তলী
বিভীষিকা আনে, ছিন্ন অঙ্গে মর্ম্মন্তুদ রবে।

ভ্রূক্ষেপ নাই। দূরে থর থর কাঁপিছে অরুন্ধতী
আকাশের ভালে। অচিরাৎ নামে বিশাল হাতের ছায়া—
ঐরাবতের শুণ্ড নামিছে ধূম-কুণ্ডলী-সম।
সন্ত্রাস ভরে আড়ষ্ট সবে—চিত্রার্পিত কায়া।

ক্ষয়ের বন্যা ধুয়ে মুছে নেয় মুমুক্ষু আত্মারে ;
পশ্চাৎ হতে একে একে সরে শেষ পতনের গানে।
বাকি যারা রয় তারা নির্ভয় সমর্পণের দ্বারে ;
প্রার্থনা শুনি গম্ভীরনাদী শেষ সূর্যের পানে।

হে পূষণ! খোলো হিরণ্য দ্বার, অবারিত কর জ্যোতি ;
লক্ষ শীর্ষ হে পুরুষ, এসো কোটি মহাবাহু লয়ে ;
মণিকুণ্ডল দেখেছি তোমার স্বর্ণ দিগ্বলয়ে ;
ধৈর্য্য লুপ্ত ; কর বিলুপ্ত প্রাণযাত্রার গতি॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

পুস্তক-পরিচয়

রবীন্দ্র-রচনাবলী—প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী) মূল্য ৪৷৷০

মহাকবিরা ক্ষণজন্মা হোন বা না হোন, আজকালকার সংস্কৃতিসঙ্কটেও তাঁদের অনেকেই বেঁচে বর্ত্তে আছেন ; এবং সমসাময়িকদের প্রতি অবজ্ঞার মাত্রা কিছু পরিমাণে কমাতে পারলেও, আমরা কেবল সুদূর অতীতেই মহত্ত্বের সন্ধান পেতুম না, আধুনিকদের সুদ্ধ কীর্ত্তিমান ব'লে ভাবতুম। তবে তথাকথিত অকাট্য নিয়মও ব্যতিক্রমের অধীন ; এবং সেইজন্যেই উল্লিখিত সামান্য বিধি সত্ত্বেও, অন্তত ভারতবর্ষে, জীবিত লেখকদের মধ্যে শুধু একজন ব্যক্তিই প্রাচীনদের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ; এবং তাঁর আসন যেহেতু ব্যাস-বাল্মীকি, হোমর-দান্তে-র সমপর্য্যায়ে, তাই তাঁর পাশে সাম্প্রতিকেরা তেমনই নিষ্প্রভ, যেমন দীপ্তিহীন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ-উপগ্রহেরা। তত্রাচ তিনিও শেষ পর্য্যন্ত প্রাগুক্ত বিধানেরই বশবর্ত্তী ; এবং আজ আর তাঁকে কোনো বিশেষ অবদানের গুণে অপ্রতিম লাগে না, তাঁর সমগ্র অভিব্যক্তির বিস্তারেই তিনি এখনো অদ্বিতীয়। অর্থাৎ তাঁর সম্পূর্ণ বিকাশের প্রত্যেক পর্ব্ব নিয়ে বিচার করলে, এ-কথা না মেনে উপায় থাকে না যে নানা ক্ষেত্রে পরবর্ত্তীরা তো তাঁর তালে পা ফেলেছে বটেই, এমনকি সময়ে সময়ে সমে ফিরেছে তারাই তাঁর আগে ; এবং আমার এই অহঙ্কৃত সিদ্ধান্তে যে অধুনাতনী হঠকারিতার নাম-গন্ধ নেই, তার প্রমাণ মিলবে "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র সদ্যপ্রকাশিত প্রথম খণ্ডে।

তার মানে এ নয় যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুদৃশ্য প্রথমাংশ আমার বিবেচনায় অপাঠ্য। তবে কবি নিজে হয়তো তাই ভাবেন ; এবং সেইজন্যেই তাঁর সমস্ত লেখার একত্রীকরণে তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই সর্ত্তে মত দিয়েছেন যে তাঁর নাবালক বয়সের উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস মূল গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান পাবে না, এক খণ্ড পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হবে। তৎসত্ত্বেও এই বিভাগে যা ঢুকেছে, তার অনেকখানিই অপরিপক্ক, এতই অপরিপক্ক যে আজকালকার কবিযশঃপ্রার্থীরা এ-রকম কবিতা ছাপাবার

আগে বেশ খানিকটা ইতস্তত করবে। তবু বাংলা সাহিত্যের তথা বঙ্গীয় সংস্কৃতির সকল ভক্তের কাছেই এ-বইখানি মহামূল্য লাগবে ; এবং যারা ইতিহাসবোধে একেবারে বঞ্চিত নয়, তারা কোনো মতে না মেনে পারবে না যে এই রকম অগ্রণিশোভন অধ্যবসায়ের ফলাফল উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্ত্তী লেখকদের না অর্শালে, বাংলা পদ্য আজও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পদাঙ্কে চলতো, আর বাংলা গদ্যে শোনা যেতো শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিধ্বনি।

অবশ্য তাঁরা উভয়েই যে বাঙালীর পক্ষে চিরস্মরণীয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই ; এবং রীতিবিচারের মূল সূত্র মনে রাখলে, অত্যাধুনিক সমালোচকেরাও তাঁদের রচনাবলীকে শুধু তাজ্জব ব্যাপারের দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখবেন না। কিন্তু তাঁরা যে-প্রসাদের পরিবেষক, তা মূলত বুদ্ধিগত ও নিরপেক্ষ ; তাঁদের গুণ নৈর্ব্যক্তিক ও ধ্রুপদী ; এবং তাঁদের মর্য্যাদাবান প্রকাশপদ্ধতি তথা তন্ময় বস্তুনিষ্ঠা বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় এমনই অচল যে আমরা বরং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আনন্দ পাই, পুরাতন পদাবলীকারদের আত্মীয় ব'লে ভাবি, তবু এই উনিশ শতকী লেখকদ্বয়কে সইতে পারি না, যদিচ তাঁরা যে-জীবনযাত্রার প্রতিনিধি, তার প্রকোপ আমাদের সদর থেকে স'রে গেলেও, অন্দরে এখনো অপরিবর্ত্তিতই রয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের কীর্ত্তি চারিত্র্যঘটিত, তাতে ব্যক্তিস্বরূপের স্বাক্ষর নেই ; এবং তাঁদের ধ্যান-ধারণা লোকাচারেই আবদ্ধ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে শিকড় ছড়ায় নি। তাহলেও তাঁরা আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের পাত্র ; এবং পূর্ব্ব পুরুষদের সঙ্কীর্ণতা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিকেরা যতই মুখ ছোটাক না কেন, এ-কথা আজ তর্কাতীত যে প্রথার শাসন-ব্যতিরেকে মাইকেলের উদ্দাম প্রকৃতি চির দিনই উচ্ছৃঙ্খল থেকে যেতো, কখনোই স্থায়ী কাব্যে আত্মপ্রকাশ করতো না।

তাহলেও মাইকেলের রচনা যেহেতু বিদ্রোহের উন্মাদনায় আপাতত অধীর, তাই বাহ্য বিচারে মনে হয় তিনিই বুঝি নব যুগের প্রবর্ত্তক। কিন্তু একটু গভীরে তাকালেই, আর এ-বিশ্বাস টিঁকে না। তখন ধরা পড়ে যে তিনি অর্ব্বাচীন শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়ে ; তাছাড়া তাঁর বিষয়বস্তু তো সনাতন বটেই, এমনকি যে-অন্তঃপ্রেরণার জোরে তিনি কবি, তাও, আদ্যন্ত বহিরাশ্রয়ী ব'লেই, ধ্রুপদী-আখ্যার যোগ্য। আসলে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমই

সর্ব্বাগ্রে গতানুগতিকের উৎপীড়নে ধৈর্য্য হারিয়েছিলেন; এবং যথোচিত সাধনার অভাববশত তাঁর বৈমুখ্য যদিও রসোত্তীর্ণ নয়, তবু, অন্তরঙ্গ, বন্ধু-বান্ধব বাদে, তিনিই যখন রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রথম গুণগ্রাহী, তখন এমন অনুমান নিশ্চয়ই সঙ্গত যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে মেকি ছিলো না, তিনি কায়মনোবাক্যে প্রচলিত ব্যবস্থার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ কেবল মন্ময় রীতির উদ্ভোক্তা নন, তাঁর আজন্ম প্রযত্নেই বাংলা কাব্য তার বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বঙ্গীয় সংস্করণ-রূপে লোকসমক্ষে এসেছিলো; এবং বাইশ বছরে পৌঁছনোর আগেই তিনি যে-কখানা কবিতা-সংগ্রহ ছাপিয়েছিলেন, সেগুলোর কোনোটাতে কলাকৌশলের নূতনত্ব না থাকলেও, প্রত্যেকটাই দেখিয়েছিলো যে এ-কবির কাব্যোপজীবিকা একেবারে নিজস্ব, এমনই নিজস্ব যে চিরন্তন প্রসঙ্গেও ইনি সাধারণ্যের ধার ধারেন না, সর্ব্বত্রই অন্য সমস্ত ভুলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান করেন।

খুব সম্ভব, সেই স্বাবলম্বনের পিছনে ছিলো পশ্চিমী ঘটনাঘটনের সাময়িক জনশ্রুতি; এবং তদ্ব্যতিরেকে তিনি নিশ্চয়ই শুধু আত্মপ্রকাশে তৃপ্ত থাকতেন না, প্রয়াস পেতেন যাতে তাঁর প্রসঙ্গে ভাবসঙ্গতির অভাব না ঘটে, তাঁর প্রকরণ অতি স্ফীতির স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলে, তাঁর ছন্দ একাধারে শৈথিল্য ও আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠে। কিন্তু বিদেশের সমর্থন না জুটলেও, তিনি ভিন্ন পথ ধরতেন না, স্বপ্রাধান্যের দিকেই এগোতেন; এবং যখন পনেরো বছর বয়সে জনৈক পণ্ডিতমূর্খকে ঠকাতে গিয়ে তিনি জ্ঞানত অনুকরণে মন দিয়েছিলেন, তখনও কোনো বাঙালী কবি তাঁকে প্রতিমান জোগাতে পারেনি, তাঁর প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন বিদ্যাপতি। কারণ একদা বিদ্যাপতিও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় শ্রদ্ধা হারিয়ে এমন এক অভিব্যক্তির প্রবর্ত্তন করেছিলেন যার সুবিধাসাপেক্ষ নমনীয়তায় বৈয়াকরণের সম্মতি না থাকলেও, সহজেই নিজস্ব অভিজ্ঞতার শিল-মোহর পড়েছিলো; এবং শুধু তাই নয়, বিদ্যাপতি চৈতন্যের আগেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন; এবং বৈষ্ণবেরা যেহেতু চির দিনই ব্যক্তি-মর্য্যাদার পরিপোষক, তাই সারা হিন্দু সমাজে কেবল ওই সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে আজীবন টেনেছে।

অন্য হিন্দুরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কৃপায় শিখেছিলো শুধু জোট পাকাতে; এবং

সেই দলাদলির সঙ্গে মিশেছিলো ঠাকুরবাড়ির ঐহিক ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে আপামর সাধারণের পরশ্রীকাতরতা। ফলত পিরালিরা এই অজুহাতে হিন্দুসমাজ থেকে বহিভুর্ক্ত হয়েছিলেন যে তাঁদের ধন-সম্পত্তি অকথ্য কালাপাহাড়ির পুরস্কার; এবং যদিও রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার আগেই তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ উক্ত ভেদবুদ্ধিকে অনেকাংশে হার মানিয়েছিলো, তবু তখনো পর্য্যন্ত ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পংক্তিভোজন চলতো না, বহির্ব্বিবাহ তাঁদের প্রায় পথে বসাতো; খামখেয়ালী বা অসমসাহসী ছাড়া আর কেউই বড় একটা তাঁদের প্রতি সদ্ভাব দেখাতো না। এ-রকম ক্ষেত্রে যে-কোনো আশুচেতন শিশু প্রথমে বিবশ বালকে ও পরিণামে বিদ্রোহী যুবকে বদলাতে বাধ্য; এবং তদুপরি সহজ প্রতিভার জোরে তাঁর জ্যেষ্ঠেরা যেহেতু ভাবতেন যে মেকলে-প্রবর্ত্তিত বিদ্যাভ্যাস শুধু কেরাণীদেরই সাজে, তাই শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই যেটুকু ঐতিহ্য-নিষ্ঠার অংশীদার, তাও কোনো কালে রবীন্দ্রনাথকে বর্ত্তায় নি। অধিকন্তু তাঁর ভাগ্যে সমবয়সীর সঙ্গ কদাচিৎ জুটতো: তাঁর ভাইয়েরা তাঁর চেয়ে এত বড় ছিলেন যে তাঁদের আমোদ-প্রমোদে রবীন্দ্রনাথ কখনোই ভাগ পেতেন না; এবং যে-আত্মীয়াদের সংসর্গে তাঁর দিন কাটতো, তাঁরা তাঁর মনে এমনই আত্মলাঘব জাগিয়ে তুলেছিলেন যে প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের নির্জ্জনে পালিয়েই তিনি বাঁচতেন, নিজেকে ভুলতেন অমানুষিক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধে।

সুতরাং শৈশবান্তেই তিনি অনুব্যবসায়ী হয়ে পড়লেন; এবং বয়োবৃদ্ধির পরেও যখন সাফল্যের প্রতিযোগিতায় স্বজনদের তিনি নাগালে পেলেন না, তখন তাঁর মানসিক দূরত্ব যেন স্বভাবতই বেড়ে গেলো, তিনি ভাবলেন তাঁর ঐকান্তিক ভাবনা বেদনা বুঝি সত্যসত্যই অমূল্য। এই অহংজ্ঞান অবিলম্বে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতেও বেরিয়ে পড়লো; এবং অচিরে তিনি তো পারিবারিক ভাষাকে সাময়িক শুদ্ধ ভাষার চেয়ে শ্রেয়স্কর ব'লে মানলেন বটেই, এমনকি ইতিমধ্যে তাঁর আত্মবিশ্বাস এমন এক উচ্চ স্তরে উঠলো যে নিজের সকল লেখা বিনা সংশোধনে সদ্য সদ্য ছাপাতেও তাঁর দ্বিধা রইলো না। ফলে অন্তত বিচক্ষণ পাঠকের কাছে তাঁর গদ্য-পদ্য অদ্ভুত রকমের তাজা লাগতে লাগলো; এবং তৎসত্ত্বেও যাঁরা প্রাচীন সাহিত্যে আস্থা হারালেন না, তাঁরাও বুঝলেন যে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে সকল বাঙালী লেখকের সমান বহ্বাড়ম্বর একাধারে

অসহ্য ও অসাধু। পক্ষান্তরে এক দল-সাত্ত্বিক সমালোচকও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তাঁর ঐতিহ্যবিদ্বেষ স্বভাবতই তাঁদের চটিয়েছিলো। এই বার তাঁকে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক জবানে কথা কইতে শুনে তাঁরা ন্যায়ত রটালেন যে তাঁর রচনারীতির উৎকর্ষ দুর্ব্বোধ্য ও অপকর্ষ অকিঞ্চিৎকর; এবং সত্যের খাতিরে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ধ্রুপদীদের অনাত্ম যাথাতথ্যে যারা আজন্ম অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে খেয়ালী হৃদয়ের বাচাল আত্মরতি যত না দূষণীয়, ততোধিক দুষ্প্রবিশ্য।

কিন্তু সেই অনন্নুকম্পায়ীদের সুরুচি যেমন প্রশংসনীয়, তাঁদের অন্ধতা তেমনই শোকাবহ; এবং অন্তর্দ্দৃষ্টির অভাব না ঘটলে, তাঁরাও নিশ্চয় বুঝতেন যে রবীন্দ্রনাথের দুরূহতা কোনো অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার ফল নয়, প্রকাশ-পদ্ধতির অসামান্যতাবশতই তিনি ক্বচিৎ-কদাচিৎ রহস্যময়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ অন্তর্ম্মুখী বেদনাবিলাসীদের অন্যতম নন, অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকারভেদে তিনি চিরদিনই নিরুৎসুক; এবং তাঁর প্রতিভা যদিও আগা-গোড়া মন্ময়, তবু তাঁর কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা বোধহয় কখনো দুর্নিবার আবেগ থেকে জন্মায় নি। আসলে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বও ফ্রয়েডী অনুমিতির পরিপোষক; এবং ফ্রয়েড্-এর মতে সাধ বা সাধ্য থাকলেই, মানুষ মহাপুরুষের পদে পৌঁছয় না, উক্ত সম্মান সে তখনই পায়, যখন তার মুখ্য উপলব্ধি সার্ব্বজনীন আদর্শের শাসন মানে, যখন তার মনোমুকুরে স্বদেশের মানচিত্র ফোটে, যখন তার ব্যক্তিস্বরূপ জাতিরূপের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হয়ে ওঠে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি অবিশিষ্ট ব'লেই, তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় চিত্তবৃত্তির প্রধান প্রতিভূ; এবং সে-অনুভূতি এমনই নৈর্ব্যক্তিক, এতখানি সার্ব্বিক যে তার অভিব্যক্তি শুধু স্বভাষীর বোধগম্য নয়, বিদেশীরাও তার মর্ম্মগ্রহণ করতে পারে।

সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের হাতে প'ড়ে বাংলাভাষা প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বচেতনার বাহন হয়ে উঠেছে; এবং এই উৎক্রান্তির ফলে সে-ভাষার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য আর নেই বটে, কিন্তু সম্প্রতি তাতে যে-বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তা প্রাক্‌রৈবিক যুগে স্বপ্নেরও অগোচর ছিলো। অবশ্য বাক্যগঠনের স্থানীয় রীতি, অর্থপ্রকাশের গতানুগতিক উপায়, সর্ব্বগ্রাহ্য ভাবানুষঙ্গ ইত্যাদি বন্ধন ভাষার পক্ষে নিতান্ত অনুপকারী নয়; এবং প্রচলিত পদবিন্যাসের অভাব

যেহেতু ভাষামাত্রের প্রাঞ্জলতা কমায়, তাই আধুনিক বাংলার দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা বাড়াতে গিয়ে আমরা প্রাচীন বাংলার প্রসাদগুণ হারিয়েছি। তাহলেও বোধ-হয় অর্ব্বাচীনেরাই অবশেষে জিতেছে; এবং অভিধার হানিতে অভিপ্রায় তো বৃদ্ধি পেয়েছেই, এমনকি গদ্য-পদ্যের অভ্যস্ত ছন্দশৃঙ্খল ভেঙে যাওয়াতে ভাষায় এতখানি স্থিতিস্থাপকতা এসেছে যে ইদানীং কেবল ধ্বনির সাহায্যে ভাবনা-বেদনার স্তরভেদ জ্ঞাপনও বাঙালীর পক্ষে সহজসাধ্য। তাছাড়া উত্তররাবীন্দ্রিক বাংলার ন্যায়সঙ্গতি যদিও খুব প্রশংসনীয় নয়, তবু তার চিত্রাঙ্কনক্ষমতা সত্যই বিস্ময়কর; এবং সর্ব্বোপরি তার বেশ-ভূষায় আর পোষাকী-আটপৌরের তফাৎ নেই, স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে সে আর ভেক বদলায় না, অন্দরমহলে যে-সাজে থাকে, রাজপথেও সেই পরিচ্ছদে ঘুরে বেড়ায়। অথচ সেই স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে বিদেশী স্বেচ্ছাচারের নাম-গন্ধ নেই, আছে স্বদেশী বিশ্রম্ভালাপের অমায়িকতা; এবং সেই কারণেই, সুযুক্তি সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সনাতনীদের আপত্তি শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে নি, সারা বাংলাদেশ তাঁর দৃষ্টান্তে কথা কইতে শিখেছে।

দুঃখের বিষয়, একা জগদীশ্বরই একাধারে নির্দ্দোষ ও বর্ত্তমান, অন্যত্র সত্তা আর পরিপূর্ণতার সম্বন্ধ বিষমানুপাতিক; এবং মনুষ্যবিশেষের প্রতিভা যতই বহুমুখী হোক না কেন, সে যেকালে অস্তিত্ববান, তখন তারই কর্ম্মকাণ্ডে যে-সমস্ত সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখা দেয়, সেগুলোর প্রত্যেকটাকে সে ফলাতে পারে না। সুতরাং এ-কথা যদিও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার নির্ব্বন্ধেই সাধু বাংলার মায়া কাটিয়েছিলেন, তবু কালক্রমে নূতন ভাষানির্ম্মাণের উন্মাদনা তাঁকে এমনই পেয়ে বসলো যে তিনি তাঁর স্বভাবদত্ত সংবেদনশীলতার তথা দৃক্-শক্তির ব্যবহার প্রায় ভুলে গেলেন, তাঁর রচনারীতি প্রাক্তন সারল্য ঘুচিয়ে আত্মজ্ঞ বক্রোক্তির শরণ নিলে, এবং তিনি তাঁর আদিম অভিজ্ঞতার পুঁজি ভাজিয়ে, সেই সঙ্গে উপমা-অলঙ্কারের খাদ মিশিয়ে, কার্পণ্য সহকারে পরবর্ত্তী লেখার কাজ চালাতে লাগলেন। অন্ততপক্ষে এতে সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথের মানস জীবনে নব যৌবনের গুরুত্ব পরিণত বয়সের চেয়ে অনেক বেশী; এবং সুদীর্ঘ প্রৌঢ়তার শেষে আজও তিনি বহির্জ্জগৎ-সম্বন্ধে আদৌ নিরাগ্রহ নন বটে, কিন্তু সে-বিষয়ে তাঁর ইদানীন্তন মনোভাব স্মরণে আনে সমাধিমগ্ন সোহং-বাদীকে যিনি, অদ্বৈত বলেই, ইন্দ্রিয় থাকতেও নির্ব্বিকার। অর্থাৎ আশী বছর

অবধি ভোগশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেও, আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যিক প্রগতির পথনির্দ্দেশ ক'রেও, রবীন্দ্রনাথ গত চল্লিশ বছর ধ'রে স্বকীয় উপলব্ধির বহিরাশ্রয় সন্ধানে বিরত আছেন; এবং সেইজন্যে বিশ্বব্যাপী অনুকম্পা সত্ত্বেও তিনি সংবেদ-ব্যাপারে তুলনীয় অ্যারিষ্টটেলী ভগবানের সঙ্গে: অধিকারভেদের কল্যাণে আত্মচিন্তা ছাড়া উভয়েরই গত্যন্তর নেই।

বলা বাহুল্য সেই আত্মসমাহিতি নিরন্তর সাধনার ফল; এবং সিদ্ধি যত দিন তাঁর আয়ত্তে আসে নি, তত দিন সমসাময়িকেরা তাঁর প্রগল্‌ভতায় প্রায়ই ধৈর্য্য হারাতেন। কিন্তু বিচক্ষণ পাঠক "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র প্রথম খণ্ড শেষ করার আগেই গ্রন্থকর্ত্তাকে বিষয়বিমুখ ব'লে চিনবেন; এবং সতেরো বছর বয়সে লিখিত "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" যেমন আশুচেতন বালকের সহজ বিস্ময়ে ও সরল জিজ্ঞাসায় উন্মুখর, তেমনি সাতাশ বৎসরে রচিত "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি" একজন এমন সমালোচকের মতামত যাঁর আত্মোপলব্ধি বিদেশী দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছে স্বভাবতই বীতশ্রদ্ধ। আসলে প্রথম যৌবনের পরে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনও রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ্যে টলাতে পারে নি; এবং সে-রকম অবিচলতা স্বগত অবৈকল্যের বহির্বিকাশ হলেও, তা যখন ধ্রুপদীদের নৈর্ব্যক্তিক মর্য্যাদাবোধেরই নিকটাত্মীয়, তখন এখানেও রবীন্দ্রনাথ স্বাধিকার-প্রমত্ত নন, বঙ্গীয় প্রাণসামগ্রীরই উত্তরাধিকারী। তত্রাচ উক্ত আত্মনিষ্ঠা বিনা মূল্যে মেলে নি; এবং তার দাম দিতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। কারণ আধুনিক জগতে ইস্কিলাস্-এর তুল্য কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা যদিও আর নাটক লেখেন না, তবু নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে একাত্মবোধ সাম্প্রতিক নাট্যকারদেরও অবশ্যকর্ত্তব্য; এবং কল্পনাগত অনুকম্পার প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আধিভৌতিক অন্বয়ব্যতিরেকে অবিশ্বাসী, তাই তাঁর চরিত্রাবলী চমকপ্রদ বাক্‌চাতুর্য্যে আমাদের তাক লাগায় বটে, কিন্তু সংক্রামক আবহের সমর্থন পেয়েও তারা শেষ পর্য্যন্ত কলের পুতুলের মতো নিষ্ক্রিয় থেকে যায়।

তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্ব্বতোমুখ সাহিত্যিক বাংলা দেশে ইতিপূর্ব্বে জন্মায় নি; এবং পরবর্ত্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যে সুদ্ধ তারা এমন কোনো পথের সন্ধান পায়

নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুত, তাঁর দিগ্বিজয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থান্তর ঘটেছে, তা এই : তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের অনেক জমি জোতদারদের দখলে এসেছে ; এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের নিজের এলাকায় শস্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে মাত্র, ফসলের জাত বদলাতে পারে নি। উপরন্ত রবীন্দ্রনাথ শুধু অগ্রনেতা হিসাবেই সাম্প্রতিকদের স্মরণীয় নন, বাংলার বর্ত্তমান সংস্কৃতি যেমন একা তাঁরই সৃষ্টি, তেমনিই আজ অবধি একা তিনিই সে সংস্কৃতির প্রামাণিক তথা পরিচালক। কারণ বাঙ্গালীর ইদানীন্তন বিশ্ববীক্ষা যদিও তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়, দেশ-বিদেশের আদর্শ-সঙ্করে গঠিত, তবু আজকালকার ধ্যান-ধারণা যে-ভাষার মুখাপেক্ষী, তা রবীন্দ্রনাথেরই অন্যতম দান ; এবং এখনকার প্রায় সকল দার্শনিকই পাকে-প্রকারে মেনে নিয়েছেন যে, যাথার্থ্য কোন্ ছার, শেষ পর্য্যন্ত পরমার্থও কেবল ভাষার ব্যাপার।

অন্ততপক্ষে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কবিরা স্বদেশপূজ্য ব'লেই, তাঁদের সঙ্গে প্রবক্তাদের পার্থক্য প্রকৃতিগত ; এবং সেইজন্যে বহুভাষীরা যখন বলেন যে কাব্যের অনুবাদ অসম্ভব, তখন তাঁরা ব্যাবসায়িক ধূর্ত্ততার পরিচয় দেন না, সত্যানুরক্তিই দেখান। কেননা অতিমানুষিক শ্রেয়োবোধে আস্থা রেখেও কোল্‌রিজ্ স্বীকার করতেন যে কবিতা অভিধানের ধার ধারে না, শ্রেষ্ঠ শব্দের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিন্যাসেই বাঁধা পড়ে ; এবং এমন দুই ভাষা অভাবনীয় যাদের মধ্যে তাৎপর্য্যবিনিময় সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। অতএব আমাদের কাছে বিদেশী কবিদের মূল্য শুধু এইখানে যে তাঁদের নাম মুখস্থ থাকলে, আমাদের বিদ্যাভিমান সাধারণের প্রশংসা পায় ; এবং বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ববশত গ্রীক্‌রা যদিও ভাষাগত ব্যবধান পেরিয়েই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি কুড়য়, তবু তর্জ্জমা প'ড়ে ল্যাটিন্ সাহিত্যের রসগ্রহণ হয়তো কারো সাধ্যেই কুলয় না। এই তো গেলো প্রাচীনদের কথা ; অর্ব্বাচীনদের অবস্থা আরো শোচনীয়। রাসীন্-প্রশস্তি আমাদের কানে শোনায় যেন কূপমণ্ডূকের ডাক ; ইংরেজিতে গোয়টে কেবল বাগ্‌বিস্তারের জন্যেই বিখ্যাত ; এবং রুষদেশের বাইরে পুশ্‌কিন্-এর রচনা কৈশোরিক আধিক্যের পরকাষ্ঠা।

আমার বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথও উক্ত মহাকবিদের পর্য্যায়ভুক্ত ; অন্ততপক্ষে

তিনিও তাঁদের মতো অভিব্যক্তির যূপে অভিজ্ঞতাকে বলি দিতে দ্বিধা করেন নি; এবং তাঁর রচনাবলী প্রায়ই ভাবগৌরবে আশ্চর্য্য রকমের গরিষ্ঠ বটে, কিন্তু তাতে প্রসঙ্গ আর প্রকরণ এমনই অন্যোন্যনির্ভর যে একের পৃথক্করণে উভয়েরই সমান ক্ষতি। ফলত রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষান্তর অসাধ্য। উপরন্তু তাঁর মনীষা যদিচ অতুলনীয়, তবু তিনি স্বভাবত হৃদ্ব্যবসায়ী; এবং বাংলায় রসপ্রতিপাদনের ব্যবস্থা যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজী বন্দোবস্তের বিপরীত, তাই ইংরেজী গীতাঞ্জলির সাফল্য আদৌ আবশ্যিক নয়, সর্ব্বৈব আপতিক। অর্থাৎ বাইবেলের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি সত্ত্বেও ইংরেজী গীতাঞ্জলির বক্তব্য ও ব্যঞ্জনা কেমন যেন অনিশ্চিত; রবীন্দ্রনাথের তুচ্ছতম বাংলা লেখাতেও ছন্দাদির যে-নির্ব্বিকল্প রূপ ধরা পড়ে, তার আভাসমাত্র সে-বইয়ে মেলে না; এবং বুঝি বা সেইজন্যেই ব্রিজেস্ সুদ্ধ গীতাঞ্জলির একটি কবিতা আগা-গোড়া শুধরেও, তার সর্ব্বনাশ সাধেন নি। তবে ব্রিজেস্ অকবি; এবং তিনিও যখন এ-ধরণের অঘটনসংঘটনে সক্ষম, তখন ভবিষ্যতের কোনো সুকবি অনুবাদ-কার্য্য হাতে নিলে, দায়িত্বহীন তর্জ্জমা রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রতি যে-অবিচার করেছে, তার আংশিক প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু সে-অনুবাদকও না মেনে পার পাবে না যে রবীন্দ্রনাথের বাংলা এক অভিনব ভাষা; তার আষ্টে-পৃষ্ঠে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রা, এবং তদ্ব্যতিরেকে তাঁকে চাওয়া মরুচারীকে নৌবিদ্যা শেখানোর চেয়েও হাস্যকর।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবিক ঐক্যবোধের অন্যতম উদ্যোক্তা হলেও, তাঁর কৃতিত্ব ঐকান্তিক আত্মোপলব্ধি; এবং সে-কথা ভুলে তাঁকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথা যুগধর্ম্মের দিক্পাল ব'লে ভাবলে, আমাদের অন্ধ ভক্তিই ধরা পড়বে, তাঁর মান বাড়বে না। বস্তুত অবগতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পথ-প্রদর্শক সুদ্ধ নন, তিনি রামমোহন-প্রমুখ আবিষ্কারকদের অনুগামী; এবং তাঁর চেষ্টা ব্যতীত বাঙ্গালীর ভোগশক্তি আজও ধারানিবদ্ধ থাকতো বটে, কিন্তু বৈবিক উদারনীতিও অভূতপূর্ব্ব নয়, ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্ থেকে স্যুইন্‌বর্ন্ পর্য্যন্ত প্রত্যেক রোমান্টিক্ কবিই অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁকে প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্যার প্রচারক হিসাবে দেখাও অসঙ্গত; এবং জড়বাদী পশ্চিম তাঁর বাণী শুনে অন্তর্দ্দর্শনের মূল্য বোঝে নি, বরং প্রাচীর জড়ভরতেরাই তাঁর

মারফতে পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে। ফলত তাদের অবস্থা প্রায় ত্রিশঙ্কুর মতো : তারা স্বদেশে উন্মূল, বিদেশের মাটিতেও শিকড় গাড়তে পারে না ; এবং সেজন্য তাদের অব্যক্ত অনুশোচনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই নিষ্ফল। তবে সে শূন্যতার দায় রবীন্দ্রনাথের নয়, অপরাধী বাঙালীর চারিত্র্য ও ঐতিহ্য ; এবং তাঁর মতো আমরাও যদি পরের মুখে ঝাল খাওয়ার সনাতন অভ্যাস কোনো দিন কাটিয়ে উঠি, তাহলে অন্তত ভাষার অভাবে আমরা আর বুক ফেটে মরবো না, বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম মেনেও সংস্কারমুক্তির বার্ত্তা রটাবো। বাঙালীর সামনে সে-সম্ভাবনার দ্বার খুলেছেন একা রবীন্দ্রনাথ ; তাই আগামী কালের বঙ্গবাসীরা তাঁর প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে করতেও তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানাবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে রবীন্দ্ররচনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা শুধু ভাবী পুরাবিৎদের অবশ্যকর্ত্তব্য নয়, রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে, আধুনিকেরা নিজেদেরও চিনতে পারবে না। সেইজন্যেই তাঁর সমস্ত লেখার প্রামাণ্য সংস্করণ একত্রে প্রকাশ ক'রে বিশ্বভারতী সারা বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বেঁধেছেন। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বাবলম্বী হলেও, স্বয়ম্ভূ নন, তাঁর সত্তা দেশ-কালের উপাদানেই তৈরী ; এবং সেই কারণে তাঁর সমগ্র পরিণতির আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পাঠে আমরা তো বাংলা ভাষার ক্রমপরিণতি বুঝবোই, এমনকি ভাষাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর চিৎপ্রকর্ষ কী পরিমাণে বদলেছে ও বদলাচ্ছে তাও অল্পায়াসে আমাদের জ্ঞানগোচরে আসবে। সুতরাং "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র বহুল প্রচার বিশেষ ভাবে কাম্য ; এবং গ্রন্থের মূল্য যথাসাধ্য কম রেখে প্রকাশকেরা আমাদের প্রত্যেককেই এ-বই কেনার সুযোগ দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য সংস্করণটি কবিসম্রাটের উপযুক্ত ; এবং এত অল্প ব্যয়ে এ-রকম উৎকৃষ্ট কাগজ ও ছাপাই সরবরাহ যখন সম্ভব, তখন সাধারণ বাংলা পুস্তকের কদর্য্যতা নিতান্ত অমার্জ্জনীয় ; বাঙালীর ঔদাসীন্যে বঙ্গীয় সৌন্দর্য্যজ্ঞান ইতি-পূর্ব্বেই চাপা না পড়লে, আমাদের গ্রন্থ-ব্যবসায়ীরা এ-বিষয়ে হয়তো আর একটু পটুত্ব ও দায়িত্ববোধ দেখাতেন।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Vision of Asia—An Interpretation of Chinese Art and Culture—by L. Cranmer-Byng (John Murray)

প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বই, বেশীর ভাগ অসংলগ্ন উক্তিতে পরিপূর্ণ, অনেক বড় বড় কথা, কাব্যগন্ধী হতে পারে, কিন্তু অর্থহীন। চীন দেশের আর্ট অবলম্বন ক'রে প্রায় সমগ্র প্রাচ্য সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। চীন সভ্যতার স্বর্ণময় যুগ হচ্ছে থাং (Tang) ও সুং (Sung), ৬১৮ হতে ১২৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। নানা মামুলী গ্রন্থ অবলম্বন করে গ্রন্থকার এই যুগের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও অসম্পূর্ণ।

নানা ভাসা ভাসা উক্তির মধ্যেও গ্রন্থকারের প্রধান বক্তব্য বিষয় খুঁজে বের করা যায়। সেখানে কোন Vision বা Interpretation-এর পরিচয় পাওয়া যায় না, প্রাচ্য সভ্যতার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের সুপরিচিত মনোভাবই দেখা যায়। Cranmer-Byng-এর মতে "For it is the past unsullied of Asia that we seek and not the present. The Eurasian mind of India, of China or Japan is not our quest." অর্থাৎ যে যুগে চীন জাপান ও ভারতবর্ষ ইউরোপের সংস্পর্শ পায় নি, তখন তাদের সভ্যতা ছিল আদর্শ-স্থানীয়, তখন তারা যে আধ্যাত্মিকতা বা ধ্যানপরায়ণতা লাভ করেছিল সভ্যতার ইতিহাসে তার স্থান অতি উচ্চে। প্রাচ্য দেশের বর্ত্তমান ইউরোপীয় মন যে সে আধ্যাত্মিকতা হারিয়েছে তা Cranmer-Byng-এর মত 'ঋষিকল্প' ব্যক্তি অতি সহজেই বুঝতে পেরেছেন। সুতরাং পাশ্চাত্য জাতি যদি তাঁর কথা শুনে প্রাচীন গ্রীস হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি "Beauty, Liberty, Directness, Humanism, Santiy, Many-sidedness"-এর উপর প্রাচ্যের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতাটুকু হাত করতে পারে তাহ'লে প্রাচ্য আর কোন দিনই তাদের সঙ্গে 'টেক্কা' দিয়ে পারবে না। বর্ত্তমান ইউরোপ যদি প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী হতে পারে তাহ'লে বর্ত্তমান চীন, জাপান বা ভারতবর্ষ কেন তাদের প্রাচীন সভ্যতার সহজ উত্তরাধিকারী হতে পারে না তা Cranmer-Byng বলেন নি, বলবার কোন দরকারও নাই। কারণ তিনি ধরেই নিয়েছেন যে ইউরোপীয় প্রভাবে বর্ত্তমান মন কলুষিত হয়েছে, এ অবস্থায় যদি কেউ

জিজ্ঞাসা করে যে ইউরোপ যদি প্রাচ্য হতে তার হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে স্বর্ণময় যুগের ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিনা, তার উত্তরও Cranmer-Byng দিতে ভোলেন নি। ২৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন—

For India is merely a geographical expression and All-India a political figment used to bind together many peoples in a common opposition to the British Raj. Mr. Gandhi is a Hindu of Hindus and as such will never consent to the equilibrium which alone might justify the term United India, Hindus at one end of the scale, Muhammadans and Minorities at the other. As Mahatma he is out to save the Hindu soul alive, to break with the alien forces of western materialism completely. But because these forces cannot be combated by texts from the Upanishads (কারণ Cranmer-Byng মহাত্মা গান্ধীর চাইতে উপনিষদ ভাল জানেন !) and saints living up to their precepts alone (কারণ Cranmer-Byng নিজেই ঋষিকল্প !), he has invoked the negative power of passive resistance, of refusal to pay taxes and of economic boycott ..... But the world (অথবা England !) needs India, and India on her part needs the world." এ অবস্থায় ভারতবর্ষের মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, তাকে ইউরেশীয়ই থাকতে হবে, এবং Cranmer-Byng-এর মত সূক্ষ্মদর্শী উপনিষদ-তত্ত্বজ্ঞদের উপদেশ অবধান করে "let it emerge by the slower process of evolution and survival ......to give common ideals and traditions and a commom tongue to the race."

মহাত্মা গান্ধী ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার খোঁজ রাখেন না, কারণ তিনি হচ্ছেন "spokesman of Hindu tradition, of the Brahmin and the rigid system of caste" আর "true signifcance of Hinduism" ছিল সেই উপনিষদে যা গান্ধী জানেন না, জানেন Cranmer-Byng। গান্ধীর তা জানাও সম্ভব নয় কারণ "This spirituality and this vision have been

partly obscured for us by the human swarm and the jungle of mind...the priests shepherding the ignorant masses, the *bunyas* who live as parasites on their toil, the multiplicity of cults ranging from extreme asceticism to wildest eroticism, the subjection of women to men......ইত্যাদি।"

সৌভাগ্যক্রমে সে অধ্যাত্মজ্ঞান 'completely obscured হয় নাই কারণ তা হলে Cranmer-Byngও তার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করতে পারতেন না।

দুঃখের বিষয় Cranmer-Byng-এর মত লেখকেরা বোঝেন না যে আমাদের "Eurasian mind" এ জাতীয় 'Vision of Asia'-র সঙ্গে সুপরিচিত। প্রাচ্য সভ্যতার এ জাতীয় interpretation-এর মূল্য নির্দ্ধারণ করতে আমাদের বেশী সময় লাগে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

Science Marches On—by Walter Shepherd, with a foreward by S. W. Woolbridge. (George G. Harrap & Co. Ltd.)

আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূলে রয়েছে প্রধানত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ও তার প্রসার। কাজেই এ সভ্যতার সত্যিকার রূপ বুঝতে হলে বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য্য। অবশ্য বিজ্ঞানের প্রাচীন মূল আদিম যুগের মানুষের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী কৌতূহল ও প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত। কাজেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা রকম প্রয়োজনের বৈচিত্র্য ও তার অনেকান্ত পরিণতির ইতিহাস বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত এই বহুমুখী পরিণতির ইতিহাসকে অবিমিশ্র জ্ঞানের জন্য মানুষের কৌতূহলের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করেছেন; মার্ক্সীয় বা মার্ক্সাস্তিক পদ্ধতিতে মানবসভ্যতার ইতিহাসের বিচার ও বিশ্লেষণ বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের ইতিহাসবেত্তাদের মহলে

সুপরিচিত ও কিছু প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, নিছক জ্ঞানের জন্য কৌতূহলকেই এই বিচিত্র ইতিহাসের বহুমুখী ধাপের মূল নিয়ামক বলে মনে করার রেওয়াজ ছিল। মার্কসীয় সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের ফলে এখন বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাস বা তার অংশ বিশেষের রচনা ও তার বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বহু সাম্প্রতিক মনীষী অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন। তাঁদের মধ্যে হেসেন্, হগ্‌বেন, উল্‌ফ্, ক্রোদার, বার্ণাল, হল্‌ডেন, কড্‌ওয়েল, হাক্‌সলি, লেভি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক না হলেও ব্রড্ ও ম্যাক্‌মারের দার্শনিক রচনাও এ পক্ষে খানিকটা সহায়তা করেছে; বিশেষতঃ টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার অতিপ্রাকৃত বলে বিবেচিত হতো, সেগুলির বিচার ও বিশ্লেষণে ব্রড্ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ জাতীয় ব্যাপারে প্রায়ই অনেক গোঁজামিল দেখতে পাওয়া যায়; কোন প্রকারে এর প্রতি বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা অনেক মনীষীর লেখাতেও দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানে যে রকম কঠিন পরীক্ষা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ দরকার, তার মাপকাঠিতে বিচার করলে এর বেশীর ভাগই হয়তো ভূয়া প্রতিপন্ন হয়; আর দু একটি তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপার, যেমন হিব্রু না জানা লোকের পক্ষে অসুখের মধ্যে হিব্রু ভাষায় প্রলাপ বকা, এরও তথ্য ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা ফ্রয়েড সুন্দরভাবেই করে দেখিয়েছেন।

শেযোক্ত ব্যাপারগুলির উল্লেখ করার কারণ এই যে, আলোচ্য পুস্তকখানিতে বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের খুব প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও, এই জাতীয় কতকগুলি ব্যাপার আশ্রয় করে লেখক প্রায় থিয়সফির রাজ্যের সীমান্ত রেখায় উপস্থিত হয়েছেন। এদিকে লেখকের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকাতেই বোধ হয় তিনি বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত পূর্ব্বোক্ত মনীষীদের গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হবার কোন চেষ্টা করেন নাই; অন্তত বইখানিতে সে প্রয়োজনীয় পরিচিতির অত্যন্ত প্রমাণাভাব। মুখবন্ধের শেষের দিকে তিনি লিখেছেন,—

"Strictly 'scientific' accounts of science are generally biassed to a considerable degree, the parts played in the

acquisition of knowledge by the aesthetic sense, by intuition and by ethical motive, for instance, being usually ignored and often violently denied. This book attempts to show how these elements stand in their true relation to scientific advance, and thus to give a view of science which will commend itself to the non-scientific mind on account of its breadth of sympathy"। অবশ্য অবৈজ্ঞানিক সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে বিজ্ঞানের সিংহচর্ম্মে আবৃত এ জাতীয় অর্দ্ধ-মিষ্টিক ও প্রায় থিয়সফীয় ধার্ম্মিক মনোভাব উপাদেয় হওয়া অসম্ভব নয়; বিশেষতঃ যখন ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙ্গন ধ'রেছে, তখন যে সব মহাপুরুষ ছলে, বলে, কৌশলে অর্জ্জিত মুনাফা বাঁচাবার চেষ্টায় প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তাঁদের কাছে এ জাতীয় 'বৈজ্ঞানিক' পুঁথি বড়ই আদরের বস্তু হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থকার যদি বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন পাঠকদের দিকেও একটু দৃষ্টি রাখতেন, তা হলে যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও সচেতন শ্রমিকশ্রেণী ক্রমবর্দ্ধমান পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তাদের মধ্যে এই সুপরিকল্পিত, সুচিত্রিত ও সুলিখিত বইখানির প্রচার হতো ও স্কুল কলেজের ছাত্ররাও বইখানি পড়ে আনন্দ ও জ্ঞান উভয়ই সঞ্চয় করতে পারতো, কিন্তু (ব্রিটিশ লেবর পার্টির ?) লণ্ডনস্থ ওয়ার্কিং মেনস্ কলেজের অধ্যাপক গ্রন্থকার মহাশয় সে চেষ্টা না করে, বরঞ্চ বিজ্ঞানের আবরণে কিঞ্চিৎ অতীন্দ্রিয়বাদের দিকেই একটু বেশী ঘেঁসেছেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার মামুলি কৈফিয়ৎ আওড়াতে তিনি কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। বইখানির ভূমিকায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজের অধ্যাপক ডক্টর উলব্রিজ লেখকের বহুমুখী পাণ্ডিত্য, রচনানৈপুণ্য ও সাহিত্যিক শক্তি সম্বন্ধে যা বলেছেন, যা খুবই সত্যি; আর সেই জন্যই আরো বেশী দুঃখ হয় যে এরকম সুলিখিত বই কিনা শেষ পর্য্যন্ত সঙ্কটের যুগে মুনাফাওয়ালাদের ধার্ম্মিক অহিফেন ব্যবসায়ের প্রচারপত্রে পর্য্যবসিত হল!

তবে বইখানি খুবই সুখপাঠ্য; আর গ্রন্থকারের অনেকটা শিশুসুলভ দার্শনিক মনোভাব বইখানির শেষ অধ্যায়েই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে বলে, তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তের অংশে এসে না পৌঁছান পর্য্যন্ত পড়তে কোনরকম বিরক্তি বা

ক্লান্তি হয় না। অবশ্য এ জাতীয় লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা খানিকটা পড়েই লেখকের অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি আকর্ষণ বুঝতে পারবেন; আর যা কিছু প্রাচীন, বিশেষত গ্রীক্, ল্যাটিন বা সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দার্শনিকদের খানিকটা ভাসাভাসা সংক্ষিপ্ত সূত্র, তাতেই গ্রন্থকারের আগ্রহ ও তার অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা বিপুল। এর ফলে বইখানি অবশ্য উপভোগ্য হয়েছে, যদিও প্রাচীন সূত্রগুলির মানে বের করার চেষ্টা একটু কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়। ভারতীয় ও আরবীয় গণিতজ্ঞদের উল্লেখও বেশ উপভোগ্য; তবে কোথাও কোথাও মুদ্রাকরপ্রমাদ একটু কৌতুকজনক হয়েছে; যেমন, "Professor Chunder Rose (of Calcutta)," অর্থাৎ Chunder Bose বা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

গ্রন্থকার প্রথমে প্রাচীন যুগের লিপির আবিষ্কার ও তথ্য লিপিবদ্ধ করবার কাহিনী থেকে আরম্ভ করে, আগুনের আবিষ্কারের কথা, স্পর্শমণি আবিষ্কারের চেষ্টা ও আধুনিক আন্তঃপরমানবিক গঠন ও রেডিয়ম্ আবিষ্কারে তার পরিণতির বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। প্রাচীন কিমিতিবিদ্যা ও আধুনিক রসায়নশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, শরীরস্থানবিদ্যা, দেহবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, সঙ্গীততত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিংবিদ্যা প্রভৃতির তিনি সুন্দর আলোচনা করেছেন; মোটের উপর বিজ্ঞানের সমগ্র ক্ষেত্র যাতে পাঠকের দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়ে গ্রন্থকার তারই চেষ্টা করেছেন ও তাতে তাঁর সাফল্যও সামান্য নয়। তবে গ্রন্থকারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তন্ত্বতান্ত্রিক না হওয়াতে ও দার্শনিক বিশ্লেষণের আধুনিক ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকাতে তাঁর সিদ্ধান্ত অনেকটা তাঁর অবচেতন ইচ্ছার পরিণতি বলে মনে হয়। যে মনের রাজ্য অভিমুখে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি বলে গ্রন্থকারের ধারণা, সে রাজ্যের রহস্য ভেদে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও মনোবিকলন বিদ্যা কতটা সহায়তা করেছে সে বিষয়ে তাঁর কোন ধারণা আছে, বইখানার মধ্যে এমন কোন প্রমাণ নাই। মনোরাজ্য অভিমুখে বিজ্ঞানের অভিযানের বিষয় বলতে গিয়ে তিনি যে সব অপসিদ্ধান্ত করেছেন, তার চেয়েও খারাপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে পুরাদস্তুর অতীন্দ্রিয়-বিলাসী থিয়সফিষ্ট প্রতিক্রিয়ার শেষ ধাপে পৌঁছাবার বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদীক্ষা ও সচেতন সাবধানতা। যাঁরা

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণে অভ্যস্ত তাঁদের কাছে বিজ্ঞানের ইতিহাস ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ জাতীয় রচনার বিক্ষিপ্ত চিন্তা আধুনিক ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ বলেই মনে হবে।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

An Introduction to Indian Philosophy. By S. C. Chatterjee, M. A., Ph. D. and D. M. Datta, M. A. Ph. D. Published by the University of Calcutta. Pp. vxiii+464. Price Rs. 3-8

ভারতের দর্শনপাঠী ছাত্রদের যে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে এখন আর দুই মত নাই। এ বিষয়ে যাঁহাদের মতের মূল্য আছে তাঁহাদের প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন, এদেশে যে সব ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে দর্শনের অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাদিগের ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও জ্ঞান হওয়া উচিত। বাস্তবিক স্বাভাবিক নিয়মে এরূপ হওয়া উচিত, ভারতীয় ছাত্র প্রথমে ভারতীয় দর্শনই পড়িতে আরম্ভ করিবে এবং তদ্দ্বারা তাহার মনের দার্শনিক ভিত্তি গড়িয়া উঠিলে পরে পাশ্চাত্য বা অন্যান্য দেশের দর্শনের আলোচনা করিবে। আমাদের দেশে যে রকম অবস্থার মধ্যে আজকাল উচ্চশিক্ষা চলিতেছে তাহাতে এ রকম ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলেও, অন্ততঃ পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করিবে, এ রকম ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে। সুখের বিষয়, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হইয়াছে।

দর্শনশিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয় দর্শন পাঠের ব্যবস্থা না থাকার একটি বিশেষ কারণও ছিল। ভারতীয় দর্শনের প্রাথমিক গ্রন্থসকল সংস্কৃত

ভাষায় লিখিত; কিন্তু যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়িতে আরম্ভ করে, তাহাদের সংস্কৃতের জ্ঞান কখনই সংস্কৃতে দর্শন পাঠের উপযুক্ত নয়। এমন কি, সংস্কৃত একেবারে না শিখিয়াও অনেকে দর্শন অধ্যয়ন করিতে পারে। আমাদের দেশের কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত ইংরাজিতে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন বটে, এবং তাহা দ্বারা জগতে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানও অনেকটা প্রসারিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সব গ্রন্থ দর্শনের প্রাথমিক ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বলা যায় না। ছাত্রদের জন্য অল্পপরিসরের মধ্যে সহজভাবে যাবতীয় তথ্য উপস্থাপিত হওয়া উচিত। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকারদ্বয় ঠিক তাহাই করিয়াছেন। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনপাঠের যে মহান্ অন্তরায় ছিল, তাহা এই গ্রন্থের দ্বারা দূরীভূত হইল। এখনও যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনপাঠের ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারা যাইবে না যে গ্রন্থের অভাব বশতঃ সে ব্যবস্থা হইতেছে না।

উভয় গ্রন্থকারই তাঁহাদের অধ্যাপনার দ্বারা ছাত্রসমাজে, এবং তাঁহাদের রচিত পুস্তকাদির দ্বারা বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। তাঁহারা নিজে পণ্ডিত বলিয়া, ভারতীয়দর্শনের প্রধানতঃ জ্ঞাতব্য বিষয় কি কি তাহা তাঁহারা স্পষ্টভাবে জানেন। শিক্ষাকার্য্যে বহুদিন তাঁহারা ব্যাপৃত আছেন বলিয়া, ছাত্রদের কাছে দুর্ব্বোধ্য বিষয় কিরূপে সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া উপস্থিত করিতে হয়, তাহার কলা ও কৌশল তাঁহাদের আয়ত্ত আছে। সুতরাং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি সব দর্শনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় পৃথক্‌ভাবে বিবৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত গ্রন্থের প্রথমেই এক সুবৃহৎ ভূমিকায় সাধারণভাবে ভারতীয় সব দর্শনের কথাই বলা হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রন্থখানি লিখিত হইলেও ইহা পড়িতে কোন রকম ভার বোধ হয় না। অতি সূক্ষ্ম বিষয়ও প্রাঞ্জলভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। ছাত্রদের কাছে পাঠ্যপুস্তকরূপে বইখানি আদর্শস্থানীয় হইবে বলিয়া আশা ত করা যায়ই, সাধারণ পাঠকের পক্ষেও ইহা খুব উপযোগী হইয়াছে।

এই স্বাদেশিকতার যুগে স্বভাবতঃই আমরা আমাদের দেশ দার্শনিকের দেশ বলিয়া গৌরব অনুভব করি। বাস্তবিক পক্ষেও ভারতবর্ষ অন্য কিছুর জন্য গৌরবের অধিকারী হউক বা না হউক, তাহার অতীতযুগের দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের কয়জনের ভারতীয়-দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে? ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রধানতঃ কি কি, এ সব বিষয়ে আমাদের অনেকেই বিশেষ কিছু জানেন না। দেশের অতীতের প্রতি অন্ধশ্রদ্ধা ছাড়িয়া, সজ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত হইতে গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইহার বহুল প্রচার সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরাসবিহারী দাস

The Man behind the Plough—by M. Azizul Huque (The Book Company, Rs. 5/.)

আজিজুল হক্ সাহেব হচ্ছেন কলকাতা ইউনিভার্সিটীর ভাইস্ চান্স্লার, আর বাংলার আইন সভার পরিচালক। তাঁর কলম থেকে এমন একটা বই বেরিয়েছে, যার প্রায় সবটা বাংলাদেশের যে কোন মার্ক্‌সবাদী লিখতে পারলে খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করত। রাজদ্বারে যিনি বহু সম্মান পেয়েছেন ও পাচ্ছেন, তাঁর বইয়ের সমাদর সব চেয়ে বেশী করবে তারা, যাদের সর্ব্বদাই রাজরোষের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে হক্ সাহেবের জ্ঞান খুবই গভীর। প্রথমে মফঃস্বলের উকীল হিসাবে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের তিনি সভাপতি হয়ে কাজ করেছেন, মফঃস্বল সহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন, জেলা বোর্ডের বহুদিন সদস্য

থেকেছেন। পরে খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য গবর্মেণ্ট-নিযুক্ত নানা কমিটিতে তিনি কাজ করেছেন; বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন, আর এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়েছেন। দেশের জীবন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান শুধু পুঁথিপড়া নয়।

সেই কারণেই তাঁর বইকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করছি, যদিও চাষীর নানা সমস্যা সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত সমাধান তিনি দেননি। সাম্যবাদীদের মতে তিনি সায় দেন না, জমিদারী প্রথার তিনি বিরোধী নন্, সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি ব্যস্ত নন্। চাষীর দুঃখ-দুর্দ্দশার ছবি তিনি দিয়েছেন, বহু সরকারী রিপোর্ট থেকে বহুদিন ধরে সংগৃহীত তথ্য প্রয়োগ করে সে ছবিকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছেন, সমাজ-কল্যাণ যে চাষীর দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর না হলে সম্ভব হবে না তা স্বীকার করেছেন; কিন্তু কোন্ পথে কি ভাবে এগিয়ে গেলে সমাজ-কল্যাণ সম্ভব হবে, তার বিশদ ব্যাখ্যাকে তিনি এড়িয়ে গেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের কি অবস্থা ঘটেছে, বেআইনী উপায়ে খাজনাবৃদ্ধি আর আব্‌ওয়ার ইত্যাদি আদায় কি ভাবে হয়েছে, তা তিনি বহু সরকারী রিপোর্ট ঘেঁটে প্রকাশ করেছেন। চাল, পাট, আখ ইত্যাদি ফসলের খবর, আর চাষীদের লাভের অঙ্কে এক রকম শূন্যেরই আবির্ভাব তিনি বর্ণনা করেছেন। চাষীদের দেনা, মুনিষদের সংখ্যাবৃদ্ধি আর বেকার সমস্যা, মালিক-চাষীর জমির অল্পতা, বলদের অভাব, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও অনটন, ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা এ বইয়ে আছে, আর সে আলোচনার প্রধান উপাদান হচ্ছে সরকারী রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি। পেশাদার বিপ্লবীর প্রলাপ বলে এ বইকে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর ১৭৯৩ থেকে এখন পর্য্যন্ত প্রজাসত্ত্ব সম্পর্কিত আইন সম্বন্ধে ধারাবাহিক বর্ণনা হক্ সাহেব দিয়েছেন। "ডালভাতের" সমস্যাটা যে একটা রাজনীতিক বুলি নয়, তা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়েছেন ; বাংলাদেশে ঐ সমস্যাই হচ্ছে প্রধান। বিদেশে নানা যায়গায় যে সব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিনি বলেছেন যে আমাদেরও ঐ রকম

একটা ব্যবস্থা না করলে চলবে না। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটা প্রস্তাবও করেছেন। কিন্তু যে বিরাট সমস্যার রূপোদ্ঘাটন তিনি করেছেন, তার সমাধান যে ছোটখাট সংস্কারে হবে না, তিনি স্পষ্ট না বললেও তাঁর লেখা থেকে তা ধরা পড়ে।

এ বইয়ের বহুল প্রচার না হলে আমাদেরই লজ্জার কথা।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বলশেভিক পার্টির ইতিহাস, আবদুল হালিম প্রণীত (অগ্রণী বুক ক্লাব), মূল্য—১৲

লেনিন ও বলশেভিক পার্টি, রেবতী বর্ম্মণ প্রণীত (বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস্) মূল্য—১৲

কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা (ন্যাশনাল বুক এজেন্সী), মূল্য—৶০

নভেম্বর বিপ্লবের দ্বাবিংশ বার্ষিকীর প্রাক্কালে বলশেভিক পার্টির ইতিহাস ও বিশেষ করে বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ লেনিনের অবদান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় দু'খানি বইয়ের প্রকাশ খুবই আনন্দের বিষয়। আবদুল হালিম ও রেবতী বর্মণ শুধু মার্কস্‌বাদের মৌখিক প্রচারক নন্; বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা নিবিড় ভাবে সংযুক্ত আছেন। মার্কস্‌বাদের এক প্রধান সূত্র—তত্ত্ব ও কর্ম্মের সমন্বয় (unity of theory and action)—তাঁদের জীবনে প্রকাশ পেয়েছে! বহু বৎসর কারাবাসের পর রেবতীবাবু মুক্তি পেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মার্কসীয় সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। "রাশিয়ার গণ-আন্দোলন" নামক পুস্তকে হালিম সাহেব পূর্ব্বেই বলশেভিক দলের ইতিহাসের একটা অংশ বাঙালী পাঠকদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। দীর্ঘ কারাভোগ ও মুক্তির পর ও বহু বৎসর বিনা বিচারে আটক থাকার পর তিনি এই বইটির জন্য

সংগৃহীত মালমশলা গুছাবার সামান্য মাত্র সময় পেয়েছেন; মনোমত সংশোধন করার পূর্ব্বেই তাঁকে আবার কারাগারের দিকে রওনা হতে হয়েছে।

যথার্থ সাম্যবাদী দল সম্বন্ধে সকলের ধারণা পরিষ্কার করেছিলেন লেনিন—কাজ দিয়ে, আর দলের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। এ বিষয়ে তাঁর কথা অবশ্যমান্য; বলশেভিক দল গঠনে তাঁর প্রভাব ও অলৌকিক কর্ম্মক্ষমতাই এর প্রমাণ। লেনিনের মতে সাম্যবাদী দল হবে শ্রমিক শ্রেণীর পুরোগামী, কোন ক্রমেই দলকে শ্রমিক শ্রেণীর লেজুড় হিসাবে বরদাস্ত করা চলে না। তিনি জানতেন যে জনসাধারণের সকলেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবে না, হবার যোগ্যতাও অর্জ্জন করতে পারবে না। কিন্তু দলের কাজ এমন হওয়া একান্ত প্রয়োজন যাতে জনসাধারণ দলের নেতৃত্বে নিশ্চিন্ত নির্ভর করতে পারে, দলকে যেন তারা সদস্য না হলেও নিজেদের জিনিষ মনে করে। শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য স্থাপনের সময় রাষ্ট্রশক্তি দখল করবে, প্রয়োগ করবে এই দল; দলই হবে ডিক্টেটরশিপের প্রধান হাতিয়ার। দলের ভিতর আলোচনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বিবাদ-বিতণ্ডা চালানোকে গুরুতর অপরাধ গণ্য করা হবে। তা'ছাড়া দলের সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যকে অপ্রতিহত রাখার জন্য সুবিধাবাদী ও চক্রান্তকারীদের নিষ্করুণ ভাবে বহিষ্কৃত করতে হবে। যথাযোগ্য দণ্ড দিতে হবে। বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে যে সব নেতা দ্বিধা করবেন, সঙ্কোচের আতিশয্যে সুযোগকে হারাবেন, তাঁদের নেতৃত্বকে দূরে পরিহার করলে আন্দোলন ও বিপ্লব দুর্ব্বল না হয়ে শক্তিমান হয়ে উঠ্‌বে।

লেনিনের শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে হলে ভারতবর্ষীয় সাম্যবাদীদের প্রয়োজন হচ্ছে জ্ঞান—বলশেভিক দলের ইতিবৃত্ত, বাধাবিপত্তির বর্ণনা, সাফল্যের কারণ, প্রকৃত নেতৃত্বের লক্ষণ, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান। হালিম সাহেবের বইয়ে অতি দ্রুত লেখার চিহ্ন কিছু আছে; জেলখানার ডাক আবার কবে হঠাৎ এসে পড়ে, তার কোন স্থিরতা না থাকায় তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে। তিনি নিজেই ভূমিকায় বলেছেন যে পাণ্ডুলিপি সংশোধনের পর্য্যন্ত তিনি সময় পান নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর এ বই থেকে বলশেভিক পার্টি সম্বন্ধে এমন বিস্তারিত বিবরণ মিল্‌বে, যা একখানা বইয়ের পক্ষে

যথেষ্টে ও বেশী। ১৮৯৮ সালে রুষদেশের সোশাল ডেমক্রাটিক দলের প্রথম কংগ্রেসের সময় থেকে পার্টির বিবরণের যে ইতিহাস তিনি বহু শ্রমে প্রণয়ন করেছেন, সে জন্য শুধু সাম্যবাদীরাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে না; যাঁরা সাম্যবাদী নন, তাঁরাও এ বই থেকে বহু তথ্যের সন্ধান পাবেন। রুষদেশে সাম্যবাদী বলে পরিচিত অনেকে নানা মত প্রচার করে দলের মধ্যে আগাছার সৃষ্টি করেছিলেন। মার্কস্‌বাদের গণ্ডীর মধ্যেই 'ইজ্‌মের' চূড়ান্ত সে দেশে হয়েছিল। আগাছা সরিয়ে আসল পার্টি গড়ে তোলার বৃত্তান্ত যে খুবই মূল্যবান, তা বলার প্রয়োজন নেই। হালিম সাহেবের ভাষা প্রাঞ্জল। বইটির একমাত্র দোষ হচ্ছে বিষয়বস্তুকে আরও সহজসাধ্য করে বর্ণনা না করা; কিন্তু তার কারণ হচ্ছে লেখকের সময়াভাব। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক কারামুক্তি পেয়ে প্রয়োজনমত সংশোধন করবেন, আর শীঘ্রই আর একটি বইয়ে ১৯১৭-এর পর থেকে বলশেভিক দলের কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানাভাব দূর করবেন।

হালিম সাহেব বলশেভিক দলের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়েছেন, আর রেবতীবাবু ঐ বিষয়েই লিখেছেন লেনিনকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি মস্কোতে লেনিনের পার্শ্বচর বলে পরিচিত কামেনেভ, জিনোভিয়েভ প্রভৃতির যে দণ্ড হয়েছে, তার তাৎপর্য্য বুঝতে হলে তাঁরা পূর্ব্বেও যে বহুবার বিপথগামী হয়েছিলেন তা জান্‌তে হবে। রেবতীবাবু এ বিষয়ে খুব সাহায্য করবেন, আর লেনিনের মতবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের জানাবেন। তাঁর ভাষা এক এক সময় দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়েছে; লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্লেষণ করে-ছিলেন, তার বর্ণনা আরও সহজসাধ্য হলে সুখী হতাম। কিন্তু মার্কস্‌বাদের বিষয়বস্তু যে সহজে ও অল্প আয়াসে আয়ত্ত করা যেতে পারে, এ ধারণাও ভুল। মার্কসীয় সাহিত্য যাঁরা পড়বেন, তাঁদের কাছ থেকে কিছু মানসিক পরিশ্রম আশা করা অন্যায় নয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক মণ্ডলী "কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন" পুস্তিকায় সভার বড়া-হুগলী সম্মেলনে গৃহীত নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। রচনাটি রেবতীবাবুর। কৃষকদের শ্রেণীপ্রতিষ্ঠান, কৃষক আন্দোলনের

প্রকৃতি, কৃষকের নানা সমস্যা, মহাজন ও কৃষকের ঋণ, কৃষকের জীবন ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ এতে আছে। কৃষক আন্দোলনের শত্রুমিত্র সকলেরই এ পুস্তিকা পড়ে দেখা উচিত।

মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত

আরতি ঃ শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

বৃহত্তর সম্ভাবনা ঃ শ্রীবরেন্দ্রনাথ বসু।

'বক-ধার্ম্মিক' ঃ শ্রীযামিনীমোহন কর।

গ্রন্থ সমালোচনার রাজ্যে দায়িত্ব ও বিপদ অসংখ্য। অসামাজিক ও দুর্মুখ হবার সম্ভাবনা কম নয়। এর কারণ হয়ত আত্মাভিমান, গ্রন্থকারেরও বটে, সমালোচকেরও বটে। এ ক্ষেত্রে লেখনী সম্বরণের উপদেশ দুই পক্ষেরই গ্রাহ্য নয়; হয়ত অন্যায়ই। বন্ধুকৃত্যের দায়ও অনেক সময় দুর্লঙ্ঘ্য। প্রায়ই দেখা যায় সমালাচনার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় গ্রন্থ-পরিচিতি নয়, গ্রন্থকার পরিচিতি এবং ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি। ওদিকে চক্ষুলজ্জাও দুর্মর। এ সঙ্কটে অদৃষ্টবাদী না হয়ে উপায় নেই। তাই কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে প্রায় বীরের মতনই লেখনী চালনা করতে হয়।

অধুনা, পলাতকেরা অনেকেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। রোমান্‌টিক্‌-সুলভ স্বপ্নতাড়িত ছন্নছাড়া জীবনের চেয়ে সামাজিক গৃহস্থের জীবনই কাম্য হয়ে উঠেছে। এবং সাহিত্যে এই সত্য সামাজিক চেতনার ও নৈতিক দায়িত্বের মূল্যও নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে। মোটামুটি আমি এই আদর্শে আস্থাবান। তাই 'আরতি'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পসমষ্টির অধিকাংশই ভাল লেগেছে, যেমন 'বক্কোর', 'ভিক্ষা' 'চাল মাৎ', 'ব্রিজ' ইত্যাদি। গ্রন্থ-পরিচয়ে জানতে পারলাম লেখক কোনোকালে 'সবুজ-পত্রে' লিখেছিলেন; এবং 'আরতির' গল্পগুলি শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়েরও গ্রাহ্য হয়েছে। এ পরিচয়-পত্র অবশ্য লেখকের পক্ষে

কৌলীন্য বর্দ্ধক। কিন্তু একটা বক্তব্য নিবেদন করছি। 'বাঙালির মুখের ভাষা' নিত্য অভ্যস্ত ভাষা হলেও সৎসাহিত্যের বাহন হিসাবে সে ভাষা সকল ক্ষেত্রে প্রশস্ত নয়, যদি সেটা হয় প্রাদেশিক। যেমন, মৈমনসিং, বরিশাল, বা য'শোরের, অথবা খাস কলিকাতার বাগ্‌বাজারী ভাষায় আগাগোড়া গল্প লেখা হাস্যকর বলেই মনে হয়। প্রবোধবাবুর ভাষা মাঝে মাঝে এই দোষে দুষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। তাতে অবশ্য আঙ্গিকের দিক থেকে গল্পগুলির সমূহ ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। এবং কোনো গভীর বৈদগ্ধ্যবান ও সুপরিণত মনের পরিচয় না পেলেও প্রবোধবাবুর সুস্থ সামাজিক-নৈতিক দায়িত্ববোধ গল্প-গুলির পরিত্রাতা। 'আরতি' সেই হিসাবে পাঠ্য হতে পেরেছে।

কিন্তু প্রায় কোনো মনেরই সাক্ষাৎ পাই না 'বৃহত্তর সম্ভাবনায়'। লেখনী বেশ অপরিণত, অগভীর ও নৈতিক দায়িত্ববিহীন। এ-ও এক গল্পগুচ্ছ। নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়, বৃহত্তর সম্ভাবনা কেন, কোনোপ্রকার সম্ভাবনাই এতে পাই না। রবীন্দ্র-শরৎ-উত্তর বাংলা সাহিত্যের অগ্রস্থতি ছোট গল্পের প্রণালীতে অনেক পরিমাণে প্রবাহমাণ। এবং এই উৎকর্ষের আসরে 'বৃহত্তর সম্ভাবনা'র স্থান কোথায় খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

এবং 'বক-ধার্ম্মিকে'র অবস্থাও দেখি তাই। যদিও এ বই গল্পসমষ্টি নয়, নাটক বা সামাজিক নক্সা। আধুনিক তথাকথিত সভ্য সমাজের অযথা বিকৃত চিত্র। বলা বাহুল্য নাট্যকার সমাজসংস্কারক রূপে কষাহস্তে অবতীর্ণ। তাই প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই বক্তৃতামুখর ও চলচ্ছক্তিবিহীন। পি, জি, ওড্‌হাউসের একটা মজার গল্প অবলম্বনে নাটকটি রচিত। সম্প্রতি 'রজত-জয়ন্তী' নামে একটি ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। ওটা 'বক ধার্ম্মিকের'ই নামান্তর বলে বোধ হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

কুমুদনাথ—সরলাবালা সরকার প্রণীত, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)
মূল্য এক টাকা।

বর্ত্তমান পুস্তক একখানি জীবনচরিত। লেখিকার মতে এবং অবশ্য আরো অনেকের মতে (ডাঃ সরসীলাল সরকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম) কবি ও সাধক ৺কুমুদনাথ লাহিড়ী (১২৮৬-১৩৪০) একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাসের আলোচনা দেশবাসীর "দুর্ব্বল মনে শক্তিসঞ্চার" করবে। এবং কেবল তাই নয়, লেখিকা আরো বিশ্বাস করেন, "এরূপ জীবনের ইতিহাস মানব সমাজের পক্ষে এক মহামূল্য সম্পদ।"

উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু এই রকম অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত চরিত্র নিয়ে জীবনী রচনা করতে হ'লে অনেক বড় বড় কথা এবং বিশেষণ ব্যবহার পটুত্ব ছাড়াও যে সৃজনী প্রতিভার প্রয়োজন লেকিখার তা আছে কিনা তাই লক্ষ্যণীয়।

জীবনীগ্রন্থ, ইংরাজীতে যাকে Biography বলে, বাংলায় তা নেই বললেই চলে। ওরই মধ্যে যেগুলি একটু খ্যাতিলাভ করেছে, সেগুলিকেও নিখুঁত Biogrophy-র পর্য্যায়ে ফেলা যায় কিনা সন্দেহ। বাংলাতে জীবনীগ্রন্থের এই অসাফল্যের প্রধান কারণ আমার মনে হয়, লেখকের সামাজিক দৃষ্টির অভাব এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা তার জীবনের ঘটনাবলীর প্রাধান্য দেবার চেষ্টা। যাঁরা ভাল ইংরাজী জীবনীগ্রন্থ এবং বিশেষভাবে লিটন ষ্ট্রেচীর জীবনী-নিবন্ধগুলি পাঠ করেছেন, জীবন-চরিতের পক্ষে মহৎ ঘটনাবলী যে মোটেই অপরিহার্য্য নয় তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে উদ্ঘাটিত করতে ঠিক যে কয়টি ঘটনার প্রয়োজন (সেগুলি মহৎ কি তুচ্ছ তা অবান্তর) কেবল সেইটুকুই যথার্থ জীবনীগ্রন্থের উপাদান। এবং এইদিক দিয়ে জীবনীকারের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যে বিশেষ কঠিন, তা অনস্বীকার্য্য।

এখানে এতটা আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে 'কুমুদনাথ' যে ধরণের পুস্তক সে রকম জিনিসের সঠিক সমালোচনা সম্ভব নয়। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এটী কি Biography হিসাবে ওৎরায় নি ? আমার উত্তর হবে স্পষ্ট নেতিবাচক। কিন্তু সেইখানেই আমার কর্ত্তব্যের শেষ নয়, ব'লে দেওয়া দরকার

Biography-র সংজ্ঞায় অসফল হ'লেও, বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে ধরণের জীবনীগ্রন্থের চলন আছে তিনচারখানাকে বাদ দিলে এই পুস্তক অবশিষ্টগুলির চেয়ে বিশেষ নিকৃষ্ট নয়। এবং আংশিকতঃ সেই কারণেই লেখিকার রচনারীতি বা ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনায় (বাহুল্য বোধে) নিরস্ত রইলাম।

মণীন্দ্র রায়

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।
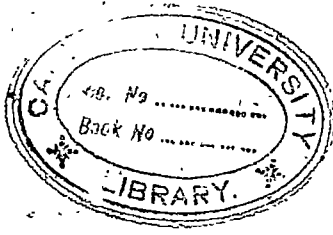
৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৪৬

পরিচয়

গ্রীক সমাজব্যবস্থার ভূমিকা

(১)

গ্রীক্ সংস্কৃতির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে তথায় একদিকে সংস্কৃতির ও সমৃদ্ধির যেমন উৎকর্ষসাধন হইয়াছিল, অন্যদিকে জনসমূহের মধ্যে তেমনি অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য বিরাজ করিত। গ্রীসের সমাজ বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধনীরা রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধা পাইত, অথচ নির্দ্ধন নাগরিক বা শ্রমিক রাষ্ট্রের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিত। সাহিত্যে এইসব ঘাত-প্রতিঘাতের সংবাদ পাওয়া যায়।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই, অধিকারবঞ্চিত এই সব গণশ্রেণীর লোকেরা আত্ম-রক্ষার জন্য কি করিত? এই স্থলেও মানবেতিহাসের সনাতন ট্র্যাজিডির পুনরভিনয় হইয়াছিল—অর্থাৎ অজ্ঞ লোকেরা জগতের ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া অরফিউস, পিথাগোরাসের আধ্যাত্মিক (mystic) ও আবেগপূর্ণ ধর্ম্মে যেমন প্রাণের শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি সংঘবদ্ধ হইয়া ব্যবসায় বা পেশা-সংঘ (trade guild) স্থাপন করিয়া নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশ্য এইসব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রেরণা এসিয়া হইতে আসে। ইহার ফলে যে-সব লোক কায়িক শ্রম করিয়া খাটিত তাহারা এক একটা ট্রেড-গিল্ডের সভ্য হইত। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পেশা-সংঘ যে প্রণালীতে সংগঠিত হইয়াছে, গ্রীক জাতির মধ্যেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হয়।* ইহার অর্থ এই যে প্রাচীন রীতি অনুসারে একটি দেব বা দেবীর নামে একটি পেশা-সংঘ

* Sir W. M. Ramsay—Asianic Elements in Greek Civilization.

উৎসর্গীকৃত হইত; এক পেশার লোক একত্রিত হইয়া একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিত; তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইত একটি। আর সমস্ত সংঘের সভ্যেরা ঐ দেবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত বলিয়া নিজেদের বিবেচনা করিত, এবং সকলে এক ফ্রাটী (phratry) বা "বেরাদারী"র লোক বলিয়া পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইত। ঐতিহাসিকগণ বলেন "পতাকাবাহীর দল" (flag bearers) এবম্প্রকারের একটি ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ পেশা-সংঘ ছিল। এই সংঘ এতদিন বাঁচিয়াছিল যে রোমান সাম্রাজ্যে যতদিন প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্ম জীবিত ছিল ততদিন ইহারও অস্তিত্ব ছিল। রোমান সম্রাটদের বড় বড় জমিদারীতে উহাদের অস্তিত্বের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কারণ এই সময়ে সম্রাট লোকচক্ষে ভগবানের স্থান অধিকার করায়, এই পতাকাবাহীর দল তাঁহাকে তাহাদের দেবতা বলিয়া পূজা করিত। ইহার ফলে সাম্রাজ্য ও প্রাচীন ধর্ম্ম মিত্রতা করিয়া নূতন খৃষ্ট ধর্ম্মকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পরে গ্রীসের শহর-রাষ্ট্রগুলি ও রোমের গভর্ণমেণ্ট কেহই এই পেশা-সংঘগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই, কারণ ইহা রাষ্ট্রের ভিতর রাষ্ট্র গঠন করিয়া সাম্রাজ্যের বা সাধারণ রাষ্ট্রের ক্ষতি করিতে পারে। তত্রাচ উক্ত সংঘ-পদ্ধতি সর্ব্বপ্রথমে এসিয়ার আনাটোলিয়াতে আরম্ভ হইয়া ইউরোপীয় গ্রীসেও ছড়াইয়া পড়িল, এবং যেখানেই এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সেখানেই এই ফ্রাটী বা বেরাদারীও টিঁকিয়া রহিল। কোন কোন পরিব্রাজক* বলেন বর্ত্তমান তুর্কিতে এই সংঘপদ্ধতি মুসলমান সমাজের মধ্য দিয়া আজকালকার যুগেও চলিয়া আসিতেছে। ১৮৯৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহার নিদর্শন বর্ত্তমান্ তুর্কিতে "হামাল" (মুটিয়া) শ্রেণীর মধ্যে পাওয়া যাইত।

গ্রীসের সমাজ বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহা ক্রমান্বয়ে অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, প্রোলেটারিয়েট এবং অর্দ্ধ গোলাম বা গোলাম শ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীবিভেদ কতটা জাতিগত বিভিন্নতার ফল, তাহা অনুসন্ধানের বস্তু।

গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমাজগঠনের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকায় সর্ব্বত্র একই

* Buckler and Calder—"Anatolian Studies,"—pp. 192-193; ইবন বেটুটার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

প্রকারের সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিবর্ত্তিত হয় নাই। গ্রীসের প্রধান দুইটি রাষ্ট্র আটিকা ও স্পার্টাতে সমাজগঠন কি প্রকারে হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। এই দুইটির মধ্যে আটিকা সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল, কারণ গ্রীক সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ তাহারই রাজধানী আথেন্সে বিকাশ পায়।

এ হেন আটিকার প্রাচীন জনশ্রুতি ও গল্প এবং চারুশিল্পকলার পরীক্ষার দ্বারা বর্ত্তমানের পণ্ডিতেরা* এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আটিকার আইওনীয় কৌম তথাকার আদিম অধিবাসী ছিল, অর্থাৎ ইহারা হেলেনিক্ মূল জাতির লোক ছিল না। হেরোডোটাস† স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আটিকার লোক জাতিতে প্রাচীন পেলাসগীয়। আবার, আটিকার লোকেরা নিজেদের সেই স্থানের আদিম অধিবাসী বলিয়া গর্ব্ব করিত ‡। সোলনের সময় পর্য্যন্ত আটিকার প্রাচীন সমাজপদ্ধতির বিষয়ে বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু এইটুকু জানা যায় যে তখন একটা ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গ এবং গরীব শ্রেণী বিদ্যমান ছিল এবং শেষোক্তেরা ভিন্ন জাতি বা পরাজিত জাতির লোক ছিল না।

অন্যদিকে ডোরীয় কৌম উত্তর হইতে অভিযান করিয়া দক্ষিণের ল্যাসিডিমন প্রদেশে আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের জয় করিয়া নিজেদের শাসক জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। §

এক্ষণে সাধারণ ভাবে গ্রীসের সমাজে শ্রেণীবিভাগ কি ভাবে উদ্ভূত হইল, তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে হেলেনিক্ কৌমদের বর্ব্বরাবস্থা অপনীত হইয়া যখন জমিতে বসবাস আরম্ভ হইল, সেই সময় হইতে জমির পরিমাণের তারতম্যের জন্য ক্রমশঃ একটি অভিজাত শ্রেণীর উদয় হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সেই অতি প্রাচীন মাইকিনীয় সংস্কৃতির সময়ে ঘটে। ¶ এই সব অভিজাতবর্গীয় গোষ্ঠীগুলি একটি দেবতা বা বীরের

---

* Karl F. Hermann—Lehrbuch der Griechischen Staatsaltertuemer, p. 300

† Herodotus—I. 56-58

‡ I. P. Mahaffy—"A Survey of Greek Civilization", p. 84

§ I. P. Mahaffy—"A Survey of Greek Civilization", p. 80

¶ K. F. Hermann; V. V. Wilamowitz-Moellendorff—"Staat und Gesellschaft der Griechen."

বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত * এবং বাপের দিকে যাহারা একই লোকের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত অর্থাৎ যাহারা হিন্দুদের মতন এক গোত্রীয় লোক ছিল, তাহারা এক "কুল" (Genos) সংগঠিত করিত। এই অভিজাত বংশকে খাঁটি রাখিবার জন্য নিজের শ্রেণীর ভিতর বিবাহ করিতে হইত। † আথেন্সে সোলনের "ড্রাকোনীয় আইন" পর্য্যন্ত ইহা কড়াভাবে বিদ্যমান ছিল। ইহা ব্যতীত, অভিজাতবংশীয়েরা সমবয়স্কদের লইয়া সংঘবদ্ধ হইত এবং এক সঙ্গে আহার বিহারাদি করিত। ‡ এই সংঘবদ্ধতার ফলে তাহারা সমগ্র জাতির অন্যাংশ যাহা ফাইলাম (phylum) ও ফ্রাট্রিতে (phratry) বিভক্ত ছিল তাদের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করে। কবি হোমরের সময়ে প্রত্যেক হেলেনিক কৌমের একটি করিয়া রাজা ছিল, কিন্তু পরে ইহাদের সরাইয়া অভিজাতবর্গ রাষ্ট্রের শাসন স্বশ্রেণীর হস্তে গ্রহণ করেন। হোমরের সময় গ্রীসের সামন্ততান্ত্রিক যুগ; হোমরের কাব্যে বর্ণিত বীরেরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অভিজাতবর্গ ছিল; তাহারা ঘোড়ায় বা রথে চড়িয়া লড়াই করিত, এবং নিজেদের জমিদারীতে ঘোড়া উৎপাদন করাইয়া তাহার ব্যবসা করিত।

হোমরের যুগের পর সমাজে নানাপ্রকার বিপ্লব হয়, সমাজে নানাপ্রকারের নূতন ব্যবস্থা হয়। গ্রীসের সমাজের এই অবস্থার সময়ে মুষ্টিমেয় স্বাধীন এবং অভিজাতবংশীয় লোকদের দ্বারা রাষ্ট্র সংগঠিত হয়। এতদ্দ্বারা শাসিতশ্রেণীর কোন লোকের পক্ষে শাসকশ্রেণীতে উন্নীত হওয়া অসম্ভব ছিল। § আর এই মুষ্টিমেয় অভিজাতবংশীয়েরাই জমি ও ধনসম্পত্তির মালিক হইয়াছিল। ইহার নীচে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীতে থাকিত কৃষক, ভাল অবস্থার মিস্ত্রি, যথা :—সূত্রধর, তামার মিস্ত্রি, চর্ম্মকার, স্বর্ণকার, এবং সর্ব্বপ্রকারের ব্যবসায়ীর দল। ইহাদের মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তা ও চারণেরাও ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীচে, অল্প আয়ের বা আয়শূন্য বৃহৎ নাগরিক শ্রেণী ছিল। ইহারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, গায়ে-খাটা মজুর এবং নানাপ্রকারের ছোট কারবারী।

---

* Ed. Meyer—"Forschungen zur aften Geschichte",—I—p. 172.

† Herodotus—V, 92.

‡ Finsler Ilberg Jahrb. IX pp. 313, 316

§ G. Jellinek—Allgem. Staatslehre p. 655.

কিন্তু এই কারিগর শ্রেণী একটা সংঘ (corporation) সংগঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই, যদিও ধর্ম্মের নাম দিয়া অনেক সংঘ অতি প্রাচীনকাল হইতে সংস্থাপিত হইয়াছিল। কারিগরদের guild বা ব্যবসায়-সঙ্ঘ পরে সংগঠিত হয়।* অবশ্য, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় এইসব সংঘের সঙ্গে দেব দেবীর নাম সংযুক্ত হইত।

এই প্রকারে গ্রীসীয় সমাজে ক্রমশঃ শ্রেণীবিভাগ বিবর্ত্তিত হয়। যখন অভিজাত শ্রেণী রাজার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া তাহাকে বিতাড়িত করে এবং রাষ্ট্রের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, সেই সময়ে আইওনীয়ার সমুদ্রকূলবর্ত্তী সহরসমূহে বাজারের জীবন ক্রমবিকশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই বাজারের আবহাওয়াতে গ্রীক Demos (জনশক্তি) নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাত হইতে শেখে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এ হেন রাষ্ট্রে কাহারা নাগরিকের অধিকার পাইত ? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ভূস্বামীগণ নিজেদের অভিজাত শ্রেণীতে বিবর্ত্তিত করিয়াছিল। হোমরের যুগের পর ইহারাই রাষ্ট্র দখল করে। ইহাদের নিম্নে যে সকল শ্রেণী ছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা আয়হীন ছিল তাহারা নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। আটিকাতে সোলন (ড্রাকনীয় আইনের স্রষ্টিকর্ত্তা) কৃষিকর্ম্ম হইতে যাহার "আয়" হইত তাহাকেই নাগরিকের অধিকার দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য যে কোন প্রকারের রাজ-ক্ষমতার উৎস ছিল জমির মালিকানা। রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করিতে হইলে, প্রত্যেককে তাহার জমির বাৎসরিক আয় প্রদর্শন করিতে হইত। যে-ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর সম্পত্তিশালী দলের লোক বলিয়া নিজেকে গণ্য করিতে চাহিত তাহাকে হয় ৫০০ শেফেল্ (Scheffel) শস্য (Gerste), না হয় সেই পরিমাণের মদ বা তেল হইতে গড়পড়তা আয় দেখাইতে হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে হইলে ৩৬০০ শেফেলের উপযোগী জমির মালিকানা এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ১৮০০ শেফল্ বা তদ্‌বিনিময়ে ড্রাকমা মুদ্রার আয়ের জমি প্রদর্শন করিতে হইত। ইহার মধ্যে বড় বড় জমিদারীগুলি অভিজাতবংশীয়দের হাতে ছিল।

এই নাগরিক সমাজের নিম্নে একটা লোক-সমষ্টি বাস করিত যাহারা স্বাধীন

* E. Ziebarth—"Das Gr. Vereinswesen"; Francotte—"L'industrie dans la Grece ancienne". II

ছিল না। ইহারা কারবার এবং কারখানাতে কর্ম্ম করিত। করিন্থ ও এজিনাতে এই দল অতি বৃহৎ ছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইত, তাহারা রাজনৈতিক অধিকারহীন 'বাসিন্দা' বলিয়া গণ্য হইত। ইহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও পাইত না, কারণ ইহাদের পূর্ব্বের মনিবের সহিত খানিকটা সম্পর্ক রাখিতে হইত। এই নিয়ম বাহির হইতে আগত বাসিন্দাদের প্রতিও প্রযোজ্য হইত। তাহাকে নাগরিক পদ পাইতে হইলে, একটা বিশিষ্ট আইন পাশ করিয়া তাহা সম্পাদন করিতে হইত। এই বিষয়ে পরবর্ত্তীকালের রোমের ব্যবস্থার সহিত গ্রীসের পার্থক্য ছিল; কারণ রোমের ন্যায় গ্রীসের দাসত্ব-বিমুক্তের দল সেই দেশের সমাজে কখন একটা বিশিষ্ট লীলা করিতে পারে নাই।

এই অধিকারবিহীন দাস শ্রেণী বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন প্রকারে গ্রীসে বিদ্যমান ছিল। অনেক দাস যুদ্ধে পরাজিত শত্রু বা লুটতরাজের সময় কয়েদ করিয়া আনা লোক। আবার স্পার্টাতে হেলটেরা ছিল ল্যাকোনিয়ার আদিম অধিবাসী, তাহারা ডোরীয়দের দ্বারা পরাজিত হইয়া দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছিল। হেলটেরা খৃঃ পূঃ ৫০০ সালে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত একটি বৃহৎ অর্দ্ধ গোলামের দল (Serfs) ছিল। ইহারা স্পার্টার রাষ্ট্রগত সম্পত্তি এবং স্পার্টানদের পেরিকয়—ইহারা ল্যাসিডেমনীয় হইলেও স্পার্টানদের সমান দরের লোক ছিল না, যদিচ "সাহসী" বলিয়া স্বীকৃত হইত—কর্ম্ম করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৩২-৪০৮, যখন স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হয়, তখন সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য হেলটেরা মুক্তি ও স্পার্টানদের সঙ্গে সমান অধিকার পায় এবং অনেকে বিদেশে "রেগুলেটর" হইয়া প্রচুর ধনোপার্জ্জন করে, আর বাকী সকলে পুনরায় দারিদ্র্যে পতিত হইয়া তাহাদের নাগরিক অধিকার হারায়।

গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রেও পেরিকয় বা হেলটের মতন অধিকারশূন্য দাস শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বত্রই এক অবস্থা ছিল; শাসকশ্রেণী সম্পত্তিশালী দলদ্বারা সংগঠিত হইত এবং অন্যান্য বাসিন্দার অনুপাতে তাহারা সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয় ছিল।

সমাজ-শরীরে অর্থনৈতিক তারতম্যের জন্য যখন শ্রেণীবিভাগ সমুৎপাদিত হইল, তখন রাষ্ট্রের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার প্রতিঘাত হইয়াছিল। গ্রীসের ইতিহাস

পাঠে আমরা এই তথ্য স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই যে তথাকার রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন রাজনীতিক দল গঠন করিয়া রাজনীতির অনুশীলন করিত। এই বিষয়ে গ্রীস তখনকার এসিয়া হইতে অগ্রগামী ছিল (এই বিষয়ে গ্রীসের উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ইউরোপও বর্ত্তমান এসিয়া অপেক্ষা অগ্রগামী)। এসিয়াতে ধর্ম্মের প্রভাব দিয়া দল গঠিত হইত ; আর গ্রীসে দলসমূহ রাজনীতিক ভিত্তির উপর গঠিত হইয়া পার্টিতে পার্টিতে রাজনৈতিক কলহ বাধাইত।

এই সময়কার হেলেনিক সমাজে কি কি শক্তির খেলা চলিতেছিল তাহা জানিলে আমরা রাজনীতিতে তাহার প্রতিক্রিয়া সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অভিজাতেরা নিজেদের মধ্যে বিবাহ করিত। একজনকে অভিজাতবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে স্বশ্রেণীতে বিবাহের প্রয়োজন হইত। প্রাচীনকাল হইতেই এই নিয়ম প্রায় অকাট্য ছিল। * ইহা ব্যতীত অভিজাতেরা সমবয়স্ক লোকদের লইয়া সংঘবদ্ধ হইত এবং একসঙ্গে আহারাদি করিত। আবার, ইহা দেখা গিয়াছে যে এই অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র শক্তি সংগঠিত হইত যদ্দ্বারা একটি বা গুটিকতক কুলের হস্তে নেতৃত্ব থাকিত। †

এই শ্রেণীর নীচে যে-সব নাগরিক শ্রেণী ছিল, তাদের মধ্যেও ধাপে ধাপে বিভাগ ছিল। এক্ষণে নাগরিক বলিলে কাহাদের বুঝাইত তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। গ্রীসের দার্শনিক পণ্ডিত আরিষ্টটল "নাগরিক" অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে যাহাদের রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার অধিকার আছে, তাহারাই "নাগরিক"। এই অর্থের নাগরিক গ্রীক রাষ্ট্রসমূহে অতি মুষ্টিমেয় ছিল। কিন্তু শাসকশ্রেণীর বাহিরে অনেক প্রজাকে সাধারণতঃ "নাগরিক" আখ্যায় অভিহিত করা হইত। ইহার মধ্যে যাহারা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রণা সমিতি, অফিস, জনসাধারণের সম্মেলন এবং আদালতে যোগদান করিতে পারিত তাহাদেরই বিশেষ ভাবে 'নাগরিক বলিয়া সম্বোধন করা হইত। ইহারা ব্যক্তিগত আইন বা ধর্ম্মসংক্রান্ত অধিকারে অনাগরিকদের হইতে পৃথক ছিল। যথা—প্রত্যেকের জমি থাকা দরকার এই নিয়ম অনাগরিকের সম্বন্ধে খাটিত না ; একটা স্বাধীন

---

* Herodotus V, 92.

† K. F. Hermann—Pt. I, Ch. III, pp. 40-42,

আদালত বা দেশী আদালতে অন্য লোকের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে মকদ্দামা করার অধিকার অনাগরিকের ছিল না; তারপর কতকগুলি ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠান যাহা খানিকটা সাধারণ এবং খানিকটা সমবায় সংঘ (co-operative society) সম্পর্কিত ব্যাপার ছিল তাহাতে নাগরিকদের যোগদানের অধিকার ছিল; অবশেষে Epigamic, অর্থাৎ সেই বিবাহ পদ্ধতি যদ্দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তি ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি নির্দ্ধারিত হইত তাহা অনাগরিকদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। *

এক্ষণে বিচার্য্য—এই অনাগরিকেরা কাহারা? প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যাহারা দাসবৃত্তি করিত তাহারাই অধিকার-বঞ্চিত দাস ছিল। আটিকাতে প্রাচীন কালে থেটিস (Thetes) নামে একটি স্বাধীন অথচ অনাগরিকের দল ছিল। ইহারা খাওয়া ও পরার বিনিময়ে পরের বাড়ী জন-মজুরের কর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিত। কিন্তু ইহারা ক্ষমতাবিহীন এবং সর্ব্বহারা বলিয়া বিশেষ দুঃখ পাইত। তৎপরে আসে ক্রীতদাস বা যুদ্ধে কয়েদ করা দাস শ্রেণী। ইহারা হয় ধনীর বাড়ী কর্ম্ম করিত না হয় ফ্যাক্টারী ও খনিতে কর্ম্ম করিতে নিয়োজিত হইত। তারপর আর একদল আসে যাহারা বিদেশ হইতে জীবিকান্বেষণে এথেন্সে আসিয়াছিল। এই সব শ্রেণীর লোকের আটিকার স্বাধীন সমাজে স্থান ছিল না, এবং ইহারা নাগরিকদের অধিকার পাইত না।

আবার, লাকোনিয়াতে অধিবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হইত; স্পার্টান, পেরিওকি এবং হেলট। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্তেরা নাগরিকের পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইত। ইহারা স্পার্টাতে থাকিত, লাইকারগাস-প্রদত্ত সমস্ত শৃঙ্খলবিধি (Discipline) মানিয়া চলিত, সিস্সিটা (Syssita) বা সাধারণ ভোজনাগারে নিজেদের দেয় প্রদান করিত, আর ইহারাই রাষ্ট্র-প্রদত্ত সম্মান বা পদ পাইবার অধিকারী ছিল। ইহাদের কৃষিকর্ম্ম করিবার সময় বা রুচি ছিল না; সেই কর্ম্ম হেলট নামক দাসশ্রেণীর দ্বারা সম্পাদিত হইত। হেলটেরা চাষের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যাহা স্থল-বিশেষে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইত তাহা জমির মালিক স্পার্টানদের প্রদান করিত। ইহা ব্যতীত স্পার্টানদের বাড়ীতে দাসের

* G. F. Schoemann—Griechische Altertuemer, p. 105.

কর্ম্ম এই হেলটেরা সম্পন্ন করিত। তাহারা অর্দ্ধ গোলাম হইয়া, জমিতে সংলগ্ন থাকিয়া স্পার্টান এবং বোধ হয় পেরিওকিদের জন্যও কৃষিকর্ম্ম করিত।

পেরিওকিরা স্বাধীন মানব ছিল কিন্তু স্পার্টার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। তাহারা লাকোনিয়ার অন্য একশত সহরের একটির নাগরিক ছিল। তাহারা কেবল স্পার্টার হুকুম মানিত; নিজেরা কোন রাজনীতির চর্চ্চা করিতে পারিত না এবং স্পার্টার গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে যোগ দিতে পারিত না। ইহারা স্পার্টানদের সহিত সমান অধিকারে বঞ্চিত ছিল বটে, কিন্তু হেলটদের উপরের স্তরে স্থান পাইত; স্পার্টানদের নিম্নস্তরের লোক বলিয়া তাহাদের সহিত বিবাহ করিতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন পেরিওকিরা মূলত অন্য জাতির বিজিত লোক ছিল এবং সম্ভবত জাতিতে আখেয়। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।*

করিন্থেও লোকের বাৎসরিক আয় অনুসারে নাগরিকদের নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। এইরূপে সর্ব্বত্র আয়ের উপরে নাগরিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পদ নির্ভর করিত।

পূর্ব্বে সংঘস্থাপনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীস সভ্যতার পথে যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই নানা প্রকারের সংঘ স্থাপিত হইতে লাগিল। এইগুলি সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত হইত। বিদেশে ব্যবসায় উপলক্ষে যাইবার জন্য কোম্পানী, অন্যান্য ব্যবসায়, কতকগুলি আত্মীয় গোষ্ঠীর এক সঙ্গে সম্পত্তি রক্ষা এবং এক গোরস্থান ব্যবহার, এমন কি একসঙ্গে খাইবার জন্য সমবায় পদ্ধতি দ্বারা সংঘ গঠিত হইত। রাষ্ট্র এইগুলির আইন কানুন বাঁধিয়া দিত।

বাকী রহিল আর একটি শ্রেণীর কথা: ইহা হইতেছে পুরোহিত শ্রেণী। ইহারা একটা বিশিষ্ট শ্রেণী বিবর্ত্তিত করে নাই, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন দল ছিল। পুরোহিত হইবার জন্য কোন বিশিষ্ট শিক্ষা বা দীক্ষার প্রয়োজন হইত না। বিশিষ্ট বংশের লোক যাহারা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত স্বাধীন নাগরিকের অধিকার এবং শারীরিক স্বাস্থ্য প্রদর্শন করিতে পারিত, তাহারাই পুরোহিত হইতে পারিত। কখন কখন জনসাধারণের সাহায্যে বা মন্দিরের ভবিষ্যৎ বাণীর (Oracle) দ্বারা কেহ কেহ পুরোহিত পদে নির্ব্বাচিত হইত। গ্রীসের স্বাধীনতার যুগ অবসান

* G. Grote—"A History of Greece", vol. II, p. 289.

হইলে, অর্থাৎ ম্যাসিডোনীয়দের রাজত্ব সময়ে (হেলেনিস্টিক অর্থাৎ হেলেনিক সভ্যতাপ্রাপ্ত যুগে), এসিয়া মাইনরের উপকূলের সহরগুলিতে এবং গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জে রাষ্ট্র দ্বারা পুরোহিতের পদ প্রায় বিক্রয় করা হইত। এই পুরোহিত সম্প্রদায় রাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রত্যেক মন্দিরের পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের আয় ইহাদের লাভ হইত ; এই আয় আদায় করিবার জন্য চাষের ও পশু চারণের জমি, মাছের পুকুর, বন প্রভৃতি তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করা হইত। এই প্রকারে, পুরোহিতেরা কখনও শ্রেণীসংগঠন না করিয়াও লোকের নিকট হইতে সম্মান পাইত এবং রাষ্ট্রে ক্ষমতাশালী ছিল। ইহাতে প্রতীত হয় যে, গ্রীসে, রাষ্ট্র হইতে বিমুক্ত কোন ধর্ম্মমণ্ডলী বা স্বাধীন পুরোহিত দলের স্তর (Hierarchy) বা গণ্ডী-আবদ্ধ পুরোহিত সম্প্রদায় ছিল না।

হোমরের ইলিয়াড ও ওডেসী বর্ণিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং তাহার রাষ্ট্র উপরোক্ত প্রকারের শ্রেণী-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার পর রাষ্ট্রে oligarchy রূপ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন শাসন প্রণালী কি, প্লেটো এক কথায় তাহা বুঝাইয়াছেন—"ধনীদের শাসন"। * ইহাতে নাগরিকত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে এই পার্থক্য হইল যে যাহার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সম্পত্তি আছে, সেই নাগরিক হইবার অধিকার পাইল। ইহার ফলে সকল নাগরিকদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার সুবিধা হয়। † আবার অন্যদিকে, অভিজাতের পরিবর্ত্তে "ধনী" নামে শ্রেণীজ্ঞান-সম্পন্ন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক কারণে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। তদ্রূপ নূতন অর্থনৈতিক কারণে এই নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইল। শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, নূতন উপনিবেশসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বাহির হইতে স্বর্ণ মুদ্রা আসিয়া প্রবেশ করায় এবং এতদ্দ্বারা প্রাকৃতিক অর্থনীতি হইতে (Natural Economy) হইতে মূলধনীয় অর্থনীতির (Capitalist Economy) উপর জাতীয় অর্থনীতি স্থাপিত হওয়ায়, এই সঙ্গে ব্যবসায়ী ও হাতের কার্য্যের পেশার লোকসকল বৃদ্ধি পাওয়ায় (ইহারা খৃঃ পূঃ ৮-৭ শতাব্দী হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল), পুরাতন

* Plato—Politics—300 E, 301 A.

† Theognis—verse 183 ; Thucidides, VIII, 21.

অভিজাতবংশীয় জমিদারকুল আর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব্বেকার মত নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই।

পরে যখন রাষ্ট্রে ডিমোক্রাসি রিবর্ত্তিত হয়, তখন সমাজে সমানাধিকার একজন পুরুষ নাগরিকের সহিত আর একজন স্ত্রীলোক নাগরিকের বৈধ বিবাহের সন্তানকে প্রদত্ত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জন্ম অথবা রাষ্ট্র দ্বারা প্রদত্ত হইলে, নাগরিকের অধিকার পাওয়া যাইত। উন্নত ডেমোক্রাটিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রেরই দুইজন স্ত্রী পুরুষের বৈধবিবাহের সন্তানকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইত। কিন্তু হোমারের সময়ে রিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রিন্স এবং বিশিষ্ট বংশের লোকদের বহির্বিবাহ চলিত। আর, যে-সব জারজ পুত্র হইত, তাহারা তাহাদের পিতার বৈধ পুত্রাপেক্ষা কম পৈতৃক সম্পত্তি পাইত। অন্যদিকে, অভিজাতেরা, সমান দরের বংশ এবং প্রচুর যৌতুকের সহিত বিবাহ করিত। কিন্তু খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে পূর্ব্বোক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব হওয়ায়, অভিজাত ও ধনী নাগরিকদের মধ্যে বিবাহ হইয়া রক্ত মিশ্রিত হইতে লাগিল। ধনী নাগরিকেরা (বুর্জোয়া) ব্যক্তিগত এবং রাজনীতিক সমান অধিকার পাইল। সেই সঙ্গে অভিজাতদের সহিত অন্য রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ধনীদের কন্যাসকলের বিবাহ হইতে লাগিল, আর তাহাদের পুত্রগণ পূর্ণ নাগরিকের অধিকার পাইতে লাগিল। এই অনুষ্ঠানটি ডেমোক্রাসি (সাধারণ তন্ত্র) সর্ব্বপ্রথম প্রচলন করে। কিন্তু অন্যদিকে আর একটি বিপদ উপস্থিত হয়। এই বুর্জোয়া-ডেমোক্রাসির যুগে বিদেশের সহিত শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হওয়ায়, বিদেশীদের সহিত বিবাহসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ডিমোক্রাসি এই বর্ণ-সঙ্কর বিবাহের বিরুদ্ধে কড়া নিয়ম করে।

অবশ্য আটিকা এবং স্পার্টা ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রে ব্যবসা বাণিজ্যের যুগ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় যখন বুর্জোয়া-ডেমোক্রাসি চলিয়া গেল, স্পার্টা তখন পর্য্যন্ত অভিজাত-শাসিত রাষ্ট্র ছিল। এই অভিজাত শ্রেণী নিজেদের মধ্যে কতকটা সাম্যবাদ পদ্ধতি (কম্যুনিজম) পালন করিত। কিন্তু নিজ শ্রেণীর বাহিরে তাহারা কঠোর বৈষম্য রাখিত। আর, গ্রীসের সর্ব্বত্রই প্রত্যেক নাগরিকশ্রেণী নিম্নের নাগরিক শ্রেণীর সহিত ভীষণ বৈষম্যের রেখা টানিত। ইহার ফলে,

প্লেটো বলিয়াছেন, প্রত্যেক গ্রীক সহরে শ্রেণী-সংগ্রাম ঘোরতরভাবে চলিতেছিল। সম্পত্তিশালী ও সম্পত্তিহীনদের কলহে গ্রীক্ রাষ্ট্রসমূহ জর্জ্জরিত হইয়াছিল। এই অবস্থার দূরীকরণের জন্য পেরিক্লিস তাঁহার নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু প্লেটো তাহা পর্য্যাপ্ত নয় বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং শেষে নিজের আদর্শ এক পুস্তকে লিখিয়া প্রচার করেন। তাঁহার এই পুস্তক, "রিপাবলিক্" আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারের সাম্যবাদীদের মতের উৎস বলিয়া গণ্য হইতেছে।*

কিন্তু সমাজের বৈষম্যে পতিত, নির্য্যাতিত ও শোষিতেরা চিরকাল পদদলিত হইয়া থাকে না; সুবিধা পাইলেই তাহারাও উত্থান করে। গ্রীসের সাহিত্য ও ইতিহাস এই পতিতদের উত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। কবি হেসিয়ড্ যেমন তাঁহার "এরগা" নামক কাব্যে গরীব কৃষকদের দুঃখের বর্ণনা করিয়াছেন, ইউরিপিডিস্ তেমন গোলাম ও স্ত্রীলোকদের পক্ষে কলম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি এই ভাবটি লোকের সম্মুখে ক্রমাগত প্রচার করিতেছিলেন যে, কতকগুলি লোক খাটে এবং পরের দাস হইয়া থাকে যদিচ তাহারা সর্ব্বদা মনিবদের চেয়ে নিম্নদরের লোক নয়। তারপর, আরিষ্টফানেস Eclisiazūsal অর্থাৎ "পার্লামেণ্টে স্ত্রীলোক" নামক নাটকে চরমপন্থীয় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রথম পড়িলে বোধ হয় যেন ইহা প্লেটো "রিপাবলিক" নামক পুস্তকে পরিবার-গোষ্ঠীকে (family) ধ্বংশ করিবার জন্য যে প্রোগ্রাম দিয়াছিলেন তাহারই রূপান্তর মাত্র!

সমাজের এই সব বৈষম্য কেবল মধ্যে মধ্যে সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাহা ভীষণ ভাবে প্রকট হইয়াছিল। গ্রীসের ইতিহাসে তাহাকে "শ্রেণী-সংগ্রাম" (class war) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

এই শ্রেণী-সংগ্রাম বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে সংঘটিত হইয়াছিল। আবার, এই শ্রেণী-সংগ্রামের ধাক্কায়ই প্রাচীন হেলেনিক

---

* প্লেটো তাঁহার মতের জন্য ভারতবর্ষের নিকট কতটা ঋণী তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, যথা—Mahaffy, Burgess, Willoughby স্বীকার করিয়াছেন।

জাতি পরবর্ত্তী রোমানদের দ্বারা চিরতরে বিধ্বস্ত হয়। এই সব শ্রেণী-সংগ্রামের যৎকিঞ্চিৎ ইতিহাস এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

এই শ্রেণী-সংগ্রামের প্রথম পর্য্যায়* খৃঃ পূঃ ৪২৭-৪২৫ সালে কর্সিরা (Corcyra) সহরে আরম্ভ হয়। খৃঃ পূঃ ৪৩৬-২ সালের মধ্যে এপিডামনুস্ (বর্ত্তমানের ডুরাজ্জো সহর) নৌযুদ্ধের কয়েদীরা কর্সিরাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া করিন্থের তরফে সেই নগরে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করে। এই জন্যই করিন্থীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহারা এই নগরকে এথেন্সের বন্ধুত্ব হইতে ভাঙাইয়া করিন্থের সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু এথেন্স এবং করিন্থ হইতে রাজনৈতিক মিশন আসিলে, কর্সিরার নাগরিকেরা স্থির করে যে তাহারা এথেন্সের সহিত বন্ধুত্ব অটুট রাখিবে। ইহাতে বিফল হইয়া ষড়যন্ত্রকারীরা পিথিয়াস্, যিনি এথেন্সের প্রতিনিধি এবং কর্সিরার প্রলেটারিয়েটদের নেতা ছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিল যে, তিনি কর্সিরাকে এথেন্সের অধীন করিতে চান। পিথিয়াস্ কিন্তু এই অভিযোগ হইতে বিমুক্ত হন এবং তিনিও ঐ দলের পাঁচজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী সভ্যের বিপক্ষে নালিশ আনিলেন যে তাহারা, জিউস্ এবং আলসিনিউস নামক দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত কাননের গাছ কাটিয়াছে। আসামীরা তাহাদের মকদ্দমায় হারিয়া যায় এবং শাস্তির ভয়ে মন্দিরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু পিথিয়াস তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য সহর-শাসকদের অনুরোধ করে। মন্দিরে থাকিয়া উক্ত পলাতকেরা ইহা শ্রবণ করে, এবং আরও শ্রবণ করে যে পিথিয়াস্ গণসমূহকে এথেন্সের সহিত একটা সন্ধি করিবার জন্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া কাউন্সিল গৃহে গিয়া পিথিয়াস ও ষাট জন অন্য লোকদেরও হত্যা করে। তারপর, তাহারা নাগরিকদের আহ্বান করিয়া বলে যাহা তাহারা করিয়াছে তাহা মঙ্গলেরই জন্য। অবশেষে তাহারা নিজেদের কর্ম্মের সাফাই গাহিবার জন্য এথেন্সে একটা মিশন পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু এথেনীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের বৈপ্লবিক বলিয়া কয়েদ করে।

ইতিমধ্যে, একটি করিন্থীয় রণতরীতে ল্যাসিডেমনীয় রাজনৈতিক মিশন

---

* Thucydides—bk. III, ch. 70—85; bk. IV, ch. 46—48.

কর্সিরাতে উপস্থিত হইলে, সেই সহরের যে-দলের হস্তে ক্ষমতা ছিল, তাহারা প্রলেটারিয়েটকে আক্রমণ করিয়া প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে পরাজিত করে। রাত্রি হইলে প্রলেটারিয়েট শ্রমিকদল কেল্লা ও সহরের উচ্চ স্থানসমূহে আশ্রয় লয়, এবং প্রতিপক্ষ বাজারে স্থান গ্রহণ করে। পরের দিন দুই দলেই আশপাশের স্থানের ক্রীতদাসদের কাছে লোক পাঠাইয়া তাহাদের স্বাধীনতা অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় দলে টানিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেশীর ভাগ গোলামেরা শ্রমিকদলে যোগদান করে। পরের দিনের যুদ্ধে শ্রমিকদল জয়লাভ করে, এই যুদ্ধে তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও সাহায্য করে। যুদ্ধের ভাগ্য পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন হইবার পর, এথেনীয় সাহায্য আসিলে, প্রতিপক্ষ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে এথেনীয় যুদ্ধ জাহাজ কর্সিরাতে পৌঁছিলে, প্রলেটারিয়েট দল সমস্ত বিপক্ষদের ছলে, বলে, কৌশলে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। শত্রুদের উপর এই দোষারোপ করা হয় যে, তাহারা প্রলেটারিয়েটকে ধ্বংস করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল, কিন্তু ইতিহাসকার বলেন,* এমন সব লোককে হত্যা করা হয় যাহাদের সহিত আক্রমণকারীদের ব্যক্তিগত বিবাদ ছিল, এবং অনেকে তাহাদের খাতকের হস্তে মৃত্যুলাভ করে। মৃত্যু চারিদিকে ভীষণভাবে বিরাজ করে। সকলে এই ভীষণতা দেখিয়া স্তম্ভিত হয়।

কর্সিবাতে শ্রেণী-সংগ্রাম এই প্রকারের বর্ব্বরতার সহিত ক্রমবিকশিত হয়, এবং এই প্রকারের সংগ্রাম গ্রীসে সর্ব্বপ্রথম সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। শেষে শ্রমিকদের এই উত্থান সমস্ত হেলেনিক জগতে বিস্তারিত হয়। প্রত্যেক দেশেই শ্রমিকদের নেতাদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্রের লোকদের মধ্যে এথেনীয় ও লাসিডিমনীয় সাহাযের জন্য বিবাদ চলে। এই প্রকারে সমস্ত হেলেনিক দেশসমূহ শ্রেণী-সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল; আর, প্রত্যেক নূতন বিপ্লবে যে হৈ চৈ পড়িত তাহার জোর পুঞ্জীকৃত হইয়া পরের স্থানের বিপ্লবে পড়িত। এই যুদ্ধে, ষড়যন্ত্র করিবার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিশোধের কেরামতি লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া যায়। একটা উন্মত্ত ধর্ম্মান্ধতা জনসাধারণকে পাইয়া বসিয়াছিল, এবং আত্মরক্ষার্থ বেপরোয়া ষড়যন্ত্র ন্যায়সঙ্গত

* Thucydides—Ibid.

উপায় বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। ইতিহাসকার * বলেন, ইহার মূলে ছিল ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার প্রবল ইচ্ছা, যাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিত।

এই সংগ্রাম যখন হেলাস (Hellas) ব্যাপী হইয়া পড়ে, তখন দলপতিরা বড় বড় লোকভোলানো কথার দ্বারা জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ নিজেকে গণসমূহের রাজনৈতিক সাম্যের দাবীর প্রতিনিধি বলিয়া গণসমূহকে বুঝাইল, কেহ বা নিজেকে নরমপন্থী সংরক্ষণশীল বলিয়া জাহির করিল। ইহারা সকলেই মুখে সাধারণের সেবার কথা বলিয়া নিজের কোলে ঝোল মাখিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্রত্যেক স্থানের নরমপন্থীরা দুই দলের গরমপন্থীদের দ্বারা নির্য্যাতিত হইতে লাগিল কারণ তাহারা কোন দলেই যোগদান করে নাই, এবং যুদ্ধাবসানে তাহারাই বাঁচিয়া থাকিবে এই আশঙ্কায় রাগ তাহাদের উপর বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই প্রকারে শ্রেণী-সংগ্রাম হেলেনিক সমাজকে সর্ব্বপ্রকারের নৈতিক অবগতিতে নিমজ্জিত করিয়াছিল। এই সংগ্রামের ভাগ্য গ্রীস ইতিহাসের অন্তর্গত। তাহার বর্ণনা এই স্থলে না করিয়া এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অবশেষে কর্সিরাতে প্রলেটারিয়েটের বিপক্ষদল নির্মূল হইয়াছিল।

হেলেনিক জগতব্যাপী এই সংগ্রামের পরে, আভিজাত-অধ্যুসিত রাষ্ট্র স্পার্টাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গরীব ও শ্রমজীবীদের উত্থিত করিবার চেষ্টা করা হয়। খৃঃ পূঃ ৪০৪ সালে যখন স্পার্টা এথেনীয় সাম্রাজ্যকে হারাইয়া নানা মূল্যবান ধাতু নিজের করগত করিতেছিল সেই সময় হইতে ল্যাসিডেমন সামাজিক ব্যাধি ও অসৎ-চরিত্রতা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ধন অতি শীঘ্র জনকতকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় দেশটা সাধারণ ভাবে গরীব হইয়া পড়ে, এবং ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ লোকের মন হইতে উদার ভাব নষ্ট হইয়া যায়, এবং উদার পেশাসমূহ বন্ধ হইয়া যায়। এই সঙ্গে ধনীদের বিপক্ষে তদনুযায়ী ঈর্ষা ও শত্রুতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এথেন্সের সহিত যুদ্ধের পর, সাতশত স্পার্টান মাত্র জীবিত ছিল এবং ইহাদের মধ্যে বোধ হয় একশত জন একভাগ জমির

* Thucicides—I bid.

মালিক ছিল ; বাকী সকলে কপর্দ্দকশূন্য ও অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া সহরে অলস হইয়া বসিয়াছিল। তাহাদের আর কোন তেজ বা উদ্যম ছিল না যদ্দ্বারা তাহারা শত্রুর বিপক্ষে দেশকে রক্ষা করিতে পারে ; কিন্তু কি সুবিধা পাইলে একটা ভীষণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত করা যায় তাহার জন্য তাহারা সর্ব্বদা সজাগ হইয়া থাকিত।

এই দৃশ্য দেখিয়া যুবক রাজা চতুর্থ আগিস* অসাম্য দূরীকৃত করিবার সঙ্কল্পে এবং নাগরিকদের সাহায্যকল্পে অনুপ্রাণিত হন, এবং এই বিষয়ে লোক-দের মন বুঝিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পে তরুণেরা আস্থা স্থাপন করে, কিন্তু বৃদ্ধেরা নিন্দাবাদ করে। আগিস তাহার মাতা, যিনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন, তাঁহাকে নিজের মতে লইয়া যায়। সে তাঁহাকে বলে, "যদি সে তাহার সমসাময়িক রাজাদের ভোগবিলাসকে তাহার আত্ম-সংযম ও সাদাসিধা আচার এবং উদারতা দ্বারা হারাইয়া দিতে পারে এবং এতদ্দ্বারা তাহার স্বদেশবাসীদের মধ্যে সাম্য ও কমুনিজম প্রচলিত করিতে পারে, তাহা হইলে সে একজন মহান রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে।" শেষে স্ত্রীলোকেরা এই যুবকের উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় আস্থা স্থাপন করে এবং তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করে। এই সময় ল্যাকোনিয়ার (ল্যাসিডেমন রাজ্য যাহার রাজধানী ছিল স্পার্টা) বেশীর ভাগ জাতীয় সম্পত্তিও স্ত্রীলোকদের হস্তে ছিল। এইজন্য প্রতিপক্ষ দল রাজা দ্বিতীয় লিওনিডাসকে (স্পার্টায় দুইজন করিয়া রাজা অভিজাত শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইত) ধরে যেন সে আগিসকে এই কর্ম্মে নিষেধ করে। লিওনিডাস ধনীদের সাহায্য করিতে বিশেষ ব্যগ্র ছিল, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী, যাহারা এই বিপ্লবসাধনে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াছিল, তাহাদের ভয় তাহাকে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেয় নাই। গুপ্তভাবে সে আগিসের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করিবার উদ্যম করিতেছিল।

যাহা হউক, অবশেষে আগিস জাতীয় কাউন্সিলে একটা বিল উপস্থাপিত করে যাহাতে অধমর্ণদের ঋণ মাপ ও নূতন করিয়া জমি ভাগের ব্যবস্থা ছিল। এই বিল উপস্থাপিত করিবার সময় আগিস একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতাতে বলে যে সে নিজের,

* Plutarch—'Parallel Lives', vol. IV, chs, 5-9 and 18-20 ;

তাহার মাতা ও পিতামহীর, তাহার বন্ধু ও সহযোগী যাহারা স্পার্টাতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ছিল তাহাদের, বিষয়কে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতেছে। প্রলেটারিয়েট শ্রেণী এই যুবকের মহান উদারতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং তিন শত বৎসর বাদে স্পার্টার উপযুক্ত রাজা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে। কিন্তু লিওনিডাস বিপক্ষদলের সহিত সম্মিলিত হয় এবং অবশেষে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাগণ এই বিপ্লবকে নষ্ট করে আর এই সঙ্গে আগিস, তাহার মাতা ও পিতামহীকে হত্যা করে। পতিতদের সব আশাভরসা নির্মূল হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

শেষরক্ষা

বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্তে দিগন্তে চৈত্রের সূর্য্য আরক্ত হ'য়ে এল, এইবার পৃথিবীতে রাত্রির অভিযান। সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রে যে সমস্ত কৃষক মাঠের এখানে সেখানে কাজ করছিল, কাঁধে লাঙ্গল তুলে গরু নিয়ে ঘরের পথে পা বাড়াল তারা। আজকের মত কাজ শেষ।

ওদেরই মধ্যে একটি লোক, বয়সে যে তরুণ, নিকষকাল পেশীবহুল দেহের ঘর্ম্মধারায় সান্ধ্য সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মিতে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠেছে যার অস্তিত্ব, নৈরাশ্য এবং শ্রান্তির পরিবর্ত্তে কী এক অনির্দ্দেশ্য আশায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে তার মুখ।

আলের পাশ দিয়ে চলতে চলতে সদ্যকর্ষিত জমিখানির দিকে বারবার চেয়ে দেখতে লাগল সে। মাটীর স্নিগ্ধ গন্ধে দুই চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল তার। এইবার বীজ ছড়াতে পারলেই কিছুদিনের মত কাজ শেষ হয়, গরু দুটোও একটু জিরিয়ে বাঁচে। সামনের কঙ্কালসার পশু দুটোর দিকে চেয়ে সহানুভূতির সাথে একটি নিশ্বাস ছাড়ল সে।

'ও নিতাই, যাত্রা শুন্‌বার যাবা না? মুচি পাড়ার বারোয়ারী পূজায় যাত্রাগান হবি যে আজ?'—ওপাশের আল থেকে প্রশ্ন এল।

খবরটা নিতাই নিজেও জানে। কিন্তু কমলঠাকুরের কাছে কথা দিয়েছে সে, আজ নিশ্চয়ই বাড়ীতে থাকবে, কথার খেলাপ কী ক'রে সে করবে? তাছাড়া,—এই কথাটাই এতক্ষণ তাকে গোপনে উৎসাহিত করছিল,—কী একটা ভারী চমৎকার জিনিস দেখাবে নাকি তাকে আজ কমল ঠাকুর! ঈষৎ হাসির সাথে সে বলল, 'না হরি জ্যাঠা, বাড়ীতে কাম আছে।'

নিতাইয়ের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে কাঁধের গামছা দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিয়ে হরি বলল, 'কাম না হাতি। বিশ্বাস যে ইস্কুলে না গেলে কমল ঠাকুর বক্‌বি, সেই ভয়ে যাবা না। তা রাত্রির কর‍্যা কি আর নিত্যি ইস্কুল করা যায়? আমার ছাওয়ালডাক তো অসুখ করবি ভয়ে যাবারই দেই না। তোমাদের কমল ঠাকুর বিশ্বাস যে আমার উপর খুব চট্যা গিছে, না?'

নিতাই উত্তর দিল না। কমল ঠাকুর সম্বন্ধে কোন কথায় প্রকাশ্যভাবে যোগ দিতে কেমন যেন তার বাধ-বাধ ঠেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে আরেকটা ছেলে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল—সুধন,—সে বলল, 'চটবি ক্যা! উনি কারু উপর চটে না। বিনা পয়সায় নিত্যি এতগুলা ছাওয়াল-বুড়াক রাত ত্থাড় প'র পর্য্যন্ত নিজের ত্যাল পোড়ায়া পড়ায়, বই তো কিনা দেয়ই, কয়জনেক কাপড় পর্য্যন্ত দিছে। বুকের পাটার কাম জ্যাধা।'

'হুঁ. বুকের পাটারই কাম! বিশ্বাস যে কিছু স্বাত্থ আছে, তাই করে। কবে বা দেখিস করা ব্যস, তোরা সব বিনা মুজুরীতে আমার মামার জমিগুলা চাষ কর‍্যা দিস। বিশ্বাস যে ও স্বদেশীয়ালা লোক, ফেরার হয়া পলায়া আছে।'

এ রকম অভিযোগের প্রতিবাদ না ক'রে নিতাই পারে না, বলল—'কক্ষুনো স্বদেশীয়ালা না উনি জ্যাঠা। কইকাতায় ওনার মস্ত বাড়ী আছে, শহরে শরীর টেঁকে না জন্যে এখানে আস্যা আছে। পুরুৎমশায় ওনার আপন মামা হয়।'

'দেখিস, দেখিস। বিশ্বাস যে—।

কথায় কথায় তারা গ্রামের উপান্তে এসে পড়ল। সামনেই নিতাইয়ের বাড়ী। আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে পাশ কাটিয়ে সে বাড়ীর পথ ধরল।

লাঙ্গলখানাকে গোয়ালের একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে গরুদুটোকে খেতে দিল নিতাই। তারপর ক্লান্তভাবে একটা হাই তুলে বাড়ীর ভেতরে চলে এল। শোবার ঘরের বারান্দায় বেড়া দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘিরে দেওয়া হ'য়েছে, নিতাইয়ের বৃদ্ধ পিতা বলরাম বাস করে সেখানে,—হাঁপানী এবং বাতের প্রকোপে সেখান থেকে নড়বার উপায় নেই তার। নিতাইয়ের পদশব্দে বৃদ্ধ ক্ষীণ ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'শিমূল তলায় মাঠের জমিডায় চাষ দিলি বুঝি আজ?

বারান্দায় উঠে তামাক সাজতে সাজতে নিতাই বলল, 'হেঁ। রাধা বলিছিলাম কমল ঠাকুরের কাছ থাইকা হোমিওপ্যাথি ওষুধ আন্যা দিবার, দিছিল?'

বলরামের উত্তর দেবার আগেই উঠানের রান্না ঘরের দরজা থেকে রাধা বলল, 'সকালে বাড়ীত ছিল না উনি। খায়া নিয়া তুমি একবার যাও।'

এর কিছুক্ষণ পরে রাধা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ পরে খেয়ে নিয়ে নিতাই কমল ঠাকুরের কাছে ওষুধ আনতে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়—

'নিতাই, নিতাই আছিস!'

'হেঁ ঠাকুর, আইসো।' নিতাই ঘর থেকে বের হ'তে না হ'তেই দীর্ঘ দেহ যুবকটি চৌকাঠে হাত দিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম!' নিতাই বলল।

'কেন রে? আমি তো আসব কথাই ছিল!'—তারপর ঈষৎ হাসির সাথে হাফসার্টের পকেট থেকে কয়েকটি পুরিয়া বের ক'রে বলরামের সামনে ধরল। এই নাও বুড়ো, তোমার ওষুধ। বুড়ো হ'য়ে গেছ, ছেলে বড় হ'ল, ছেলের বৌ এল, দুদিন পর নাতি নাত্নী হবে—এখনো বেঁচে থাকবার সখ গেল না তোমার?'

বলরাম দন্তহীন হাসি হেসে বলল, 'শেষেরডা বাদ আছে যে ঠাকুর এখনো। ওডা না দেখ্যা যাচ্ছি না।'

'তুমি থাকতে সে আর আসছে না।' অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে কমল আবার বলল, গরীবের সংসার, তিন পেটের জায়গায় চার পেট একত্র হ'লেই মহামারী কাণ্ড বোঝ ত'?'

এই সমবেদনা সম্পন্ন নিছক সত্য কথায় বৃদ্ধ বলরাম একটি ছোট নিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইল। কমল কণ্ঠস্বরর গাঢ় ক'রে অনুচ্চভাবে বলল, 'গরীব হবার অপরাধের কী আর শেষ আছে বুড়ো? পেট ভ'রে খাওয়াও দোষ!'

'ভগমান মারনেয়ালা, যাকে যেমন ইচ্ছা মারে।'—বলরাম কপালে হাত ঠেকাল।

'ভগবান?'—আকস্মিক উত্তেজনায় কমলের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল,—'ভগবানই বটে। জাতিতে কৈবর্ত্ত, শেষ বয়সে জমিদারের ভয়ে নদীতে, সাধারণের জলায় মাছ ধরা ছেড়ে দিলে, ভগবানেরই কারসাজীতে; ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে না সেও ভগবানের ইচ্ছাতে; ছেলের বিয়ের ঋণের দায়ে

পনের আনা জমি মহাজনের কাছে বিকিয়ে দিলে, তাতেও ভগবানের মন্ত্রণা আছে নিশ্চয় ? নিজের মূর্খতায় নিজেরা মরবে, দোষ দেবে ভগবানের। ভগবান ; ভগবান কেউ নেই, সব আমরা নিজেরা।' তারপর হঠাৎ কথার মাঝখানে উঠে প'ড়ে চারদিকে চেয়ে সে ব্যস্তভাবে বলল, 'কিন্তু আর দেরী করতে পারছিনে এখন। এখন ঘুমিয়ে পড় বুড়ো। নিতাই, গেলাম ; যাত্রা শুনতে যেও না যেন !'

কমল অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বলরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, 'ঠাকুরের সব্বই ভাল, কিন্তুক ভগমানে ভক্তি নাই।' উঠানের একপাশে জামগাছের নিচে রাধা বাসন পরিষ্কার করছিল, অন্যমনস্কভাবে সেইদিকে চেয়ে নিতাই আন্দাজ করতে চেষ্টা করল, কতখানি চমৎকার জিনিস আজ কমল দেখাতে পারে তাকে।

নিতাইদের বাড়ী হইতে মুচিপাড়ার দূরত্ব বেশী নয়। গভীর রাত্রে বিছানায় জেগে জেগে নিরুপায় ভাবে ঢোলকের আস্ফালন শুনতে লাগল নিতাই। পাশে রাধা ঘুমে অচেতন। বারান্দায় বলরামের কাসিও থেমে গেছে—সেও ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত। চারিদিকের এই নিরুদ্বেগ ঘুমের কথা মনে পড়তে নিতাইয়ের নিজেরও দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর আর কতক্ষণ জেগে থাকা যায় ? না, কমল ঠাকুরের যদি এতটুকু মায়ামমতা থাকে ! ঘুম জয় করিবার জন্য নিতাই অযথা খানিকটা কাসল। ঘরের পাশ দিয়ে পাতা খচ্‌মচ্‌ করতে করতে কি যেন চলে গেল। কমল ঠাকুর না কি ? নিতাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বহুক্ষণ পরেও যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন বিরক্তভাবে সে মনে মনে বলল, 'শালা শিয়াল' ! কিন্তু কমল ঠাকুর এখনো আসে না কেন ? ভুলে যায় নি ত ? না, ভুল কখনো হয় না ঠাকুরের। হয়ত যে জিনিষটা আজ নিতাইকে সে দেখাবে সেটা খুঁজে পাচ্ছে না কিম্বা ভেঙ্গে গেছে, না হয়ত—। কিন্তু জিনিষটা কি ? রাধা ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে শু'ল। নিতাইয়ের ভারী ইচ্ছা হল তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে একটু আদর করে। কিন্তু জেগে যায় যদি ? ঘরের স্তব্ধ অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে চেপে চেপে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল।

'নিতাই, নিতাই।'

কমল ঠাকুরের গলা না ? নিতাই নীরবে আরেকটি ডাকের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। নিশির ডাকও তো হ'তে পারে ! কিন্তু তিন ডাকে আর সে ভয় নাই ৷৷

'নিতাই।' অনুচ্চকণ্ঠে আবার আহ্বান এল।

সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেমে নিতাই দরজা খুলল। উঠানের জামগাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে। আবছা আলোয় অদূরে চাদর আবৃত কমল ঠাকুরের দীর্ঘ আকৃতিকে দেখা গেল। আর দেরী নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হ'য়ে যাবে—স্বচক্ষে দেখা যাবে সেই অসম্ভব চমৎকার জিনিসটি। উত্তেজনায় নিতাইয়ের বুকের ভেতর ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল।

বারান্দা থেকে নেমে কমল ঠাকুরের নিকটে—অত্যন্ত নিকটে—এসে দাঁড়াল নিতাই।

'কি, ভয় পেয়েছিস নাকি।' মৃদু হেসে কমল বলল।

'না। সে জিনিসট্যা আনিছাও তো ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখানে নয়। আলো জ্বালতে হ'বে, মোমবাতি এনেছি। গোয়ালঘরে জায়গা হবে ? চল্ সেইখানেই যাই তবে।'

কমলকে অনুসরণ ক'রে নিতাই গোয়ালের ভেতর এসে দাঁড়াল। রোমন্থনরত গরু দুটো তাদের দেখে ভয় পেয়ে ওঠবার চেষ্টা করল, নিতাই যেয়ে গায়ে হাত বুলাতে শান্ত হ'য়ে তারা আবার রোমন্থনে মন দিল। চাদরের ভেতরকার জামার পকেট থেকে কমল বাঁ হাতে দেশলাই বের ক'রে নিতাইয়ের হাতে দিল। তারপর আবার সেই ভাবেই বের ক'রে দিল মোমবাতি,—'জ্বাল্।'

ডান হাতে সেই জিনিসটি ধরা আছে হয়ত। নিতাই আলো জ্বালল। গোয়ালের একপাশ থেকে কিছু খড় নিয়ে এসে মোমের সামনে ছড়িয়ে দিয়ে কমল বলল, 'বস্।'

নিতাই বসল। কিন্তু দেরী আর সইছে না তার,—এই ভাবে আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের সামনে ব'সে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায় ? চাদরের ভেতর থেকে একখানি মোটা বই বের ক'রে কমল পাশে খড়ের ওপর রাখল। তারপর কিছুক্ষণ স্থির ভাবে কী ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা নিতাই তুই আমায় ভালবাসিস্ ?'

হঠাৎ এই রকম অসম্ভব প্রশ্নে নিতাই কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতে তার ঘাড় নাড়ানো লক্ষ্য ক'রে কমল আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে যে আমি ভালবাসি, তা জানিস তুই ?'

'হুঁ', বিহ্বলভাবে নিতাই বলল।

পাশ থেকে বইখানা তুলে নিয়ে নিতাই বলল, 'আজ যা তোকে জানাব, আর কাউকে সে কথা তুই বলবি না, জানি আমি। তবু যদি কোনোদিন কেউ এ সব ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে নির্ভয়ে আমার নামই তুই বলিস। বীরত্ব ক'রে নিজে বিপদগ্রস্ত হ'সনে।'—এইটুকু বলে গম্ভীরভাবে বইখানা খুলে সেই দিকে চেয়ে রইল কমল।

কিন্তু নিতাইয়ের কেমন যেন হাসি পেতে লাগল ; এত ভনিতার পর আসল জিনিসটিই দেখাতে ভুলে গেল শেষে !—'কই, সে জিনিসট্যা কই ?'

বই থেকে চোখ তুলে কমল মৃদু হেসে বলল, 'কেন, দেখিস নি এখনো ? এই তো !'

বই ! শেষকালে শুধু একখানা বই ! এরই জন্য এত ! একমুহূর্ত্তে নিতাইয়ের সমস্ত উৎসাহ যেন চোপসান বেলুনের মত এতটুকু হ'য়ে গেল। ঠাকুরের মাথা খারাপ হ'ল না কি ?

কিন্তু ততক্ষণে কমল পড়তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, 'মানুষের দুঃখের শেষ নাই। তাহার দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইতে যাওয়া মূর্খতা। যতদিন মানুষের হৃদয়বৃত্তি থাকিবে, বিবেক থাকিবে, এবং সমাজের আর দশজনের সহিত সে বাস করিতে থাকিবে, দুঃখ তাহাকে পীড়া দিবেই। তবু মানুষ চেষ্টা করিলে সকল অসুবিধারই আংশিক নিরাকরণ করিতে পারে। দুঃখের যে দিকটা একান্তই মানসিক সে দিকটার কোন পরিবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য হইলেও, উহার বাস্তব দিকটার যথেষ্ট প্রতিবিধান আমরা অবশ্য করিতে পারি।'…

'বুঝতে পারছিস কিছু ?' ঈষৎ হাসির সাথে কমল জিজ্ঞাসা করল। নিতাই মনে মনে বেশ বিরক্ত হ'য়ে উঠছিল। কিন্তু কোনো বিষয়ে অধৈর্য্য প্রকাশ করলে কমল ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়। ও পাশে মুখ ফিরিয়ে একটা হাই গোপন ক'রে বলল, 'সব কথা বোঝা যায় না।'

'শোন, শুনতে শুনতেই ক্রমে সব বুঝতে পারবি।' কমল আবার বইয়ের

দিকে চোখ ফেরাল ঃ 'একথা আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, সংসারে ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে গেলে, মানুষের মত জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অর্থহীন লোক জীবনে সকল দিক দিয়াই অসার্থক ও ব্যর্থ। কিন্তু পৃথিবীতে চিরদিনই দেখা গিয়াছে যে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের সমান অর্থবল থাকে না। তোমার যে সময়ে অন্ন সংস্থান হওয়া কঠিন, তোমার গ্রামের জমিদার সে সময়ে অনায়াসে কলিকাতা-বাসের বৃহৎ ব্যয় বহন করিবার আর্থিক যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের এই যোগ্যতা আসিবার কারণ কী? পৃথিবীতে যত ধন আছে উহাতে যদি প্রত্যেকের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ঐ জমিদার বা ঐরূপ ধনশালী ব্যক্তিগণের আর্থিক যোগ্যতা তোমাদের এবং তোমাদেরই মত আরও কোটি কোটি যাহারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটায় তাহাদেরই ন্যায্য প্রাপ্য ছলে কৌশলে অপহরণ করিয়া গঠিত হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর জনসাধারণকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়,—ধনশালী সম্প্রদায় এবং ধনহীন শোষিতের দল।'......

হঠাৎ এই পর্য্যন্ত প'ড়ে ওষ্ঠে তর্জ্জনী ঠেকিয়ে চুপ করতে ব'লে কমল ফুঁ দিয়ে আলোটি নিভিয়ে দিল। এবং এর সামান্য কিছু পরেই একদল লোক গোয়ালঘরের ও পাশের রাস্তা দিয়ে আলোচনা করতে করতে গ্রামের ভেতরে চ'লে গেল। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে কমল মোমবাতি জ্বালল, বলল, 'ভাগ্যি টের পেয়েছিলাম! যাত্রা দেখে ফিরছিল বোধহয়; কেলেঙ্কারী কাণ্ড হত, দেখতে পেলে। কিন্তু তোর বড্ড ঘুম পেয়েছে দেখছি। আজ আর তবে থাক। পরশু, আচ্ছা পরশু নয়, তার পরের দিন বুধবারে আবার আসব কিন্তু! কেমন?'

'আচ্ছা।'—অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতাইকে মত দিতে হল; কমল ঠাকুর এমন ভাবে বলে—!

সে বুধবার এবং তারপরেও আরও কয়টি রবিবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবার কেটে গেছে। আজকাল প্রায় রোজই তাদের নৈশ পাঠের ব্যবস্থা হয়। প্রথম প্রথম অকারণ রাত্রি জেগে এই সব শুষ্ক বিষয়ের আলোচনার কী সুফল হ'তে পারে নিতাই ভেবেই উঠতে পারে নি। কিন্তু ক'টা দিন কেটে যেতেই,

ব্যাপারটা যখন কিছু কিছু বুঝতে লাগল সে, নৈরাশ্য ও বিরক্তির পরিবর্তে কেমন এক প্রকার শঙ্কা ও সন্দেহে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হ'য়ে আসতে লাগল তার। একদিন সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে এ সব কথা শুনায়া লাভ কী হরি ঠাকুর? স্বরাজ পা'লেই বা কী, না পা'লেই বা কী, আমাদের যে হাভাত সে হাভাতই।'

কমল উত্তর দিয়েছিল, 'তুই নিজের জীবনে হয়ত স্বরাজ পাবার খুব একটা সুবিধে নাও পেতে পারিস। কিন্তু তোর পরেও তো লোক আছে। তোর ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারে সেটা কী তোর দেখা উচিৎ নয়?'

কিন্তু এ সব ফাঁকা কথায় সহজে ধরা দেয় নি নিতাই, বলেছিল, 'আমি যদি দুঃখে কাটাল্যাম তো সাতকুড়ি বছর পর কে সুখ পাবি তা দিয়া আমার লাভ।'

'অমন স্বার্থপরের মত কথা বলিসনে নিতাই। লাভ লোকসানের কথা নয়, এটা তোর কর্তব্য। তোর বাপ ঠাকুরদার কথা একবার ভেবে দেখ দেখি। তারাও তো তোকে ঠকিয়ে জমিজমা বেঁচে নিজেরা ফুর্তি ক'রে যেতে পারত।'

এরপর আরও কয়েকটা দিন কেটে যেতে, ঠিক আনন্দ নয়, নেশার মত অনুভূতি আসতে লাগল নিতাইয়ের মনে। বইয়ে ব'লে দেশের সমস্ত জনসাধারণ যদি জেগে উঠে তবে দেশে মুক্তি অনিবার্য্য। কেননা জনসাধারণের শক্তির কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কোন শক্তি নেই পৃথিবীতে। এই ধরণের আরো অনেক কথা। সব কথা যে মনেপ্রাণে নিতাই সব সময়ে বিশ্বাস করতে পারে তা নয়, তবু কথাগুলো যেন যাদু জানে, শুনে যেতে মন্দ লাগে না।

কিন্তু মাস দেড়েক পরে নিতাইয়ের মন যখন অন্তরের বাধা অতিক্রম ক'রে বইয়ের কথাগুলোর ওপর একটু আস্থা ও শ্রদ্ধাবান হ'তে আরম্ভ করেছে তখন বিপদ এল বাহির থেকে, সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে। এ দিকটা তারা মোটেই ভেবে দেখে নি। প্রতিদিন রাত্রে ঘরে অনুপস্থিত থাকার ফলে যে রাধা কোন-না-কোন দিন ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত ধরে ফেলতে পারে, এ আশঙ্কাই তাদের মনে উদয় হয় নি। কিন্তু ঘটনা বেশীদূর গড়ায় নি। রাত্রি

শেষে ঘরে এসে প্রতিদিনের মত পুনরায় শোবার উদ্যোগ করতেই রাধা ঝর্‌ঝরে্ জাগ্রতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ছিলা সারাডা রাত ?'

প্রশ্নের ধরণ দেখে নিতাইয়ের হাসি পেল,—চুরি কি বদমায়েসী করতে গিয়েছিল যেন ! কিন্তু উত্তর একটা দিতেই হবে, এবং অবিলম্বে। কি বলবে ঠিক করতে না পেরে একটু দ্বিধা ক'রে মরীয়া হয়ে সে বলল, 'সুধনের সাথে মাছ ধরতিছিলাম্ বিলে। ক্যা, একলা থাকতি ভয় করতিছিল না কি ?'

'বল্যা যাওয়া লাগে না ! উনি তো বারান্দায় মরার মতন, বাড়ীত একটা মুনিষ্যি নাই—আবার জিজ্ঞাসা করে, ভয় করতিছিল না কি ? ঢঙ !'

'তুমি মানা করবা ভয়ে কই নাই।'

'বড় কামই করিছাও।'

যাক্ নিতাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বিনা প্রতিবাদে শয্যায় আশ্রয় নিল সে।

পরের দিন বিকালে হাটের মধ্যে ঠাকুরের সাথে দেখা। চোখের ইসারায় তাকে টিউবওয়েলের পাশে একটু নিরিবিলি জায়গায় ডেকে নিয়ে নিতাই গত রাতের ঘটনাটা জানাল, বলল, 'ইয়্যার পর তো আর নিত্যি ঘর ছাড়্যা যাওয়া ঠিক হয় না ঠাকুর !'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কমল বলল 'আর না আসাই ভাল বাইরে। তুই বরং এক কাজ করিস, কিছু মোমবাতি আর বই তোকে দেব আমি, সুবিধে মত ঘরেই পড়িস তুই। কিন্তু পড়তে ভুলে যাসনি তো ?'

ঈষৎ সলজ্জভাবে হেসে নিতাই বলল 'না, ভুলবো ক্যা ? এই তো গেল হাটের আগের দিন হরি জ্যাঠার চিঠি লেখ্যা দিছি।'

'দিয়েছিস না কি ? অথচ ও নিজের ছেলেটাকে কিছুতেই পড়াল না,—অদ্ভুত !' একটু পরে কমল আবার বলল 'সুধন ছেলেটাকে তোর কেমন মনে হয় ?'

'সুধন ? ভালই। খুব সরল আর বিশ্বাসী !'

'আমারো তাই মনে হয়', ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে কমল বলল, 'আচ্ছা যা তাহলে এখন, সওদা করগে। সন্ধ্যার পর ওগুলো দিয়ে যাব তোর কাছে।'

তারপর থেকে গভীর রাত্রে মোমবাতি জ্বেলে নিতাই পড়তে আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল একটা নতুন পৃথিবীর

ছবি। সেখানে হিংসা নেই, স্বার্থপরতা নেই, অন্নাভাব নেই,—মানুষে মানুষে কোন পার্থক্যই নেই যেখানে। অসম্ভব রকম বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল তার মনের দিগন্ত। প্রথমটা পড়তে কষ্ট হ'ত, কিছুক্ষণ পড়ত, বিশ্রাম নেবার জন্য আর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকত,—চেয়ে থাকত নিদ্রিতা রাধার মুখের দিকে। নিস্তব্ধ নিশীথে মোমের বিবর্ণ আলোয় বড় অসহায় মনে হ'ত রাধাকে। একটা ছেলে পর্য্যন্ত হ'ল না বেচারার, কী নিয়ে থকেবে? কিন্তু আর বেশী নয়, মনের রাশ আল্‌গা করলে চলবে না, বইয়ে বলছে 'নূতন যুগের অগ্রদূত' হ'তে হবে তাকে (সকল পাঠককেই),—পড়তে হবে তাকে। আবার পড়তে থাকে সে।

রাধা মাঝে মাঝে অনুযোগ করত, সে নাকি খুব গম্ভীর হ'য়ে উঠছে আজকাল, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে। সে যে তাদেরই দুঃখদুর্দ্দশার অবসানের সাধনায় রত, একথা খুলে বলতে পারলে রাধা বুঝতে পারত হয়ত—নিতাই ভাবে,—তার অন্যমনস্ক হবার, গম্ভীর হবার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু বলা নিষেধ। রাধার কথার উত্তরে সে কেবল তাই নীরবে মৃদুভাবে হাসে।

গ্রীষ্ম শেষ হ'য়ে বর্ষা এল, সঙ্গে সঙ্গে দিবারাত্রি বৃষ্টি। ঘর থেকে বের হওয়া যায় না। ঘড়ের চাল দিয়ে জল পড়তে সুরু করল। অন্যান্যবার বর্ষার আগেই চালখানাকে জায়গায় জায়গায় মেরামত ক'রে নেয় নিতাই। এবার সেটা খেয়ালই হয়নি তার। ইদানিং সংসারের সমস্ত কাজেই তার অবহেলা আসতে আরম্ভ করেছে। সে বুঝতে পারে, কিন্তু কেমন যেন নিরুপায়!

রাধা বলে' পুঁথিগুলাই তোমার সর্‌বনাশ ক'রল।'—নিতাই যে রাত্রে পড়ে এ খবর সে আজকাল জানে।

'আগে থাকতি ভুল হয়া গিছে রাধা, কাল দেখি তো আঁটি কয়েক খড় দেওয়া যায় কি চালে।' নিতাই বিব্রতভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়।

কিন্তু খড় দেবে কি, বৃষ্টিই যে ছাড়ে না। চালের বাঁশগুলো সবই পচে গেছে, ভেঙে যেয়ে কেলেঙ্কারী হওয়াও বিচিত্র নয়!

বৃদ্ধ বলরামের বাতের প্রকোপ বেড়ে গেছে আজকাল। সারাদিন ব'সে ব'সে বৃষ্টিকে গাল দেয়, এবং ভগবানের কাছে নিজের মৃত্যুর কামনা করে, 'হে ভগবান, কত পাপ করিছি, চরণে থান দেও এবার। শালা বৃষ্টির চোটে ভিজ্যা পচ্যা গেলাম একেবারে।'

সেদিন হরি জ্যাঠা এসেছিল। বয়সে বলরামের সমান হ'লেও শরীর এখনো বেশ সমর্থই আছে তার। ভেজা মাথালীটা একপাশে নামিয়ে রেখে বলল, 'ছাওয়ালেক কওনা, চালডা সার‍্যা দেক্।'

'হুঃ কব আর-কী? দেখতিছে না।'

'বিশ্বাস যে খড় নাই পালায়, তাই চুপ কর‍্যা আছে। তা আমার কাছ থাইকা কয় আঁটি নিয়া আসে য্যান্। বিশ্বাস এখনো দশবারো আঁটি আমার পালায় মজুত আছে।'

নিতাই ঘরের ভেতর থেকে এদের আলোচনা শুনছিল।

রাধা রান্নাঘর থেকে কি দরকারে ভিজতে ভিজতে এসে হরির প্রস্তাব শুনে বলল, 'খড় আবার থাকবি না ক্যা জ্যাঠা? সময় যে নেই! বিদ্বান হচ্ছে আজকাইল তা তো জানো না, পড়্যাশুন্যা সময় পাওয়া যায় না। রাত ছ্যাড়প'র দুইপ'র পর্য্যন্ত তানার পড়া হয়।'

কণ্ঠস্বরে এতখানি ঝাঁঝ রাধার কোনদিন ছিল না—রাধা যে এরকম ক'রে তার সম্বন্ধে বলতে পারে তা নিতাই স্বপ্নেও ভাবে নি। অকস্মাৎ তার মনে হ'ল সংসারে যারা নিতান্ত আপন, তার পিতা, তার স্ত্রী, তারা সত্যই তার আপন নয়। তার গতানুগতিকতার মোহমুক্তির বিরুদ্ধে তারা শতাব্দী সঞ্চিত কুসংস্কারের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হয়েছে। এই চক্রান্তকারী সংকীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে যাওয়াই তার সাধনা।

বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে এসে নিতাইকে দেখে রাধা অপ্রতিভ হ'য়ে গেল। এই সময়টা গরুকে খেতে দিতে যায় নিতাই, সেই মনে করেই এতবড় বিরুদ্ধ উক্তি করতে সাহস করেছিল সে। কিন্তু—ছি, সবই শুনতে পেয়েছে যে। ক্ষমা চাইবে কি রাধা?—তাই উচিৎ। সলজ্জভাবে কি একটা বলতে যেতেই নিতাই স্পষ্ট চাপা গলায় বলল, 'খুব আরাম পাইলা!'

'পালামই তো,'—এক মুহূর্ত্তে মনের সমস্ত কোমলতা চ'লে গেল রাধার,—'সারাদিন বই পড়্যা কি ভাগ্যি বাড়াচ্ছ আমাগরে শুনি? আমি সব টের পাই, কমল ঠাকুর স্বদেশীয়ালা, জেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতিছে তোমাক্।'

কলহের আভাস পেতেই হরিজ্যাঠা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'বিশ্বাস যে তুমি ঠিকই কইছাও রাধা। ও ঠাকুর স্বদেশীয়ালাই নিশ্চয়। নিতাইরেও

আমি সে কথা কইছি আগে। তা কয় যে, শহরে বাড়ী আছে, শরীর টেঁকে না, তাইত এখানে আস্থা আছে। তুমি ঠিক জাইনো রাধা ও সব মিথ্যা কথা। বিশ্বাস যে মিথ্যা কথা কওয়াই ও সব পিরকৃতির লোকের স্বভাব। বলে শরীর টেঁকে না কইলকাতায়, তাই আসিছেন এখানে,—ম্যালেরির ডিপো যে ঠাঁই!'

এদের সব অকাট্য যুক্তি এবং স্বদেশী সম্বন্ধে উজ্জ্বল ধারণায় নিতাইয়ের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করতে প্রবৃত্তি হ'ল না। নীরবে পাশ কাটিয়ে গোয়ালে চ'লে গেল।

কয়দিন পর।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শেষে আজ ভোরের দিকে আকাশটা পরিষ্কার হ'য়ে এসেছিল। রোদ ওঠবার আভাস পেয়ে বলরামের মনে যেন আনন্দের জোয়ার এল। বারান্দা থেকে ডাকতে লাগল, 'ও নিতাই ওঠ, দেখ রোদ উঠিছে আজ। ও রাধা……।'

ডাকাডাকিতে রাধার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালা দিয়ে একফালি পাতলা আরক্ত রোদ এসে বিছানার ওপর লুটিয়ে আছে দেখে সে বেশ আশ্চর্য্য অনুভব করল। বৃষ্টিটা শেষ পর্য্যন্ত থেমেই গেল তবে! কিন্তু নিতাই কই? এত সকালে তো সে ওঠে না। কোথায় গেছে হয়ত, আসবে এখনি, তাকে তো আর আজকাল ব'লে যাওয়া দরকার বোধ করে না কিছুই। রাধা বিছানা থেকে নেমে বাইরে এসে দাঁড়াল। জাম গাছটার আগায় কচি পাতায় রোদ পড়ায় ভেজা সবুজ আর সোনালীতে ভারী সুন্দর লাগল রাধার। যাক্, বৃষ্টিটা আর তা'হলে চিরকাল রইল না।

'কী চমৎকার রোদ্দির উঠেছে আজ দেখ রাধা। আজ কিন্তুক গরম জলে আর চান করব না, হেঁ!' বলরাম শিশুর মত আব্দার করল।

'আচ্ছা সেতো এখনো দেরী আছে বাবা। বর্ষার সময় আবার কখন বিষ্টি নামে কে জানে!' বলতে বলতে রাধা নামল।

'নিতাই কই? নিতাই উঠল না ক্যা রাধা?'

সন্তর্পণে কাদার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে উঠান থেকে রাধা উত্তর দিল, 'উঠিছে, ক'নে গিছে বা।'

নিতাই ফিরল বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ। সর্ব্বাঙ্গে কাদা, দরদর ক'রে

ঘাম ঝরছে, চুল উস্‌কোখুস্‌কো, বিষণ্ণ মুখে সে বারান্দায় উঠে তামাক সাজতে বসল। বলরাম জিজ্ঞাসা করল, 'ক'নে গিছিলি, হ্যাঁরে।'

'মাঠে। বানের জল কাল রাতে একহাত বাড়্যা গিছে। ভোরে সুধনা আস্যা ডাক্যা নিয়া গিছিল। সন্ধ্যা লাগাদই জমির ধানপাট সব ডুব্যা যাবিনি বোধ করি।' চিন্তিত ভাবে নিতাই তামাক টানতে লাগল।

'তা'লে তো সরবনাশ কাণ্ড। হ্যাঁরে সত্যিই সব জমি ডুব্যা যাবি?' বলরাম যেন বিশ্বাস করতে পারে না!

'হুঁ।' কিছুক্ষণ নীরবে তামাক টেনে নিয়ে নিতাই আবার বলল 'জমি ডুব্‌বিই, এখন গরু বাছুর নিয়া মানুষ রক্ষা পালি হয়। কমল ঠাকুর বলল, রেলের সড়কে বানের জল ঠেক্যা ফুল্যা উঠিছে। রেলের সড়কে জল বারানের কোন রাস্তা নাই কিনা।'—নিতাই আবার তামাক টানতে লাগল।

রাধা এসে একপাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বলল, 'কি হবি তা'লে?'

হুঁকাটি বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ম্লান হেসে নিতাই বলল, 'ক্যাম্‌নে কই! ঠাকুরের সাথে সকাল থাক্যা আমি আর সুধন চেষ্টা করলাম রেল কোম্পানীর কাছে একটা দরখাস্ত পাঠানের জন্যে যে রেল লাইনের মধ্যে একটা নালা কর্যা দিক, তা গাঁয়ের লোক কেউ রাজী হয় না। কয় গরমেন্টের কাছে ওসব কিছু করবার পারব না, হাতে হাতকরা পড়বি শেষকালে! কত বুঝালাম, কে শোনে!'—নিতাই উঠে দাঁড়াল।

রাধা আশ্চর্য্য হয়ে গেল,—স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায়। গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করলে রাজদ্রোহের দায়ে পড়তে হবে, গ্রামের প্রত্যেকটি লোক একথা বুঝতে পারল, সে নিজে তো অতি স্পষ্টই বুঝতে পারছে, আর নিতাই তা পারছে না? এ যে ঐ কমল ঠাকুরের চক্রান্ত রাধা তা বেশ বুঝতে পারল। ইদানীং লোকটির গতিবিধি রাধার মোটেই ভাল লাগছিল না। ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে কে আবার গরীব ছোট লোকের বাড়ীতে এত ঘোরা-ফেরা করে! নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু মতলব আছে! আর, স্বামীকে তো তার ইতিমধ্যেই বশ ক'রে ফেলেছে। যে নিতাই আগে তার মত ছাড়া কোন কাজ করত না, সে কিনা আজকাল ভাল ক'রে একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না। কিন্তু এভাবে স্বামীকে হারাতে পারে না সে কিছুতেই। নিতাইয়ের মুখের দিকে সোজাসুজি

তাকিয়ে রাধা দৃঢ়ভাবে বলল,—'গাঁয়ের লোক শোনে নাই, বেশ করিছে। তাদের বুদ্ধি আছে, তোমার মতন অবোধ না। যাক্, বেশী কথায় কাম নাই, ওসবের মধ্যে আর তুমি যাবার পারবা না,—পারবা না, পারবা না, পারবা না। এই আমি শেষ কয়া দিলাম।'—ব'লেই রাধা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল।

অকস্মাৎ এতখানি বাধা নিতাই আশা তো দূরস্থান, কল্পনাই ক'রে উঠতে পারে নি। ধীরে ধীরে রাধাকে অনুসরণ ক'রে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'হঠাৎ অমন পাগলের মত হয়া উঠ্‌লা ক্যা?'

রাধা উত্তর দিল না। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি অনিবার্য্য কোন কারণে আত্মগোপন করছে, বোঝা গেল না। নিতাই আবার বলল, 'রাগ করলা?'

'না।'—রাধার গলার স্বর বেশ পরিষ্কার কিন্তু গম্ভীর,—'রাগ আবার করবো ক্যা? রাগের বয়েস চল্যা গিছে।'

একটু স্তুতি করা উচিৎ, নিতাই বুঝল। কিন্তু কিভাবে আরম্ভ করবে ঠিক করতে না পারায় দ্বিধান্বিতভাবে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। গোপনে মুখটি একবার মুছে নিয়ে রাধা এদিকে ফিরে বলল, 'দাঁড়ায়া রইলা ক্যা? চান করগা এখন যাও।'

'যাই। কিন্তু তুমি চট্যা রইলা রাধা,'—স্খলিতভাবে নিতাই বলল।

'চটব আবার ক্যা, চটি নাই। কিন্তুক আমাগরেও মানুষ বল্যা মনে কইরো, আমরাও আছি; ক্যাবল তোমার কমল ঠাকুরই একা মানুষ না।'—রাধা বিষণ্ণভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করল।

কমল ঠাকুরের সাথে সে মেশে এটা রাধা, তার বাবা এবং গ্রামের আরো অনেকেই পছন্দ করে না, তা নিতাই জানত। কিন্তু অসন্তোষ যে এতখানি প্রখর হ'য়ে উঠেছে এটা বুঝতে পারেনি। বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিরুত্তরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নিতাই।......

এদিকে বন্যার জল হু হু ক'রে বেড়ে চলল। প্রথমে সবুজ শস্যপূর্ণ জমিজমাগুলো একে একে ডুবল, তারপর অপেক্ষাকৃত উঁচু বাসস্থানগুলির ওপর আক্রমণ সুরু হ'ল। কৃষককুলে হাহাকার উঠল। অথচ কমল বা নিতায়ের পুনঃপুনঃ চেষ্টাতেও রেল কোম্পানীর কাছে দরখাস্তে একটা স্বাক্ষর বা টিপসই

পর্য্যন্ত দিল না কেউ। অবশেষে একদিন কমল শ্রান্ত ও বিরক্ত হ'য়ে বলল, 'অপদার্থ সব মরুক গে।'

কিন্তু এতে সত্যকার সমস্যার সমাধান হ'ল না কিছুই। জল বাড়তে বাড়তে নিতাইয়ের গোয়ালঘর পর্য্যন্ত এল। গরুদুটোকে শোবার ঘরের বারান্দার একপ্রান্তে স্থান দিল নিতাই। তাপরপর আরো দুই দিন পরে রান্নাঘর ভূমিসাৎ ক'রে জলের কুটিল স্পর্শ যখন শোবার ঘরের দাওয়া পর্য্যন্ত এসে ত্রোঁছাল নিতাই আর তখন স্থির হ'য়ে ব'সে থাকতে পারল না।—'একটা কিছু করা লাগে ঠাকুর, আর তো চুপ কইরা থাকা যায় না,' কমলকে যেয়ে বলল।

'কী করবি বল্? তোর তো তাও এখনো বিপদের সুরু, কিছুই হয় নি এখনো,—হরির, গঙ্গার, উমেশের, কেদারের তো সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। মাচার ওপর আশ্রয় নিয়েছে তারা, গরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে হাঁটু জলে। অথচ একটা টিপ পর্য্যন্ত দিলে না কেউ।'

'তা না দেক। তাই বল্য লোকগুলা মরবি না কি! একটা বিহিত কিছু কর।'

কমল একথার উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত্ত, যেন কয়েক প্রহর, নিঃশব্দে এইভাবে কেটে যাবার পর বিষণ্ণমুখে একটু আশার জ্যোতি ফুটল। চুপি চুপি নিতাইকে কী যেন বলল সে। কিন্তু নিতাই একথা শোনা মাত্রেই বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত চমকে বলে উঠল, 'না, না, ওসবের মধ্যে যাইও না, জেল হবি।'

'হোক। যেতে হবে।'—কমলের কণ্ঠে দৃঢ় আদেশের স্বর, 'তুই, আমি, আর, সুধন। রাত একটার পর।'······

সমস্ত দিন যে নিতাইয়ের কী ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে কাটল, তা বলা যায় না! দুশ্চিন্তায় ভাল ক'রে খেতে পারল না পর্য্যন্ত। রাধা জিজ্ঞাসা করল, 'অমন ওঠ্‌বস্ করতিছ ক্যা? কি হ'ছে কি?'

নিতাই ম্লানভাবে হেসে বলল, 'কৈ, কিছু না তো।'

কিন্তু আজকের অবস্থা সত্যই অস্বাভাবিক, অত সহজে চোখে ধুলো দেওয়া গেল না রাধার। সে বলল, 'না নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে, গোপন কইরা যাতিছ?'

'না, না ; কিছুই হয় নাই রাধা। এই মাথাটা একটু সামান্য ধরিছে।'

'তা'লে আজ আর কোথাও বা'র হ'য়ো না। জ্বরজারি হবার পারে।'

রাত্রে শোবার পর নিতাইয়ের যেন অনাগত আশঙ্কায় নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগল। এ তারা করতে যাচ্ছে কী?—রাজদ্রোহ, সত্যই সে তবে রাজদ্রোহ করতে যাচ্ছে! নাঃ, রাধার কথা শুনে আগেই যদি সে কমল ঠাকুরের সাথে মেলামেশা বন্ধ ক'রে দিত! নিতাই সন্তর্পণে পাশ ফিরে অন্ধকারে নিদ্রিতা রাধার দিকে চেয়ে রইল।......

সেইরাত্রে গভীর নির্জ্জনতার ভেতর দিয়ে একখানি ছোট নৌকো এসে রেল লাইনের সড়কের পাশে লাগল। জল এপাশে থৈ থৈ করছে, মাঝখানে এই সামান্য ভূখণ্ড, ওপাশে অনেক নিচে সাধারণ বর্ষা। সমস্ত দেখে শুনে কমল চাপা গলায় বলল, 'আধঘণ্টা কাজ করলেই এদিকের জল ওদিকে যাবার রাস্তা পাবে নিতাই। তারপর আমরা চ'লে যাব, জল নিজেই নিজের পথ ক'রে নেবে। নে, এইখান থেকেই আরম্ভ কর সুধন।'

জল যেদিকটায় কম সেইদিক থেকে কোদাল চালাতে আরম্ভ করল তিন-জনে। মাটী বেশ নরম, কাটতে অসুবিধা নেই, কিন্তু তবু যেন আশানুরূপ কাজ হ'য়ে উঠছে না। আরো জোরে জোরে কোদাল চালাতে লাগল তারা। রেলের নিচ দিয়ে, স্লিপারের পাশ দিয়ে সরু সরু কয়টা গভীর খাত তৈরী করল আগে, তারপর ঘণ্টাখানেক পরে এ পাশের জলের জন্য রাস্তা তৈরী ক'রে দিল সেই খাতগুলোর ভেতর দিয়ে। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর জোরে, কলোচ্ছ্বাসে,... পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যেন মহা বিপর্য্যয় ঘটে গেল। স্লিপার সরিয়ে, লাইন বেঁকিয়ে প্রায় দশহাত চওড়া এক নালা দিয়ে বন্যার অবরুদ্ধ জল মত্তবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। কয়েক মিনিট অন্ধকারে প্রেতমূর্ত্তির মত এই কাণ্ড দেখতে লাগল তারা, তারপর ধীরে ধীরে নৌকায় ফিরে এসে গ্রামের দিকে রওনা হ'ল।

'যাক রাত্রে আর ট্রেন নেই', কমল বলল। তারপর কারো মুখে আর কোন কথা নেই, কেবল নৌকা ব'য়ে চলার অস্পষ্ট বোবা শব্দ।

পরদিন রাষ্ট্র হ'য়ে গেল, জলের চাপে রেল লাইন ভেঙে গেছে।

'কেমন বলিছিলাম না বলরাম, ভগমানের উপর আর কারু হাত নেই,'—

হরি জ্যাঠা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'বিশ্বাস যে নেহাৎ প্রাণে মারা যাই দেখ্যা তানার দয়া হ'ছে, কি কও !'

'অবিশ্যি, তা আর বলতে ! তা না হ'লে রেলের লাইন আবার ভাঙে নাকি কোনোদিন ? সবই তানার ইচ্ছা।' বলরাম গভীর শ্রদ্ধা সহকারে কপালে হাত ঠেকালে।

'আমিও তাই কই। তানার দয়া হ'লে সবই হয়। তা না দরখাস্ত হেন তেন,—বিশ্বাস যে ছাওয়ালগুলার সব মাথাই খারাপ হয়া গিছে।'

ঘরের ভেতর নির্জ্জীবের মত ব'সে নিতাই এদের আলাপ শুনতে লাগল। আজ সমস্ত দিন ঘুমাতে পারলে হয়ত তার শরীর মনের এই আড়ষ্টতা কেটে যেতে পারত। কিন্তু সমস্ত সকাল ধ'রে চেষ্টা ক'রেও দুচোখের পাতাকে একত্র করতে পারে নি সে।—গতরাত্রের জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড শব্দে মাথাটা যেন তার ঝিম ঝিম করতে থাকে !

রাধা এসে বার দুই তিন জিজ্ঞাসা ক'রে গেছে, অসুখটা সত্যিই বেড়ে গেছে কিনা। নিতাই জানিয়ে দিয়েছে, অসুখ তার বাড়েনি, আদতে অসুখই তার হয় নি, বর্ষা কিস্তির খাজনা দেবে কি ক'রে তাই ভাবছে।

কিন্তু এই মিথ্যাচারে মনে শান্তি আসে নি তার, বরং উত্তাপই গেছে আরো বেড়ে। এই আট দশ মাস আগেও যে লোকের নাম পর্য্যন্ত জানা ছিল না তার, সেই লোকই অনায়াসে এতবড় একটা সাংঘাতিক কাজ করিয়ে নিল কী ক'রে তাকে দিয়ে, নিতাই ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। একটা গভীর সুদীর্ঘ ঘুম থেকে উঠল যেন সে এইমাত্র, এমনি মনের অবস্থা। তার সংসার, তার পিতা, স্ত্রী সবাইকে ফেলে এ কোথায় ছুটে চলছিল সে ?—দেশের স্বাধীনতার সন্ধানে ? কিন্তু আইন শৃঙ্খলাকে অমান্য ক'রে কি ভাবে দেশের স্বাধীনতা আসতে পারে আশৈশব সরল গ্রাম্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বর্দ্ধিত নিতাই কিছুতেই সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। স্বাধীনতা হয় দেশের এটা নিতাই চায়, কিন্তু এরকম ভাবে নয়, এরকম ভাবে কখনোই নয় !

মনে পড়ল রাধার অভিমানক্ষুব্ধ স্বর, 'আমগরেও মানুষ বল্যা মনে কইরো, আমরাও আছি, কেবল তোমার কমল ঠাকুরই একা মানুষ না।'

কিন্তু রাত্রে এই মানসিক সঙ্ঘাতের অবস্থাটা একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছাল

যখন রাধা অনেক অভিমান এবং ভনিতা করবার পর জানাল—সে সন্তানসম্ভবা।
—'তুমি তো কথাই বল না আজকাল। এদিকে কি হ'ছে জানো নাকি কিছু?'

নিতাই নির্ব্বিকার ভাবে জানাল সে জানে না কিছু।

'তা আর জান্‌বা ক্যা? —রাধা চুপ ক'রে রইল।

'কী? কী হ'ছে?'

রাধা উত্তর দিল না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিতাই আবার জিজ্ঞাসা করল 'কী হ'ছে তা কওনা ক্যা?'

'রাধা প্রাণপণে একটা পূর্ণ নিশ্বাস নিয়ে বলবার চেষ্টা করতেই লজ্জায় হেসে ফেলে দিল, 'ধেৎ, সে অমন কইরা কওয়া যায় না কি?'

'না না কও। আমাক আবার লজ্জা কি! কও, রাধা!'

প্রায় নিতাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রাধা নিম্নস্বরে সেই খবরটি জানাল এবার, তারপর ঈষৎ উঁচু গলায় আরো বলল, 'সকালেই হবি, মাস দুয়েকের মধ্যেই। তুমি তো আর এসব কোন খোঁজ রাখ না। পর হয়া গিছি আমরা সব!'

কিন্তু এতবড় একটা সুসংবাদও যে কি ভীষণ কষ্টকর হ'য়ে উঠতে পারে, সেই মুহূর্ত্তে নিতাইয়ের মুখ দেখে থাকলে তা স্পষ্ট বিশ্বাস করা যায় না। তার যেন মনে হ'ল, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক খাড়া পাহাড়ের গায়ে, যেখান থেকে পিছু হটা বিপজ্জনক—রাস্তা মনে নেই,—স্থিরভাবে অপেক্ষা করাও অধিকতর মারাত্মক, এগিয়ে যেতে হবে শেষ চূড়ার দিকে, অথচ নিচে ঐ সমতলে যেখানে তার আত্মীয় স্বজন, ঘরবাড়ী, পরিচিত প্রতিবেশ নীরবে আহ্বান করছে তাকে, সেখানে ফিরে যেতে পারলে কত সান্ত্বনাই না পেত! নির্জ্জন মনে নিতাই স্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে রইল, এই সু-খবরের একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারল না।...

পরদিন সকালে তার খবর নিতে এসে কমল চমকে উঠল, 'কি হ'য়েছে তোর নিতাই?

নিতাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছুই না।'

'তবে অমন শুকিয়ে গেলি কেন? মনে বুঝি খুব অশান্তি বোধ করছিস্?'

এই সহানুভূতির স্বরে নিতাইয়ের মন অভ্যস্ত ভাবে সাড়া দিতে গেল, কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছাকে চেপে চেপে রেখে সে নিরুত্তরে ব'সে রইল।

কমল আবার বলল, 'ভয় পেয়েছিল বোধহয়? কিন্তু আমি তোকে স্থির বলছি নিতাই, ভয়ের কোন কারণ নেই তোর। কেউই ঠিক পায় নি,—পাবেও না।'

নিতাই তথাপি নীরব।

'রাগ করেছিস নাকি আমার ওপর? কি ছেলে মানুষরে তুই!'—কমল সহজ হবার চেষ্টা করল।

নিতাই আশ্চর্য্যভাবে তার মুখের দিকে চাইল। বিশ্বাস করতে পারল না এতবড় একটা গুরুতর অপরাধের পরও কি ক'রে ঠাট্টা করতে পারে মানুষ!

'সুধন কিন্তু এতটুকু ভয় পায় নি,'—কমল বলল।

নিতাইয়ের ইচ্ছা হল বলে, সুধনের ভয় পাবার কোন কারণ নেই, সে ভয় পায় নাই। তার বাপ. মা, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, পরের বাড়ীতে প্রতিপালিত, নিতাইয়ের মত বিবাহিতও নয় সে, আর বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি সন্তানও তার মাতৃগর্ভে অপেক্ষা ক'রে নেই। কিন্তু এসব কিছুই বলল না সে, নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে কুলুঙ্গি থেকে খান কয়েক বই পেড়ে কমলের হাতে দিল।

'কী?' কমল বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

'নিয়া যাও। আর কিছু পড়ব না। সংসারী মানুষের এসব পোষায় না।'—নিতাই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গভীর রাত্রে মোমের বিষণ্ণ আলোয় ব'সে কমল সেইদিন তার ডায়রীতে লিখল—

'নিতাইয়ের জন্য আমি দুঃখিত। আমার এবারের লোক নির্ব্বাচনে ভুল হ'য়েছিল। তবু একেবারে ব্যর্থ হয়ত হইনি। ওর মনটা ভাল,—দুর্ব্বল—কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরকে হয়ত কিছু দিয়ে যেতেও পারে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতার স্পৃহা।...এবার সুধন রইল। কিন্তু ততদিন সময় পাব তো?'

* * *

এর কিছু দিন পরে শরতের এক আরক্ত সন্ধ্যায় নিতাই হাট থেকে ফিরে এসে শুনতে পেল একটি ছেলে হয়েছে রাধার।

পরদিন প্রাতে হরিজ্যাঠা ছেলে দেখতে এসে বলরামকে বলল, 'বিশ্বাস যে নিতাইয়ের মতই হ'চ্ছে দেখতে বাচ্চাডা?'

বলরাম একগাল হেসে সায় দিয়ে বলল, 'তাই বোধহয়। এখন তোমাগরে আর ভগমানের আশীর্ব্বাদে বাঁইচা থাকলি হয়।'

'তা থাকবি আবার না! পাঁচ কুড়ি বছর পেরমায়ু হবি। তামুক খাওয়া লাগে; নিতাই গেল কই? ওগরে মাষ্টারের কাণ্ড শুনিছাও তো—ঐ যে রাত্তিরে পড়াতো সেই ঠাকুর?'

গরুদুটোকে খেতে দিয়ে গোয়াল থেকে ফিরছিল নিতাই। বেড়ার আড়ালে থমকে দাঁড়াল।

'কমল ঠাকুর? তা কি হ'ছে তানার?'—বলরাম জিজ্ঞাসা করল।

'হ'ছে যা তা বিশ্বাস যে ভালই হ'ছে। কইলকাতা থাইকা পুলিশের লোক আইয়া কাল সন্ধায় উয়ারে ধইয়া নিয়া গিছে। আমি আগেই কছিলাম, ও স্বদেশীয়ালা লোক, তা তখন নিতাই বিশ্বাস করল না। ও নাকি ওগরে দলের হয়া আসছিল গাঁয়ের লোকগুলারে গরমিণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপাবার জন্যে।—তাই কইল পুলিশেরা। কি ভীষণ…!'

নিতাই পা টিপে টিপে ফিরে যেয়ে গোয়ালে আহার-রত গরুদুটোর আড়ালে বোকার মত ব'সে পড়ল। তারপর অকস্মাৎ তার দুই চোখ জলে ভ'রে এল।…

বাড়ীর ভেতর থেকে এল নতুন শিশুর কান্না।

মণীন্দ্র রায়

পরলোকে 'তর-তম'

আমার এক খৃষ্টান বন্ধু একবার আমাকে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'আচ্ছা, প্রাচীন হিন্দুরা কি পাপ-পুণ্যের প্রভেদ জানিতেন? এটা কিন্তু নিশ্চিত—Sin-সম্পর্কে তাঁহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।' উত্তরে আমি বলিলাম, 'কেন? আপনি কি ঈশ-উপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র জানেন না?—যুয়োধি অস্মৎ জুহুরাণম্ এনঃ।' বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এনঃ কি'। আমি বলিলাম, 'এনঃ'-শব্দের অর্থ "পাপ"; শুধু 'এনস্' কেন, বৈদিক সাহিত্যে পাপ-বাচক 'আগস্' শব্দও আছে।' বন্ধু বলিলেন, 'কিন্তু "পাপ" শব্দ ত' নাই।' তিনি মিশনারি—একটু আধটু বাংলা জানিতেন। আমি বলিলাম, 'তাহাও আছে—পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন (বৃহ, ৪।৪।৫)—পুণ্য কর্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, পাপ-কর্মের ফলে পাপী হয়।'

বস্তুতঃ উপনিষদেরও পূর্ববর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বেদে সুকৃত-দুষ্কৃতের ভেদ সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট রহিয়াছে।* সংহিতায় 'সুকৃতাং লোকঃ' অর্থাৎ, সুকৃতকারীর পরলোকের সাধারণ নাম 'স্বর্গ'। আর দুষ্কৃতকারীর পরলোকের নাম 'বব্রঃ' (pit) (ঋগ্বেদ, ৭।১০৪।৩), পদং গভীরং (ইদং পদম্ অজানত গভীরম্—ঋগ্বেদ, ৪।৫।৫), অন্ধং তমঃ, অনারম্ভণং তমঃ (ঋগ্বেদ, ১০।৮৯।১৫, ও ১০।১০৩।১২)। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ঈশ-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তান্ তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে আত্মহনো জনাঃ॥

স্বর্গ দেবলোক—আর এ লোক অসুরলোক। যম এই লোকের অধিপতি—'সংযমনো জনানাম্' (ঋগ্বেদ, ১০।১৪।১)—তাঁহার পাশ ও পট্টীশ পাপীর ভয়দাতা (represent the terrors of death) এবং তাঁহার শবল চতুরক্ষ ভয়ঙ্কর শ্বানৌ (কুকুরদ্বয়) স্বর্গরোধী দ্বারপাল।

বৈদিক সাহিত্যে সুকৃতাং লোক † স্বর্গের অনেক মনোমদ বর্ণনা আছে। ঐ বর্ণনার সার সঙ্কলন করিয়া কঠ-উপনিষদে নচিকেতাঃ বলিয়াছেন—

* এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্রষ্টব্য—ঋগ্বেদ, ১০।১১৭।৯

† ঋগ্বেদ, ১০।১৬।৪ ও শুক্ল যজুর্বেদ, ১৮।৫২

স্বর্গেলোকে ন ভয়ং কিং চ নাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥—কঠ, ১।১২

'স্বর্গলোকে ভয়ের প্রচার নাই, জরার প্রসার নাই, যমের অধিকার নাই। স্বর্গ-লোকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া, শোকের অতীত হইয়া, (জীব) আমোদে বিহরণ করে।'

যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি ॥—ঋগ্বেদ ৯।১১৩।১১

'যে লোকে আনন্দ ও মোদ, প্রমোদ ও আমোদের স্থিতি—যেখানে কামনার কামও স্তিমিত, সেই লোকে আমি যেন অ-মৃত হই।'

স্বর্গ দেবস্থান (তিব্বতীর দেবচান, Devachan)।

নাকস্য পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতো
য প্রিণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি—ঋগ্বেদ, ১।১২৬।৫

সুকৃতকারীরা স্বর্গবাসী জ্যোতির্ময় পিতৃ ও দেবগণের সহিত 'স্বধামাদং মদন্তি'—

অথা পিতৄন্ সুবিদত্রা উপেহি,
উপেহি যমেন যে স্বধামাদং মদংতি।—ঋগ্বেদ, ১০।১৪।১০
যূয়ম্ অগ্নে! শন্তমাভি স্তনূভি রীজানম্ অভিলোক স্বর্গম্।
অশ্বা ভূত্বা পৃষ্টিবাহো বহাথ, যত্র দেবৈঃ সধমাদং মদন্তি ॥
—অথর্ব বেদ, ১৮।৪।১০

অথর্ব বেদের এই মন্ত্রে আমরা স্বর্গলোকীর 'শন্তমা তনূ'র কথা পাইলাম। অন্যত্র অথর্ববেদ বলিয়াছেন, সুকৃতকারীরা স্বর্গলোকে 'সর্বতনু সর্বাঙ্গ সর্বপরু' হইয়া উত্থিত হন।

এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ। সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সংভবতি য এবং বেদ—অথর্ববেদ, ১১।৩।৩২

'ঐ মন্ত্রপূত ওদন (rice-dish) সর্বাঙ্গ, সর্বপরু (পরু=joint), সর্বতনূ। যিনি এবংবিৎ, তিনি সর্বাঙ্গ সর্বপরু সর্বতনূ হইয়া উদ্ভূত হন।'

স হ সর্বতনূরেব যজমানঃ অমুষ্মিন্ লোকে সংভবতি—শতপথ, ৪।৬।১।১

'সেই যজমান সর্বতনু হইয়া ঐ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য উৎক্রান্ত জীবের যে 'নবতর কল্যাণতর রূপে'র উল্লেখ করিয়াছেন—সে রূপ অথর্ববেদোক্ত ঐ 'শন্তমা তনূ'। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই :—

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি, এবমেবায়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো (অর্থাৎ সুবর্ণস্য) মাত্রাম্ উপাদায় অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা* অন্যৎ নবতরং রূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্
—বৃহ, ৪।৪।৩-৪

অর্থাৎ যেমন জোঁক একটি তৃণের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করে, সেই মত ঐ আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করিয়া অচেতন করাইয়া, দেহান্তর গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করেন। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে, সেই মত ঐ আত্মা এই শরীর ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর শরীর রচনা করেন—পিতৃলোকের উপযোগী, গন্ধর্বলোকের উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী কিম্বা অন্যলোকের উপযোগী শরীর রচনা করেন।

ইহার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—

নিত্যোপাত্তানি এব পৃথিব্যাদীনি আকাশান্তানি পঞ্চভূতানি* * পেশঃ-স্থানীয়ানি। তান্যেব উপমৃদ্য উপমৃদ্য—অন্যৎ অন্যৎ চ দেহান্তরং (নবতরং কল্যাণতরং রূপং) কুরুতে—পৈত্র্যং বা পিতৃলোকোপভোগ-যোগ্যং, গান্ধর্বং গন্ধর্বাণাম্ উপভোগযোগ্যং, তথা দেবানাং দৈবং, প্রজাপতেঃ প্রাজাপত্যং, ব্রহ্মণ ইদং ব্রাহ্মং বা, যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ অন্যেষাং বা ভূতানাং সম্বন্ধি শরীরান্তরং কুরুতে।

অর্থাৎ, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চভূত (যাহা নিরন্তর উপাত্ত বা available আছে এবং যাহাদিগকে এখানে সুবর্ণস্থানীয় বলা হইয়াছে)—জীব ঐ ভূতপঞ্চককে যথোচিত উপমর্দন করিয়া অন্য অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ

* অচেতনং কৃত্বা—শঙ্কর

অর্থাৎ দেহান্তর রচনা করে—পিতৃলোকভোগোপযোগী, গন্ধর্বলোকভোগোপযোগী, দেবলোক-উপযোগী, প্রজাপতিলোক-উপযোগী, ব্রহ্মলোক-উপযোগী—অথবা 'যথা কর্ম যথাশ্রুত' অপর ভূতগণের উপযোগী অন্যবিধ শরীর নির্মাণ করে।

এই যে যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর দেহান্তে 'পৈত্র্য বা গান্ধর্ব বা দৈব বা প্রাজাপত্য বা ব্রাহ্ম' নবতর কল্যাণতর রূপের কথা বলিবেন—ইহার দ্বারা মনুষ্য-লোকের ঊর্দ্ধে পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক (গন্ধর্বলোক পিতৃলোকেরই অন্তর্গত), দেবলোক, প্রজাপতিলোক বা ব্রহ্মলোকের উপযোগী শরীরের কথাই বলা হইল। কারণ, যাহার যেমন অধিকার দেহান্তে তাহার সেইরূপ পরলোক-গতি হয়।* যে নিম্নলোকের অধিকারী, সে তদনুযায়ী শরীর-অবলম্বনে নিম্নলোকে যায়; আর যে উচ্চ লোকের অধিকারী, সেও তদনুযায়ী শরীর-অবলম্বনে ঊর্দ্ধলোকে যায়। †

এই যে যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর পক্ষে পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক, ব্রহ্মলোক

---

* এ প্রসঙ্গে মজ্ঝিমনিকায়ে রক্ষিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্ত বাণী তুলনীয়—'Five in number, Sariputta, are the fates which may befall after death; namely these—passage into the hell world, the animal kingdom, the realm of shades, the world of men or the abodes of the gods.'—m. n. I, p. 73. বুদ্ধদেব নাস্তিকের ন্যায় দেহের নাশের সহিত জীবের বিনাশ স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন 'There is existence after death'। কি কি রূপে? মৃত্যুর পর জীবের ঐ দৈব, কিম্বা মানুষ, কিম্বা নারক, কিম্বা পৈশাচ, কিম্বা তির্যক্ যোনিতে পুনর্জন্ম হয়। বলা বাহুল্য নরকে, প্রেতলোকে বা পশুলোকে দুষ্কৃতকারীরই গতি হয়। উদ্ধৃত বচনে যে হেতু যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর কথাই বলিতেছেন, সেজন্য তিনি ঐ সকল অধম লোকের উল্লেখ করিলেন না।

† অধ্যাপক ডয়সন্ এই 'নবতর কল্যাণতর রূপ' সম্পর্কে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন ইহাদ্বারা জন্মান্তর সূচিত হইয়াছে। তাঁহার কথা এই:—This passage does not yet recognise a twofold retribution, in a future world and again upon earth, but only one by transmigration. Immediately after death the soul enters into a new body, in accordance with its good or evil deeds. This is shown not only by the instance of the caterpillar which as soon as it has eaten up one leaf transfers itself to another, but also by the fact that the sphere of transmigration is extended through the worlds of men, fathers and gods, upto Prajapati and the personal Bramhan, that consequently the worlds of the fathers and the gods cannot be set apart, as according to the later theory, for a recompense by the side and independent of that by transmigration—The Philosophy of the Upanishads—p. 33.

প্রভৃতির উল্লেখ করিলেন, কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায় :—

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে, ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোকে ॥

—কঠ, ৬।৫

শঙ্করাচার্য ইহার ভাষ্যে বলেন যে, এক ব্রহ্মলোকেই শরীর-বিবিক্ত আত্মার দর্শন সম্ভব হয়, যেমন দর্পনস্থ মুখের—অন্যলোকে হয় না।

যস্মাৎ ইহৈব আত্মনো দর্শনম্ আদর্শস্থেব মুখস্য স্পষ্টম্ উপপাদ্যতে—ন লোকান্তরেষু।

এই ঊর্দ্ধলোকে গতির সম্পর্কে বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন :—

যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি * * তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে।
স লোকমাগচ্ছতি অশোকম্ অহিমম্। তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ—৫।১০।১

'(সুকৃতকারী) পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করতঃ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন; তিনি সেই লোকে উপনীত হন—যে লোক অশোক-অহিম (শীত-উষ্ণের অতীত)। সে লোকে তিনি শাশ্বতী সমা (সুদীর্ঘ কাল) বসতি করেন।*

আমরা দেখিলাম সুকৃতকারীর জন্য নির্দিষ্ট ঐ সকল ঊর্দ্ধ লোকের সাধারণ নাম 'স্বর্গলোক'। ঐ ভাবে স্বর্গলোক লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন :—অনুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণঃ * * তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকং। এষ পন্থা ব্রহ্মণা অনুবিত্তঃ তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ ॥—বৃহ, ৪।৪।৮-৯।†

এখানে যে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃতের কথা বলা হইল—যিনি সেই পুরাতন অণুতম পথ বাহিয়া 'স্বর্গ' লোকে উপনীত হন—তাঁহাকে 'তৈজস' বলা হইল। 'তৈজস' অর্থে জ্যোতির্ময়রূপধারী—যাহাকে প্রাচীন গ্রীকেরা 'Luciform Vehicle' বলিতেন—ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্বোক্ত নবতর কল্যাণতর রূপ।

* অভিজ্ঞ পাঠকের এ প্রসঙ্গে গীতার বাক্য স্মরণ হইবে—প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

† শঙ্করাচার্য বলেন, এখানে স্বর্গলোকের অর্থ—মোক্ষ। মোক্ষং স্বর্গং লোকং—স্বর্গলোকশব্দঃ ত্রিপিষ্টপবাচী অপি সন্ ইহ প্রকরণাৎ মোক্ষাভিধায়কঃ। এ মত কিন্তু সঙ্গত মনে হয় না। এখানে স্বর্গলোক অর্থে উচ্চতর লোক।

বলা বাহুল্য, এখানে উপনিষদ্ উচ্চতর অধিকারীর কথা বলিলেন। আর যিনি উচ্চতম অধিকারী, মুণ্ডক যাঁহাকে 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিয়ম কি? তাঁহার কোন্ লোকে গতি হয়?

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তান্ চ কামান্॥—মুণ্ডক, ৩।১।১০

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এ সম্পর্কে বৈদিক ঋষির সার কথা এই—প্রত্যেককেই স্বীয় কর্মার্জিত লোকে বসতি করিতে হয়।

তস্মাদ্ আহুঃ কৃতং লোকং পুরুষঃ অভিজায়তে ইতি—শতপথ, ৬।২।২।২৭

অন্যত্র শতপথ রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন—

স যদ্ধ বা অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ অন্নম্ অত্তি, তদ্ এনং অমুষ্মিন্ লোকে প্রত্যত্তি।
—১২।৯।১।১

'ইহলোকে জীব যে অন্ন ভক্ষণ করে, পরলোকে সে সেই অন্নের দ্বারা ভক্ষিত হয়।'

ইহাকেই বলে কর্মের বিপাক (Retribution)—কারণ, পরলোকে নিক্তির তৌলে সূক্ষ্ম বিচার নিষ্পন্ন হয়।

তুলায়াং বা হ অমুষ্মিন্ লোকে আদধতি, যতরদ্ যংস্যতি তদ্ অন্বেষ্যতি, যদি সাধু বা অসাধু বা—শতপথ, ১১।২।৭।৩৩

'পরলোকে তুলাদণ্ডে জীব নিহিত হয়; দুই দিকের যে দিক্ উত্তোলিত হয় সে তাহার অনুসরণ করে। তা' সে সাধুই হউক আর অসাধুই হউক।'

শতপথ ব্রাহ্মণে ভৃগুর সম্পর্কিত একটি প্রাচীন কাহিনী রক্ষিত আছে; দুষ্কৃতকারী পরলোকে কিরূপ কর্মবিপাক ভোগ করে, ভৃগু তাহা ধ্যান দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন।

স হ তত এব প্রাঙ্ প্রবব্রাজ। এত্য পুরুষৈঃ পুরুষান্ পর্বাণি এষাং পর্বশঃ সংবৃশ্চং পর্বশো বিভজমানান্ ইদং তব ইদং মম ইতি। স হোবাচ ভীষ্মং বত ভোঃ পুরুষান্ বা এনৎ পুরুষাঃ পর্বাণি এষাং পর্বশঃ সংবৃশ্চং পর্বশো ব্যভক্ষত ইতি। তে হ উচুঃ ইত্থং বা ইমে অস্মান্ অমুষ্মিন্ লোকে অসচন্ত তান্ বয়ম্ ইদম্ ইহ প্রতিসচামহে ইতি।—শতপথ, ১১।৬।৩

ইহার Julius Eggalin-কৃত ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ—

He (ভৃগু) then wentforth from thence eastward, and Lo, men were dismembering men, hewing off their limbs one by one, and saying 'this to thee, this to me'. He said 'Horrible ! Woe is me ! Men here have dismembered men, hewing off their limbs one by one !' They replied, 'Thus, indeed, these dealt with us in yonder world and so we now deal with them in return.'

এই উক্তি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশের পর ভৃগু দেখিলেন, দণ্ডহস্ত এক শ্যামবর্ণ পুরুষ (ইনিই যমরাজ) এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে সুশ্রী ও বিশ্রী দুই রমণী অর্থাৎ সুকৃত ও দুষ্কৃতের সাকার মূর্তি। স হ তত এব অবান্তরদেশং প্রবব্রাজ। এহ্ স্ত্রিয়ৌ কল্যাণী চাতিকল্যাণীচ। তে অন্তরেণ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ পিঙ্গাক্ষো-দণ্ডপাণিঃ তস্থৌ তং হৈনং দৃষ্টা ভীর্বিবেদ—১১।৬।৭

অতএব দুষ্কৃতকারীরা যে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কশ্চিদ্ হ বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য * * কশ্চিৎ স্বং লোকং ন প্রতি-প্রজানাতি অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিপ্রজানাতি। —তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।১

'কেহ কেহ ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া স্ব লোক খুঁজিয়া পায় না— অগ্নিমুগ্ধ হইয়া, (চিতা-) ধূমাকুলিত হইয়া স্ব লোক খুঁজিয়া পায় না।'

কারণ, তাহাদের কৃত দুষ্কৃত স্বর্গের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে।

এইবার সুকৃতকারীর পুণ্যবিপাকের আলোচনা করি। সে অবশ্য স্বর্গভোগ করে।

তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্ অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।—গীতা, ৯।২০

সুকৃতকারীর এই যে স্বর্গভোগ সুকৃতের পরিমাণ অনুসারে কিন্তু তাহারও 'তর-তম' আছে। * প্রথমতঃ ঐ তারতম্যের ফলে কেহ পিতৃলোকে নীত হন, কেহ দেবলোকে। তাই বৃহদারণ্যক সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন : -

* The Vedic conception is not an indiscriminate felicity for the departed, but different degrees of compensation proportionale to their knowledge and actions.
—Deussen, p. 354.

কর্মণা পিতৃলোকঃ বিদ্যয়া দেবলোকঃ* —বৃহ ১।৫।১৬

দেবলোক পিতৃলোক হইতে ঊর্দ্ধতর। (আগামী অধ্যায়ে আমরা পিতৃযান ও দেবযানের যে আলোচনা করিব তাহাতে এ বিষয় বিস্পষ্ট হইবে)। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এই পিতৃলোক ও দেবলোকের ভেদ সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দেবা বৈ যজ্ঞস্য স্বগাকর্তারং নাবিন্দন্ত ইমং নো যজ্ঞং স্বগা কুরু ইতি—তাঁবতঃ সংবৎসরান্ পিতৃলোকং ন প্রজানাৎ ইতি—তৈত্তি সংহিতা, ২।৬।১০।১-২

এষা হ উভয়েষাং দেবমনুষ্যাণাং দিক্ যদ্ উদীচী প্রাচী। যদ্ধেব উদঙ্ প্রাঙ্ তিষ্ঠন্ এতস্যাং হি দিশি স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারম্—শতপথ, ৬।৬।২।৪

আগ্নেয়ো বা অনড্বান্। অগ্নিমুখা এব তৎ পিতৃলোকাৎ জীবলোকম্ আভ্যাযন্তি। উদ্বয়ং তমসঃ পরি ইতি। এতাং ঋচং জপন্তো যন্তি তৎ তমসঃ পিতৃলোকাৎ আদিত্যং জ্যোতিঃ অভ্যায়ন্তি—শতপথ, ১৩।৮।৪।৬-৭

এ সকল বচন হইতে পিতৃলোক ও দেবলোকের প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে।

যজমান যজ্ঞ-জনিত 'অপূর্ব' দ্বারা এইরূপে যে স্বর্গলোকে নীত হইয়া, দেবগণের সহিত স্বর্গের সমৃদ্ধি সম্ভোগ করেন ('দেবেষু রত্নম্ অজভন্ত ধীরাঃ')—ইহাকে দেবতাদিগের সহিত 'স-লোকতা' বলা যাইতে পারে। সলোকতা অর্থে সমান-লোক-প্রাপ্তি, কিন্তু ইহাই স্বর্গের চরম নহে।

সলোকতার উপরে দেবতার সহিত সরূপতা, তাহারও উপর দেবতার সহিত সাযুজ্য।

অসৌ বাব আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমম্ আদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি—কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ৫।১।৮।৬

'ঐ আদিত্যই উত্তম জ্যোতিঃ—(যজমান) আদিত্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন।'

অমৃতো হৈব ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ এতি, আদিত্যস্য সাযুজ্যম্—তৈঃ ব্রাঃ, ৩।১।১১

স হ হংসো হিরণ্ময়ো ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ ইয়ায় আদিত্যস্য সাযুজ্যম্—তৈঃ ব্রাঃ, ৩।১০।৯।১১

---

* শঙ্করাচার্য ঠিকই বলিয়াছেন—এ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নহে—ইহা দেবতা-জ্ঞান।

যৎ দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানম্ কর্ম্মসম্বন্ধিত্বেন উপন্যস্তং, ন পরমাত্মজ্ঞানম্। বিদ্যয়া দেবলোক ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ * * যেতু বিদ্যায়াম্ এব দেবতাজ্ঞানে এব রতা * * অবিদ্যয়া কর্মণা (অগ্নিহোত্রাদিনা) মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম জ্ঞানঞ্চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্ উভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন অমৃতত্বং দেবতাত্মভাবং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি।

'সেই জীব হিরণ্ময় হইয়া স্বর্গলোকে আসিল—সূর্যের সাযুজ্য লাভ করিল।' বৃহদারণ্যকের এক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য কর্মদ্বারা মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

যে কর্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে—বৃহ, ৪।৩।৩৩

—ইহা দেবতার সারূপ্য। অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি— বৃহ ৪।১।২

—ইহা দেব-সরূপতা নহে, দেব-সাযুজ্য।

ঐ যে 'অপ্যয়' বা দেবতার সহিত একীভূত হওয়া—উদ্ধৃত ব্রাহ্মণ-বাক্যে উহাকেই 'সাযুজ্য' বলা হইয়াছে। ইহার ফলে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দেবলোকে স্থিতি ও দেবতার মহনীয় ঐশ্বর্যভোগ ঘটে।

ইহাকে কোথাও কোথাও 'অমৃতত্ব' বলা হইয়াছে বটে—

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম।

অথবা—

দক্ষিণাবংন্তো অমৃতং ভজন্তে—ঋগ্‌বেদ, ১।১২৫।৬

কিন্তু আমরা যথাস্থানে দেখিব এ অমৃতত্ব আপেক্ষিক মাত্র—ভোগান্তে স্বর্গলোকীর পতন অবশ্যংভাবী।

এ অধ্যায়ে আমরা পরলোকে যে 'তরতমে'র আলোচনা করিলাম, সুকৃত-কারীর ধূমযানে কৃষ্ণা গতি ও দেবযানে শুক্লা গতির বিবরণে তাহা আরও বিস্পষ্ট হইবে। আগামী অধ্যায়ে আমার তাহার বিবৃতি করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পরিচ্ছদ।*

[ধূসর গিরি-চূড়ায় দেবদূত উপবিষ্ট। অজাত উপস্থিত হ'ল ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভারী পরদা দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে।]

অজাত—হারিয়ে গেছি। আমি হারিয়ে গেছি। কোন দিক্? পথ কৈ? আমি কি এই অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে চলবো, না ফিরে যাবো? এত অন্ধকার, একহাত দূরেও কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। না কি আমি স্বর্গ থেকে নেমে আসছি বলে অন্ধকার এত বেশি মনে হচ্ছে? আর একটুখানি, আস্তে আস্তে হয়তো এই ঝাপসা আলোয় দেখা অভ্যেস হ'য়ে যাবে। এইতো দেখতে পাচ্ছি—গিরিপথ,—আশে পাশে ঘাস বিছানো। খুব তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি বোধ হচ্ছে। তাহ'লে পৃথিবী তো বেশী দূর নয় আর।

আঃ অতীতের স্মৃতি যদি ভুল না হয়, তবে পাবো—দুই চোখ দিয়ে আবার পৃথিবীর সৌন্দর্য্য শুষে নেবো। মনে পড়ছে সেই নিবিড় বনানী আর স্বচ্ছ আকাশ, সমুদ্রের বুকে ভোরের সোনালী আলো, আর রক্তিম সূর্য্যাস্ত। মনে পড়ছে কত সুখী নরনারী আনন্দে করুণায় ভরপূর। আঃ আবার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া—আবার নর বা নারীরূপে নবজন্ম! কি করে এখন জানবো কোন পথে যাবো?

দেবদূত পৃথিবী আর একদিনের পথ।

অজাত এখনও আমি স্বর্গের কাছে রয়েছি—কালমাত্র যাদের মধুর সঙ্গ ছেড়ে এসেছি তাদেরি মনে করে তোমাকে অভিনন্দন জানাই দেবদূত। (পরস্পর চুম্বন) জানো বোধ হয় আমি এসেছি পৃথিবীর সন্ধানে। বলো কোন পথে যাবো?

দেবদূত তুমি নবজন্ম চাও? কেন স্বর্গে কি তুমি অনন্ত প্রশান্তি পাওনি?

---

* Clifford Baxএর Cloak নাটিকা অনুসরণে।

অজাত আমি স্বর্গের সুধাপাত্র—ভালোবাসায় ভরপূর হ'য়ে উঠেছি। প্রেমের পেয়ালা যে উপচে পড়ছে, তাইতো আমার সঞ্চয় আজ বিলিয়ে দিতে বেরিয়েছি। পৃথিবীর স্মৃতি আজো আমার মনে মধুর উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। তবু হয়তো অনেক কথা ভুলে গেছি—আর এখন প্রায়ই শুনে থাকি পৃথিবীকে মানুষ আজো স্বর্গের মত সুন্দর করে তুলতে পারেনি। তাই—হয়তো এটা আমার অহঙ্কার—এই আশা নিয়ে বেরিয়েছি—পৃথিবীতে ভালোবাসার আজো দরকার আছে। বল দেবদূত কোন পথে আমি যাবো ?

দেবদূত এসো। এই গিরি-শিখর থেকে দেখতে পাবে সেই গ্রহ যেখানে তুমি যেতে চাও।

অজাত কোথায় ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না ; অন্ধকারের অসীম সাগরে যেন অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ ভাসছে দেখতে পাচ্ছি। ওর মধ্যে কোনটা পৃথিবী ? ঐ যে বিরাট আগুনের উৎস দেখা যাচ্ছে ঐটি নাকি ?

দেবদূত না। পৃথিবী ওর চাইতে অনেক কম উজ্জ্বল—ছোট্ট একটি গ্রহ যাকে এইসব বিরাট সূর্য্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়াই শক্ত। ছায়াপথ পার হ'য়ে আরো দূরে তাকাও।

অজাত একটা ছোট্ট আলোর কণা দেখতে পাচ্ছি—ঐ কি পৃথিবী ?

দেবদূত না না, ও হচ্ছে সেই সূর্য্য যা পৃথিবীর মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

অজাত হ্যাঁ—এখন দেখতে পাচ্ছি—কতকগুলি অস্পষ্ট—ঐ সূর্য্যের চারিদিকে আবর্ত্তন করছে।

দেবদূত ঐ যে তৃতীয়টি, এখন দেখতে পাচ্ছ ?

অজাত হ্যাঁ।

দেবদূত ঐ পৃথিবী—কত ছোট, কত নগণ্য মনে করছ তুমি, তবু তুমি ওখানে গেলে দেখতে পাবে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আর দুর্ব্বহ দুঃখের ভার।

অজাত আর জন্মটা কি রকম জিনিস ?

দেবদূত ধীরে ধীরে তোমার চেতনার উপর সুষুপ্তির যবনিকা নেমে আসবে ; তোমার শক্তি ক্ষীণ হতে থাকবে আর অবশেষে ঐ জীবনপ্রবাহে

নিমজ্জিত হয়ে তুমি জেগে উঠবে—অতৃপ্তি আর কান্নার পাথেয় নিয়ে।

অজাত তবু আমি এই বিশ্বাস ছাড়বো না যে যতদিন পৃথিবীতে থাকি ততদিন আমি আমার ভালবাসার সঞ্চয় বিলিয়ে যাবো।

দেবদূত কোটি কোটি আত্মা যায় ঐ বিশ্বাস নিয়ে—হয়তো তোমার সঙ্কল্প সফল হবে, তবু মনে রেখো,—তোমায় সাবধান করে দেই—আমাদের অসীম আত্মা ছোট হয়ে যায় নবজন্মে।

অজাত বল, বল আমায় তার পরের কথা বল।

দেবদূত একটি কঠিন কাজের ভার আছে আমার উপর,—তোমায় একটু অপেক্ষা করতে হবে।

অজাত কি কাজ?

দেবদূত পৃথিবীতে একটি রমণীর এইমাত্র মৃত্যু হয়েছে,—তাকে স্বর্গের তোরণ-দ্বারে পৌঁছে দেবার ভার আমার। সকল মানবাত্মাকেই দেহত্যাগ করবার পর এই পথ অতিক্রম করতে হয়। স্বর্গ থেকে ধরণীর বুকে প্রথম যখন তারা নেমে যায় তারা থাকে তোমারি মত নিরাবরণ,—সহজ সরল সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত। তারপর বছরের পর বছর কাটে,—ধীরে ধীরে তাদের সরলতা কোথায় মিলিয়ে যায়। থাকে শুধু অহংজ্ঞান আর স্বার্থবোধ। এরা আস্তে আস্তে বিচিত্র কারু-কার্য্যময় আবরণের মত আত্মার অনাবৃত মহিমাকে আবৃত করে ফেলে,—মানুষ তা জানতেও পারে না। যতদিন পৃথিবীতে থাকে মানুষ, এই বাইরের আবরণকেই তারা পরম সত্য বলে মেনে নেয়, আর কখনো তা ছাড়তে চায় না। কিন্তু পৃথিবীর বিচিত্র আচ্ছাদন নিয়ে তো রমণীটি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না; তাই আমার কাজ তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে এখানে তার স্বতন্ত্র সত্তা বলে কিছু থাকতে পারে না, সে হবে তোমারি মত নিরাবরণ।

অজাত আমার একটা কথা রাখবে?

দেবদূত বল।
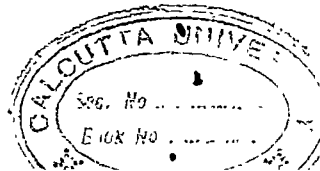
অজাত প্রেমের যে কল্যাণরূপের কথা আমি বলেছি তা নিরর্থক বলিনি; সেই কথা আমাকে প্রমাণ করতে দাও। ওর আত্মাকে আমি নিজে মুক্ত করে দিতে চাই।

দেবদূত কি করে পারবে? কাজটা সহজ মনে করছ বটে, করবার বেলা কিন্তু বেশ কঠিন।

অজাত কেন? এতে তো তারই মঙ্গল। কৃত্রিম আবরণের বোঝা দূরে ফেলে দিয়ে তার আত্মার অমলিন জ্যোতি আবার ফিরে পাবে—তবুও কি সে আবরণ ত্যাগ করবে না?

দেবদূত বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।—দেখ, দেখ সে আসছে; পৃথিবীর স্মৃতি এখনো তাকে জড়িয়ে আছে, স্মৃতিভারে তার সমগ্র চেতনা অবলুপ্ত,······কিন্তু তবু সে আসছে;······অর্দ্ধ জাগ্রত, অর্দ্ধ ঘুমন্ত অবস্থায়;······যেন স্বপ্নরাজ্যের কুহেলিকা-জাল থেকে বাস্তবে সে কিছুতেই ফিরে আসতে পারছে না।

(মৃতা রমণীর প্রবেশ।)

মৃতা না, নাগো আমার কাছে থাকো, আমাকে তুমি ছেড়ে যেতে পারবে না। শরীরে কোন যন্ত্রনা এখন আমার নাই, তাই আমি রোগ-শয্যায় সেকথা আর ভাবতেই পারছি না। আমার মনে এক বিচিত্র অনুভূতি,··· পৃথিবীর প্রান্তপথ অতিক্রম করে পর্ব্বতমালার শিখর থেকে শিখরে আমি ছুটে চলেছি। সে চলার যেন আর শেষ নাই···কোথাও থামতে পারছি না···। কিন্তু আমি যে বড় ক্লান্ত; আমার যে বিশ্রাম চাই।

(মৃতা ক্লান্তভাবে মাটিতে বসে পড়ল)

দেবদূত (অজাতকে) রমণীটির মন এখনও পৃথিবীর হাজারো স্মৃতিতে আর জীবনের সম্মোহে বিজড়িত,—তাই অতীতের সঞ্চয়-ভারাক্রান্ত মনে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না।

মৃতা এসো, আরও কাছে এগিয়ে এসো। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। শুনতে পাচ্ছো কি? আমি আমার বোনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলাম; এখনো শোধ দেওয়া হয়নি। তার ভয়

হ'য়েছে পাছে রুগ্ন হ'য়ে পড়ে থেকে তার টাকা তাকে আমি আর ফিরিয়ে না দেই। তাকে বোলো টাকা আমি তাকে ফিরিয়ে দেবোই। আমার এ অবস্থা বেশী দিন থাকবে না। তাই না?...কথা বলছ না কেন? ...আমি কি ঘুমিয়ে পড়ছি?

দেবদূত (পূর্ব্বের ন্যায়) স্মৃতির এই মোহাবিষ্ট ভাব এখন তার সকল শক্তিকে সংহত করে রেখেছে। কিন্তু এ ভাব বেশিক্ষণ থাকবে না,—কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ক্রমশ কমে আসবে।

মৃতা এই ধূসর গিরিমালা, মুক্তাশুভ্র সূর্য্যরশ্মি যা শূন্য দিগন্তকে আর অসীম আকাশকে রঙীন আভায় উজ্জ্বল ক'রে তোলে,...ঐ পুষ্প-সম্ভারে পরিপূর্ণ শ্যামল বনানী,...সবই যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে...।

......এসো, কাছে এসো। যদি আমার বোন টাকার কথা আবার বলে বোলো আমি সুস্থ হ'য়ে তাকে নিশ্চয়ই সব শোধ করে দেবো।...কই, তুমি কোথায় গেলে? মনে হচ্ছে তুমি আমার কাছ থেকে যেন হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছ।

...আবার...আবার আমার মনে সেই স্বপ্নঘেরা গিরিমালা ভেসে আসছে। আমার আচ্ছাদনের ভার পর্য্যন্ত আমি বইতে পারছি না;...আমি কি এতই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লাম?

(মৃতা তার ক্লান্ত দেহভার নিয়ে উঠে দাঁড়ালো)

দেবদূত এইবার তন্দ্রার ঘোর কেটে গিয়ে সে জেগে উঠছে। যাও, ওর মোহাচ্ছন্ন বিহ্বলতা দূর করে দাও। পৃথিবীর মোহ ওকে ঘিরে আছে বলেই ও তার আবরণ ত্যাগ করতে পারছে না। যাও...শীগগির যাও।

(দেবদূতের প্রস্থান)

অজ্ঞাত শোনো, তোমার যাত্রাপথে আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি?

মৃতা কেন? আমার তো কারো সাহায্যের দরকার হয়নি। কোন কাজে অন্যের উপর নির্ভর করাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।...তুমি কে?

অজাত আমি একটি আত্মা, পৃথিবীর বুকে যার এখনো জন্ম হয়নি।

মৃতা যার জন্ম হয়নি এমন কোন কিছু থাকতেই পারে না।

অজাত কিন্তু তবু তো আমি তোমার সামনে রয়েছি,…কি ক'রে এটা বিশ্বাস করছ ?

মৃতা দেহহীন আত্মা! অসম্ভব…যেন তন্ত্রীবিহীন বীণার সুর। কিন্তু তোমার তো দেহ আছে।

অজাত এখন আমায় যে রকম দেখছ এটা আমি পৃথিবীতে কি রূপে জন্ম নেবো তারি পূর্ব্বাভাস।

মৃতা কি বলছ ? তুমি পৃথিবীতে যাবে ?

অজাত হ্যাঁ, আজই আমি সেখানে যাচ্ছি।

মৃতা তুমি যা বল্লে তা যদি সত্যি হয় তবে কি ক'রে তুমি পৃথিবীতে যাবে ? …আচ্ছা…তা'হলে আমার কি হবে ?

অজাত তোমার দেহের এইমাত্র মৃত্যু হ'য়েছে।

মৃতা মৃত্যু হ'য়েছে ? কি বলছ তুমি। তাহলে তো মানুষ কিছুই জানে না। তারা যে অনেকদিন হ'ল এই সব আজগুবি কল্পনা ভুলে গিয়েছে।

অজাত তাই নাকি ? আশ্চর্য্য তো।

মৃতা ঐ যে পর্ব্বতমালা দেখা যাচ্ছে, ঐ কি স্বর্গ ?

অজাত না স্বর্গ এই গিরিপথ থেকে আরো অনেক দূরে। স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই জগতের মাঝে সেতু হ'ল ঐ গিরিপথ।

মৃতা বেশ, যদি স্বর্গ সত্যিই থাকে তাহলে একটা পথ নিশ্চয়ই সেখান পর্য্যন্ত গিয়েছে,…সেই পথ ধরে আমি যাবো।

অজাত তুমি যে বেশে পৃথিবী থেকে এসেছ ঠিক সেই বেশেই কি স্বর্গের নির্ম্মল আলোয় নবজন্ম পেতে চাও ?

মৃতা কেন চাইবো না ?

অজাত জীবনের যত সম্পদ সবই যে এখন মাধুর্য্যবিহীন।

মৃতা যদি সত্যিই আমার মৃত্যু হ'য়ে থাকে তবে আমি আমার ধন সম্পদ যশ মান সবই তো হারিয়েছি। আর তুমি যা বলছ তাই যদি সত্যি হয়

তবে আমার এই যে অপরাজিত ব্যক্তিত্ব আর পৃথিবীর বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে আহরিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা,—আমার এ সব কিছুর স্বর্গে কোন দাম, কোন মানেই রইবে না? আমি মিশে যাবো তাহলে নামহীন জনতার মাঝে; আমি হবো শুদ্ধ তাদেরই একজন?—বল, আমাকে স্বর্গে যেতে হলে কি করতে হবে?

অজাত   প্রথমে তোমার আবরণকে ছিঁড়ে ফেলে দাও দূরে।

মৃতা   এই চাও? আমি যে একে সুন্দর সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্যে সারা জীবন ব্যয় করেছি। কত সূক্ষ্ম সুতো আর রঙীণ টুকরো সাজিয়ে আমার ব্যক্তিত্বের বিচিত্র পরিচ্ছদ বুনে চলেছি সারা জীবন ভরে। এর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য লোকের চোখে আমাকে বড় করে তুলেছে। পৃথিবীতে যদিও এমন সুন্দর আবরণ আছে আরো, কিন্তু আমার পরিচ্ছদের মত অপরূপ আর একটিও নাই।—এর কি তুলনা হয়!

অজাত   যতই অতুলনীয় সুন্দর হোক না কেন তবু এ অকিঞ্চিৎকর; একে পরিত্যাগ না করলে তুমি স্বর্গে যেতে পারবে না।

মৃতা   তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এই পরিচ্ছদ ছাড়া আমার নিজের কি আছে?

অজাত   এ তো শুধু বাইরের আবরণ।

মৃতা   না, এ শুধু বাইরের আবরণই নয়,...তার চাইতে বেশী। আমার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এই পরিচ্ছদ। একে যদি আমি হারাই আমার নিজের বলতে তাহলে তার কি থাকবে? আমার সত্তাকে হারিয়ে তখন আমি সহস্রের মাঝে একজন,—যেন জ্বলন্ত সূর্য্যের মাঝে ছোট একটি জ্যোতির কণা। এই ভাবে যদি তুমি জীবনের সন্ধান পেতে চাও তাহলে তোমার কোন আশা নেই।

অজাত   তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না।

মৃতা   পৃথিবীর মন ভোলাবার জন্যে যদি তোমার কোন আবরণ না থাকে তবে তোমার সেখানে দুর্দ্দশার সীমা রইবে না। দেখবে প্রত্যেকেই আপন আপন চলার পথ থেকে তোমায় সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে।

অজাত   মানুষ কি পরস্পরকে সাহায্য করে না!

মৃতা পৃথিবীর সম্বন্ধে তুমি এত অজ্ঞ ? আর তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ ? তোমার অনেক শেখবার আছে পৃথিবীতে। অনেক দুঃখ আঘাতের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারবে তোমার সরলতাকে নির্ব্বুদ্ধিতা বলে লোকে কি ভাবে উপহাস করছে।

অজাত আশ্চর্য্য ! মানুষের অন্তরের শুভ ইচ্ছা যা নাকি বাতাসের মত অবাধ কুণ্ঠাহীন দাক্ষিণ্যে সবাইকে ছুঁয়ে যায় তাও ওখানে এত দুর্লভ ? —আচ্ছা…। কিন্তু ভালোবাসা! মানুষের জীবনে কি প্রেমেরও স্থান নাই ?

মৃতা ভালোবাসা ? যেন একটি উজ্জ্বল শুভ্র নক্ষত্র ; ক্ষণকালের জন্য জীবনের পূর্ব্বাচল উদ্ভাসিত করে তোলে…আবার অকস্মাৎ মিলিয়ে যায়।

অজাত মানুষ কি এখনও আগেকার মত যুদ্ধ করে ?

মৃতা হ্যাঁ, অতি সামান্য কারণে,—এক টুকরো জমি, একমুঠো সোনার জন্য তারা পরস্পর যুদ্ধ করে।

অজাত এখনও যুদ্ধ করে ?…আচ্ছা যখন যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যায় তখন তারা কি করে ?

মৃতা নিজের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদে ব্যস্ত থাকে।

অজাত বন্ধুও বন্ধুর বিরুদ্ধে যায় ? পৃথিবী তবে কি ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে ?

মৃতা কি ভাবে ? যদি কোনো উন্নতি হয়েই থাকে তা নিতান্তই দৈবক্রমে ; মানুষের কল্যাণ-কর্ম্মের ফলে নয়।

অজাত মানুষ নিশ্চয়ই দয়ালু আর ন্যায়বান ?

মৃতা মানুষের তাতে লাভ কি ? ধূলোর শরীর ধূলোতেই মিশে যাবে,— তখন আর দয়া, করুণা, ন্যায়পরায়ণতার সার্থকতা জীবনে কোথায় ?

অজাত কিন্তু মানুষ তো শুধু ধূলোর নয়, তার আত্মা যে চিরকাল থাকে।

মৃতা তবুও অধিকাংশ লোক তাদের দিন কাটিয়ে দেয় অকারণ কলহ ও মূর্খতায়।

অজাত হায়, একথা যদি সত্যি হয় তাহলে পৃথিবী তো ভীষণ জায়গা। পৃথিবীতে ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার ক্রমে কমে আসছে।

মৃতা তোমার সরল অন্তঃকরণ দিয়ে তুমি এখন প্রেমকেই জীবনের চরম কল্যাণ আর পরম শক্তি বলে মনে করছ; কিন্তু এই মন নিয়ে পৃথিবীতে গেলে সেখানে তোমার অশান্তির সীমা রইবেনা। যতই দিন কাটবে ততই বুঝবে মানুষ বড় নিষ্ঠুর, বড় ছলনাময়। তারা কেবল নির্ম্মমতার পূজারী, তা ছাড়া জীবনের যা কিছু সত্য তাদের কাছে অনাদৃত।

আমার কথা শোনো,—মানুষের ধূর্ত্ততা ও চাতুরীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তোমার চারিদিকে এক আবরণের সৃষ্টি কর। একথা ঠিক জানবে যে পৃথিবীতে তোমার জীবনের একটি পথ মাত্র বেছে নিতে হ'বে। হয় তুমি সকলের ইচ্ছে অনুসারে চলবে কিম্বা তোমার ইচ্ছা সকলের উপর অপ্রতিহত ভাবে চালাবে, আর নয়তো মন থেকে দয়ামায়াকে একেবারে মুছে ফেলে বিনাদ্বিধায় সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজের দাবী নিয়ে এগিয়ে চলবে,—আর অন্য কোন পথ নেই।

অজাত আমি মানুষকে চিরন্তন প্রেমের বাণী শোনাতে চাইছি।

মৃতা ভালোবাসা ও সরলতা দিয়ে পৃথিবীতে কোন কাজ হয়না।

অজাত তাই বুঝি তুমি এই আবরণ তৈরী করে নিয়েছ?

মৃতা হ্যাঁ তাই। এই তো তুমি এর মূল্য বুঝতে আরম্ভ করেছ...। কিন্তু আমি কোন পথে যাবো? সব পথই তো দেখছি দুর্গম।

অজাত যতক্ষণ না তুমি তোমার আবরণ ত্যাগ করবে ততক্ষণ তুমি এখানে থাকতে বাধ্য।

মৃতা তুমি তো খুব চালাক দেখছি। আমি এটা ত্যাগ করি আর তুমি নিজে এটা ব্যবহার কর—চমৎকার মতলব!...আচ্ছা, পথের সন্ধান তুমি নাইবা বললে, আমি নিজেই খুঁজে নেবো...বিদায়।

(মৃতা রমণী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে উদ্যত; দেবদূত তার গতিরোধ করল।)

দেবদূত কোথায় যাচ্ছো?

মৃতা স্বর্গের সন্ধানে।

দেবদূত তার আগে তোমার অহঙ্কারকে যে চূর্ণ করতে হবে।

মৃতা তুমিও সেই কথা বলছ ? তাহলে আমাদের ব্যক্তিত্বের কোন মর্য্যাদা কি স্বর্গে নেই ?

দেবদূত সে হচ্ছে পৃথিবী অলীক কল্পনা।

মৃতা কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ?

দেবদূত সেখানে এমন অহমিকাশূন্য স্বচ্ছ শুভ্র জ্ঞানের সন্ধান পাবে, যা মানুষের জানবার সীমানার বাইরে ও তার চাইতেও অনেক সূক্ষ্ম।

মৃতা সে কেমন ?

দেবদূত সেখানে পবিত্র প্রেমের আলোয় সকলি আমাদের কাছে আপনি উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

মৃতা আমি আর আমার এই পৃথিবীর আবরণ এর মধ্যে তো কোন ভেদ নেই, তবুও কেন বলছ আমি যেতে পাবো না ?

দেবদূত যেতে চাও ? তবে নিজেকে ত্যাগ কর।

মৃতা না, তা আমি পারবো না।

দেবদূত তাহলে তোমার যাত্রার মধ্যপথে এইভাবে থেমে থাকো এইখানে। তারপর ধীরে ধীরে যখন জ্ঞানের উন্মেষ হ'বে তখন 'আমিত্বের' অহঙ্কারে নিজেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে।

মৃতা হায়, আমি যে অপেক্ষা করতে পারছি না।

দেবদূত আবরণ ত্যাগ কর, এই মুহূর্ত্তেই যেতে পারবে।

মৃতা অজানা রহস্যের ভীতি আর তাকে জানবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা আমার মনকে সংশয় দোলায় দুলিয়ে রেখেছে। কি করি এখন ?···না, ভয় করলে চলবে না, আমার পরিচ্ছদই আমি ত্যাগ করবো।

(মৃতা তাহার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, এখন সে অজাতর মতই নিরাবরণ)

কি নিবিড় আনন্দে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কোন বন্ধন নাই আমার, এখন আমি মুক্ত। জীবনের আনন্দ-উৎস এখন আমার কাছে অবারিত,—বিশ্ব আর আমি যেন এক সুরে ঝঙ্কৃত হচ্ছি···।

(দেবদূত ও মৃতার প্রস্থান। অজাত তাদের গতি কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল ; তারপর পিছন ফিরতেই তার চোখে পড়ল পরিত্যক্ত পরিচ্ছদটি)

অজাত　আমার পথ আরো দুর্গম। আমাকে বিদ্রূপ করে মৃত রমণীটি বলে গেল পৃথিবীতে নাকি আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না ; আমার সারল্যের সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করবে, আর প্রতিপদে শুধু তাদের কাছে হার মানবো। কিন্তু—আমি যদি ওর এই পরিত্যক্ত পরিচ্ছদটি তুলে নেই ? তাহলে তো আমি পৃথিবীর যে কোনো মানুষের থেকে বেশী ক্ষমতাশালী, বেশী কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন আর সংসার-বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞ হবো। হাঁ তাই ঠিক, আমি এটাই পরবো।

(অজাত পরিচ্ছদটি পরিধান করিল)

কি মজা, পৃথিবীর সকল আনন্দ-ভাণ্ডারকে যেন আমি নিংড়ে শুষে নিয়েছি। আমার আর কোন ভয় নেই,...এখন আমার ক্ষমতা সকলের উপরে, সকলেরই মাথা আমার কাছে নত হবে। সকল পৃথিবী জানবে আমি কে, আমার মূল্য কতখানি।

(অজাতর প্রস্থান, দেবদূতের আবির্ভাব।)

দেবদূত　শেষ পর্য্যন্ত ওর পতন হোলো! এখন আবার কে আসবে কে জানে! তার অদৃষ্টও তো অদৃশ্য রহস্যে বিজড়িত। জীবনযাত্রার আরম্ভের পূর্ব্বে কত অজাতকে দেখছি যাদের অন্তরেও এমনি ভাবেই প্রেমের উজ্জ্বল শিখা জ্বলে উঠেছিল,—যা দেখে মানুষ মুহূর্ত্তের জন্যও হয়তো বুঝতে পেরেছিল প্রেমের কোন অমরলোক হতে তারা এসেছে।

মঞ্জু আচার্য্য

রেনে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

য়ু-চে'দের অভিযান ও শক অক্রমণ

দেখা গেল যে প্রথমে গ্রীকো-ব্যাকৃট্রিয়, পরে, ইন্দো-গ্রীসীয় রাজ্যের পতন, য়ু-চেদের অভিযানের ফল।

য়ু-চেদের আমরা তাদের চৈনিক নামে অভিহিত করি; কিন্তু গ্রীকরা তাদের পরে জানান 'তোখারিস্', সংস্কৃত 'তুখার' অথবা ইন্দো-শিথিয়ান নামে। তাদের আদি দেশ গোবিমরুস্থিত তুয়ান-হুয়াং বা বর্ত্তমান চীনের কান-সু প্রদেশ। সীগ ও সীগলিং প্রমুখ জনকতক প্রাচ্যজ্ঞ পণ্ডিত মনে করেন যে, এই জাতিই আসিয়ায় "তোখারিয়েন" নামক ভাষার প্রবর্ত্তনা করেছে। এটি একটি ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা-বিশেষ, যেটি বর্ত্তমান যুগের দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত গোবির উত্তর মরূদ্যানে,তুর্ফান থেকে কুশ অবধি কথ্য ছিল। অন্যান্য পণ্ডিতের মতে এরা শক-দেরই সমশ্রেণীর প্রাচ্য-ইরাণী জাতি। দুই মতানুসারেই য়ু-চেরা ইন্দো-য়ুরোপীয় শকজাতি; অথচ কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত তাদের তুর্কীজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হত। খৃঃ পূঃ ১৭৬ ও ১৬৫-র মধ্যে এরা মঙ্গোলিয়ার হিয়ং-নু (হূণ) জাতি কর্ত্তৃক বারম্বার পরাজিত এবং অবশেষে কান-সু ও তার সংলগ্ন মরূদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়। তারা পশ্চিমদিকে যাত্রা করে, ইলিপ্রদেশে কিছুকাল বাস করে, সেখানে পুনরায় হূণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়, এবং আবার অভিযান আরম্ভ করে; এবার দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে, ফরগণা ও ট্রান্স্-অক্সিয়ানার দিকে।

কাশগর ও ফরগণা প্রদেশ বহু শতাব্দ যাবত প্রাচ্য-ইরাণীদের অধিকারভুক্ত ছিল; তারা অর্ধ যাযাবর রয়ে গিয়েছিল, ও শক-নামে পরিচিত ছিল (সংস্কৃত শক, পারস্য লেখের সক, চীনেদের সিউ)। য়ু-চেরা শকদের পাশ কাটিয়ে অথবা কিঞ্চিৎ বিধ্বস্ত ক'রে (অনুমান ১৬৩) গ্রীকো-ব্যাকৃট্রিয়ানদের আক্রমণ করলে।

* শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত "রেনে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ" সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।

আমরা দেখেছি যে, ১৬২ থেকে ১৫৫-র মধ্যে তারা গ্রীকরাজ ইউক্রাটীডিসের কাছ থেকে সগ্‌ডিয়ানা কেড়ে নিয়েছিল। ১৩৫ (?) খৃষ্টাব্দের দিকে আবার শকগণ সম্ভবত য়ু-চে'দের তাড়না থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য গ্রীকদের কাছে সমগ্র ব্যাক্‌ট্রিয়াই কেড়ে নিলে। কিন্তু তারা প্রায় তৎক্ষণাৎ য়ু-চেগণ কর্ত্তৃক সেখান থেকে বিতাড়িত হয়; এবং শেষোক্ত নিজেদের সেখানে প্রতিষ্ঠা ক'রে আপন এক সম্প্রদায়ের নামে সে দেশের নাম দেয় তুহারেস্থান (অনুমান ১২৯-১২৫ ?)।

শকগণ ব্যাক্‌ট্রিয়া থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পূর্ব্ব গ্রীসীয় উপনিবেশ আরাসোজিয়া (কাণ্ডাহার) ও দ্রাঙ্গিয়ানায় নিবাস স্থাপন করলে,—শেষোক্তের নাম হল শকস্থান (সইস্তান)। সেখান থেকে তারা পঞ্জাবের দুই গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করলে। র‍্যাপসন সাহেবের দলের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা মেনে নিচ্ছি যে, অনুমান খৃঃ পূঃ ৭৫(?) তাদের রাজা মাওয়ে পশ্চিম প্রদেশ (তক্ষশিলা) বল-পূর্ব্বক প্রবেশ বা পরাজয় করেন, এবং অনুমান ৫৮ (?) তাঁর উত্তরাধিকারী আরো দক্ষিণ প্রদেশ অধিকার করেন (শাকল)। শকগণ তাঁদের বিজয়যাত্রা বিস্তার করলেন পূর্ব্বে মথুরা পর্য্যন্ত, দক্ষিণে সিন্ধুনদের দোয়াব কাথিওয়াড় ও গুজরাট পর্য্যন্ত। মাউয়ে সিন্ধুনদের দক্ষিণতীরে মীননগরের বন্দর স্থাপন করেন বলে শোনা যায়। এই রাজাদের মুদ্রা অল্পবিস্তর ইন্দো-গ্রীকদেরই অনু-করণে তৈরি, তাদেরই মত গ্রীক ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই অঙ্কিত।

সইস্তান ও ভারতের শকরাজ্যগুলি অনতিবিলম্বে পার্থদের (সংস্কৃত পহ্লব) অধীন হয়। দুই জাতিই শক-ইরাণীয়, এবং ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট ব'লে বোধ হয়। এমন কি, আমরা দেখতে পাই ১৯ ও ৪৫ অথবা ২০ ও ৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শক রাজ্যগুলি পার্থরাজ গন্দোফার্নিস কর্ত্তৃক শাসিত। এই গন্দোফার্নিসই সম্ভবত খৃষ্টীয় পুরাণকাহিনীমতে স্বীয় রাজধানী মীননগরে খৃষ্টশিষ্য সেন্ট্-টমাসকে হয় শহীদ করেছিলেন, কিম্বা তাঁর কাছ থেকে ধর্মাভিষেক গ্রহণ করেছিলেন। এই শক-পহ্লব রাজ্য ১ম শতাব্দীর মাঝামাঝি য়ু-চে'দের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়, এবং পঞ্জাব তাদের হস্তগত হয়। কিন্তু বোধহয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সিন্ধুদেশ আর সর্বোপরি কাথিয়াওয়াড় ও গুজরাট (সুরাষ্ট্র) শকদের অধিকারভুক্ত ছিল এবং এক নব শকস্তানে পরিণত হয়েছিল।

কুশাণ-সাম্রাজ্য—কণিষ্ক

খৃঃ পূঃ ১২৫-এর দিকে য়ু-চে'রা ব্যাকৃট্রিয়া জয় করেছিল। সার্ধ শতাব্দী পরে, কুশাণ নামক এক রাজবংশ কর্তৃক তাঁদের পৃথক সম্প্রদায়গুলি একীভূত হয় এবং সৌভাগ্য চরমে উন্নীত হয়। আদি কুশাণ কোজুলো (বা কুয়ুলা কর) প্রথম কাডফিসেসের রাজত্বকাল, ফুসে সাহেবের মতে ২৫ থেকে ৬০ এবং ভিনসেণ্ট স্মিথ্-এর মতে ৪০ থেকে ৭৮ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত। শোনা যায় তিনি শক ও পার্থদের কাছ থেকে গান্ধার এবং পঞ্জাবের একাংশ কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী বিম (বা বীমো) দ্বিতীয় কাডফিসেস (৬০-৭০ বা ৭৮-১১০?) সম্ভবত পঞ্জাববিজয় সমাপ্ত করেন এবং তার উপর দোয়াব ও অযোধ্যাজয় যোগ করেন। দশ বৎসর পরে তৃতীয় এক কুশাণ রাজের আগমন হয়, তিনি পূর্বোক্ত দুজনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বোধ হয় না।—তাঁর নাম কনিষ্ক (ফুসের মতে ৮—১১০, স্মিথের মতে ১২০—১৬২)। কাডফিসেসেরা ব্যাকৃট্রিয়াতেই থেকে গিয়েছিলেন মনে হয়, কিন্তু কণিষ্ক যেন ইন্দো-আফগান সীমান্তে বাস করতেন,—কখনো কাপিশে, কখনো পুরুষপুরে (পেশাওয়ার)। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ হুবিষ্ক (১১০—১৫২ ? বা ১৬২—১৮২ ?) এবং বাসুদেবও (১৫০ ? —১৭৬ ? বা ১৮২—২২০ ?) সম্ভবত ভারতবর্ষে বাস করতেন (শেষোক্ত মথুরায় পুণ্যকীর্ত্তি স্থাপন করে গেছেন)। এই রাজগণের রাজত্বকালের অনির্দ্দিষ্টতার দরুণ বলা যায় না হিউ-হান-চু যে চীনদেশের সঙ্গে যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, সেটা এঁদের মধ্যে কার সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

উত্তরকালে চৈনিক বিজেতা পান-চাও কাশগরবিজয়ে রত ছিলেন (বর্ত্তমান পূর্ব্ব-তুর্কীস্থান)। ৯০ খৃষ্টাব্দে কুশাণরাজ দ্বিতীয় কাডফিসেস্ অথবা কণিষ্কের সঙ্গে চীন রাজদরবারের মনান্তর ঘটবার কারণ এই যে, শেষোক্ত প্রথমোক্তকে কোন রাজকন্যা দানে অসম্মত হয়েছিলেন। এইজন্য কুশাণরাজ কাশগরীতে এক দল সৈন্য পাঠান, চীনের সঙ্গে যুদ্ধরত কুশনাগরিকদের সাহায্যার্থে। কিন্তু পান-চাওয়ের নিকট এই সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। ১২০ খৃষ্টাব্দের দিকে কুশাণদের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত সুপ্রসন্ন হয়। চীনশক্তি হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ ক'রে তাঁরা ক্ষণকালের জন্য কাশগর রাজ্যের উপর, এবং সেই সূত্রে য়ারকণ্ডের

উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। অবশেষে চীনগণ কাশগরী পুনরধিকার করেন; এবং কুশাণগণ এ ক্ষেত্রে নিজের প্রচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করেন।

ইরাণ ও ভারতবর্ষের মধ্যে ক্রমাগত ঘোড়দৌড় করত এই কুশাণ সাম্রাজ্য যে নানা ভিন্ন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তার পরিচয় তাদের মুদ্রাতেই ধরা পড়ে। প্রথম কাডফিসেস শেষ ইন্দো-গ্রীক বা রোম সম্রাটের মুদ্রা অনুকরণ ক'রেই সন্তুষ্ট ছিলেন, তার উপর সনাতন গ্রীসীয়-প্রাকৃত যুগল ব্যাখ্যাসহ। দ্বিতীয় কাডফিসেস, কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব নিজ নিজ মূর্তি মুদ্রায় অঙ্কিত করতেন। তাঁদের চেহারা ঠিক পাকা শকদের মত, যেমন সিমেনীয় বস্ফরসে গ্রীক ফুলদানির উপর অঙ্কিত দেখা যায়:—শ্মশ্রুশোভিত মূর্তি, মাথায় উচ্চ লোমশ টোপর অথবা টায়রাজাতীয় শিরস্ত্রাণ, পরণে লম্বা জোব্বা, পায়ে ভারি পুরু বনাতের বুটজুতা। (পেশাওয়ারে প্রাপ্ত বলে যে স্মরণচিহ্নাধার দেখা যায়, তাতেও কণিষ্কের চিত্র এইরূপ)। গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় "বাসিলিয়ুস" উপাধিতে, লেখের গ্রীক অক্ষরে, এবং হেরাক্লিস্ হেলিয়স ও সেলেনসের মূর্ত্তিতে। ইরাণীয় প্রভাব মিত্র, মাও, নানা, আর্দক্ষ, পারো, বেরেত্রায়নের প্রতিকৃতিতে, এবং কণিষ্ক ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাওনানো শাও (শাহান শা) উপাধিতে। দ্বিতীয় কাডফিসেসের মহারাজ রাজাধিরাজ উপাধিতে ভারতবর্ষের সাধারণ প্রভাব সমর্থিত। ভারতবর্ষীয় ধর্মসম্প্রদায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে, হিন্দু-ধর্মের পক্ষে রয়েছে শিবের নানা মূর্তি, ওয়েশো (বৃষ-শিব) স্কন্দ, মহাসেন প্রভৃতি নাম, দ্বিতীয় কাডফিসেসের অঙ্গীকৃত বিশেষণ মহেশ্বর; এবং রাজা বাসুদেবের বৈষ্ণবোচিত নাম। পরিশেষে বৌদ্ধধর্মের আনুমানিক আবির্ভাব কাডফিসেসের মুদ্রায় "সত্য ধর্মের ধ্রুব বিশেষজ্ঞ" উপাধিতে, এবং নিশ্চিত আবির্ভাব কণিষ্কের মুদ্রায় বুদ্ধের চিত্রে, তার নীচে গ্রীক অক্ষরে লেখা Boddo। অপরপক্ষে মার্শাল সাহেব ও স্পুনার সাহেব ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শাহ-জী-কি-ঢেরি স্তূপে একটি স্মারক চিহ্নাধার আবিষ্কার করেছেন, তার উপর অন্যান্য বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্গে উৎকীর্ণ রয়েছেন একটি মাথায় টায়রা দেওয়া, শক-ইরাণী বেশপরা মানুষ, যাঁর নাম কণিষ্ক বলে লেখা আছে।

তা'ভিন্ন সংস্কৃত ও চীনা বৌদ্ধ শ্লোকে একবাক্যে স্বীকৃত যে, কণিষ্ক বৌদ্ধ

ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এক নবতর অশোকবিশেষ। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এঁরা এই বর্বর বিজেতাকে যে ভূমিকায় দাঁড় করান, তা'তে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে ক্লোবিসের অনুরূপ সম্বন্ধ স্মরণ করিয়ে দেয়। এই শাস্ত্র প্রমাণে দেখা যায়, তিনি পঞ্জাব ও কাশ্মীরের সীমান্ত দেশস্থ জালন্ধরে একটী মহতী সভা আহ্বান করেন; ফলত এই সভা দ্বারাই সংস্কৃত বা সর্ব্বাস্তিবাদিন্ ধর্মশাস্ত্র বিধিবদ্ধ হয়। এই সভার সভাপতিদ্বয়,—কণিষ্কের বৌদ্ধ মন্ত্রী পার্শ্ব এবং বসুমিত্র, ত্রিপিটকের প্রত্যেক পিটকের এক প্রামাণ্য ভাষ্য বা বিভাষা লিপিবদ্ধ করান (সূত্রোপদেশ, বিনয়-বিভাষা, অভিধর্ম বিভাষা)। কণিষ্কের রাজ্যে (বিশেষত মথুরা ও কাশ্মীরে) সর্ব্বাস্তিবাদিনরাই দলে ভারি ছিল, তাই এইরূপে তারা নূতন বিধর্ম দ্বারা সত্যধর্মের বিকারকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল খুব সম্ভব। অপর পক্ষে, বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষও কণিষ্কের মন্ত্রী ছিলেন। তাকে সম্ভবত তিনি উক্ত সভায় আহ্বান করেছিলেন এবং তার উপর বিভাষার মতবাদকে সাহিত্যিক আকার প্রদানের ভার দিয়েছিলেন।

কণিষ্ক এবং অপরাপর কুশাণরাজদের ক্ষেত্রে যে নানাপ্রকার ধর্মপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তার কারণ সুস্পষ্ট; রোম সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষ ও চীনদেশ পর্য্যন্ত যে বাণিজ্য পথ ছিল, কুশাণ রাজ্য তার চৌ-মাথায় অবস্থিত। টলেমির লিখিত মতে (১।১১ ও ১২ পরিঃ) সার্থবাহের রাজপথ বা রেশমের যাত্রাপথ সিরিয়া থেকে বেরিয়ে নিশীবস্থ এডেসা থেকে ইরাণে উঠত; পরে এনবাট্রানিয়া ও রাজ্যে দিয়ে পার্থ সাম্রাজ্য পেরিয়ে ব্যাকট্রিয়ায় পৌঁছত, অর্থাৎ ইন্দো-শক বা কুশাণদের রাজ্যে। সেখান থেকে রাস্তা দ্বিধাবিভক্ত হত। একটি পথ গান্ধার উপত্যকায় পড়ত। অপরটি যেত কোমেদ পাহাড়ের দিকে (বর্ত্তমান পামিরস্থ কুমেধ) এবং রোষান ও ফরগানার ভিতরকার রেশমী বাজারে গিয়ে পৌঁছত। সে জায়গাকে বল্‌ত লিথিনস্ পির্‌গস্ (পাথরের বুরুজ) ও সেখানে পূর্বতুর্কী এবং চীনা সার্থবাহীদের মালের অদলবদল হত। টলেমির কাছ থেকে আমরা এমন খবরও পাই, টির সহরের মারিনস্ প্রমুখাৎ (১ম শতাব্দী) যে সিরিয়া-নিবাসী সায়েস্ টিটিয়ানস্ নামক এক মাসেডোনীয় সওদাগর এক রাস্তা দিয়ে সরস নগর পর্য্যন্ত কর্ম্মচারী পাঠিয়েছিলেন। (এই "সেরা রাজধানী" কি কান্-সু'র কোন সহর ? বা সিনিয়ান-ফু ? কিম্বা দ্বিতীয় হানদ্রের রাজধানী লো-য়াড) ?

বাসুদেবের পর থেকে কুশাণদের বিষয় আমরা প্রায় কিছুই জানতে পাইনে। এই বংশের রাজগণ তাঁদের ইন্দো-ইরাণী সাম্রাজ্য হারিয়েছিলেন ব'লে বোধ হয়। কিন্তু তাঁরা একদিকে রক্ষা করেছিলেন পঞ্জাবের কতকগুলি প্রদেশ এবং কাবুল ও গান্ধার, অন্যদিকে ব্যাক্‌ট্রিয়া ; সেখানে তাঁরা পঞ্চম শতাব্দীর হূণ আক্রমণ পর্য্যন্ত (সম্ভবত পারস্য সাসানীডদের রাজত্বকালে) নিজেদের বজায় রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন, যিনি চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাবুলে রাজত্ব করতেন, সাসানীড দ্বিতীয় হোর্‌মজ্‌দ্‌কে (৩০১-৩১০) কন্যাদান করেন। আর একজন কিদার নামে ব্যাক্‌ট্রিয়ার রাজা ছিলেন, তিনি ৪২৫ খৃষ্টাব্দের দিকে হেফ্‌তালীট হুন (হূণ) দের আক্রমণে সেখান থেকে তাড়িত হয়ে গান্ধারে বাসস্থাপন করেন। ৪৭৫-এর দিকে হূণগণ গান্ধারসুদ্ধ অধিকার করায় কুশাণগণ চিত্রাল ও গিল্‌গিটের অধিত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। হূণদের পরাজয়ের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁরা সেখান থেকে নেমে আসেন, এবং নবম শতাব্দী পর্যন্ত গান্ধার প্রদেশের একাংশ তাঁদের অধিকারভুক্ত থাকে। তারপর এক ব্রাহ্মণ বংশ সিংহাসনারূঢ় হন।

অন্ধ্র এবং ক্ষত্রপ

আমরা দেখলুম যে, বর্ত্তমান অব্দের কাছাকাছি শকগণ সুরাষ্ট্রে (কাথিয়াওয়াড় এবং গুজরাট) নিজেদের স্থাপন করেন, ও সেখান থেকে মালবদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন। এই প্রদেশের শাক্যরাজগণ "ক্ষত্রপ" নামক ইরাণী উপাধি ধারণ করেন। সম্ভবত তাঁরা পঞ্জাবের কুশাণ সম্রাটদের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। অন্ততঃ "মহাক্ষত্রপ" কষ্ঠানের সেই পদবী ছিল, যিনি ছিলেন টলেমির "ওজেন (উজ্জয়িনী) রাজ টিয়াষ্টানেস", এবং যিনি দ্বিতীয় কাড্‌ফিসেস্ বা কণিষ্কের সময় (অনুমান ৮০ খৃঃ ?) সুরাষ্ট্র এবং মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন ব'লে মনে হয়। এই সময়ে আর এক রাজবংশের দর্শন পাওয়া যায়, তাঁদেরও উৎপত্তি সম্ভবত শাক্য বংশে। তাঁদের নাম ক্ষহরাত, এবং নিবাস আরও দক্ষিণে, মহারাষ্ট্র দেশে। প্রধান ক্ষহরাত ছিলেন নহপান, এবং তিনিও সম্ভবত ছিলেন দ্বিতীয় কাড্‌ফিসেস বা কণিষ্কের সামন্ত।

দাক্ষিণাত্যে তেলুগু দেশের পরিধি মধ্যে অন্ধ্ররাজ্যের অভ্যুদয় হয় (প্লিনির

আন্দারয়), বর্তমান নিজাম রাজ্যের হায়দ্রাবাদ। অন্ধ্রগণ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, এবং মৌর্য বংশের অধঃপতনের পূর্বেই (খৃঃ পূঃ ২৩০-২২০ ?) স্বাধীনতা লাভ করে। তাদের রাজাদের মধ্যে অনেকেরই নাম শাতকর্নী থাকায়, ইতিহাসে তারা প্রায়শ এই নামেই অভিহিত। তারা উত্তর-পূর্ব বা মহারাষ্ট্রের দিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তাদের এইদিকে ঠেলে যাবার এবং দেশস্থ ক্ষাত্রপদের সঙ্গে বিবাদ হবার কারণ মনে হয় মারাঠী ঘাটসোপান অধিকারের ইচ্ছে, যেগুলি ছিল Levant-এর বাণিজ্যের ভাণ্ডার-ঘর। এই উদ্দেশ্যে তারা নিম্ন-কৃষ্ণা নদীর তীরস্থিত তাদের রাজধানী অমরাবতীকে উচ্চ-গোদাবরীর প্রতিষ্ঠান (পৈঠান) নগরীতে তুলে নিয়ে গেল। শক এবং কুশাণরা ছিল বিদেশী, অপর পক্ষে এরা ছিল খাঁটি ভারতবর্ষীয় ; তাই এরা যথার্থই দেশস্থ ধর্ম্মের বিশেষত ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের দাঁড় করাতে পারত। অমরাবতীর স্তূপ (খৃঃ পূর্ব ২০০-২০০ খৃঃ) এবং অজন্তার ৯ম ও ১৪ম গুহাগুলি (১০০ খৃঃ-র দিকে) তাদেরই রাজত্বকালে উদ্ভুত শাতবাহন নামক এক অন্ধ্ররাজ, যিনি হাল নামেই বেশি পরিচিত (অনুমান ৬৯-৭৪ ?), তিনি সত্তসাই (সপ্তশতক) নামক মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত মনোহর কাব্যসংগ্রহের রচয়িতা ব'লে প্রসিদ্ধ।

১১৭-১২৪-এর দিকে (?) অন্ধ্ররাজ গৌতমীপুত্র মহারাষ্ট্র দেশস্থ শহরাতদের শাক্যরাজ্য বিনাশপূর্ব্বক আত্মসাৎ করেন। কিন্তু মালবদেশস্থ (উজ্জয়িনীর) ক্ষত্রপ রুদ্রদমন নামক অপর এক শাক্যবংশীয় এর প্রতিফল স্বরূপ অন্ধ্রদের কাছ থেকে তাদের অধিকৃত প্রদেশসকল কেড়ে নিলেন (অনুমান ১২৮-১৩০ ?)। রুদ্রদমনের বংশ ক্ষত্রপ বংশ ব'লে খ্যাত। তাঁরা তদবধি উজ্জয়িনীকে রাজধানী ক'রে সুরাষ্ট্র (কাথিয়াওয়াড় ও গুজরাট) মালব ও কোঁকন প্রদেশে রাজত্ব করতে লাগলেন,—যতদিন না গুপ্তগণ দ্বারা সে রাজধানী বিধ্বস্ত হয় (৩৮৮-৪০১-এর মধ্যে)। ২২৫-২৩৫-এর মধ্যে পহ্লবগণ অন্ধ্ররাজ্য বিনষ্ট করে।

সুরাষ্ট্র ও মালবের শকরাজ্য এবং অন্ধ্ররাজ্য সমুদ্রপথ দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। ষ্ট্রাবোর (২১ খৃঃ) গ্রন্থে আমরা ভারতবর্ষ এবং মিশর দেশের মধ্যে রীতিমত নৌবহর (১২০টি জাহাজ) চলাচলের

সংবাদ পাই ; এবং প্লিনি বলেন ভারতবর্ষ থেকে রোম সাম্রাজ্য প্রতি বৎসর ৫ ক্রোর sesterces (?)-এর মাল খরিদ করতেন। এই বাণিজ্য ব্যপদেশে নিম্নলিখিত ভারতীয় বন্দরগুলি ছিল বিশেষ লাভবান :—ভরুকচ্ছ (ব্রোচ), মাঙ্গালোরের নিকটবর্ত্তী "মুসিরিস্" এবং মসুলিপট্টমের নিকটবর্ত্তী "মায়সোলিয়া"। তা'ছাড়া কোঙ্কনে "যবন" সওদাগরদের বৌদ্ধ দানসকল আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে জুলিওক্লাডিয়ান রাজবংশের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এমন কি, "মুসিরিস্"-এ ভূমধ্যসাগরিক ব্যবসাদারগণ সম্রাট অগষ্টসের নামে একটা মন্দির পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিল। এবং খৃঃ পূঃ ২০ অব্দে একজন অজ্ঞাতনামা ভারতীয় রাজকুমার (রাজা ?) অগষ্টসের কাছে একটি দূত বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা এসিয়া-মাইনর-এর সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্যামস্ দ্বীপে সম্রাটের সাক্ষাৎলাভ করেন।

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সকাল বেলাই এমন একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি হইবে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। মনে মনে সকলেই একটা শঙ্কা-জড়িত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। বিভূতি সদানন্দকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করায় যে খাপছাড়া কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, বিপিনের আবির্ভাবে এখনকার মত সেটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য? মহেশ চৌধুরী ছাড়িবার পাত্র নয়। সে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, বিভূতি সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম না করিলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাইবে। বিপিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলেই সে আবার ছেলেকে নিয়া পড়িবে।

কিন্তু কি বোঝাপড়া হইবে বিপিনের সঙ্গে? মহেশ চৌধুরী কি চুপ করিয়া থাকিবে বিপিনের ধমক সহ্য করিয়া? ধমকটা সদানন্দ দিলে সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিত, সদানন্দ এমন প্রচণ্ড শব্দে ধমক দিলে এতটা খারাপ শোনাইত না। মহেশ চৌধুরীর মত ভক্তকে ধমক দিবার অধিকার সদানন্দের মত মহাপুরুষের থাকে এবং আগেও অনেকবার অনেক ছুতায় মহেশ চৌধুরীকে সে অপমান করিয়াছে। সদানন্দের অপমান অনেকটা গা-সহা হইয়া আসিয়াছে মহেশ চৌধুরীর। কিন্তু বিপিনের অপমান সে সহ্য করিবে কেন? দুজনে যদি এখন কলহ বাধিয়া যায়!

মহেশ চৌধুরী কি বলে শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরীর মুখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। বিপিনের ধমকটা তার কানে গিয়াছে কি না এ বিষয়েও যেন কেমন সন্দেহ জাগে। চাহিয়া সে থাকে মাধবীলতার মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর তার একটা নূতন রূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনায় শশধর ও সদানন্দের কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরীর মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হইয়া আসে। আকাশের দিকে

একবার মুখ তুলিয়া উদাস কণ্ঠে সে বলে, 'মাধু আশ্রমে আসতে পাবে না হুকুম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না বিপিন বাবু।'

মহেশ চৌধুরীর ভঙ্গিটাই মারাত্মক। তার উপর 'হুকুম' শব্দটা সকলের কানে যেন বিঁধিয়া যায়।

মাধবীলতার অপরাধ-ক্লিষ্ট মুখের ম্লানিমায় স্নায়বিক মূঢ়তার ভাবটাই এতক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল, তবে মহেশ চৌধুরী ছাড়া সেটা কেউ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিজের প্রয়োজনে কে আর ওভাবে তরুণী মেয়ের মুখ দেখিতে শেখে? সোজাসুজি ভীরুতা আর কোমলতার অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া নেওয়ায় কত ভাল লাগিতেছিল সকলের, কেমন দরদ সকলে বোধ করিতেছিল মেয়েটার জন্য। কিন্তু ওরকম বর্ব্বরের মত মায়া করা মহেশ চৌধুরীর ধর্ম্ম নয়, ওরকম সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা তার নাই। মানুষের এই স্বগত রসানন্দরূপী পিপাসা-সৃষ্টির আগ্রহ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় অসংখ্য ছোট ছোট মুক্তির মধ্যে মহেশ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। মাধবীলতার ভীরু কোমল কাঁদ' কাঁদ' মুখখানা দেখিয়া মহেশ চৌধুরী ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিত তার ভয় বা দুঃখ হয় নাই, আকস্মিক স্নায়বিক উত্তেজনায় সে একটু দিশেহারা হইয়া গিয়াছে? খোঁচা দিয়া তার আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার এবং তার অবরুদ্ধ তেজকে মুক্তি দিবার বুদ্ধি বা সাহস আর কার হইত? সোণালী রোদের মতই মাধবীলতার মুখে লালিমার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিয়া মহেশ আবার বলে, 'এবারকার মত ওকে মাপ করুন বিপিন বাবু। আপনি ওকে বারণ করেছেন জানলে—' বিপিনের আদেশ অমান্য করায় মাধবীলতার যে অকথ্য অপরাধ হইয়াছে তার বিরাটত্ব অনুভব করিয়া মহেশ চৌধুরী নিজেই যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কোন রকমে এবারকার মত মেয়েটাকে বিপিনের ক্ষমা পাওয়াইয়া দিবার ব্যাকুলতায় যেন দিশেহারা হইয়া যায়। মাধবীলতার হইয়া সে যেন বিপিনের পায়ে ধরিয়া বসিবে।

এবার মাধবীলতা ফোঁস করিয়া উঠে, 'বারণ করেছেন মানে? উনি বারণ করবার কে? বেশ করেছি আমি আশ্রমে এসেছি।'

বিপিন বলে, 'আশ্রমটা বেড়াবার যায়গা নয় মাধু।'

মাধবীলতা ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'কি করবেন, মারবেন?'

সদানন্দ বলে, 'আহা, কি আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা ?'

সে কথা কানে না তুলিয়া বিপিন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, 'ছেলেমানুষী কোরো না মাধু। আমার সঙ্গে এসো।'

মহেশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া বলে, 'যাও মা, যাও। বিপিন বাবুর সঙ্গে যাও।'

মহেশ চৌধুরী ফোড়ন না দিলে হয়তো মাধবীলতার উদ্ধত ভাবটা ধীরে ধীরে নরম হইয়া আসিত। বিপিনের সংযমহারা রাগ দেখিতে ভিতরে ভিতরে তার যেন কেমন ভাল লাগিতেছিল। সেদিন রাত্রের কথা মাধবীলতার মনে পড়িয়া গিয়াছে, বিপিন যখন তাকে মহেশ চৌধুরীর বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রের স্মৃতি ভুলিবার নয়, মাধবীলতা ভুলিয়াও যায় নাই। হঠাৎ তার খেয়াল হইয়াছে, সে রাত্রে বিপিন তার সঙ্গে যে আশ্চর্য্য ব্যবহার করিয়াছিল, তার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যেখানে যাইতে চায় পাঠাইয়া দিবে, তাকে বাড়ী কিনিয়া দিবে, তার নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে, মাঝখানে কয়েকদিনের ছেদ দিয়া আজ দিনের আলোয় বিপিন যেন সেই ব্যবহারেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। তফাৎ কেবল এইটুকু যে, মাঝখানের সময়টাতে সে যেন সত্যসত্যই নিঃসন্দেহে বিপিনের হইয়া গিয়াছে। বিপিনের রাগ আর ধমক দিয়া জোর গলায় কথা বলার মধ্যে পর্য্যন্ত মাধবীলতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে বিপিন জোর খাটাইতেছে আত্মীয়তার, অন্য কিছু নয়। সে যেন বিপিনের মেয়ে বা বৌ একটা কিছু।

কিন্তু মহেশ চৌধুরী ফোড়ন কাটায় এতগুলি মানুষের সামনে বিপিনের ব্যবহারে মেজাজটা তার চড়িয়াই যাইতে থাকে। সকলের সামনে এভাবে শাসন করিতে গেলে মেয়ে বা বৌও চটিয়া যায় বৈকি।

মাধবীলতা বিভূতির সামনে গিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পিছন ফিরিয়া।

'চলুন আমরা ফিরে যাই বিভূতিবাবু। যাবেন ?'

'আমার ওখানে একবার আসবে না মাধু ?'—সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'যাও মা যাও, প্রভুর মন্দিরে একবার যাও।'

মাধবীলতা জবাবও দিল না।

বিভূতি এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া সে

বাড়ীর দিকে রওনা হওয়ার উপক্রম করে, সকলে দাঁড়াইয়া থাকে কাঠের পুতুলের মত। বিভূতি অস্বীকার করিয়াছে প্রণাম করিতে, মাধবীলতা ফিরিয়া চলিল আদেশ অমান্য করিয়া! চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে না কি সদানন্দের বিরুদ্ধে? আশ্রমে দাঁড়াইয়া সদানন্দকে এভাবে অপমান আর অমান্য করা! দাঁতের বদলে রত্নাবলীর চোখ দু'টি চকচক করে। শশধর বোকার মত হাঁ করিয়া থাকে। কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বিপিন অসহায় ক্রোধ দমন করার জন্য একটা বিড়ি ধরায়। সদানন্দের ভীতিকর গাম্ভীর্য্য ঘনীভূত হইয়া আসে। বিপিন আর সদানন্দ দুজনের মনেই প্রায় এক ধরণের অদম্য ইচ্ছা জাগে—ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বগলদাবা করিয়া বিভূতিকে আথালি-পাথালি প্রহার করা।

মহেশ ডাকে, 'বিভূতি।'

বিভূতি দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরাইয়া তাকায়। মাধবীলতা দাঁড়ায় কিন্তু মুখ ফিরায় না।

মহেশ বলে, 'এখানে এসো।'

বিভূতি কাছে আসে এবং হাই তোলে। মাধবীলতা সঙ্গে আসে কিন্তু মুখ নীচু করিয়া থাকে।

মহেশ বলে, 'প্রভুকে প্রণাম কর।'

সদানন্দ বলে, 'তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ মহেশ।'—সদানন্দের গলা কাঁপিয়া যায়।

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, 'বাড়াবাড়ি প্রভু? ও যদি আপনাকে এখন প্রণাম না করে আমায় যে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে হবে প্রভু।'

সদানন্দ বলে, 'তাই যাও তুমি, বজ্জাত কোথাকার!

মহেশ তখনও হাত জোড় করিয়া বলে, 'ওকে প্রণাম না করিয়ে কেমন করে যাব প্রভু?'

সদানন্দ বাক্যহারা হইয়া থাকে। মহেশ বলে, 'বিভূতি, প্রণাম কর প্রভুকে।'

বিভূতি নড়ে না। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া সশব্দে মহেশের গালে বসাইয়া দেয় এক চড়।

কিছুদূরে চালার নীচে আশ্রমের অধিকাংশ নরনারী জমা হইয়াছিল; দু'চারজন করিয়া তখনও আসিয়া জুটিতেছিল। সদানন্দ আজ আত্মজ্ঞান লাভের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্য্যের স্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সকলে নিঃশব্দে সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতে করিতে কাটের গুঁড়িটার কাছে এদের লক্ষ্য করিতেছিল। ততদূর হইতে কথা বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সকলের চলাফেরা আর অঙ্গভঙ্গির নির্ব্বাক অভিনয় দেখিয়া বেশ অনুমান করিতে পারিতেছিল যে রীতিমত একটি নাটকীয় ব্যাপারই ঘটিতেছে। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীর গালে যে চড় বসাইয়া দিয়াছে, এটা তারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। হঠাৎ একটা জোরালো গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

সদানন্দ সকলের আগে একবার চাহিয়া দেখিল চালার দিকে। অনেক সাক্ষীর সামনেই মহাপুরুষ সদানন্দ সাধু মহেশ চৌধুরীকে মারিয়া বসিয়াছে বটে। তখন কেবল ঘটনাটা সকলের চোখে পড়িল, পরে বিস্তারিত বিবরণ শুনিবে।

রত্নাবলীর চোখ আর দাঁত দুই-ই তখন চকচক করিতেছে। মাধবীলতা একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে ডান হাতের চারটি আঙ্গুল—ছেলেবেলায় মাধবীর এই অভ্যাসটা ছিল, বড় হইয়া কোনদিন এভাবে সে মুখে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেয় নাই।

থতমত খাইয়া গিয়াছিল সকলেই, কিন্তু দেখা গেল অবাধ্য বিভূতি বাপের অপমানের প্রতিকার করিতে বড়ই চটপটে। মহেশ চৌধুরীর মোটা বাঁশের ছড়িটি কাটের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া রাখা ছিল। চোখের পলকে লাঠিটা তুলিয়া নিয়া সে সদানন্দের দিকে আগাইয়া আসিল। দেশের জন্য মানুষ খুন করার কেবল পরামর্শ করার জন্য এতগুলি বছর সে আটক থাকিয়া আসিয়াছে, আজ বাপের জন্য হয়তো সত্যসত্যই মানুষ খুন করিয়া বসিত। বাধা দিল মহেশ।

'ছি বিভূতি, ছি।'

বিভূতির হাতের লাঠি ছিনাইয়া নিয়া সদানন্দের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহেশ চৌধুরী তার মাথা গুঁজিয়া দিল।

'আপনাকে রাগিয়েছি, আমায় মাপ করুন প্রভু। ছেলে আমার আপনাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠেছিল, আমায় মাপ করুন প্রভু।'

প্রায় আর্ত্তনাদ করার মত চীৎকার করিয়া বিভূতি বলিল, 'তোমার কি লজ্জাসরম নেই বাবা ?'

'কি বকছিস্ তুই পাগলের মত ? প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে প্রণাম কর। ও বিভূতি, শীগগির প্রণাম কর প্রভুকে। আমি না তোর বাপ বিভূতি ? আমার দেবতাকে মারবার জন্য তুই লাঠি তুলেছিস, হাত যে তোর খসে যাবে রে, কুষ্ঠ হবে যে তোর হাতে। শীগগির প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে শীগগির প্রণাম কর।'

পাগল হইয়া গিয়াছে মহেশ চৌধুরী ? বিভূতি সভয় বিস্ময়ে সদানন্দের পদতলে বাপের সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্গ চাহিয়া দেখে আর তার অভিনব মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া যায়। মাধবীলতা কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, 'প্রণাম করে নিন্। তারপর ওঁকে নিয়ে বাড়ী যাই চলুন।'

বিভূতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিবার জন্য আগাইয়া যায়। মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সদানন্দের পা দুটিকে মুক্তি দেয়। হাত জোড় করিয়া নিবেদন জানায়, 'প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন ছেলের যেন আমার সুমতি হয়।'

বিকালে মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে সকলে পিঠা পায়েস খাইতে বসিয়াছে। খাওয়ার জন্য বিভূতির লুব্ধ ব্যাকুলতা দেখিয়া তার মার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। ছেলে বাড়ী ফেরার পর বিভূতির মা আজকাল কেবল নানা রকম খাবারই তৈরী করে। বিভূতি খাইতে পারে না, সামান্য কিছু খাইলেই তার পেট ভরিয়া যায়, দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত উগ্র খাওয়ার লোভের তার তৃপ্তি হয় না। তার চাহনি দেখিয়া কত কথাই যে মাধবীলতার মনে হয়। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া মাথায় সে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

ভিতরের চওড়া বারান্দায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে, মুখোমুখি হওয়ার সুবিধার জন্য। বৈকালিক জলখাবার শেষ হইতে কোন কোনদিন দু'ঘণ্টা সময়ও লাগিয়া যায়। রাজ্যের কথা আলোচনা হয় এই সময়। আজ কথাবার্ত্তা তেমন জমিতেছিল না। সকালের ঘটনায় একমাত্র মহেশ চৌধুরী ছাড়া সকলেই কমবেশী অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

হঠাৎ বিভূতি বলিল, 'আচ্ছা বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'কে আগে কথা তোলে দেখছিলাম। পাগলামী মনে হয়েছে তোদের, না ? কেন বল তো ? পাগলের কথা কাজ কোন কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, আমি তো খাপছাড়া কিছু বলিও নি, কিছু করিও নি।'

'বল নি ? কর নি ?'

'না। আমি আবোলতাবোল কথা কোনদিন বলি না, খাপছাড়া কাজ করি না। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে, তা সেটা সবারি হয়।'

'এরকম অহঙ্কার তো কখনও দেখিনি তোমার। নিজেকে প্রায় মহাপুরুষ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছ।'

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িল, 'তা করিনি, একটা সোজা সত্য কথা বলেছি। তোর অহঙ্কার মনে হল কেন জানিস্ ? তোর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার মনে আছে তুই আমার ছেলে, কিন্তু আমার বিচার করার সময় তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমি তোর বাপ। কথাটা প্রভুকে বললে অন্যভাবে বলতাম—শুনলে আমার বেশী বেশী বিনয় দেখে তুই চটে যেতিস, তখন তোর খেয়াল থাকত যে আমি তোর বাপ, আর নিজের বাপের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের অভাব দেখে লজ্জায় দুঃখে অপমানে তোর মাথা হেঁট হয়ে যেত।'

এভাবে মহেশ চৌধুরীকে কথা বলিতে মাধবীলতা কখনো শোনে নাই। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল, 'আত্মমর্য্যাদা বলতে তোরা কি বুঝিস জানিস ? ফাঁকা গর্ব্ব, গোঁয়ার্ত্তুমি। মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া তোদের আত্মমর্য্যাদা টেঁকে না, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি লাগবে, দরকার হলে প্রকাশ্যেও হাতাহাতি হয়ে যাবে, লাঠি হাতে মারতে উঠবি, তবে তোদের আত্মমর্য্যাদা খাড়া থাকতে পারবে। কি বল মাধু, তাই নয় ?'

মাধবীলতার মুখ ভর্ত্তি ছিল, খাবারটা গিলিয়া কথা বলিতে হওয়ায় বড়ই সে লজ্জা পাইল।—'কি জানি, ওসব বড় বড় দার্শনিক কথা ভাল বুঝি না।'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'বড় বড় দার্শনিক কথা আবার কখন বললাম ? জানলে তো বলব। আচ্ছা, কথাটা বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।'

'থাক্ না, আমার না বুঝলেও চলবে।'

'উঁহুঁ, তা চলবে না। কথাটা তোমায় না বুঝিয়ে ছাড়ব না।'

মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমিতে মাধবীলতার হঠাৎ বড় হাসি পায়। মনে হয়, সে যদি কথাটা না বুঝে, সদানন্দের চরণ দর্শনের জন্য একদিন যেমন ধন্না দিয়াছিল, আজ সকালে যেভাবে বিভূতিকে সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাইয়াছে, তেমনি একটা কিছু কাণ্ড মহেশ চৌধুরী আরম্ভ করিয়া দিবে।

'বুঝেও যদি না বুঝি ?'

মহেশ চৌধুরী শান্তভাবে বলিল, 'হেসো না, হাসতে নেই। বুঝবে বৈকি, বললেই বুঝবে। শোন বলি। সকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে যে ঝগড়া করলে, মানুষটার মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করলে, আত্মমর্য্যাদা বাঁচাবার জন্য তো ? তুমি ভাবলে, বিপিনবাবুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বললে সবাই তোমাকে ভীরু অপদার্থ মনে করবে, লোকের কাছে তোমার অপমান হবে। ব্যাপারটা কি বিশ্রী দাঁড়িয়ে গেল বল ত ? তুমিও উল্টেপাল্টে সারাদিন ওই কথাই ভাবছ, বিপিনবাবুও ভাবছেন। তোমাদের দুজনের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি হাসিমুখে দুটো মিষ্টি কথা বলতে, এক মুহূর্ত্তে বিপিনবাবুর রাগ জল হয়ে যেত। তুমিও চাইছিলে ঝগড়া না হয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে ভাব হোক, বিপিনবাবুও তাই চাইছিলেন—আত্মমর্য্যাদা বাঁচাবার জন্য তোমাদের ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তোমরা সকলকে হিংসা কর কি না তাই এমন হয়। নিজের যাতে কোন্ ক্ষতি নেই পরের জন্য সেটুকু ত্যাগও করতে পার না।'

মাধবীলতা কথা বলিল না।

বিভূতি বলিল, 'গালে যে চড় মারে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেয়ে ওরকম ঝগড়া ঢের ভাল।'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'গালে চড় মেরেছেন, প্রভুর সঙ্গে আমার কি শুধু এইটুকু সম্পর্ক বিভূতি ? আমি তো চিরদিন প্রভুর পায়ে লুটিয়ে আসছি ? প্রভুকে যদি আগে থেকে দেবতার মত ভক্তি না করতাম, আজ গালে চড় মারার পর মানুষকে আমার ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দেখাবার জন্য প্রভুর পায়ে ধরতাম তা হলে অন্যায় হত। তার মানে কি দাঁড়াত জানিস ? আমি যেন প্রভুর চেয়ে বড়। কিন্তু প্রভুর সম্বন্ধে আমার অহঙ্কার নেই, দীনতা নেই, উদারতা নেই—

আমি সোজাসুজি তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করি। গালে যখন উনি চড় মারলেন, আমি বুঝতে পারলাম উনি ভয়ানক রাগ করেছেন। আমার মনে বড় কষ্ট হল, তাই ওঁর পায়ে ধরলাম। উনি আমায় বড় ভালবাসেন বিভূতি—আমায় মারার জন্য না জানি মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছেন।'

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মানুষের পক্ষে মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করা—'

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলিল, 'উচিত নয়। মানুষ কখনও মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করে না। কিন্তু সংসারে কটা মানুষ আছে বল তো? যে মানুষ নয় সে মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করবে না কেন বল তো? সবাই যদি মানুষ হত বিভূতি, পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত।'

এবারও বিভূতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তোমার কথা ঠিক নয় বাবা। একজন মানুষ আরেকজনকে দেবতার মত ভয় ভক্তি করে বলেই সংসারে এত বেশী অমানুষ আছে—সবাই মানুষ হতে পারছে না। একজন মানুষের চাপে আরেকজন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেকথা থাক—আমাকে কেন তুমি জোর করে ওঁকে প্রণাম করালে? আমি তো ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করি না। বরং—'

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলিল 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুই আমার ছেলে বলে তোকে প্রণাম করিয়েছি। তুই ভক্তি করিস বা না করিস সে কথা ভিন্ন, তোকে দিয়ে ওঁকে প্রণাম করাবার ক্ষমতা থাকতেও যদি প্রণাম না করাতাম, আমার পক্ষে সেটা অন্যায় হত। অন্য কাউকে তো আমি জোর করে প্রণাম করাই না।' বিভূতি মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ স্বয়ং সদানন্দ মহেশ চৌধুরীর বাড়ী আসিল।

সকলে ভাবিল, বুঝি সকালবেলা মহেশ চৌধুরীর গালে চড় মারার প্রতিবিধান করিতে আসিয়াছে। ভক্তকে সদানন্দ আজ অনেক আদর করিবে।

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বলিল, 'প্রভু?'

সদানন্দ বলিল, 'মহেশ, বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়ীতে থাকব।'—(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"আমার হয়েছে মৃত্যু"

আমার হয়েছে মৃত্যু সীমাহীন সমুদ্র-বেলায়,
যেথায় আঘাত করে উর্দ্ধবাহু উদ্বেল প্রবাহ ;
আমা হতে বহু দূরে উঠিতেছে ক্ষুব্ধ কোলাহল,
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে আসে সকরুণ তাহারি আভাস ;
লবণাম্বু আলোড়িয়া নিত্য যেথা তৃষ্ণা জেগে থাকে,
যে তৃষ্ণা মেটে না কভু, যে ক্ষোভের নাহি প্রশমন ;
কামনা-নাগিনী যেথা উর্দ্ধফণা উন্মত্ত ভয়াল,
সেথায় হয়েছে মৃত্যু প্রাণহীন সমুদ্র-শ্মশানে।

আমার হয়েছে মৃত্যু গর্জ্জমান আকাশের মাঝে,
যেথায় মেঘের পরে মেঘ জমে দুর্য্যোগ ঘনায়,
সূচিভেদ্য অন্ধকার নেমে আসে ধরণীর পরে,
মেঘের সংঘাতে যেথা অবিরাম বিদ্যুৎ ঠিকরে,
গর্জ্জনে বর্ষণে নামে অগ্নিগর্ভ বজ্র ভয়ঙ্কর !
যেথায় তাণ্ডব চলে মহাকাল ধ্বংস-দেবতার,
অণুপরমাণু হয়ে মিশে যায় ব্রহ্মাণ্ড যেথায়,
আমার হয়েছে মৃত্যু সেইখানে সে মৃত্যু-আহবে।

আমার হয়েছে মৃত্যু অভ্রভেদী হিমগিরি-শিরে,
আড়ষ্ট হিমের দেশে, তুহিনের গুপ্ত কথা মাঝে,
যেথায় সূর্য্যের আলো উৎসারিত প্রদোষ-আঁধারে,
সেথায় কখন যেন হারালাম দীর্ঘ গিরি-পথ,
সে বন্ধুর পথপ্রান্তে একান্তে মৃত্যুর সনে দেখা—
ধ্যান-মগ্ন সদাশিব, স্তব্ধ মূক ভৈরব নিশ্চল।
গৌরীর তপস্যা যেথা কম্পমান উদগ্র আশায়,
কৃতাঞ্জলি অর্ঘ্যপুটে ফুটে ফুল অম্লান সুন্দর,

দূরে নন্দী ভৃঙ্গী আজো জাগিতেছে সন্ত্রস্ত প্রহরা,
তেমনি তর্জ্জনী আজো উদ্যত রয়েছে অবিকল,
আমার জীবন-যাত্রা অপহত কঠিন শিলায়
মৃত্যুর নিথর কোলে চিরতরে লভেছে সমাধি।

আমার হয়েছে মৃত্যু কুঞ্জবনে ছায়া-বীথি-তলে,
বন চামেলীর গন্ধ-সমাকুল নির্জ্জন সন্ধ্যায়,
জ্যোৎস্নার জোয়ারে যেথা উচ্ছ্বসিত মিলন-পূর্ণিমা,
ফুল দোলে কলকণ্ঠে উঠিতেছে দে দোল দে দোল ;
ছিন্ন ভিন্ন ফুলদল বাপীতটে যেথা ম্রিয়মাণ,
বিরহ-নিশার আশা প্রভাতের নিষ্ফল আবেগে
যেথায় গুমরি মরে পথ চাহি অধীর আগ্রহে,
সেথায় হয়েছে মৃত্যু অবাঞ্ছিত রূঢ় দিবালোকে।
যেথায় উন্মুখ প্রাণ উপেক্ষিতা সূর্য্যমুখী সম
নিত্য ফোটে দিনান্তের অফুরন্ত দুরন্ত আশায়।
যেথা কুসুমের মাসে ফুলে ফুলে ওঠে শিহরণ,
মধুগন্ধে মোহাবিষ্ট মধুপের মৃদু সঞ্চরণ,
সন্নত নয়নে যেথা জেগে ওঠে রহস্য-আভাস,
আমার হয়েছে মৃত্যু সে রহস্য অতল গভীরে।

আমার হয়েছে মৃত্যু আমারি সাধনা-বেদীতলে,
দেবতার পাদপীঠে মানুষের অর্ঘ্য নিবেদনে,
পরমা জ্যোতির তীর্থে, যেথা মন্ত্র উদাত্ত গম্ভীর,
মূর্চ্ছনায় তন্দ্রাহত দিবস রাত্রির ব্যবধান,
ছন্দে ছন্দে জেগে ওঠে সুকৃতির স্মৃতি রমণীয়,
স্বর্গ মর্ত্ত এক হয় কলস্বরা মন্দাকিনী-তীরে,
শতেক তীর্থের বারি বহি আনে পুণ্য মাঙ্গলিকে,
প্রত্যাশিত সে লগনে অকৃতার্থ চিত্তের তৃষ্ণায়
আমার হয়েছে মৃত্যু বুভুক্ষিত সে মৃত্যু-বাসরে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মৃগতৃষ্ণা

শিশিরস্তিমিত আকাশ গোধূলিম্লান।
তমসাঞ্চল-কম্পন-ফুৎকারে
নিব-নিবন্ত ম্রিয়মাণ দিন-দীপ।
বাব্‌লার বনে নদীর সহসা-বাঁক—
কার কলাপের বঙ্কিম ইঙ্গিত।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় তন্দ্রাশমিত স্রোত
শৃঙ্খলায়িত শ্বেত সারসের সারি—
গেহাতুর-পাখা-স্বননে শিহরি উঠে
নিদ্রা-নিথর নীল নীল নদীজল।
কোথা যায় তারা কোথায় ওদের দেশ
অস্তাচলের পাটল-আকাশ-পারে—
মুদিবে কি ডানা ক্লান্ত দিনের শেষে
স্তন-প্রচ্ছায়ে মানস-সরসে তব?
ভাসালেম মোর স্বপনের সম্ভার
অপসরিষ্ণু ক্ষিপ্র সে-বলাকায়।

তারার দেউটি একটি একটি জ্বলে।
কোন্ সে-কোথায় সুদূর সঙ্গোপনে
ভাবনা-দীপের মিছিল ভাসাইয়াছো
দুর্বার কোন্ বন্যার কালো জলে
কার উদ্দেশে অক্ষর-যৌবনা?
প্রান্তর হেথা হানে হেমন্তবায়—
কান্তারে কোথা দাঁড়ায়ে বেপথুমতী
প্রার্থিত কার অভিসারে অবগুণ্ঠিতা—
দোলে অঞ্চল উড়িছে অলকদাম।

স্মরিয়াছো বুঝি আদিম প্রণয়ীজনে
তোমার আকাশে বিদায়-দরশ যার—
ভালোবাসা যার নারিলে নারিলে নিতে
ছল করো আজ অভিমান-অভিনয় ?

সংবর অয়ি সংবর অকরুণা
অতিবিলম্বে অকারণ সংকেত—
প্রেম মোর এবে জনান্তর-স্মরণ-অক্ষমালা
আয়ুর তপন পশ্চিমে হেলিয়াছে।
মরণের হ্রেষা শোনো॥

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

Buried Empires—by Patrick Carleton, (Arnolds) 10/6.

বিগত মহাযুদ্ধ উপনিপাতকেও নিত্যনৈমিত্তিকের কোঠায় ফেলেছিলো; এবং তার পরে ফৌজদারী আদালতের ছোট-খাট বিভীষিকায় আর কারোই চমক ভাঙে নি। অগত্যা সাংবাদিকেরা রোমাঞ্চসন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন মেসোপোটেমিয়ায়; এবং সেখানে সুমেরীয় পুরাবৃত্তের পুনরুদ্ধারকল্পে লেওনার্ড্ উলি যে-খননকার্য্য চালাচ্ছিলেন, তার বিবরণে ও ছবিতে প্রায় সকল দৈনিক পত্রই অন্তত কিছু দিনের জন্যে ভ'রে উঠেছিলো। তাহলেও ইরাকী প্রত্নতত্ত্বের বিজ্ঞাপনটুকুই উত্তরসামরিক সঙ্কটের অন্যতম প্রতিক্রিয়া, তার আরম্ভ তথা অনুশীলন অপদস্থ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উত্তর সাক্ষী নয়; এবং বাইবেলী মহাপুরুষদের লীলাভূমি ব'লে, ধার্ম্মিকেরা তো এ-অঞ্চলের খোঁজ-খবর সর্ব্বদাই রাখতেন, এমনকি আঠারো শতকের দুঃসাহসিক পুণ্যলোভীরাও ব্যাবিলন্ ও নিনিভার ধ্বংসস্তূপ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। স্থানীয় প্রাচীনদের 'ক্যুনীফর্ম্' বা কীলকলিপির প্রথম নিদর্শন তাঁরাই সংগ্রহ করেন; এবং সেই সকল মৃত্তিকালেখের অনুবাদ যদিও সমসাময়িকদের সাধ্যে কুলয় নি, তবু জন-কয়েক সুইডিশ্ মনীষী বুদ্ধিবলেই সে-লিপির উচ্চারণপদ্ধতি ধরতে পেরেছিলেন। অতঃপর হেন্‌রি রলিন্সন্-এর প্রাণপণ প্রয়াসে তার অর্থও অপ্রকাশ রইলো না; এবং ১৮৩৫ সালে পারস্য থেকে তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের যে-অনুশাসন টুকে আনলেন, তাতে যেহেতু লিপির বৈচিত্র্য না থাকলেও, ত্রিবিধ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিলো, তাই পারসিক সংস্করণের সাহায্যে অন্য দুটির মানে বুঝে তিনি ও তাঁর সহকর্ম্মীরা ভজালেন যে তিনটিই আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, এবং সেগুলির সম্পর্ক এত নিকট যে সম্ভবত প্রত্যেকটি একই উৎস থেকে উৎপন্ন। পক্ষান্তরে সে-উৎস যে সুমেরীয় ভাষা এ-আবিষ্কারের সম্মান ফরাসী পণ্ডিত জ্যুল্ ওপের-এর প্রাপ্য; এবং সেকালের বিশেষজ্ঞেরা তাঁর সিদ্ধান্ত তখনই তখনই মানতে চান নি বটে, কিন্তু পরবর্ত্তীদের খনিত্র আজও সেই অনুমানের প্রমাণ জোগাচ্ছে।

উপরন্তু খননকার্য্যেও ঊনবিংশ শতাব্দীর অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়; এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাবিলোনিয়ার দুটি ধ্বংসস্তূপ খুঁজতে খুঁজতে টেলর এরিদু ও উর-নামক সুমেরীয় নগরীদ্বয়ের সন্ধান তো পান বটেই, এমনকি তাঁর আগেই লফ্‌টাস্ উক্ত সহর-দুটি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেগুলির পরিচয় তিনি তখন জানতেন না; এবং আসিরিয়ার প্রস্তর স্থাপত্যের সংসর্গে প্রত্নতত্ত্ব শিখে তিনি যেহেতু ইষ্টকাদিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন, তাই উরুকের বিখ্যাত দেবালয়ের খানিকটা খুঁড়েই তাঁর আগ্রহ মিটেছিলো, তিনি আরো নীচে নামতে চান নি। কারণ সমসাময়িক পুরাবিদেরা ওপের-কে তফাতে রাখতেন; এবং সত্যের খাতিরে আমরা মানতে বাধ্য যে সে পর্য্যন্ত উল্লিখিত স্থানগুলিতে এ-রকম কোনো সাক্ষ্য মেলে নি যাতে সুমেরীয় সভ্যতাকে ব্যাবিলন্-অসুরের জনক ব'লে ভাবা যেতো। তৎসত্ত্বেও ইরাকী পুরাবৃত্তের গবেষণা এগিয়ে চলেছিলো; এবং ১৮৭৪ সাল থেকে ফরাসী সরকারের অনুগ্রহে লাগাশ্ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষে যে-পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ সুরু হয়, তার ফলেই সুমেরীয় ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারা আমাদের জ্ঞানগোচরে এসেছে। তবে সে-ইতিহাসের আদি পর্ব্ব আমরা পড়তে পেরেছি সম্প্রতি; এবং সুসার প্রাক্‌সুমেরীয় সংস্কৃতি যদিও গত শতাব্দীর শেষেই দ মর্গান্-এর কাছে ধরা দিয়েছিলো, তবু সে-সংস্কৃতি যেহেতু যাযাবর অবস্থারই রূপান্তর, তাই আমরা স্থানীয় সভ্যতার প্রথম স্তরে পৌঁছেছি উলি-প্রমুখ উত্তরসামরিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রযত্নে। অর্থাৎ উর রাজবংশের বহুবিজ্ঞাপিত সমাধিমন্দিরই সুমেরীয় জাতির প্রাচীনতম নিদর্শন; এবং সে-কবরগুলির বয়স-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, এখন আর এতে সন্দেহ নেই যে উক্ত গোরস্থান খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার থেকে আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু উলি নিজে আরো পাঁচ শ বছর পিছিয়ে যান; এবং যত দিন সুমেরের অন্যত্র নরবলির প্রমাণ না জোটে, তত দিন অবধি অনেকেই উলি-র দিকে ঝুঁকবেন।

সে যাই হোক, এ-সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত যে সুমেরীয় জাতি ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের প্রাগ্‌বর্ত্তী; এবং সেই সময়েও তারা এমন সুব্যবস্থিত সমাজে বাস করতো যে শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে তারা নিশ্চয় তখন যৌবনে পৌঁছেছিলো। বস্তুত অনুশাসনের যুগে সুমেরীয় চিৎপ্রকর্ষের কোনো বিস্ময়কর উন্নতি আমাদের চোখে

পড়ে না, বরং তাদের প্রাগৈতিহাসিক কীর্ত্তিকলাপই এখনো আমাদের তাক লাগায়। কারণ তাদের লিখিত ইতিবৃত্ত প্রধানত যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণমাত্র; এবং সে-হানাহানির মধ্যে তারা স্বভাবতই তাদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি, দিগ্বিজয় অথবা আত্মরক্ষার দাবি মেটাতে গিয়ে প্রাচীনতর চর্চ্চা ও চর্য্যা ভুলতে বসেছিলো। অবশ্য তাদের প্রাক্তন পরিচয় আমাদের অবিদিত; এবং তাদের আদি বসতি কোথায়, কারা তাদের পূর্ব্বপুরুষ, তারা কবে সুমেরে আসে, এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা আজ পর্য্যন্ত জানি না। তাহলেও এ-কথা নিরাপদে বলা চলে যে আমরা যখন ইরাকে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ পাই, তখন তারা সেখানকার পুরাতন বাসিন্দা, এত পুরাতন বাসিন্দা যে তখন আর তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই, নানা রক্তের সংমিশ্রণ ঘ'টে তাদের ভিতর সঙ্করতা দেখা দিয়েছে। অন্ততপক্ষে তাদের পুরাকালীন ভাস্কর্য্য তথা করোটি-কঙ্কলের সাক্ষ্য সেই রকম; এবং সুমেরীয় ভাষার সম-গোত্রীয় ভাষা যদিচ অন্যত্র মেলে না, তবু পণ্ডিতেরা মর্জ্জিমতো তার সঙ্গে তুর্কী, জর্জ্জীয়, বাস্ক্, চীনা, কোরীয়, তামিল, বাণ্টু ও পোলিনেসীয় ভাষার মিল খুঁজে পেয়েছেন। আবার তারা নিজেরা ভাবতো যে মহাপ্লাবনের আগে তাদের দেশ ছিলো পারস্য উপসাগরের পূর্ব্বপারে, এবং দেবরোষে অন্য সকলে ডুবে মরলে, তাগ্‌তুগ্‌-নামক জনৈক ধার্ম্মিক সপরিবারে পালিয়ে ব্যাবিলোনিয়ায় সংসার পাতে। পক্ষান্তরে সুমেরের মন্দিরগুলি যেহেতু পর্ব্বতের আদর্শে নির্ম্মিত, তাই কোনো কোনো পণ্ডিতের অনুমানে তারা মূলত ইরানীয় অধিত্যকার অধিবাসী; এবং আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা উক্ত মত মানেন না, তাঁর বিশ্বাস তারা এক সময়ে থাক্‌তো কৃষ্ণসাগর ও ক্যাস্‌পিয়ান সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে।

সৌভাগ্যক্রমে উৎপত্তির আলোচনা স্থগিত রেখেও পরিণতির বিচার সম্ভবপর; এবং সুমেরীয় জাতির জন্মবৃত্তান্ত অনিশ্চিত ব'লেই, এ-প্রসঙ্গ আর তর্কাধীন নয় যে খৃষ্টাব্দের ত্রিশ শতক পূর্ব্বে তারা যতখানি ঐহিক সমৃদ্ধির অধিকারী ছিলো, যন্ত্রযুগের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত য়ুরোপ ততোধিক ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পায় নি। উপরন্তু আয়ুর পরিমাণে সুমের যদিচ মিসরের সমকক্ষ নয়, তবু প্রভাবে তথা প্রতি-পত্তিতে সে-সভ্যতা হয়তো ঈজিপ্ট্‌কে হার মানিয়েছিলো; এবং প্রতিদ্বন্দ্বী নগররাষ্ট্রের অনৈক্যবশত গ্রীকদের মতো তারাও বারম্বার বিদেশী শত্রুর কবলে

পড়েছিলো বটে, অথচ তাতে তাদের সমাজব্যবস্থা অপ্রতিষ্ঠ হয় নি, বরং বিজেতারাই তার কুহকে ম'জে অবিলম্বে নিজেদের বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিহার করেছিলো। এমনকি, মাঝে মাঝে য়িহুদি ও বর্ব্বরের হাত ঘুরে, ইরাকের অধিরাজ্য যখন সুমের ও আক্কাদের দোটানা থেকে অবশেষে ব্যাবিলনের তত্ত্বাবধানে চ'লে গেলো, তখন দিগ্বিজয়ী হামুরাবি সুমেরীয় আদর্শেই তাঁর সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুললেন ; এবং তাঁর জগদ্বিখ্যাত শাসনবিধিতে তিনি কেবল সেই সনাতন নিয়ম-নিষেধকেই স্থান দিলেন, যেগুলো আবহমান কাল ধ'রে সুমেরের ভূতপূর্ব্ব রাজাদের একাধিক অনুশাসনে ছড়িয়েছিলো। অবশ্য তার পরে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে সুমেরীয়দের অস্তিত্ব আর কারো মনে রইলো না ; তারা আস্তে আস্তে ব্যাবিলোনীয়দের সঙ্গে মিশতে লাগলো। তত্রাচ তাদের ধর্ম্ম ও আচার আরো পনেরো শ বছর টিঁকেছিলো ; এবং খৃষ্টপূর্ব্ব সাত শতকে সুদ্ধ তাদের নাম একেবারে ডোবে নি ; তাদের ভাষায় কথোপকথন তদানীন্তন অসুরবাসীদের সাধ্যে না কুললেও, সেখানকার প্রত্যেক শিলালিপিতে কথিত ভাষার পাশে পাশে সুমেরীয় ভাষা যথাবৎ ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এটাই সুমেরীয় দুর্মরতার শেষ নিদর্শন নয় ; যে-ব্যূহরচনার গুণে আলেক্জাণ্ডার-এর অভিযান কোথাও থামে নি, তা বোধহয় সুমেরীয় কারয়িত্রী প্রতিভার অন্যতম কীর্ত্তি ; এবং তৎসত্ত্বেও সার্গন্, নারাম্-সিন্ বা ডুঙ্গি যেমন রাজ্যবিস্তার-ব্যাপারে সিকন্দরের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তেমনি তাঁদের জয়যাত্রার প্রসার প্রায় সমান রোমহর্ষক, তার ফল নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী।

তাহলেও তারা স্বভাবত অসুরবাসীদের চেয়ে কম রক্তপিপাসু ছিলো ; এবং উরের সমাধিমন্দিরে নরবলির প্রাচুর্য্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের বাহুল্য দেখে সে-বিশ্বাস প্রথমেই ধাক্কা খায় বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচয় যতই বাড়ে, ততই বোঝা যায় যে সাধারণ নাগরিকের আষ্টপ্রহরিক জীবনে ন্যায়বল বাহুবলকে দাবিয়ে রাখতো। পক্ষান্তরে সুরু থেকেই তাদের সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাগ প্রশ্রয় পেয়েছিলো। তবে সেখানকার অধিকারভেদ বোধহয় কৌলিন্যের ধার ধারতো না, জীবিকাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণও আপনা আপনি বদলাতে থাকতো। অন্ততপক্ষে প্রথিতযশা রাজারা শ্রেণীবিশেষের শোষণে অন্য সকলের উচ্ছেদ অপছন্দ করতেন, ধর্ম্মের নামে পুরোহিতদের উদরপূর্ত্তি ঘটতে দিতেন না ; এবং

খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৯০ সালে মহাপ্রাণ উরুকাগিনা তাঁর রাজ্য থেকে দাসপ্রথা তাড়িয়েছিলেন। অবশ্য উরুকাগিনার মতো রাজা সুমেরেও একাধিক বার জন্মায় নি; এবং পররাষ্ট্র-ব্যাপারে সুদ্ধ অস্ত্রধারণ অমার্জ্জনীয় ভেবে তিনি অবশেষে যখন একাধারে প্রাণ ও সিংহাসন হারালেন, তখন উরে দাসত্ব আবার ফিরে এসেছিল কিনা, তা আমাদের জানা নেই। তত্রাচ সে-দেশে পূর্ত্ত ইত্যাদি হিতৈষণা রাজধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ব'লে বরাবরই স্বীকৃত হয়েছিলো; এবং যাতে অব্যাহত ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা বা অকারণ চুক্তিভঙ্গ ঢুকতে না পারে, তদনুরূপ বিধি-নিষেধের পরিকল্পনাতে অনেক রাজাই প্রচুর সময় কাটিয়েছিলেন। বস্তুত সভ্যতার পথে সুমেরীয়েরা এতখানি এগিয়েছিলে যে কেবল কৃষিকর্ম্মের আয়ে তাদের কুলতো না, অধিকাংশ নাগরিকের দিন চলতো বিকিকিনির লাভে; এবং সেইজন্যই বড় বড় দেবালয়েও তারা হাট বসাতো, একত্রে পুণ্যার্জ্জন ও ধনাগম তাদের বিবেকে বাধনো না। ফলত অধিদৈবতের সঙ্গে তারা প্রায় অপত্যসম্বন্ধ পাতিয়েছিলো; এবং তাদের প্রধান দেবতা, বিশ্বমাতা, যদিও প্রাচীন জাতিমাত্রের অধ্যাত্মিক উপলব্ধির রহস্যময় প্রতীক, তবু সুমেরের ছোট-খাট দেবদেবীরা বোধহয় সেখানকার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতারই মুখপত্র।

কিন্তু ১৯২২ সালে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ক'রে স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন যে প্রাচীন জগতে সুমেরীয়দের চেয়ে নিরীহ জাতি তো ছিলো বটেই, এমনকি এই ভারতীয় জাতি হয়তো সাংসারিক সম্পদেও সকল প্রতিবেশীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। উক্ত আবিষ্কারের আগে পর্য্যন্ত সকলেই এক বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের আরম্ভ আর্য্য বিজেতাদের সঙ্গে; এবং মুখ্যত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাক্ষ্যে স্থানীয় পণ্ডিতেরা যদিও বলতেন যে আর্য্যেরা এ-দেশে পা দিয়েছিলো পাঁচ হাজার খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, তবু, এক য়াকোবি বাদে, পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা প্রত্যেকেই ভাষাতত্ত্বের নির্দ্দেশে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ সালের আগে আর্য্যদের নাম এ-অঞ্চলে শোনা যায় নি। উপরন্তু সেই অর্দ্ধবর্ব্বর যাযাবরেরা যেহেতু অশ্বচালনা ও কাব্যরচনা ভিন্ন অন্য কোনো কলাবিদ্যার ধার ধারতো না, তাই প্রত্নতত্ত্বও এ-ক্ষেত্রে স্থির মীমাংসায় আসতে পারে নি; এবং সে-দিন পর্য্যন্ত পাথরের অস্ত্র-

শস্ত্র ও স্থূল রকমের মৃৎপাত্র ব্যতীত প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগের আর কিছু নিদর্শন মেলে নি ব'লে, দ্রাবিড় সভ্যতার মহিমাকীর্ত্তন ঐতিহাসিকের কাছে হাস্যকর ঠেকতো। তবে বিশপ্ কল্‌ডোয়েল্-প্রমুখ দু-একজন নিরুক্তকার ভারতের আদিম ভাষাসমূহ ঘেঁটে এই কিংবদন্তী রটিয়েছিলেন যে এখানকার অনার্য্য বাসিন্দারা রাজা, নগর, মন্দির, ধাতুনির্ম্মিত তৈজস-পত্র ও লিখিত পুস্তকাদির চক্ষুষ পরিচয় পেয়েছিলো ; এবং বেলুচিস্তানের দ্রাবিড় ভাষাভাষী ব্রাহুইদের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে গবেষকেরা মাঝে মাঝে কল্পনার রাশ ছাড়তেন। সুতরাং মহেঞ্জো-দড়োতে এক বৌদ্ধ স্তূপ খুঁড়তে খুঁড়তে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় যখন জানলেন যে সেটি প্রাচীনতর প্রত্নাবশেষে নির্ম্মিত, তখন অলৌকিক প্রতিভাই তাঁর চোখে অহেতুক দিব্যদৃষ্টির অঞ্জন পরিয়েছিলো ; এবং সেইজন্যেই তিনি অবিলম্বে বুঝেছিলেন সে-ধ্বংসে কয়েক ফুটের উপর-নীচে অন্তত দু হাজার বছরের তফাৎ ঘটছে।

পক্ষান্তরে আর্য্যেরা নিজেরা রটিয়েছিলো যে ভারতবর্ষে ঢুকতেই, তাদের সঙ্গে এক কৃষ্ণকায় মহাজতির সংঘর্ষ বাধে। সেই আদিম মানুষেরা নাকি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগরে থাকতো ; সর্ব্ববিধ শিল্প-কলায় তাদের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিলো ; ব্যবসা-বাণিজ্যে কেউ তাদের এঁটে উঠতে পারতো না ; এবং তারা যেহেতু নানারকম অশ্লীল উপচারে বিবিধ বিগ্রহের ভজন-পূজন করতো, তাই নিরাকারপন্থী আর্য্যেরা কর্ত্তব্যের তাগিদে তাদের ধনে প্রাণে মারে। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে প্রমাণ মিললো বটে যে আর্য্যদের আত্মপ্রসাদ একেবারে অমূলক নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেলো যে তথাকথিত দাসদের সয়তানি-সম্বন্ধে তারা যত গল্প বানিয়েছিলো, সেগুলো সর্ব্বৈব মিথ্যা, সে-রকম মিথ্যা তাদের বর্ত্তমান বংশধর হের ষ্ট্রাইখার-এর সংবাদপত্রকেই সাজে। কারণ যে-জাতি আম্রি, নাল, মহেঞ্জো-দড়ো, হারাপ্পা, রূপার ইত্যাদি নগরের প্রতিষ্ঠাতা, তাদের সমান শান্তিপ্রিয় মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও এখনো জন্মায় নি ; এবং মহেঞ্জো-দড়োতে প্রাপ্ত কয়েকটা কঙ্কাল দেখে যদিও স্বভাবতই মনে হয় যে স্থানীয় অধিবাসীদের অপমৃত্যু ঘটেছিলো, তবু কতিপয় খেলার তলোয়ার আর শোভাযাত্রার সড়কি ভিন্ন অপর কোনো অস্ত্র এখানে বা অন্যত্র আজ অবধি কেউ খুঁজে পায় নি। উপরন্তু তারা কোথাও দুর্গ বসায় নি, বা শহরের চার দিকে পরিখা কাটে নি অথবা প্রাচীর তোলে নি ; এবং তাদের অগণিত সিলমোহরে

কী লেখা আছে, তা পড়তে না পারলে, যেমন তাদের বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা পূরোপূরি কাটবে না, তেমনি তাদের উপনিবেশসমূহে অনুসাশনের নিতান্ত অভাব নিশ্চয়ই এই বিশ্বাসের পরিপোষক যে তারা কখনো কোনো যশোলিপ্সু রাজা বা রাষ্ট্রনায়কের শাসন মানে নি।

বলাই বাহুল্য যে শিলালিপি ইত্যাদি লিখিত দলিল-পত্রের অবর্ত্তমানে তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের অগোচরে রয়েছে; এবং ব্যবসাগতিকে সুমেরে পৌঁছে, তারা যদি সেখানে তাদের স্মৃতিচিহ্ন ছেড়ে না আসতো, তবে সিন্ধু সভ্যতার কালনির্ণয় হয়তো আমাদের সাধ্যে কুলতো না। তাহলেও আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারতুম তাদের সংস্কৃতি উৎকর্ষের কোন্ উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিলো, এবং কতখানি শুচিতা, সদ্বুদ্ধি ও সঙ্কল্প নিয়ে তারা তাদের নগরগুলির পরিকল্পনা করেছিলো। তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও কম শৃঙ্খলা দেখা যায় না; এবং যেহেতু তাদের প্রত্যেক শহরে প্রায় সব বাড়ী-ঘর সমান মাপের, তাই এই অনুমান স্বাভাবিক যে সেই গণতান্ত্রিক জাতির মধ্যে খুব বেশী ধনবৈষম্য ছিলো না। সুমেরীয়দের মতো তারাও বুঝতো যে বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসতি; এবং সম্ভবত বণিকোচিত কাণ্ডজ্ঞানের গুণে তারা সর্ব্বত্র অলঙ্কারের আতিশয্য বাঁচিয়ে চলতো। তথাচ, দরকার পড়লে, তারা কলাকৌশলে পরবর্ত্তী গ্রীকদের সুদ্ধ হার মানাতো; এবং উল্লিখিত সিলমোহরগুলি তো অতুলনীয় বটেই, এমনকি যে-দু-একটা প্রস্তর বা ধাতু মূর্ত্তি হারাপ্পা ও মহেঞ্জো-দড়োতে বেরিয়েছে, সেগুলির বস্তুনিষ্ঠা তথা রূপায়তনিক শুদ্ধি সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিস্ময়াবহ। দেশজয়ে বিরত থেকেও তারা পৃথিবীর যতখানি ঘুরে বেড়িয়েছিল, তার হিসাব শুনলে, সত্যই চমক লাগে: তাদের নগরে ব্রহ্ম দেশের চুনি ও ইরাকী প্রসাধনসামগ্রীর সাক্ষাৎ মেলে; উর রাজবংশের কবরে, পাঞ্জাবী পুঁতির মালা, ভারতীয় বানরের প্রতিকৃতি, সিন্ধু প্রদেশের মৃৎপাত্র ইত্যাদি ছাড়াও, যে-সোনার শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেছে, তা এ-দেশী কেশবিন্যাশের অনুকরণ; এবং সারা মেসোপোটেমিয়ায় আজ অবধি যেকালে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহার নেই, তখন আক্কাদের এক সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রাসাদে জঞ্জালনির্গমের সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই সিন্ধু মিস্ত্রিদের কীর্ত্তি। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই সভ্যতার প্রভাব ইস্টার দ্বীপে পর্য্যন্ত পাড়ি দিয়েছিলো; কারণ সেখানকার লিপি নাকি মহেঞ্জো-দড়ো লিপিরই নকল।

মহেঞ্জো-দড়োতে একটি অট্টালিকা বেরিয়েছে, যা দেবমন্দির না সাধারণ স্নানাগার, তা আমরা এখনো জানি না। তৎসত্ত্বেও সেখানকার বসতবাড়িতে ঠাকুরঘরের এত ছড়াছড়ি যে স্থানীয় নাগরিকদের ধর্ম্মপ্রাণ না ব'লে উপায় নেই। তবে হয়তো আধ্যাত্মিক বিষয়েও তারা গণতান্ত্রিক আদর্শ মেনে চলতো; এবং ধর্ম্মের মতো ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সংঘের অনধিকার প্রবেশ তাদের ভালো লাগতো না। আসলে নৃবিজ্ঞানীরা যে-সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের নাম দিয়েছেন "লাইফ্ রিলিজন্" অথবা প্রাণধর্ম্ম, তারই প্রকারভেদ সিন্ধু দেশের সর্ব্বত্রই শিকড় ছড়িয়েছিলো; এবং জগন্মাতার স্বামী বা পুত্র হিসাবে পশুপতিও জনসাধারণের পূজা পেতেন। সুতরাং প্রাণধর্ম্মেই শক্তিমন্ত্রের সূত্রপাত; এবং শাক্ত আর তান্ত্রিক সমার্থবাচক। এমনকি টানা হেঁচড়া করলে, শৈবেরাও এই দলে ভিড়তে পারে; এবং পরবর্ত্তী কালের শাক্ত ও শৈব দ্রাবিড়েরা সিন্ধু জাতির বংশধর হোক বা না হোক, অন্ততপক্ষে এ-বিশ্বাসের কোনো হেতু নেই যে সে-জাতির পাট উঠতেই, আর্য্যধর্ম্ম সারা ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেললে। অবশ্য ঐতিহ্য আর ইতিহাস এক নয়; এবং নিংসংশয় প্রমাণের অভাবে তন্ত্রপ্রকরণের জনশ্রুত প্রাচীনতা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য। তাহলেও এ-কথা অস্বীকার্য্য যে এ-দেশে যত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তার মধ্যে তান্ত্রিক সাধনাই সর্ব্বপুরাতন নয়; এবং আ-বুদ্ধ-চৈতন্য সংস্কারকদের মধ্যে এমন একজনেরও সাক্ষাৎ মেলে না যিনি ওই ভাবধারার বাইরে থেকে জনগণকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের বিধিবদ্ধ যাগ-যজ্ঞ এ-দেশের মাটিতে বাড়ে নি; তৎসম্পর্কিত চাতুর্ব্বর্ণ্য নির্য্যাতিত অন্ত্যজদের কাছে সদা-সর্ব্বদাই অন্যায় ঠেকেছিলো; এবং শুধু তন্ত্রই এই সঙ্কীর্ণতায় বাঁধা পড়ে নি, ব্যক্তিমর্য্যাদার উপরে জোর দিয়ে আর সহজ আরাধনার গুণ গেয়ে প্রাগার্য্য মনুষ্যধর্ম্মকে নিরন্তর বাঁচিয়ে রেখেছিলো।

সেইজন্যে যোগদর্শনও তন্ত্রের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ; এবং তন্ত্রের মতোই সেখানে অপৌরুষেয় প্রামাণ্য পরিত্যক্ত ও বিশ্বমানবিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা শিরোধার্য্য হয়েছে। অতএব, মহেঞ্জো-দড়োতে তান্ত্রিক পদ্ধতির উপস্থিতি সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না জুটলেও, আমরা সেখানকার মুদ্রাচিত্রের সাক্ষ্যে এ-কথা অনায়াসে বলতে পারি যে সিন্ধু সভ্যতাই যেকালে যোগসাধনার আবিষ্কর্ত্তা, তখন তান্ত্রিক আদর্শও তদানীন্তন মানুষের অজ্ঞাত ছিলো না; এবং

কালক্রমে এই দুই মার্গকেই আর্য্য বিজেতারা আগা-গোড়া বদ্‌লেছিলো বটে, কিন্তু ভারতের যে যে অংশে তাদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা কম, সেই সেই অংশে তন্ত্রের প্রতিপত্তি যেমন প্রবল, মহেঞ্জো-দড়োর শিল্পগত প্রভাব তেমনি সুস্পষ্ট। উদাহরণত বাংলা দেশ উল্লেখযোগ্য; এবং শুধু মহাস্থান ও পাহাড়পুরের তক্ষণকলাই সিন্ধু ভাস্কর্য্যকে স্মরণে আনে না, আধুনিক বাঙালীর নিত্যব্যবহার্য্য খেলনা, কাঁথা, বাসন-কোসন ইত্যাদিও সেই ধারাকে অবিকৃত রেখেছে। বস্তুত সারা ভারতের লোকশিল্প বোধহয় প্রাগার্য্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক; এবং আপাতত এ-বিশ্বাসও সঙ্গত যে আর্য্যদের নিরাকার ধর্ম্ম স্বভাবদোষেই সুকুমার কলার পরিপন্থী। বুঝি বা সেই কারণেই বৌদ্ধ যুগের আগে স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের অভাব এত শোকাবহ; এবং তার পরে যদিচ, বৌদ্ধ দেব-দেবীদের কোল দিতে, হিন্দু সমাজেও অগণ্য রূপকার জন্মালো, তবু তাদের সৃষ্টি কেমন যেন ক্ষিতি-নিরপেক্ষ রয়ে গেলো, তার আভিজাতিক অলঙ্কারবাহুল্যে অন্ত্যজদের সহজ বস্তুনিষ্ঠা কোনো কালেই আমল পেলে না। ফলত সংস্কৃত শিল্প টিঁকলো না, শেষ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের মান বাঁচালে অনার্য্যেরা, এবং যে-উৎস থেকে তাদের প্রাণধারা উৎপন্ন, তা এমনই অফুরন্ত যে সর্ব্বনাশে চাপা প'ড়েও তার প্রেরণা শুকয় নি, শোষিত ভারতকে পাঁচ হাজার বছর ধ'রে একা সেই অমৃত জোগাচ্ছে।

অবশ্য মহেঞ্জো-দড়োর তারিখ-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে; এবং যাঁরা তাকে ৩০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের অগ্রবর্ত্তী বলেন, তাঁরা যেমন সকল সমস্যার সমাধানে অক্ষম, তেমনি যাঁদের মতে তার বয়স আরো পাঁচ-সাত শ কি হাজার বছর কম, তাঁরও সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। প্রথম দল স্বপক্ষসমর্থনে এই যুক্তি দেখান যে উরের শিরস্ত্রাণ যে-স্তরে পাওয়া গিয়েছে, তা সর্ব্বসম্মতিক্রমে খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর আগেকার; এবং সেই স্তরেরই প্রসাধনসামগ্রী যখন হারাপ্পার উর্দ্ধতর স্তরে বর্ত্তমান, তখন উর রাজবংশের সমাধিমন্দির বোধহয় হারাপ্পার চেয়ে অর্ব্বাচীন। উপরন্ত মহেঞ্জো-দড়ো হারাপ্পার চেয়ে বেশ খানিকটা বড়; এবং আম্রি মহেঞ্জো-দড়োর বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সুতরাং সুমের সিন্ধু সভ্যতার অনুজ; এবং সিন্ধু সভ্যতা সুসার সমসাময়িক; যার আয়ুষ্কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ থেকে ৪০০০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত মানলে, আর ভাবা চলে না

যে আর্য্যেরাই সিন্ধু সভ্যতাকে নিপাতে পাঠিয়েছিলো ; এবং মহেঞ্জো-দড়োর পতন যদি বা আধিদৈবিক কারণে ঘটে থাকে, তবু সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অন্যান্য নগরগুলি নিশ্চয়ই আপনা আপনি ধ্বংসে পড়ে নি, কোনো স্থায়ী শত্রুর আক্রমণেই একে একে নষ্ট হয়েছিলো। ফলত দ্বিতীয় দল কতকগুলো সিলমোহর আর মৃৎপাত্রকে সাক্ষী ডাকেন ; এবং তাদের জবানবন্দি শুনে তাঁরা সাব্যস্ত করেন যে বাড়তে সিন্ধু সভ্যতার অনেকখানি সময় লাগলেও, তার পরিণত রূপ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ সনের ও-দিকে দ্রষ্টব্য নয়, বরং আর পাঁচ শ বছরের ভিতরেই তাকে জরা ধরেছিলো। খননকার্য্য আরো না এগোলে, এই দোটানায় কূল মিলবে না ; এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-সম্পর্কে বিদেশীরা যত না উদাসীন, সরকারের কার্পণ্যে স্থানীয় গবেষকেরা ততোধিক নিশ্চেষ্ট। ইতিমধ্যে আমার মতো ত্রিশঙ্কুর পক্ষে বাক্যব্যয় অশোভন ; এবং কার্ল্‌টন্‌ সাহেব হয়তো তাই বুঝেই এ-প্রসঙ্গ যথাসংক্ষেপে সেরেছেন।

আসলে মহেঞ্জো-দড়ো-সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনো কৌতূহল নেই ; এবং উলি-র অধীনে তিনি সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্বেই হাত পাকিয়েছেন। উপরন্তু ভারতীয় ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান নাতিবিস্তৃত ; এবং অধীত বিদ্যার জন্যে ওই বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা অপরিহার্য্য ব'লেই, তিনি সিন্ধু সভ্যতার নাম নিয়েছেন, নচেৎ হয়তো ও-দিকেই এগোতেন না। অবশ্য তিনি সে-প্রসঙ্গে যতটুকু লিখেছেন, তা প্রায় নির্ভুল। কিন্তু যেখানে তিনি পূর্ব্বপ্রকাশিত বিবরণের চুম্বকসংগ্রহ ছেড়ে স্বকীয় মন্তব্য দিতে গিয়েছেন, সেখানে তাঁর যুক্তিজালে তো ছিদ্র আছেই, এমনকি ভারতীয় পুরাণ-উপকথার উপহাস্য বিকৃতিও তাঁর পুস্তকে সুলভ। পক্ষান্তরে সুমের-সম্পর্কে তিনি সর্ব্বত্রই বিশ্বাসযোগ্য, যদিচ তিনি নিজেও মানেন যে মারি অনুশাসনের আবিষ্কার তাঁর কালগণনাকে বাতিল করেছে। তবে এটা নিশ্চয়ই সামান্য ত্রুটি ; এবং লেখক আপনাকে সুমেরীয় চিৎপ্রকর্ষের ব্যাখ্যাপনে আবদ্ধ রাখলে, এই বিদূষণের প্রয়োজনমাত্র থাকতো না। দুঃখের বিষয়, কার্ল্‌টন্‌ সাহেবের আগ্রহ মুখ্যত অনুশাসনের প্রতি ; এবং দু-একটা ব্যতিক্রম বাদে, অনুশাসনলব্ধ ইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ শান্তি-সংস্কৃতির অগ্রগণ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানিও উক্ত নিয়মের প্রমাণ ; এবং প্রত্ন মৃৎপাত্রের সারগর্ভ বর্ণনা সত্ত্বেও, এর অধিকাংশই বিভিন্ন রাজবংশ ও তদীয় জয়-পরাজয়ের

তালিকা। ফলত বইটি সম্ভবত পরীক্ষার্থীদের উপকারে লাগবে, সাধারণ পাঠকের মন জোগাতে পারবে না। তাহলেও এতে রঙ্গের অভাব নেই। কারণ লেখক শুধু বিবেকসম্পন্ন ঐতিহাতিক নন, তিনি স্বাধিকারপ্রমত্ত সমাজ-বিজ্ঞানীও বটে; এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পোষণে তিনি প্রাচ্যের বর্ত্তমান ধরণ-ধারণ-সম্বন্ধে যত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেগুলোর প্রত্যেকটাই যেমন অবান্তর, তেমনি হাস্যকর। বইটির প্রধান ঐশ্চর্য্য কখানি আলোকচিত্র; এবং সেগুলি এত সুনির্ব্বাচিত ও সুমুদ্রিত যে সেজন্যে পুস্তকের একাধিক মুদ্রাকরপ্রমাদ সুদ্ধ মার্জ্জনীয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Chateaubriand: A Biogrophy—By Joan Evans—
(Macmillan & Co.)

আলোচ্য জীবনকাহিনীটি বিভিন্ন গ্রন্থ এবং প্রধানতঃ শাতোব্রীয়াঁর স্বরচিত আত্মস্মৃতি অবলম্বনে প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থকর্ত্রী প্রাপ্তিস্বীকার করেছেন মুখবন্ধে, নিঃসঙ্কোচে, কিন্তু আদ্যন্ত গ্রন্থখানির মধ্যে দু'একটি কবিতা ছাড়া কোথাও ফরাসী বচন উদ্ধৃত করা হয় নি, কিম্বা কোন্ ঘটনা কি গ্রন্থ হতে সংগৃহীত হয়েছে তার কোন ইঙ্গিত নাই। আর নাই শাতোব্রীয়াঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সমালোচনা বা তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের পরিচয়। ফলে কাহিনীটি দাঁড়িয়েছে সহজপাঠ্য; কিন্তু যাঁরা যথার্থ সাহিত্যের অনুরাগী এবং ফরাসী কথা-শিল্পের অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইতিবৃত্তে অনুরক্ত তাঁদের কাছে এ রচনা নিরর্থক প্রতীয়মান হবে।

সাহিত্যিক হিসাবে আজ শাতোব্রীয়াঁর খ্যাতি লুপ্তপ্রায়, কিন্তু জীবদ্দশায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল তিনি স্বদেশের কথাশিল্প ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করে এসেছেন। সে শতাব্দীকাল পূর্ব্বের কথা, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী যখন তাঁর বিস্মৃত গরিমা ব্যক্ত করবার ভার গ্রহণ করেছেন তখন উচিত ছিল ব্যক্তিগত জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক আবহের প্রবর্ত্তন করা। সে শক্তি বা তদুপযুক্ত বিদ্যাবত্তা বোধ করি গ্রন্থকর্ত্রীর নাই। আশ্চর্য্য লাগে প্রকাশক-সঙ্ঘের দায়িত্বের অভাব দেখে। পাঠক-সম্প্রদায়ের রুচি অরুচি যাই হোক, তাঁদের কর্ত্তব্য সাহিত্যের উৎকর্ষ বজায় রাখা—তা না করে, তাঁরা একযোগে বর্ত্তমান গ্রন্থের মত অন্তঃসার-

শূন্য বেসাতি দিয়ে সাধারণের ধীশক্তি আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। অনেকে বলেন আজকালকার জরাগ্রস্ত যুগে বিশুদ্ধ সাহিত্যের মহত্ত্ব অবধারণ করবার মতো পাঠকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কথাটি বহু প্রচলিত হলেও, সত্য নয়। সকল শ্রেণীর পাঠক সংখ্যাই উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, কিন্তু পরিবেশনে হচ্ছে অসামঞ্জস্য।

গ্রন্থখানি আকারে সুবৃহৎ এবং বহু বৈচিত্র্যময় ঘটনায় সমাচ্ছন্ন হলেও হৃদয় স্পর্শ করে না ঐ একই কারণে—ঐতিহাসিক পটভূমিকার অভাবে অনেক কিছু মনে হয় অবান্তর ও কৃত্রিম। শাতোব্রীয়াঁর ভূ-পর্য্যটন কাহিনীর অধিকাংশ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত হয়েছে, মায় আলো ছায়া ও আকাশ বাতাসের ক্ষণিক খেলা পর্য্যন্ত। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাপারের পাশাপাশি থেকে সে স্মৃতিখণ্ডগুলি সৌন্দর্য্য হারিয়েছে শোচনীয় রূপে। অনেক বর্ণনা রংদার ভাষায় রঞ্জিত হলেও উৎসব-শেষের বাসি ফুলের মত দীপ্তিহীন। প্রাচ্য দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিচ্ছেদটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার এবং কতকটা স্থান-সংক্ষেপের জন্য আর কতকটা ভাষান্তরে যাওয়ার ফলে দাঁড়িয়েছে রেল কোম্পানীর টাইম্-টেবেল্-এর মতো নীরস।

এত দোষ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থকর্ত্রীর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয়, তাঁর সরলতার জন্য। যে-রূপ নির্লিপ্ত ঔদার্য্যের সঙ্গে তিনি শাতোব্রীয়াঁর বহু অবৈধ প্রেম-ব্যাপার ও রাজনৈতিক ফন্দিবাজীর কথা ব্যক্ত করেছেন, পাকা জীবনী-কারের দ্বারা সে-রূপ কখনই সম্ভব হতো না। গ্রন্থখানি না হয়েছে প্রশস্তি-সর্ব্বস্ব না হয়েছে কলঙ্ক-কীর্ত্তনে মুখরিত। এক প্রকার ভাল, কারণ পাঠকের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে।

গ্রন্থখানির মধ্যে একটি মাত্র চরিত্র ভাস্কর্য্যের মতো ফুটে উঠেছে, সেটি হচ্ছে শাতোব্রীয়াঁর ভাগ্যহীনা সহধর্ম্মিনী। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁর নায়কের চরিত্রগত দুর্ব্বলতাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে গিয়ে যাবতীয় স্ত্রী-সুলভ দোষ চাপিয়েছেন কৃশাঙ্গী সাধ্বীর স্কন্ধে। মেয়েলী হাতের ছোট ছোট শাণিত ঘায়ে এই চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—যেন যে-কোন ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রীর প্রতীক।

ভদ্র মহিলাকে ভাগ্যহীনা বলেছি কারণ শাতোব্রীয়াঁ শুধু আর্থিক ও নৈতিক প্রতারণায় ক্ষান্ত ছিলেন না—দাম্পত্য জীবনকে বর্জ্জন করে এসেছেন প্রায় আজীবন।

গ্রন্থকর্ত্রী কাহিনীটির উপসংহারে এসে জবাবদিহি দিয়েছেন খুব মজার। বলেছেন রাজনীতি তাঁর নায়কের স্বাভাবিক পেশা নয়, তিনি ছিলেন আত্মভোলা কবি কিন্তু তাঁর কবিত্ব বং-এর খেলায় বা বাক্য-রচনায় ফুটে ওঠে নি, ফুটেছে জীবন যাপনের ভঙ্গীতে। কবিত্ব যদি উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর হয় তাহলে বলতে হয় সে যুগের অধিকাংশ অভিজাত ধনী ব্যক্তি ছিলেন কবি।

যে ব্যক্তির লাম্পট্য ও ধাপ্পাবাজী প্রতিপদে বিকশিত তার প্রতি গ্রন্থকর্ত্রীর প্রগাঢ় অনুরাগ সারল্যের পরাকাষ্ঠা মনে হয়। বাড়াবাড়ি সন্দেহ নাই কিন্তু শাতোব্রীয়াঁর অনেকগুলি গুণ ছিল যথার্থই প্রশংসনীয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ কক্ষ যতই দুর্নীতিতে দূষিত হোক না কেন বাহিরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ ছিল আত্মবিস্মৃত কবির মতো। তাঁর ভ্রমণ-স্পৃহা ও ভাষার আবেশ, ছন্দ ও রং হচ্ছে তার সাক্ষ্য। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে সাহস।

দ্যুক্ দাগিয়েঁ-এর অন্যায় প্রাণদণ্ডে অর্থকরী দৌত্যকার্য্যে ইস্তফা দিয়ে নেপোলিয়ান-এর বিরাগ-ভাজন হতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। একাধিকবার কর্ত্তৃপক্ষের শ্রুতিকটু ইস্তাহার প্রচার করেছেন।

আজ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতামত অসঙ্গত ও পরস্পর-বিরোধী প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেই সময় তাঁর বক্তব্যের ওজস্বিতা শিক্ষিত জনসাধারণকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িত্রী অবশ্য শাতোব্রীয়াঁর সমসাময়িক প্রতিষ্ঠার কিছুই উজ্জীবিত করতে পারেন নি, উপরন্তু পরবর্ত্তী কালের কথা-শিল্পীদের কথা উত্থাপন করে অযথা নিজের অজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করেছেন। বলেছেন বায়রন, হিউগো, লামার্তিন, ভিঞি, মিশেলে—এমন কী ফ্লোবেয়ার পর্য্যন্ত শাতোব্রীয়াঁর অনুকরণ করে প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই উক্তিটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে গ্রন্থখানির উপসংহারে নতুবা অনেক পাঠকের উৎসাহ বিরাম লাভ করতো মধ্য পথে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

The Boundaries of Science—By John Macmurray (Faber and Faber Ltd.) 7/6 net.

দার্শনিক ও সাধারণ পাঠক মহলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক জন্ ম্যাক্‌মারের নাম সুপরিচিত; জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর দার্শনিক আলোচনার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। অবশ্য টি. এ. জ্যাক্‌সন তাঁর 'ডায়ালেকটিস্' গ্রন্থে ম্যাকমারের সাম্যবাদী দর্শনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর বক্তব্যকে একেবারে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব হয় নাই। তত্ত্ব ও ব্যবহারের ঐক্যমূলক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই ডায়ালেকটিক দর্শনের প্রাণ স্বরূপ। কাজেই বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ইতিহাসের ধারার সঙ্গে পরিচয় ডায়ালেকটিক বস্তুতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য। সঙ্গে সঙ্গে যদি বিজ্ঞানের প্রগতির কোন শেষ সীমান্ত নিদ্ধারণ ভারসহ ও যুক্তিসম্মত হয়, তা হ'লে ডায়ালেকটিকেরও রূপান্তর ঘটবে কি না, এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। এ দিক থেকে আলোচ্য বইখানিতে অনেক চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে। বইখানির বিষয়বস্তু অবশ্য মনোবিজ্ঞানের দার্শনিক আলোচনা; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত নিবাত পরিমণ্ডলে পৌঁছাবার আগে বিজ্ঞানকে জড় ও দৈব প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের পথে অনেক ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সেই চিন্তাধারার লুপ্তপ্রায় বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস মার্কস্‌বাদীরা বহু কষ্টে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র ঘেঁটে উদ্ধার করেছেন; তাঁদের মধ্যে হেসেন, হগ্‌বেন, ক্রোদার, বার্নাল প্রভৃতির নাম অগ্রগণ্য। এই বইখানিতে তাঁদের নামের উল্লেখ না থাকলেও, গ্রন্থকার যে তাঁদের আবিষ্কার ও মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই।

তবে ম্যাক্‌মারের পণ্ডিতজনোচিত লেখায় এত 'যদি' ও 'কিন্তু'র বাহুল্য যে এমন কি বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতবাদকেও মার্ক্সীয় না বলে মার্ক্-সান্তিক বলাই সঙ্গত। আর সেইজন্যই বোধ হয় তিনি মানসিক ব্যাপারগুলিকে সামাজিক শক্তি-সঙ্ঘাতের পরিণাম ফল মনে না করে বরঞ্চ খানিকটা স্বতন্ত্র কারণের পর্য্যায়েই ফেলবার চেষ্টা করেছেন। অধিকন্তু বিজ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে রাজা ক্যানিউটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করলেও তিনি এমন প্রত্যয়সমষ্টি ব্যবহার করেছেন ও এ প্রসঙ্গে এমন বিচার-পদ্ধতির

অনুসরণ করেছেন যা দার্শনিক মহলে সুপ্রচলিত হলেও মার্ক্‌স্‌বাদীর দৃষ্টিতে কথার জাল বোনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ম্যাক্‌মারের মতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচার ও বিশ্লেষণের সঙ্গে যার সম্পর্ক সে হচ্ছে world-as-means; আর world-as-end-এর সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক বলে, ধর্ম্মচেতনা ছাড়া world-as-means অর্থাৎ বিজ্ঞানের শেষ পর্য্যন্ত কোন অর্থ থাকতে পারে না। অবশ্য তিনি বিজ্ঞানের এই জাতীয় দার্শনিক সীমা ছাড়া বিষয়বস্তুগত সীমা নির্দ্ধারণের বৃথা চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু এই দার্শনিক প্রত্যয়গুলিকে ম্যাক্‌মারে স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিয়েছেন; হয়তো বা তাঁর গভীর ধর্ম্মগত সংস্কারে বাধা পেয়েই বিশ্লেষণীবৃত্তিকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে। কিন্তু যাঁরা নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদের অনুসরণ করেন, তাঁরাও world-as-means ও world-as-end জাতীয় প্রত্যয়কে মেনে নিতে রাজী হবেন না, মার্ক্‌স্‌বাদীরা তো দূরের কথা। ম্যাক্‌মারে তাঁর বক্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনোবিজ্ঞানের মানসিকতা ও মানসিক চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা ও গম্ভীর আলোচনা করেছেন। কিন্তু খানিকটা নব্য হেগেলীয় দর্শনসুলভ *a priori* বিচার পদ্ধতির প্রভাব তিনি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই বলে মনে হয়।

মূলতঃ খানিকটা মার্কসীয় দর্শন ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বের সংমিশ্রণে ভাববাদের প্রক্ষেপের ফলে ম্যাক্‌মারের মতবাদ গঠিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উদ্ভবের পর্য্যায়ক্রম সম্বন্ধে তাঁর ধারণার উল্লেখ করা যেতে পারে। ধন উৎপাদনের পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তনের কথা মেনে নিয়েও তিনি বাহ্য প্রকৃতির বিজ্ঞান কেন প্রথমে উদ্ভূত হল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে মানসিকতার আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটিয়েও পদার্থ-বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও প্রসার সম্ভব বলেই এটা হতে পেরেছিল; ক্রমে জীববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রসারের পরে যখন মানুষ মনের রাজ্যের বিধি আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলো তখনই দেখা গেল যে মনের দিক থেকেই আসে মনোবিজ্ঞানের প্রসারের পক্ষে প্রধান বাধা। অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ যতই বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসতে লাগলো, ততই বদ্ধমূল মানসিক অভ্যাসগুলির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ালো। আর মনের প্রাচীন অভ্যাসের পরিবর্ত্তনের মূলে আছে প্রচলিত মূল্যবোধ; এই

মূল্যচেতনাকে ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করে ম্যাক্মারে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। অবশ্য তিনি বলেছেন যে ঈশ্বর মানা বা না মানার সঙ্গে এই ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই ; কিন্তু world-as-end বা ultimate intentionality প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরবাদে পৌঁছান ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তবে বইখানি বেশ সুখপাঠ্য। কি দার্শনিক বিশেষজ্ঞ, কি সাধারণ পাঠক, কাকেও ম্যাক্মারের মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। কিন্তু যেসব যায়গায় খুব জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, সেখানে অবশ্য স্বভাবতই বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্যের পক্ষে প্রবেশ অনায়াসসাধ্য নয়। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে সব প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। অবশ্য যাঁরা মার্কস্‌পন্থী তাঁরা এ সমস্যাগুলিকে অন্যভাবে বিচার করবেন ; দুএকটি প্রশ্ন হয়তো তাঁদের কাছে অপ্রয়োজনীয়, এমন কি শুদ্ধ কূটতর্ক বলে মনে হওয়াও বিচিত্র নয়। পাঠক ম্যাক্মারের সঙ্গে সব বিষয়ে একমত না হতে পারলেও বইখানি পড়লে মোটের উপর উপকৃতই হবেন ; কারণ লেখক যে মূল সমস্যারি সমাধানের চেষ্টা করছেন, সেটা হচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্ব ও ব্যবহারের সম্পর্ক। ধর্ম্মগত ব্যবহার ছাড়াও ম্যাক্মারের সমস্যার সম্পূর্ণ লৌকিক সমাধান কোন পথে সম্ভব এ বিষয়ে চিন্তার উদ্রেকের পক্ষে বইখানা যথেষ্ট সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

Memorandum on the Permanent Settlement (Bengal Provincial Kisan Sabha) Annas Eight.

Society and its Development by Rebati Burman (National Book Agency) Annas Three.

বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য সম্প্রতি সার ফ্রান্সিস্ ফ্লাডের নেতৃত্বে যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, বাংলার কৃষকসভা সেখানে একটী মূল্যবান্ বিবৃতি পেশ করেছে। ফ্লাড কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কারুরই কোন মোহ আশা করি নেই। কিন্তু কমিশনের নিয়োগ অজুহাতে কৃষক সভা যথেষ্ট

পরিশ্রম করে যে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে, তা খুবই সুখের বিষয়। অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে বাংলা দেশে কৃষকসভার সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী; প্রায় সকল জেলাতেই সভার শাখা আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন, যে উদ্দেশ্যে ঐ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল তার ব্যর্থতা, কৃষকের অধিকারচ্যুতি ও নানাবিধ বিড়ম্বনা, মালিকচাষী আর ক্ষেতমজুরদের দুঃখকষ্ট, খাজনাবৃদ্ধি, অবৈধ আদায়, দুর্ভিক্ষ, জলসেচের অব্যবস্থা, ভাগচাষীদের অসুবিধা, মহাজনের অত্যাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সযত্নে কৃষকসভা সংগ্রহ করেছে। ৯০ পাতার বইয়ে বাংলার চাষীদের ছবি পাওয়া যতটা সম্ভব, তা এখানে পাওয়া যাবে। লেখা সুপাঠ্য, অকারণ উষ্মাপ্রকাশ বড় একটা কোথাও নেই, ছাপার ভুল প্রায় নেই বললেই চলে। এ বইয়ের বহু সংস্করণ না হওয়াই আশ্চর্য্য।

রেবতীবাবুর পুস্তিকাটিতে পাণ্ডিত্যের চিহ্ন স্পষ্ট, কিন্তু অল্প পরিসরে নানা কথা বলার ফলে লেখাটা কটমট হয়েছে। এ ধরণের বই—যা অল্প দাম বলে অনেকেই কিন্‌তে পারে—খুবই সহজবোধ্য ভাষায় না লেখা হলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আশা করি রেবতীবাবু পরবর্ত্তী পুস্তিকাগুলিতে এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়—শচীন সেন, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। মূল্য তিন টাকা।

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়' পড়িয়া যে আনন্দ পাইয়াছি মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিব। আনন্দ পাইবার কারণ অতি সহজ। বাংলাদেশের আরও বহু শত কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় আমি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাবে আমার জীবন আচ্ছন্ন। সমরুচি লোক পাইলে স্বভাবতই আনন্দ হয়। শচীন সেন মহোদয়কে রবীন্দ্র কাব্যোপভোগে আমার বন্ধু জানিয়া তাই আনন্দ লাভ করিলাম। আদ্যন্ত তাঁহার পুস্তক পাঠে আর একবার রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রেরণা আমার মনে প্রাণে সঞ্চারিত হইল।

কিন্তু এই আনন্দ যে অনাবিল তাহা বলিতে পারিলাম না। তাহার প্রধান কারণ, যদিও শচীনবাবু সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় দানের চেষ্টা করিয়াছেন, যে উপায়ে তিনি করিয়াছেন তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা অল্প। আমার মতে—ইহা একান্তই আমার মত—সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে তাহা করা উচিত রচনার কালক্রম ধরিয়া। তাহা

হইলে কি ভাবে স্তরে স্তরে এই সাহিত্যের বিকাশ হইল তাহার ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি দুই-ই সহজসাধ্য হয়।

কিন্তু শচীন সেন মহাশয় তাহা না করিয়া 'রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার কতক-গুলি মূলসূত্র' অবলম্বনে তাঁহার পুস্তকের বৃহত্তম অংশ—'রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকা'—রচনা করিয়াছেন। এই অংশের বিভিন্ন বিভাগ শীর্ষক 'ক' হইতে 'ট' পর্য্যন্ত একাদিক্রমে প্রায় সবগুলি বর্ণকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এই মূলসূত্রগুলি। ফলে, 'জীবন-দেবতা', 'গতি-ধর্ম', 'বিশ্বৈক্যানুভূতি', প্রভৃতি বড় বড় সাইন-বোর্ডের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বরূপ প্রায় আত্মগোপন করিয়াছে। ইহা হইয়াছে আরও এই কারণে যে লেখক রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁহার কাব্য হইতে উদাহরণ সঙ্কলন করিয়াছেন একেবারে বাছাই না করিয়া। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিন্তাধারার নজিরস্বরূপ যদি এই অংশগুলি উদ্ধৃত হইত আপত্তি ছিলনা। কিন্তু কাব্যালোচনায় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কবিতার ভেদবিচার অবশ্য প্রয়োজনীয়।

শচীনবাবুর আর একটি ত্রুটির উল্লেখ করিব। রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে তিনি কোনোই আলোচনা করেন নাই। অনেকে বলিতে পারেন ভাষা ঠিক সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত নহে, তাহা ছাড়া লেখক নিজেও বলিয়াছেন 'একখণ্ড গ্রন্থের সীমাবদ্ধ পরিধির ভিতর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের আলোচনা সম্ভব নহে'...। কিন্তু ভাষাকে বাদ দিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা—বিশেষত পুস্তকাকারে—আমার নিকট প্রায় রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ রচনার মতনই অদ্ভুত। রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁহার রচনার প্রাণ, যথার্থ ই ইহাকে তাঁহার রচনার 'আঙ্গিক' বলা যাইতে পারে এবং এই ভাষা একান্ত তাঁহারই সৃষ্টি। সাহিত্যের ইতিহাসে একজন লেখকের পক্ষে এইরূপ বিস্ময়কর ভাষার সৃজন দুর্লভ।

শচীনবাবুর পুস্তকের এই ত্রুটিগুলির উল্লেখ করিলাম বলিয়া যে ইহাকে আমি মূল্যবান মনে করিনা তাহা নহে। লেখক রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত, বলিয়াই ইহার পরিচয় দিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। শুধু তাই নহে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলায় বা ইংরাজিতে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তিনি পাঠ করিয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতামত সম্পূর্ণ ই তাঁহার স্বকীয় এবং অত্যন্ত স্বাধীন ভাবেই তাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্তৃক আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।